ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা

শক্তি হালদার
সম্পাদিত

ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের ধারা
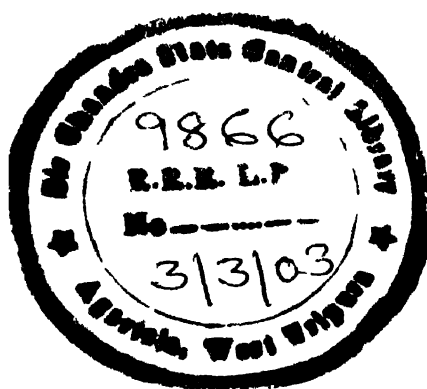
শক্তি হালদার সম্পাদিত

সহযোগী সম্পাদক

নমিতা হালদার (চক্রবর্তী)

TRIPURAR NATYA ANDOLANER DHARA

Edited by *Sri Sakti Haldar*

Associate Editor : Sm. *Namita Haldar (Chakraborti)*

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০০২,

প্রকাশক : দেবকুমার বসু।

বিশ্বজ্ঞান, ৯/৩ টেমার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ : মিত্রারুণ হালদার

লেজার সেটিং : ডায়নামিক

৫৫বি, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ : জগদ্ধাত্রী প্রেস

২৮ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ISBN-81-87329-66-1

মূল্য : এক শত পঁচাত্তর টাকা

উৎসর্গ

ঘরের খেয়ে যাঁরা বনের মোষ তাড়ান, সেই সব সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ যাঁরা স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে যাত্রা-নাটক করেছেন তাঁদের সম্মানার্থে এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করা হোল।

"ত্রিপুরায় নাট্য আন্দোলনের ধারা 'বইটি লেখার ইচ্ছা আমার স্বামীর বহুদিনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে গিয়ে গত পাঁচ বছরে ওনাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবশ্য পল্টুদা এবং নিধুবাবু যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। আগরতলা থেকে Reference পাঠানোর ব্যাপারে ওনাদের সাহায্য না পেলে ওনাকে আরও পরিশ্রম করতে হতো। কলকাতাতে আগরতলার অনেকেই এখন বসবাস করছেন। এদের মধ্যে অনেকেই একসময় নাটকের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে এবং তাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছবি এবং Biodata সংগ্রহ করেছেন। শেষের দিকে একা একা যাতায়াত করতে অসুবিধা হত বলে সবসময় সঙ্গে আমাকে যেতে হত। আমি নিজে দেখেছি অনেকেই সহযোগিতা করেছেন ছবি এবং Biodata দিয়ে আবার কয়েকবার যাওয়া সত্ত্বেও অনেকে সহযোগিতা করেন নি। তাতে অবশ্য বইটি আটকায় নি। উনি মনে মনে দুঃখ পেয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এ যে এত কষ্ট করা সত্ত্বেও বইটি শেষ হওয়া উনি দেখে যেতে পারেন নি। বইটির Final proof দেখে বইটি ছাপা শেষ হওয়ার আগেই উনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমি এই বিশাল দায়িত্ব বহন করতে সক্ষম নই অথচ ওনার শেষ ইচ্ছা এবং অসমাপ্ত কাজ যে ভাবেই হোক শেষ করতেই হবে এই মনোভাব নিয়েই আমি এগিয়েছি। জানিনা যদি আমার অক্ষমতার জন্য যদি কোন ত্রুটি হয়ে যায় সেটা আমার অনিচ্ছাকৃত। তাই পাঠকের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ আমার ভুল সম্পূর্ণ আমারই ভুল। এই গ্রন্থে যে সব লেখা পূর্বপ্রকাশিত বা অন্যান্য লেখক দ্বারা সংযোজিত তা উল্লেখ করা হয়েছে। যে সব লেখায় লেখকের কোনো নাম নেই তার অধিকাংশই শক্তি হালদার রচিত বা সংগৃহিত এই ব্যাপারে কোনো ত্রুটি থাকলে অনুগ্রহ করে আমাকে জানাবেন। পরবর্তী ক্ষেত্রে আমি সংশোধন করে দেবার প্রচেষ্টা নেব। এই বইটি আমাদের পরবর্ত্তী প্রজন্মের কাছে ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাস যাতে পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হয় তারই প্রয়াস। যদি একজন পাঠকও বইটি পড়ে উপকৃত হয় এবং ত্রিপুরার নাটকের গতি কি ভাবে প্রবাহিত হয়েছে পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারে, তাহলেই আমার স্বামীর আত্মা শান্তি পাবে এবং তাঁর প্রচেষ্টা সার্থক হবে। — ইতি

নমিতা হালদার

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা ঃ আলোচ্য সূচী

আলোচ্য বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রসঙ্গ কথা

ত্রিপুরা পূর্বভারতের এক উল্লেখযোগ্য রাজ্য। শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চায় ত্রিপুরার খ্যাতি বহু প্রাচীনকালের। সংস্কৃতিচর্চায় ত্রিপুরার রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল যেমন সুগভীর তেমনি আন্তরিক। সংস্কৃতিচর্চায় অন্যতম হল নাট্যচর্চা। এই নাট্যচর্চার শুরুর ইতিহাস আজও অজ্ঞাত। এই ইতিহাস স্পষ্টতা পেয়েছে উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বে। যাত্রা, নাট্যগীত, কবিগান প্রভৃতি মিলে যে লোকনাট্যের রূপরেখা বাংলার মধ্যযুগে বিকশিত হয়েছিল, তারই প্রসারিত বিস্তার লক্ষ্য করা যায় উনবিংশ শতকের ত্রিপুরায়। ত্রিপুরার রাজপরিবার ছিলেন সংস্কৃতিপরায়ণ।

এই পরিবারের উদার সহযোগিতায় ত্রিপুরায় গড়ে ওঠে নাট্যসংস্কৃতির এক বিমিশ্র প্রতিরূপ। সেখানে বাংলার নাট্যসংস্কৃতির অবদান যেমন ছিল লক্ষনীয়, তেমনি ত্রিপুরার প্রতিবেশী রাজ্য মণিপুরের শিল্পরীতির প্রতিফলনও মিলবে অবধারিতভাবে। তার ফলে ত্রিপুরার নাট্যশিল্প বিচিত্র উপাদানে সমৃদ্ধ হতে পেরেছিল। ত্রিপুরার সংস্কৃতি সাধনার প্রাণপুরুষ ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সঙ্গীত বিশারদ। তাঁরই ঐকান্তিক আগ্রহে ত্রিপুরা হয়ে উঠেছিল আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তীর্থপীঠ। শিল্পসাহিত্য চর্চার আধুনিক কেন্দ্রভূমি হয় আগরতলা। বীরচন্দ্র স্থাপন করেন সঙ্গীত সাধনা মন্দির। এই মন্দিরে যেমন অনুশীলিত হত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, তেমনি গৌড়ীয় ও মণিপুরী রীতিরস সমন্বয়ে সূচিত হয় অভিনব নৃত্যগীত ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা। উক্ত নৃত্যগীত ও পালার উদ্ভাবক ছিলেন মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য। পরবর্তী নাট্যচর্চায় মহারাজা বীরচন্দ্রের নাট্যপ্রয়াস নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাঁর সুযোগ্য সংস্কৃতিপরায়ণ পুত্র মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যও ছিলেন সাহিত্য ও সংস্কৃতির ধারক বাহক। তিনি যাত্রা, কবির লড়াই ও লোকনাট্যচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। বাংলার ঢাকা ও বরিশাল থেকে যাত্রাদল আগরতলায় এসে যাত্রাপালা প্রদর্শন করতেন। তার ফলে আগরতলায় গড়ে ওঠে অপেরা পার্টি। ত্রিপুরার শহরে ও গ্রামে এই পার্টি ধর্মমূলক নাটকের অভিনয় করতেন।

মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আগরতলায় ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ। এটি ত্রিপুরার আদি নাটমঞ্চ। বলাবাহুল্য, এই নাটমঞ্চ

পাশ্চাত্যরীতিতে গঠিত হয়। কলকাতার স্টার থিয়েটার উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজে এসে অভিনয় করে গেছেন। স্টারের নাট্যরীতিই অনুসৃত হত এই থিয়েটারে। এখানে প্রথম অভিনীত হয় মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মা রচিত পঞ্চাংক নাটক 'পতিব্রতা'। আনন্দের কথা, 'পতিব্রতা'ই ত্রিপুরার প্রথম আধুনিক নাটক। এই মঞ্চে অভিনীত হয়েছে ত্রিপুরার রাজপরিবারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রানী' এবং 'বিসর্জন'। এছাড়া গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল বসু ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকও ঐ মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। এই মঞ্চে একটি নাটক তিনদিন অভিনীত হত। প্রথমদিনের দর্শক থাকতেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়দিন থাকতেন যথাক্রমে নারী ও সাধারণ জনগণ। এইভাবে ত্রিপুরার রাজ পরিবারের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ত্রিপুরায় সংগঠিত হয়ে ওঠে নাট্যচর্চা। সেই চর্চার বহতা ধারায় পুষ্ট হয়েছে ত্রিপুরার নাট্যসংস্কৃতি। এই নাট্যসংস্কৃতির দু'টি ধারা। একটি স্বাধীনতাপূর্ব ও অন্যটি স্বাধীনতোত্তর। স্বাধীনতাপূর্ব যুগেই ত্রিপুরার নাট্যসংস্কৃতিতে আসে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যব্যক্তিত্ব হলেন ত্রিপুরেশ মজুমদার। তিনি ছিলেন অভিনেতাও নাট্যসংগঠক। তাঁর ঐকান্তিক প্রয়াসে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমা শহরে ও গ্রামে নাট্যচর্চার বিপুল প্রয়াস ছড়িয়ে পড়ে।

স্বাধীনতোত্তর যুগে ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় আসে যুগান্তর। যুগান্তরপর্বের এই নাট্যধারা পুষ্ট হয়েছে তৎকালীন বাংলা নবনাট্য চেতনার দ্বারা। বাংলা থিয়েটারের শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় ১৯৭২ সালে। ত্রিপুরার নাট্যজগৎ সেই উৎসব পালনেও উৎসাহিত হয়। ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাস যেমন রোমাঞ্চকর তেমনি সমৃদ্ধ। লেখক ও শিল্পী শ্রীশক্তি হালদার মহাশয় গভীর অনুসন্ধিৎসায় ও সুকঠোর অনুশীলিত গবেষণায় এই নাট্যচর্চার ইতিহাস আমাদের শুনিয়েছেন আলোচ্য গ্রন্থে। লেখক শ্রীহালদার নিজে একজন বিশিষ্ট নট, নাট্যপরিচালক এবং নাট্যসংগঠক। ত্রিপুরার নাট্যচর্চার আধুনিক ধারা পুষ্ট হয়েছে তাঁর নাট্যকর্মের প্রয়াসে। অতএব তাঁর মতো অকৃত্রিম নাট্যকর্মী যখন ত্রিপুরার নাট্যচর্চার রূপরেখা আঁকতে বসেন তখন স্বাভাবিক কারণেই তাঁর প্রয়াস পাঠকের কাছে কৌতূহল জাগায়।

লেখক তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছেন ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের ধারা। নামকরণটি নানাকারণে সঠিক। লেখক ঐ ধারায় সন্ধান করতে গিয়ে সাহায্য নিয়েছেন ত্রিপুরার বিভিন্ন নাট্য-গবেষকের গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ ও প্রতিবেদন। ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যগবেষকের নাম শ্রীঅনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। তাঁর একটি অনবদ্য নাট্যপ্রবন্ধের নাম 'ত্রিপুরার বাংলা নাট্যচর্চা'। লেখক শ্রীহালদার শ্রদ্ধার সঙ্গে সেই প্রবন্ধটিকে তাঁর গ্রন্থের প্রথমেই স্থান দিয়েছেন। এছাড়াও এখানে স্থান পেয়েছে বিশিষ্ট নাট্যশিল্পী শিশু সেনগুপ্তের 'আগরতলার নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি' ও বিখ্যাত নাট্যগবেষক শ্রীরমাপ্রসাদ দত্তের

'নবনাট্য আন্দোলনে ত্রিপুরার লোকশিল্পী সংসদ'। এই তিনটি প্রবন্ধে ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিকথা তথ্যসহ বিবৃত হয়েছে। লেখক সংগত কারণেই এই তিনটি রচনা মুদ্রিত করে তাঁর গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। বলা যায় তাঁর ইতিহাস রচনার মাল মশলায় কাজ করেছে ঐ ক'টি প্রবন্ধ। লেখক শিশু সেনগুপ্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে ত্রিপুরার নাট্যমঞ্চে অভিনীত নাটক ও সেইসঙ্গে ত্রিপুরার নটনটীদের এক বিশ্বস্ত তালিকা প্রণয়ন করেছেন। এই তালিকার সাহায্য না নিলে ত্রিপুরার প্রাচীন ও আধুনিককালের নাট্যচর্চার ইতিহাস রচনা সম্ভব নয়। লেখক শ্রীশক্তি হালদার সংগত কারণেই ঐ সব রচনা নির্বিকার চিত্তে গ্রহণ ও গ্রন্থভুক্ত করেছেন। শ্রীহালদার নিজে একজন প্রবল নাট্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। তাঁরই উৎসাহে ত্রিপুরায় গড়ে উঠেছে আধুনিক নাট্যচর্চার ধারা। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্ত ও শিশু সেনগুপ্ত প্রমুখ ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যগবেষকবৃন্দ। তাঁদের নাট্যগবেষণার প্রয়াস উজ্জীবিত করেছে লেখক শ্রীহালদারকে। তিনি বর্তমান গ্রন্থটি রচনা করে এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছেন। তিনি ত্রিপুরার ধারাবাহিক নাট্যচর্চার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছেন। সেইসঙ্গে তিনি তাঁর অকপট নাট্যউৎসাহী সহচরদের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাতর্পণ করেছেন। এই সব উৎসাহীদের সঙ্গে না পেলে ত্রিপুরার আধুনিক নাট্যচর্চায় ব্যাপক সাড়া জাগান যেতো না।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাস রচনা এবং সেই রচনাকে কেন্দ্র করে রচিত বিসর্জন নাটক ত্রিপুরার রাজপরিবারকে আলোকিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তৎকালীন ত্রিপুরার রাজপরিবারের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ্ ছিলেন। স্বাভাবিক কারণেই ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাট্যচর্চা লক্ষ্য করা গেছে। লেখক নিজে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটক পরিচালনা করেছিলেন। আলোচ্যগ্রন্থে ত্রিপুরায় 'রবীন্দ্রনাটকের জোয়ার' অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাটকাভিনয়ের বিস্তৃত তালিকা পাঠকের দৃষ্টিগোচর হবে। এই তালিকা একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিনয়ের ইতিহাস রচনায় উল্লিখিত তালিকাটি বিশেষ সাহায্য করবে আশা করা যায়।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ইতিহাস রচনা করে লেখক শ্রীশক্তি হালদার ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতের একটি অভাবপূরণ করলেন। বলতে দ্বিধা নেই তিনি একটি জাতীয় দায়িত্ব পালন করলেন। নাট্যসংস্কৃতিমনস্ক পাঠকের কাছে আলোচ্য গ্রন্থের চাহিদা বিপুল হবে, আশা করতে দোষ নেই। লেখককে এই সুযোগে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

১ মে ২০০১ **ড. জগন্নাথ ঘোষ**

৩৫এ. কে. এন. সি. রোড (দক্ষিণ)
পোঃ বারাসাত, উঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩২০১

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলন প্রসঙ্গে

'ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা' গ্রন্থটির অংশ বিশেষ পড়েই আমাকে এই প্রবন্ধ লিখতে হচ্ছে সুপ্রিয় দেবকুমার বসুর নির্দেশে। ত্রিপুরার এ নাট্যধারা বাংলা নাটকেরই নাট্যধারা। এ কারণে আমি প্রথম থেকেই এ গ্রন্থটির প্রকাশও সর্বপ্রকার সমৃদ্ধির স্বপ্ন দেখেছি।

বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাস সংগ্রহের আদিপুরুষ ছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের ভিত্তিতেই আমরা লেবেদফকে প্রথম প্রসেনিয়মের পেছনে বাংলা-নাটক উচ্চারিত করবার কৃতিত্ব দিয়ে থাকি। যদিও সে ধারার সঙ্গে বাংলা নাটক ও নাট্যশালার কোন যোগ বা প্রভাব নেই। এর প্রায় ৩৫/৪০ বৎসর পরে এই প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং ধারাবাহিকভাবে আজও নানা বিবর্তনের ভেতর দিয়ে চলে আসছে। ব্রজেনবাবুর এই মহৎ প্রচেষ্টার একটা সীমাবদ্ধতা আজ আমাদের পীড়িত করে। তিনি প্রথম দিকে কলকাতা ও মফঃস্বলের কিছু নাটকাভিনয়ের সংবাদ দিলেও শেষ দিকে কলকাতার নাট্যদলের সংবাদেই গ্রন্থ শেষ করেছেন। তাঁর গ্রন্থের সূত্র ধরে শঙ্কর ভট্টাচার্য 'বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান' গ্রন্থে কলকাতা নাট্যমঞ্চের প্রায় প্রতিটি দিনের ইতিহাস রচনা করে এক মহৎ সম্পদ দান করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য, অজিত ঘোষও কলকাতার রঙালয়গুলির নাটক ও নাট্যচর্চা দিয়েই তাঁদের আলোচনা সীমিত করেছেন। আমাদের হাতে যে নাট্যচর্চার ইতিহাস আলোচনার সম্পর্কিত গ্রন্থ আছে, তার কোনোটিই তার বাইরে যায়না, বা যদি গিয়ে থাকে, তবে দুর্ভাগ্যবশে আমার নজরে পড়েনি।

১৯৬০ সালের কাছাকাছি আমার মনে হয় কলকাতাকে ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়েছে মফঃস্বল বাংলার নাট্যচর্চা। আমি ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ঐ সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গে জেলা-ওয়ারী নাট্য-চর্চা ধারার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ শুরু করি। কিন্তু আর্থিক সহায় না থাকায় তা শেষ করতে পারিনি। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় শুনেছি সাহিত্য সংসদ থেকে এর সম্পূরক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। নাট্যশোধ সংস্থা পরিকল্পনায় ব্রতী হয়ে শিলচরবাসী তীর্থঙ্কর চন্দের সহায়তার কয়েকটি জেলার বিশদ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এ ব্যাপারে আমিও ব্যক্তিগতভাবে মুর্শিদাবাদ ও মালদহের নাট্যচর্চার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করে দিয়েছি। এই মানসিকতার প্রেক্ষিতে আমার কাছে পৌঁছাল শক্তি হালদার এবং নমিতা হালদার (চক্রবর্তী) সম্পাদিত 'ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের খণ্ডাংশ। আমি সাগ্রহে বরণ করে নিলাম অংশটি। কারণ আমি জানি,

অন্তরের আনিবার্য তাগিদ না থাকলে ভূতের বেগারের মত এমন ধন্যবাদহীন কাজের দায় কেউ গ্রহণ করে না। এজন্য প্রথমেই সংকলকদ্বয়কে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

যেটুকু পড়লাম তাতে বোঝা গেল, ত্রিপুরার নাট্য ইতিহাস সংগ্রহের কাজ কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে কেউ কেউ করে থাকলেও এমন করে একটি সামগ্রিক ইতিহাস নির্মাণ চেষ্টা ইতোপূর্বে হয়নি। প্রাথমিক নির্মাণ প্রচেষ্টা যে কী শ্রমসাধ্য ব্যাপার তা ব্যাক্তিগত ভাবে আমার জানা আছে। এরূপক্ষেত্রে সহযোগিতা, সমর্থন ও উৎসাহ বাক্য যতদুর পাওয়া যায়, কার্যকালে তার শতাংশও কার্যকর হয় না। এসব বাস্তব অসুবিধা স্বীকার করেও সম্পাদকদ্বয় যে কী বিপুল উদ্যমে যে এই প্রথম খণ্ডটি সংগ্রহ ও সম্পাদন করেছেন, এত চিত্র ও নথি সংগ্রহ করেছেন, তা স্বতঃই কল্পনা করা যায়। তা তাঁদের নাছোড়বান্দা লেগে থাকার গুণ, নির্ভেজাল নিষ্ঠা, বিপুল জনসংযোগ এবং সর্বোপরি হিসাবহীন শ্রম ও অর্থ ব্যয়ের পরিচয় দেয়।

যাইহোক প্রথম প্রয়াস হিসবে এ গ্রন্থে অনেক ত্রুটি থাকতেই পারে। কিন্তু ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক দৃষ্টি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। গ্রন্থে তার কিছু অভাব আছে। প্রামাণ্য কথা ছাড়া ইতিহাস হয় না। সর্বদা তথ্য সংগ্রহের উৎসের উল্লেখ করতে হয়। এ গ্রন্থে প্রায় কোথাও-ই তা করা হয়নি। আশা করা যায়, দ্বিতীয় খণ্ডে, এবং এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে সম্পাদকেরা এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

দ্বিতীয়ত, নাট্য ইতিহাস একইসঙ্গে নাট্য রচনা, নাটক-মঞ্চায়ন, নাট্য প্রয়োগের ইতিহাস। সংকলকেরা মোটামুটি নাট্যরচনা ও মঞ্চায়নের ইতিহাস রচনা করেছেন। ত্রিপুরার মঞ্চগুলি কি ভাবে নির্মিত হল, তাদের অবস্থান, ইতিহাস, মেক-আপ, আলো, আবহ, সঙ্গীত, নৃত্য— ইত্যাদি দিকগুলির ক্রমবিবর্তনের সংবাদ-ও নাট্য ইতিহাসের অঙ্গ। আমি প্রত্যাশা করব নাট্যকর্মী হিসাবে শক্তিবাবু এগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে তাঁর সংগৃহীত ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করবেন। আসলে এদিকে তাঁদের দৃষ্টি ছিল না। না হলে এখণ্ডের প্রবন্ধ গুলিতেও লেখকেরা এসব বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতার বিবরণ দিতে পারতেন।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চ্চার ইতিহাস বাংলা নাট্যচর্চ্চার ইতিহাসেরই অঙ্গ। অতএব বলা যায়, শক্তিবাবু আমাদের জানা ইতিহাসের পরিধি একান্তভাবে বিস্তৃত করে দিলেন। 'প্রথম খণ্ড' শব্দটি বুঝিয়ে দেয় যে তাঁর একাধিক খণ্ডের পরিকল্পনা আছে। খণ্ডে খণ্ডে এ ইতিহাস সমগ্র হয়ে উঠুক। তাঁর গ্রন্থ ব্রজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস' গ্রন্থটির মত বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারে অক্ষয় আসন অধিকার করে থাকবে— এই প্রত্যাশা জানিয়ে শেষ করছি।

৫. ৬. ২০০১

অঙ্গনা, কৃষ্ণনগর, নদীয়া — নীরদবরণ হাজরা

শ্রদ্ধার্ঘ্য

সদ্য প্রয়াত শিল্পী শক্তি হালদারের কর্মজীবন

নিধু হাজরা

আমার প্রিয় বন্ধু আর্ট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ বিমল কর, দুরালাপনে জানালেন — আমাদের অতি প্রিয় শিল্পী শক্তি হালদার আর নেই। একুশে আগষ্ট রাত এগারটায়ও তিনি খাওয়া-দাওয়া সেরে কথাবার্তা বলেছেন পরিবারের অন্যদের সঙ্গে। হঠাৎ বুকে প্রচণ্ড ব্যথা। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ শুরু। সব তৈরী হয়ে বি এম বিড়লা হার্ট রিসার্চ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয়। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, পথেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন শক্তি হালদার।

নিধু হাজরা

দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সাথী প্রিয় বন্ধুর হঠাৎ এই প্রয়াণে গভীরভাবে শোকাহত হয়েছি। '৫৯ সনের মেদিনীপুরের বন্যার ত্রাণ তহবিলের চাঁদা তুলতে গিয়ে মেলার মাঠে একটা চায়ের দোকানে শক্তিবাবুর সঙ্গে আলাপ। আলাপের কারণটা ছিল— সেই সময় মানুষ যখন দশ নয়া, পাঁচ নয়া বা সিকি আধুলী বাক্সে দেয় তখন একজন লোক পাঁচ টাকা দিচ্ছে, অবাক হবার কথাই, বিশেষভাবে যার মাসিক বেতন একশ টাকার কম।

১৯৩২ সালে ৩০ শে সেপ্টেম্বর, শক্তি হালদারের জন্ম কোলকাতায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মহামারি, দেশভাগ এ সকল তাপ তাঁর দেহে ও মনে এবং পরিবারে পড়েছিল। ১৯৫০ সনে একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত যুবক হয়ে এসে পড়েন আগরতলায়। সঙ্গে সম্বল সামান্য কিছু বিদ্যা ও রং তুলি। দেবসাহিত্য কুটিরে ছবি আঁকতে গেছেন, পোষায় নাই। সেই যে একবারের জন্যে আগরতলায় এলেন তেমনিভাবে আবার মাত্র পাঁচ বছর আগে দমদমের দেবীনিবাস রোডে ফ্ল্যাট কিনে চলে গেছেন।

শক্তি হালদার দীর্ঘ সাতচল্লিশ বৎসর আগরতলায় কাটিয়েছেন। এই সময়ের প্রায় সবটাই তার শিল্পমনের আবেগ ছোঁয়া, হাতের তুলির টান প্রসারিত হয়েছিল গহন অরণ্যের

ছায়ায় আদিবাসী পল্লী থেকে রাজভবনের প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত। তাঁর আঁকা অসংখ্য ছবি এম বি বি কলেজে, বেণুবন বিহারে, মিউজিয়ামে সরকারী আর্কিসগুলোতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালে শক্তিবাবু রাজ্যের বাহিরে ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন নিয়ে চিত্র প্রদর্শনী করেন কোলকাতার গভর্ণমেন্ট প্লেসে। এই একক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কর্ণেল উইলসন। ত্রিপুরার বাহিরে তার শেষ চিত্র প্রদর্শনী হয়েছে দু'বছর আগে কোলকাতার গোর্কী সদনে। উদ্বোধন করেন সোভিয়েত রাশিয়ার কনসোলেট জেনারেল। এই প্রদর্শনীর বৈশিষ্ট্য ছিল ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা ও উপকথাভিত্তিক চিত্র। শিল্পী রাইমা সরমা কাহিনী সহ সাঁইত্রিশটি চিত্রে ত্রিপুরার উপকথাকে জীবন্ত করে তোলেন। এই উপলক্ষ্যে রিয়াং বিদ্রোহের গায়ক রতনমণির জীবনী করেছেন। প্রদর্শনী ও বইটি বিশেষ সমাদর লাভ করে।

ত্রিপুরার মানুষের কাছে শক্তি হালদার একজন চিত্র শিল্পী ও আর্ট শিক্ষকরূপে পরিচিত। শিক্ষা অধিকর্তা গোবিন্দ নারায়ণ চ্যাটার্জী শক্তিবাবুকে আর্ট মাস্টার, এভাবেই প্রাথমিক বিভাগে নূতন নগর স্কুলে চাকুরী দিয়েছিলেন। এই সুযোগটা তিনি যথার্থভাবেই গ্রহণ করে আদিবাসী জনজীবনকে শিল্পের অঙ্গনে প্রসারিত করেছেন ও কোলকাতার শিল্পপ্রেমীদের কাছে পৌঁছে দেন। নিজে একটি আর্ট স্কুলও নিজের বাড়ীতে পরিচালনা করে অসংখ্য শিশুকে হাতে-কলমে ছবি আঁকা শিখিয়েছেন।

শক্তিবাবু একজন বিশিষ্ট অভিনেতা, নাট্য পরিচালক, নির্দেশক এবং অনেকগুলো বই লিখেছেন। কাব্য, নাটক, গল্প এবং ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বিরল উপন্যাস ও জীবনী সাহিত্য পর্যন্ত তাঁর শৈল্পিক হস্ত, ভাব ভাষা ও মানসিকতায় প্রসারিত। রাজতন্ত্রের ও ত্রিপুরায় রাজপ্রাসাদকেন্দ্রিক শিল্পচর্চা ও নাট্যচর্চাকে স্বাধীন ভারতের জনগণের দুয়ারে যারা হাজির করলেন তাদের মধ্যে শক্তি হালদার অন্যতম প্রতিভা।

তিনিই নবনাট্য আন্দোলনের (আই পি টি-এর) ধারা নিয়ে এলেন ত্রিপুরার মাটিতে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্ররা যখন রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী করে আলোড়ন এনেছেন, সেই ধারাই এসে পড়ে ত্রিপুরায়। ১৯৭০ সালে ত্রিপুরায় শক্তি হালদার শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালকের সম্মান লাভ করেন।

লোক সংস্কৃতির বিশেষ মাধ্যম যাত্রানাট্য সংস্কৃতি। ত্রিপুরার জনজীবনের উপর যাত্রা বিশেষ প্রভাবশীল। পাঁচের দশকে, ছয়ের দশকে ও সাতের দশকে আগরতলার চিলড্রেন পার্কে শীতের যাত্রা শিল্পীদের সংলাপ শোনা যেত গভীর রাত পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গে যাত্রা শিল্পে যখন শান্তিগোপাল ও ভৈরব গাঙ্গুলীদের আবিষ্কার করলো সেই সময় ১৯৭৪ সালে শক্তি হালদার আগরতলায় যাত্রা সম্মেলন আরম্ভ করলেন। তিনি ছিলেন তার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। ১৯৭৮ সালের শেষদিক পর্যন্ত চালিয়ে নেন। ননী দাস, নরেশ পোদ্দার, হরিপদ দাশ, হীরালাল সরকার, যতীন দাস প্রমুখ যাত্রাকে

শক্তিবাবুর নেতৃত্বে মর্যাদার আসনে নিয়ে এলো। লেনিন, হিটলারের মত এখানেও রাতের পর রাত অভিনয় হল 'সামসের গাজী'। এমনকি দস্যুরানী ফুলন দেবীও রবীন্দ্রভবনে অভিনীত হয়। দুর্গাবাড়ীর মঞ্চ রূপান্তরিত হল মুকুন্দ মঞ্চে। এক সময় সংকীর্ণ চিন্তার মুখে পড়ে শক্তি সরে গেল যাত্রা সম্মেলন থেকে।

কত স্মৃতি, কত কথা মনে পড়ে। ১৯৮০ সালের জুন মাসের ছয় তারিখ ত্রিপুরা রাঙ্গি য়ে গেল এক ভ্রাতৃঘাতী রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায়। ঐদিন সন্ধ্যায় আগরতলা শহরের মানুষ দেখতে পেল দূর দূর অঞ্চলে জ্বলছে গাঁয়ের মানুষের বাড়ীঘর। মান্দাই বোরাখা এসব অঞ্চলই হবে। উদ্বিগ্ন রাত কাটার পর সকাল বেলা চলে গেলাম শক্তিবাবুর মহিলা কলেজের সম্মুখে পেলেস কম্পাউণ্ডের বাসায়। বাড়ীর সম্মুখে গেইটে দাঁড়িয়ে ডাক দিতেই শক্তিবাবু দোতলা থেকে দ্রুত নেমে এসে নিয়ে গিয়ে তাঁর ছবি আঁকার রুমে বসালেন। দেওয়ালে টাঙ্গানো আদিবাসীদের পিঠে ঝুলানো শিশু সহ বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে কেঁদে উঠলেন শিল্পী ও মানবপ্রেমী শক্তি হালদার। কান্না যেন ওর থামছিল না। আমি নবীন সেনের কুরুক্ষেত্র মহাকাব্যের অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রসিদ্ধ উক্তি উচ্চারণ করে বললাম—"বীর শোক অশ্রু নহে অসির ঝঙ্কার।" শক্তিবাবু চোখ মুছলেন। বললেন, কি করে বা দাঙ্গার বিরুদ্ধে মানুষের হয়ে মানুষের কাছে আবেদন রাখবো। দু'জনেই আবেদনের বয়ান ঠিক করলাম। কিছু কাটছাট করে শক্তিবাবুর হাতের লেখা সুন্দর তিনিই কপি করলেন। রাতেই শহরে কারফিউ জারী হয়ে যায়।

শিল্পের ও সাধারণ ক্ষেত্রে শক্তিবাবুর কোন ডিগ্রী না থাকার জন্যে, বিরাট প্রতিভার অধিকারী হয়েও তিনি উমাকান্ত ও তুলসীবতী স্কুলে আর্ট মাস্টার হয়েই অবসর নিয়েছেন। মাঝে জরুরী অবস্থার সময় পানিসাগরে বদলি হন। ত্রিপুরাতে প্রথমদিকে তাকে প্রচণ্ড আর্থিক কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল। নব্বই-এর দশকের গোড়ায় শক্তিবাবু অবসর নেন। ঐ সময় তিনি লেখালেখির জগতে পাকাপাকিভাবে এসে পড়েন। শক্তিবাবু রংতুলির পাশাপাশি শক্ত হাতে কলম ধরলেন। ধারাবাহিকভাবে প্রতিদিন তার লেখা পত্রিকায় থাকত ত্রিপুরার আদিবাসী জনজীবনের উপর। তার লেখা উপন্যাস "অজান" ১৯৯৪ সালে অক্টোবরে প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ের তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'কাঞ্চনমালা'। শক্তি হালদার আদিবাসী পল্লীতে বারবার গেছেন, থেকেছেন দিনের পর দিন। শক্তি হালদার কবিতাও লিখেছেন—"ত্রিপুরা তোমাকে" তাঁর কাব্য গ্রন্থ। "এই শহর আগরতলা" তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। শক্তি হালদারের প্রচুর ছবি ত্রিপুরায় রয়েছে। স্কুলে, কলেজে, মিউজিয়ামে রয়েছে অনেক ছবি। আর্টের ছাত্রছাত্রী রয়েছে এবং প্রচুর বইয়ের প্রচ্ছদ তিনি এঁকেছেন। রাজ্য সরকারের এক সময়ে অনেক বইয়ের প্রচ্ছদ তাঁর আঁকা। তাছাড়া বইমেলা উপলক্ষ্যে আগরতলায় বই প্রকাশের যে জোয়ার এসেছে সেই সময় তিনি অসংখ্য বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকেন। শিল্পের এই মাধ্যমটিকে কেন্দ্র করে শক্তি হালদার ত্রিপুরার ঘরে ঘরে প্রবেশ করেন। স্কুল ম্যাগাজিন, ক্লাবের পূজা সংখ্যা,

শেষ প্রুফ দেখায় ব্যস্ত শক্তি হালদার

বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই এসবে তার উৎসাহ কম ছিল না। ১৯৮৮-তে আমার দুটি বই একত্রে বইমেলায় বের হচ্ছে। কোলকাতার আর্টিস্ট যে ছবি আঁকেন তাহা আমার মোটেই পছন্দ হয় নাই। শক্তিবাবু দুটোরই মিজোরামেব মিজোরাও 'ঘরনী' বই দুইটির সুন্দর পরিকল্পনা করে ছেলে মিত্রারুণকে দিয়ে আঁকালেন এবং ছবি দুটি সকল পাঠকের প্রশংসা লাভ করে। বিশেষভাবে মিজোরামের একজন মহিলার ছবি ছিল এককথায় অপূর্ব। বিমূর্ত চিত্র আঁকতে শক্তিবাবুকে আমি খুব দেখি নাই। চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের ত্রিপুরার আত্মার মূল থিমটা তিনি ধরেছিলেন—গণতান্ত্রিকতা জনশিক্ষা এসব।

মোহিতলাল মজুমদারের কবিতার মত শক্তি হালদার মনে করতেন "যদিও মোরা কাব্য লিখি/তবু চালের দর জানি/হৃদয় যে উদরের মূল/সেকথা হাজারবার মানি।" শক্তি হালদার প্রথম জীবনে সরস্বতীর আঙ্গিনায় ঘুরে ঘুরেই লক্ষ্মীর সন্ধান পেয়েছেন। শক্তি হালদারের শক্তির উৎস ছিল— যে কোন বিপরীত অবক্ষয়ী ও অপসংস্কৃতি এবং গণতন্ত্রের বিরোধী শক্তির সঙ্গে অবিরাম সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া। এই সংগ্রাম তার আত্মার শুদ্ধতা ও বোধের উপলব্দ্ধিতে নিয়ত অক্সিজেন সরবরাহ করেছে। তাই মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা আগেও আমার পত্র ও ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসের সংখ্যাবিশেষ পাঠানো পাণ্ডুলিপি পড়েছেন ও প্রেস থেকে আসা 'প্রুফ' দেখেছেন। সংগ্রামহীন দুর্বল ব্যক্তি এতটা পথ হাঁটতে পারে না।

শক্তি হালদারের শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শেষ প্রার্থনা ছিল, দুটি বই সম্পাদন করা। বই দুটি সংস্কৃতি আন্দোলনের রূপরেখা। মূলতঃ এই দুটি বিষয়ে শক্তি হালদার অবশ্যই লেখার ও বলার — দুই-এরই অধিকারী। এসব ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে যোগাযোগ ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে তার সীমাবদ্ধতা ছিল। তার উপর ত্রিপুরা থেকে তিনি পাঁচ

বৎসর আগেই দমদমে দেবী নিবাস রোডে ফ্ল্যাট কিনে চলে যান। এ বিষয়ে তিনি আমার সহযোগিতা চেয়েছিলেন। আমি এ বিষয়ে তাকে আমার ক্ষুদ্র লাইব্রেরী থেকে বইপত্র এবং জনসংযোগের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ত্রিপুরা স্বাধীনতা উত্তর নাট্য ও সংস্কৃতি আন্দোলনের অনেক বিশেষ ব্যক্তিত্ব এখনও জীবিত রয়েছেন। কাজটা খুবই বড়। তাঁর ইচ্ছা ছিল এ সকল ব্যক্তি মানুষগুলো থেকে তাদের অভিনীত জীবন ছবি এমন কি যে যে ছবিতে তারা যে যে ভূমিকার অভিনয় করেছেন তার ছবি সংগ্রহ করা ও প্রকাশ করা। বহু যাত্রা শিল্পী, নাট্যকার, অবহেলায় মর্যাদাহীনভাবে চলে যাচ্ছেন এটা তাকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। বইটির পরিকল্পনা ও পাণ্ডুলিপি শেষ হলে শক্তিবাবু কোলকাতার খুবই দামীনামী প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তার সর্বশেষ পত্রে আমাকে জানান, প্রথম খণ্ড বইয়ের ছাপা শেষের পথে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এই খণ্ড প্রকাশে খরচ পড়বে পঞ্চাশ হাজার টাকা। বইতে নাট্যকার, নাট্যকর্মী, অভিনীত ছবি মিলে প্রায় দুশ ছবি থাকছে। তিনি অভিমানে লিখেছেন, এই কাজে কারো টাকা চান না, চান সহযোগিতা। তার পরবর্তী বই ত্রিপুরার সংস্কৃতি আন্দোলনের পাণ্ডুলিপিও তৈরী করছেন বলে জানান। শক্তি অন্যদের জীবনী লিখেছেন আর রমাপ্রসাদ গবেষণাগারের গবেষক রমাপ্রসাদও লিখেছেন শক্তির জীবনী।

একটি প্রশ্ন তবু থেকে যায় যে, শক্তি হালদার পঁয়তাল্লিশ বৎসর ত্রিপুরার মাটি মানুষ জলবায়ুর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশে গিয়ে কেন ত্রিপুরা ছেড়ে গেলেন। মূলতঃ ত্রিপুরার সাম্প্রতিক অবস্থা, পারিবারিক কিছুটা সংকট ও মর্যাদার ক্ষেত্রে হীনমন্যভাব প্রোথিত মাটিকে বন্যার জলস্রোতের মত আল্‌গা করে দেয়। তবু তিনি বাহিরে থেকেও ত্রিপুরার মাটি প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আরও বাঁচার চেষ্টা করেছেন।

শিল্পপ্রেমী মানবদরদী সকল সংস্কৃতিবান ব্যক্তির মতই এই সকল মানুষ বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত আভ্যন্তরিক মানসিক দ্বন্দ্বে সংকীর্ণতা ও সংস্কার মুক্ত হতে হতে বিশ্বময় হয়ে পড়েন, বিপরীত ক্ষেত্রে বিপরীত ফল। শক্তি হালদারের ক্ষেত্রে প্রথমটা হয়ে নির্বাণ লাভ ঘটেচে। এ পথেই রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— "মরণ অমৃত করে দান।"

শক্তি হালদারের সংক্ষিপ্ত জীবন প্রবাহ ঃ শিল্প ঃ জন্ম ৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩২, *কোলকাতায়। আদিবাসীদের জীবনধারায় এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে ত্রিপুরায় আসেন ১৯৫০ সনে।* ১৯৫২ সনে ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল থেকে চারুকলায় ডিপ্লোমা লাভ। ঐ বৎসর ত্রিপুরার আদিবাসী জীবন নিয়ে চিত্র ৫নং গভর্ণমেন্ট প্রেস কোলকাতায় প্রথম একক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কর্ণেল উইলসন, ডিরেকটর ইন্টার ন্যাশানাল ব্যুরো। ১৯৫৩ সালে আগরতলায় একক চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা সুখময় সেনগুপ্ত। ১৯৫৪-তে বেণুবন বিহারে বুদ্ধ জীবন চিত্রের ফ্রেসকো আঁকেন, উদ্বোধন করেন ডি এম রণজিৎ ঘোষ। ১৯৫৫ সালে চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন

করেন উপদেষ্টা শচীন্দ্রলাল সিংহ। ১৯৫৭ সালে নেহেরুর ডিসকভারী অব ইণ্ডিয়ার তৈলচিত্রের সিরিজ আঁকেন। ছবিগুলি এম. বি. বি. কলেজে সংরক্ষিত। ঐ বৎসর গৌতম বুদ্ধের জাতক কাহিনীর তৈল চিত্রগুলো আঁকেন। ছবিগুলো রাজ্যশিক্ষা বিভাগে সংরক্ষিত। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী চিত্র প্রদর্শনীতে রবীন্দ্র কাব্যের উপর চল্লিশটি চিত্র সৃষ্টি। ১৯৭৫ সালে আগরতলা মিউজিয়ামে আদিবাসী জীবনের উপর একক প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মন্ত্রী হংসধ্বজ দেওয়ান।

সংস্কৃতি ঃ ১৯৫৩ ত্রিপুরা সাহিত্য বাসরের কর্মসমিতির সদস্য। ১৯৫৫ সালে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সংস্থা লোকশিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৬২ সালে রূপারোপ নাট্য সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৭০ সালে ত্রিপুরার শ্রেষ্ঠ নাট্য পরিচালকের সম্মান লাভ। ১৯৭৪ সালে নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। ১৯৭৫ সালে ত্রিপুরায় ন্যাশনাল ফোরাম পারফর্মিং আর্ট-এর আহ্বায়ক নির্বাচিত হন। ১৯৭৭-এ অন্বেষক সংস্কৃতি সংস্থার সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭৮-এ ত্রিপুরা রাজ্য সাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদক। ১৯৮২ সালে রবীন্দ্র পরিষদের কর্মসমিতির সদস্য। ১৯৮৯ সালে ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য, সংস্কৃতি এবং পর্যটন দপ্তরের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য। ১৯৯১ সালে ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি সংস্থা E.Z.E.C. র প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য। ১৯৯৪ কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ত্রিপুরা শাখার উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য। ত্রিপুরা আদিম জাতি সেবক সংঘের কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন।

শক্তি হালদার ত্রিপুরায় দীর্ঘ প্রায় অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী শিল্প সংস্কৃতির সংগঠকরূপে নিজেকে প্রসারিত করেছেন এবং বিস্তার ঘটিয়েছেন তার দীর্ঘ পাখার। কিন্তু ততটা ফসল তুলতে সমর্থ হন নাই। তীব্র শৈল্পিক আত্মমর্যাদাবোধ এবং চিন্তার ও সচেতনতার ঘাটতি এবং অনুচরদের কর্তাভজা মনোভাব সংগঠনগুলোকে স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে উঠে।

সাতবোনের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাহিত্য সম্মেলনে শক্তি হালদার সাতবোনের মানচিত্রের এক বোনকে রং-এ রাঙ্গিয়ে দিয়েছেন। ১৯৯৮ সালে বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পী মুকবুল হুদার শিল্প সৃষ্টি মুম্বাইতে আক্রান্ত হয়। তখন শক্তি হালদার আগরতলায় আমাদের সঙ্গে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের চত্বরের প্রতিবাদসভায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং দুর্গাপূজার ষষ্ঠীর দিন দীর্ঘ মিছিলে শহর পরিক্রমা করেন। সর্বভারতীয় ইংরেজী পত্রিকাগুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে ছবি ও সংবাদ পরিবেশন করে। আক্ষেপের বিষয় হল, তার শেষ বই ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের বইটি প্রকাশের শেষ পর্যায় এসে গেলেও আনুষ্ঠানিক প্রকাশ দেখে যেতে পারেন নাই। গত একুশ আগষ্ট উনসত্তর বৎসর পূর্ণ হবার এক মাস নয়দিন আগেই জীবনাবসান ঘটে যায়।

।। ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা ।।

§ ভূমিকা §

যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুক্ত ধারা আপন বেগে বয়ে চলেছে; যে ধারায় আছে বিবিধের মাঝে মিলনছন্দ। এই ছন্দকে আবার বিচ্ছিন্ন করে দেখলে ত্রিপুরাকে চেনা যাবে না। সুদূর প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতির মহামিলনকে আজ কেউ কেউ লাসকাটা ঘরে নিয়ে গিয়ে যদি বিচ্ছিন্ন করতে থাকে, প্রাণের চাবিকাঠির সন্ধানে, তবে তা শুধুই অকল্যাণ ডেকে আনবে।

ত্রিপুরা সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ লুকিয়ে আছে গভীর জঙ্গলে আর পাহাড়ে ঘেরা জনজাতীয় জীবন ধারার মধ্যে। সেখানে রিয়াং যুবতীরা 'হজাগিরি নাচে মাতাল করে জীবনের একাকিত্বকে। ত্রিপুরী ছেলে মেয়ে এক সঙ্গে নাচে গানে ভরিয়ে তোলে গড়িয়া • উৎসবে। জমাতিয়াদের গড়িয়া গাজন সেতো জীবনমুখী এক জাগরণের নব চেতনা। পূর্ণিমার রাতে মণিপুরীদের রাধাকৃষ্ণের রাসনৃত্য খোল আর মৃদঙ্গের বোলে নতুন জীবনের ছন্দ আনে। দুঃখ কষ্টে ভরা ত্রিপুরার আদিবাসী জীবনে সংস্কৃতিই হোল বেঁচে থাকার মূল উপাদান।

ত্রিপুরার একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বাঙালি। দেশ বিভাগের কারণে নিরুপায় বাঙালি সমাজ সবকিছু হারিয়ে একদিন ত্রিপুরায় আশ্রয় পেয়ে নতুন করে ঘর বেঁধেছিল। ঘরবাড়ি ফেলে আসার সময় সঙ্গে করে তারা কিছুই আনতে পারেনি, যা এনেছিল তা হোল তাদের দীর্ঘদিনের সংস্কৃতি, তাদের আচার আচরণ। এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে জাতি উপজাতির মানুষ আজ প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত ত্রিপুরার বুকে সংস্কৃতি মৈত্রীর [illegible] চলেছিল। কিন্তু সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল জুড়ে অর্থনৈতিক কারণে এসব অঞ্চলের মানুষ বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতির ক্রীড়নক হয়ে দেশকে এবং দশকে যে দুর্বিসহ [illegible] দিকে ঠেলে দিয়েছে, তা থেকে উদ্ধার না পেলে এতদিনের সযতনে গড়ে তোলা
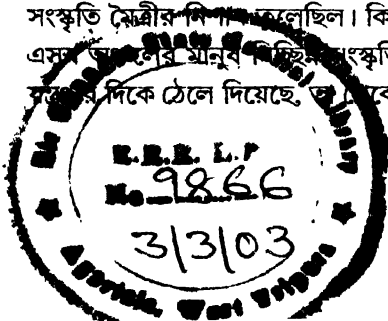
আমাদের বাউল গান, তর্জ্জা, যাত্রা, ঢপযাত্রা, মনসামঙ্গলের গান, গড়িয়া উৎসব ইত্যাদি লোকসংস্কৃতি খড়কুটোর মত ভেসে যাবে।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্য থেকে বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য পর্যন্ত ত্রিপুরার কর্ম, সাহিত্য, ইতিহাস, সঙ্গীত নৃত্যকলা শিল্পসংস্কৃতিতে যে অবদান রেখে গেছেন তার কোন তুলনা মিলবে না। কেউ কেউ হয়তো এ বক্তব্যের বিরোধী হতে পারেন, বলতে পারেন ত্রিপুরার আদিবাসী শিল্প সংস্কৃতির উন্নতির জন্য রাজারা কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি যতটা বাংলা সংস্কৃতির জন্য করেছেন।

ত্রিপুরার রাজাগণ ছিলেন প্রজানুরঞ্জক। প্রজাদের জন্য তাদের মঙ্গলের জন্য তাঁদের সেই সুদূর চট্টগ্রাম থেকে সিলেট পর্যন্ত এবং পার্বত্য ত্রিপুরাতো আছেই, প্রজাকল্যাণ-জনক বহু কীর্তি—ইতিহাস হয়ে সাক্ষ্য বহন করছে। যেহেতু ত্রিপুররাজ অধিকৃত রাজ্যে পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতল অঞ্চল অনেক বেশী, সেইহেতু সমতলের বঙ্গভাষী প্রজাগণ রাজকোষের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে যা কিছু কর্মোদ্যোগ বেশীর ভাগ সমতলে এলাকায় ঘটেছে। পার্বত্য ত্রিপুরার প্রতি সদিচ্ছার অভাব ছিল না যে তার স্বাক্ষর ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমায় বর্তমান।

প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরার রাজকার্যে বাঙলা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে এবং এই কারণে বাঙলাভাষার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। ত্রিপুরার আদি বাসিন্দা বাঙালিগণ জাতীয় ভাষার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করেছেন। ত্রিপুরার রাজগণ এ বিষয়ে তাঁদের উৎসাহ যুগিয়েছেন যদিও ত্রিপুরার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা 'কগবরক' নিয়ে রাজগণ এবং পণ্ডিতগণ কোন বিশেষ চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারেননি। অথচ ১৩২৯ শকাব্দে ১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর রচনা করেছিলেন ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 'রাজমালা'। সেটি ছিল সংস্কৃত ভাষায়। বর্তমান শতাব্দীতে সেই রাজমালা বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল, রচনা করেছিলেন শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন।

ত্রিপুরার রাজগণের আশ্রয়ে থেকে প্রাচীন কবিগণ অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের আদেশ অনুসারে মহাভারতের বাঙলা অনুবাদ এই ত্রিপুরাতেই করা হয়েছিল।

প্রাচীনকাল থেকে ত্রিপুরার রাজগণ সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতির জন্য কাজ করে গেছেন। মহারাজ ধন্যমাণিক্য প্রজাদের গানবাজনা শিক্ষার জন্য মিথিলা থেকে সঙ্গীতের অধ্যাপক আনিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে ত্রিপুরায় সঙ্গীতের সাধনা অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসছে এবং এই কারণেই ত্রিপুরায় গীতি কবিতার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে।

উদয়পুর এবং অমরপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে গোমতী নদীর তীরে বড়মুড়া পাহাড়ের গায়ে নানা প্রকার ভাস্কর্য্য খোদাই করা আছে বলে পাহাড়ের এই অংশকে দেবতা মুড়

এবং ছবি মুড়া বলা হয়েছে। এখানে পাহাড়ের গায়ে খোদিত আছে দেবদেবীর মূর্তি; এর মধ্যে মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তিটি প্রায় পঁয়তাল্লিশ ফুট দীর্ঘ। নির্মাণশৈলী অনুযায়ী এই সৃষ্টিগুলি ষোড়শ শতাব্দীর বলে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছেন। মূর্তিগুলি ত্রিপুরার আদিবাসী শিল্পীদের সৃষ্টি বলে অনুমিত হয়।

ত্রিপুরার রাজগণ ছিলেন কেউ শিল্পী, কেউ কবি, এবং অনেকই সঙ্গীত শাস্ত্রে ওস্তাদ ব্যক্তি। বর্তমান যুগে স্বর্গীয় পুলিন দেববর্মা রাজদরবার থেকে মার্গ সঙ্গীতের ধারা সাধারণ্যে এনে দিয়েছেন—সেখান থেকেই সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের সূচনা। তার আগে ঠাকুর অনিলকৃষ্ণ দেববর্মা এবং ঠাকুর সুরেশকৃষ্ণ দেববর্মা যন্ত্র সঙ্গীতের চর্চার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে গেছেন। এইভাবে ধাপে ধাপে সত্তরের দশকে একসময় সঙ্গীত, নৃত্য এবং নাটকে অনেক উন্নত প্রয়োগ কৌশল শিল্পচর্চার পরিধিকে বিস্তৃত করেছে অথচ আশির দশকের আগেই শিল্পচর্চার প্রবহমান ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে; যদিও এই অভাবিত পরিণতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বর্তমান দশকের সংস্কৃতি কর্মীরা অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আশাবাদীদের কাছে এটাই বড় সান্ত্বনা।

রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর প্রতিভাকে মহারাজা বীরচন্দ্র থেকে বীরবিক্রম পর্যন্ত সবাই জানিয়েছেন সম্মান, সঙ্গে সঙ্গে নিজেরাও হয়েছেন সম্মানিত। মণিপুরী সংস্কৃতিতে আপ্লুত ছিলেন মহারাজা বীরচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ মণিপুরী নৃত্যকে ত্রিপুরা থেকে শান্তিনিকেতনের ছাতিমতলায় এনে যে নবরূপ দিয়েছিলেন, তার ফলে মণিপুরী নৃত্য বিশ্বমাঝে সম্মানিত হয়েছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ত্রিপুরার মানুষকে প্রভাবিত করেছে স্বাভাবিক কারণে। রবীন্দ্র-সংস্কৃতির প্রভাব ত্রিপুরার সংস্কৃতিতে এনেছে প্রাণের জোয়ার।

রাজবাড়ির চত্বর থেকে ত্রিপুরার নাট্যচর্চা সাধারণ মানুষের কাছে এসে পড়েছিল স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে। এইসময় আমরা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এবং নাট্যকর্মীদের একাত্ম হতে দেখেছি। নাটক সাধারণ মানুষের হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়ে দিতে পেরেছে এই যুগে। তবে কি শিল্প, কি সঙ্গীত, কি সাহিত্য— সর্বক্ষেত্রে ত্রিপুরার পশ্চিমবঙ্গমুখী হওয়ার প্রবণতা ইদানিংকালে প্রকট হওয়ায় ত্রিপুরার নিজস্ব মৌলিক সৃষ্টি ব্যহত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে সচেতন হওয়া দরকার। এই শতকে কগবরক সাহিত্যের উন্নতি, নিজের সংস্কৃতি সম্পর্কে সচতেনতা, সৃষ্টির এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এ আশা অনেকেই পোষণ করেন। এই কারণে সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাধীন চিন্তা ভাবনা এবং জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপ দেওয়ার প্রবণতা থেকে উদ্ভূত আন্দোলন সংস্কৃতি আন্দোলনকে বেগবান করবে।

সংস্কৃতি উন্নয়ণের বড় বাঁধা অবশ্য অর্থনীতি। ভারতের অনুন্নত অঞ্চলের মধ্যে

আমাদের এই উত্তর পূর্বাঞ্চল অন্যতম। এই অঞ্চলের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করার জন্য কেন্দ্রীয় সম্পদ সরবরাহের প্রয়োজন। যদিও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিমাপ করা নিয়ে নানা অভিমত রয়েছে, তবুও মোটামুটিভাবে মাথাপিছু আয়ের পার্থক্য দিয়েই বিভিন্ন রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের তুলনামূলক পার্থক্য বিচার করা যেতে পারে। ১৯৮৯—৯০ সালের মূল্যসূচক অনুযায়ী ঐ বছর দেশের মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৪২৫২.৪০ টাকা। কিন্তু পাঞ্জাবের মাথাপিছু আয় ছিল ৭০৮১ টাকা, দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বোচ্চ মাথা পিছু আয়। দ্বিতীয় স্থান হোল গোয়া, মাথাপিছু আয় ৬৯৩৯ টাকা, তৃতীয় স্থানে হরিয়ানার মাথা পিছু আয় ৬২৬৫ টাকা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে মাথাপিছু আয় আসামে ৩১৭৯ টাকা, নাগাল্যান্ডে ৩৪৬৪ টাকা ('৮৮-'৮৯ সনে) এবং ত্রিপুরায় ২৮৬৬ টাকা, অরুণাচলে ৪১৭৬ টাকা। অর্থাৎ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবকটি রাজ্যে, একমাত্র অরুণাচল ছাড়া, মাথাপিছু গড় আয় সর্বভারতীয় গড় আয়ের অনেক নীচে আছে।

ত্রিপুরার মত একটি ছোট রাজ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই, কারণ তিনদিক বাঙলাদেশ ঘিরে রেখেছে এবং একটি মাত্র রাস্তা তার আসামের ভিতর দিয়ে মেঘালয় হয়ে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে। বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং যোগাযোগের অব্যবস্থার জন্য শিল্পোদ্যোগের অভাব আজ সমতলবাসী ও পাহাড়ের অধিবাসী উভয় সম্প্রদায়ের যুবমানসে ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছে। অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের হতাশাগ্রস্ত পাহাড়ের যুবকরা অস্ত্র হাতে নিয়েছে উজ্জ্বল দিনের স্বপ্ন চোখে নিয়ে; হয়তো আগামী দিনে সমতলের যুবকরাও এই পথগ্রহণ করতে বাধ্য হবে। এই যে দেশের অবস্থা, এরই ভিতর দিয়ে ত্রিপুরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিতে পারবে কিনা তা কে বলতে পারে। তবুও এই হতাশগ্রস্ত অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য যে সব সংস্কৃতি সৈনিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন, দেশ তাদের কাছে ঋণী থাকবে।

ত্রিপুরার নাট্যান্দোলনে ১৯৭৫ সন পর্যন্ত যে অবিচ্ছিন্ন গতি ছিল তার প্রামাণ্য দলিল হিসাবে এই পুস্তকটি রচিত হোল। তথ্য রমাপ্রসাদ গবেষণাগার থেকে বহু পুরাতন পত্রিকা ঘেঁটে এবং সংস্থাদের ছাপানো অনুষ্ঠানসূচি ও তাঁদের প্রকাশিত স্যুভেনির থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এর পরেও অনেক তথ্য অজানা রয়ে গেল। এই অজানা অপ্রকাশিত তথ্যগুলি যাঁদের জানা আছে সেই শিল্পী অথবা সংস্থা আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে প্রকাশ করে ত্রুটিমুক্ত করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করি।

বন্ধুবর রমাপ্রসাদ দত্ত এই পুস্তক রচনায় যেভাবে সাহায্য করেছেন তাতে তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তাঁর কাছে রক্ষিত বিভিন্ন পত্র পত্রিকা স্যুভেনির ইত্যাদি থেকে দীর্ঘ

নাট্যাভিনয়-পঞ্জী সংগ্রহ করতে হয়েছে। এ ব্যাপারে পত্রিকার সংবাদ, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম এবং কোনো কোনো পরিচালকের পাঠানো নিজ নিজ তথ্যকে প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তবুও জানি, অনেক সংস্থার অনুষ্ঠান তথ্যের অভাবে বাদ পড়ে যেতে পারে। তাই অনুরোধ জানাচ্ছি এ বিষয়ে সংগঠনগুলি প্রামাণিক তথ্য দিয়ে লিখিতভাবে জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা সম্ভব হবে।

নাট্য ব্যক্তিত্বদের ছবি ছাপানোর জন্য আমি নিজে বহুজনকে ছবি পাঠাতে অনুরোধ করেছি বহুবার, কিন্তু অনেকের কাছ থেকে ঠিক মত সহযোগিতা পাইনি। তবু যতটুকু পেয়েছি এবং যা কিছু সংগ্রহে ছিল তাই দিয়ে বইটি সম্পূর্ণ করা হোল। আশা রাখি দ্বিতীয় সংস্করণে আরো কিছু কাজ করতে পারব।

পুস্তকটি ছাপানো এবং প্রকাশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নাট্যপ্রেমী শ্রদ্ধেয় দেবকুমার বসু গ্রহণ করায় আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের পুত্র শ্রীমান মিত্রারুণ হালদার তার কর্মক্ষেত্রে অতিব্যস্ততার মধ্যেও বইটির প্রচুর পরিমাণ ছবি এবং প্রচ্ছদ যত্ন সহকারে করে দেওয়ায় আমরা উপকৃত; তাকে আমাদের আন্তরিক আশীর্বাদ।

পুস্তকটি প্রকাশের পূর্ব মুহূর্তে বন্ধুবর সাহিত্যিক নিধু হাজরা বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের লেখা এবং তথ্য পাঠিয়ে পুস্তকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে সাহায্য করেছেন, তাঁর ঋণ ভোলার নয়। বন্ধুবর দেবপ্রসাদ দে বিভিন্নভাবে যে সাহায্য করেছেন তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা অসীম। শ্রদ্ধেয় ডঃ জগন্নাথ ঘোষ তাঁর অমূল্য সময় ব্যয় করে পুস্তকটির মুখবন্ধ-এ যে মূল্যবাম রচনা লিখেছেন তার জন্য আমি কম ঋণী নই।

শক্তি হালদার

দু-এক কথা

'ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা' বইটির সম্পাদনার জন্য কিছু সহযোগিতা আমাকে করতে হোল। না করে উপায় কই! সংস্কৃতি পাগল মানুষদের নিয়ে যেসব মহিলা সংসার করেছেন তাঁরাই জানেন এঁদের সামলানো কত কষ্ট। একদিকে সংসার সামলানো, অন্যদিকে ওঁদের সংস্কৃতি ক্ষুধার রসদ জোগান, সেকি একটুখানি ব্যাপার! দিনের-পর-দিন মহড়া চলছে— মহড়াকক্ষ থেকে অর্ডার এল ২০/২৫ কাপ চা এখুনি করে দাও। ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে চায়ের জল চাপাতে হোল, দেরি হলে কুরুক্ষেত্র। মহড়া চলছে, হঠাৎ ডাক পড়ল— 'তাড়াতাড়ি এস, রিহার্সাল বন্ধ হয়ে যাবে'। কারণ এক অভিনেত্রী আসেনি, তার জায়গায় প্রক্সি দিতে হবে, কো-অ্যাকটার ঠিকমত অভিনয় করতে পারছে না। শুধু কি এই, নাটক মঞ্চস্থ হবার দু-একদিন আগে দেখা গেল অভিনেত্রী অসুস্থ অথবা ব্যাগড়া বাধিয়েছে, এখন নামতে হবে ঐ চরিত্রে। এরকম কতশত ঝামেলা পোয়াতে হয় আমাদের।

শক্তি হালদার যদি শুধু নাটক করেই ক্ষান্ত হোতেন তাহলে কিছু বলার ছিল না। তাঁর শিল্পী সত্ত্বা তখন ছবি আঁকার দিকে দৌড়চ্ছে। দিন নেই রাত নেই—আদিবাসী মানুষের দুঃখ বেদনা নিয়ে ছবি এঁকে চলেছেন—খাওয়ার সময় নেই, ঘুমের সময় নেই। তারপর প্রদর্শনী করে তবে কাজের গতি স্তব্ধ হোল।

ছবির নেশা বন্ধ হোলতো এলো সাহিত্য সম্মেলন। গড়ে তুললেন ত্রিপুরা রাজ্য সাহিত্য সম্মেলন। ত্রিপুরার জাতি উপজাতির মিলিত সম্মেলন। সেই একই অবস্থা, কি করে দিন যাচ্ছে রাত যাচ্ছে বলতে পারব না। সম্মেলন শেষ হলে শান্তি।

ত্রিপুরার যাত্রা শিল্পীরা বড় কষ্টে আছে, এদের জন্য কিছু করতে সম্মেলন দরকার। ব্যাস, শুরু হয়ে গেল ননী দাস আর হীরালাল সরকারকে সঙ্গে নিয়ে ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘুরে ঘুরে শিল্পীদের সংগঠিত করা। এ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো। সংসারের কি হাল হয়েছিল সেতো আমি জানি। সেদিন আজকের মত

সরকার কোন সাহায্য সহায়তা করতে এগিয়ে আসেনি, তবু ওরা করে গেছে সংস্কৃতিকে ভালবেসে।

সেই ভালবাসাকে সম্মান জানাতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নাটকে শেষ মুহূর্তে অভিনয় করতে হয়েছে, তা হলেও আমার অভিনয় যাঁরা দেখেছেন প্রশংসাই করেছেন। ঐ অভিমতটুকু সম্বল করে এই বই প্রকাশের ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছি।

অতীত এখন বিস্মৃতির কুয়াশায়। আমাদের সেই নাট্যোৎসাহ আর নেই। এখন শুধু নষ্টালজিয়া। সেই স্মৃতিকে সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অসাবধানে কিছু লিখে থাকলে আপনাদের ক্ষমাসুন্দর মন সে ভুল শুধরে দেবেন। আপনাদের শুভেচ্ছা আমি প্রার্থনা করি।

সবশেষে এইটুকু বলার যে নাটকপাগল শক্তি হালদার প্রায় পাঁচ-ছয় বছর ধরে এই পুস্তকের খুঁটি নাটি বিষয় নিয়ে কাজ করেছেন। তাঁর ঐ পরিশ্রম যদি ত্রিপুরার নাট্যশিল্পী, যাত্রা শিল্পী এবং রসিকদের কাজে লাগে তবে আমাদের ঐ পরিশ্রম সার্থক হবে।

নমিতা হালদার (চক্রবর্তী)

৬৫/৪ দেবী নিবাস রোড
নাগের বাজার, কলকাতা-৭০০০৭৪
ফোন : ৫৫৯-৫৮১৫

যাত্রা ও ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি

পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে আজকের এই আণবিক যুগ পর্যন্ত লোক-সংস্কৃতির চেহারায় কোথাও কিছু কিছু রূপান্তর বা বিকৃতি ঘটলেও এর মুলগত প্রকৃতিটা প্রায় অবিকৃত রয়ে গেছে বলা চলে। লোক সংস্কৃতির সৃষ্টি আদিম মানব সমাজে প্রকৃতির কোলে গড়ে ওঠা মানুষের সরল ও সাবলীল জীবন ধারার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসাবে। মানব সভ্যতা চলতে চলতে এগিয়ে এল নগর সভ্যতায়। নগর সভ্যতার সঙ্গে গ্রাম্য জীবনে পরিস্ফুট হল ব্যবধান, ক্ষতিগ্রস্ত হল লোক সংস্কৃতি, বিধ্বস্ত হল তার গতিবেগ। আবার যুগে যুগে সংস্কৃতিমান মানুষ নতুন করে লোক সংস্কৃতির মূল্যায়ন করে তাকে উজ্জীবিত করেছে। ধ্বংসের হাত হতে করেছে রক্ষা, তবে নগর সভ্যতা যে ভাবে গ্রাম্য সভ্যতাকে গ্রাস করছে তাতে এই সংস্কৃতি তার মূল ভাবধারাকে কতখানি রক্ষা করে প্রাণের রসে মাতাল করতে পারবে, তা অবশ্যই ভাবনার বিষয়।

বাংলাদেশের বেশ কিছু অঞ্চল এবং পার্বত্য বর্তমান ত্রিপুরাকে নিয়ে তখনকার ত্রিপুরা। সুতরাং দীর্ঘদিন ধরেই ত্রিপুরায় বাংলা লোক-সংস্কৃতি প্রভাব ফেলেছে। বাংলা লোক সংস্কৃতি বলতে সাধারণভাবে ধরে নিতে পারি—কীর্তন, কবিগান, বাউল, পাঁচালী কথকতা, তর্জা, জারি, ধুমুর, যাত্রা, ঢপ যাত্রা এবং লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত। এই সংস্কৃতির অনেকগুলি ধারাই ত্রিপুরার উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল কিন্তু উৎসাহদানের অভাবে এবং নগর সভ্যতার চটকদার সংস্কৃতির চাপে অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

গণশিক্ষার মাধ্যম হচ্ছে এই লোক-সংস্কৃতির ধারাগুলি। চারণ কবি মুকুন্দ দাস তাঁর উদাত্ত গানের সুরে তখনকার সমাজ জীবনের ভণ্ডামী এবং সামাজিক বৈষম্য ও কুসংস্কার থেকে মুক্তির মন্ত্র জ্বেলে দেশের মানুষকে নিজের দেশ সম্পর্কে সচেতন করে বিপ্লবমুখী করেছিলেন : এ সঙ্গীতকে কি বলব? কবিগান? স্বদেশী যাত্রা? না গণসঙ্গীত! কারণ কবির ঐ কণ্ঠ আগরতলার মাটি কাঁপিয়ে ত্রিপুরার সর্বশ্রেণীর মানুষকে মাতিয়ে তুলেছিল—"বান এসেছে মরা গাঙ্গে খুলতে হবে নাও, তোমরা এখোনো ঘুমাও?" কোথায় সেই কণ্ঠ! কোথায় সেই গান—যে গানে লক্ষ কণ্ঠ গলা মিলিয়ে দেয়, কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে যাবার প্রেরণা যোগায়!

আবার একটু পিছন দিকে তাকাই। কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, রামায়ণ কীর্তন—এও

লোকসংস্কৃতি। শ্রীচৈতন্যদেব নদিয়ার মানুষকে পাগল করে বৈষ্ণবধর্মের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে গেলেন সুদূর ওড়িশা পর্যন্ত বসবাসী মানুষকে। কৃষ্ণ কীর্তনের নব জোয়ারে খেটে খাওয়া মানুষ হতাশা থেকে মুক্তি পেয়েছিল। বিধর্মী থেকে আত্মরক্ষা করে নিজধর্মে জোরদার আশ্রয় পেয়েছিল। বর্তমানে কীর্তন, পালাকীর্তন, কথকতায় লক্ষ লক্ষ মানুষ শিক্ষা লাভ করছে।

এমনিভাবে তর্জা, বাউল সঙ্গীত ইত্যাদি গ্রাম জীবনে প্রচণ্ড একঘেয়েমী থেকে শুধু মুক্তিই দেয়নি—যখনই এই সরল জীবনধারার মানুষ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছে তখন এরাই দেখিয়েছে পথ। এমনিভাবে যুগ যুগ ধরে 'যাত্রা', এও সেই লোক-সংস্কৃতির একটি ধারা, গ্রামের কোটি কোটি মানুষকে নব উদ্যমে ক্ষেতে খামারে কাজ করতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

যাত্রা প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি ক্ষুদে যাত্রার দিকে একটু নজর দেওয়া যাক। ক্ষুদে যাত্রাটি হল 'গাজন'। এটিও প্রায় লুপ্ত। চৈত্র মাসে চড়কপূজা পর্যন্ত এই গাজন গ্রামে গ্রামে গিয়ে আঞ্চলিক সমস্যার উপর পথ-নাটক করতো। গ্রামের মেয়ে পুরুষ ওদের ঢাকের কাঠির আওয়াজে শুকনো খট্‌খটে ধানের ক্ষেত মাড়িয়ে ছুটে আসতো দলে দলে। সবাই না আসা পর্যন্ত শিব দুর্গা বা শিবকালী খুব একচোট নাচ নেচে নিত। সম্ভবতঃ এটা মূল পালাগানের আগে দর্শক সমাগমের সুযোগ দানের জন্য বাড়তি অনুষ্ঠান, অথবা শিবদুর্গার নৃত্যকে কেন্দ্র করে ক্ষুদে যাত্রা অনুষ্ঠান—যে কোন একটি ভেবে নেওয়া যেতে পারে। শেষ কথা, ভালরকম ভীড় না জমা পর্যন্ত পালাগান শুরু হত না। আড়ম্বরহীন পালা। সে পালা হয়তো কোন হাস্যরসের কাহিনী; রাজা বা জমিদার শ্রেণীকে ব্যঙ্গ করে অথবা উক্ত শ্রেণীর কোনো অত্যাচারের বেদনাময় কাহিনী সহজ সরল গ্রাম্য কথ্য ভাষায় গ্রামেরই কোনো পালাকারের রচনা। অত্যন্ত মর্মস্পর্শী এ মাধ্যম। এই ক্ষুদে যাত্রা থেকেই যাত্রার শিল্পী সৃষ্টি হোত দেখা গেছে। এই প্রাচীন ধারাকেই আমরা বর্তমানে 'পথ-নাটক' বলছি। গ্রীক নাটকের প্রাথমিক পর্যায়তো এই একই পদ্ধতি। তবে ওরা মুখে বিভিন্ন জন্তু-জানোয়ারের মুখোস পরতো, এই যা তফাৎ।

যাত্রার ঐতিহ্য খুবই প্রাচীন, এতো সবারই জানা; আর এই যাত্রাই সেই সুপ্রাচীন কাল থেকে লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জনের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে চলেছে, এও সবার জানা। তবে আলোচনার দরকার যেটা সেটা হল, এই শক্তিশালী ধারাটির এরকম দুরবস্থা কেন?

এ বিষয়ে আমরা খুব গোড়ার চিন্তায় এসে দেখি যে বিদেশী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নগর সভ্যতার জীবন ধারার পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল। 'নগর' হতে গ্রামের পুষ্টি— এই ছিল এতদিনের ধর্ম। ইংরেজী শিক্ষায় মধ্যবিত্ত মানসিকতায় ইংরেজীয়ানার প্রভাব যত

বাড়তে লাগলো, গ্রাম-সংস্কৃতিতে তত অপুষ্টি দেখা দিল। যাত্রা পালার সমতল মঞ্চ সরে গিয়ে দেখা দিল রঙ্গমঞ্চ নাটক। কাহিনীতে পৌরাণিক দেবদেবী অথবা ঐতিহাসিক রাজা নবাবের যুদ্ধ জয় কিম্বা অত্যাচার অথবা সমাজ চেতনার থেকে সরে গিয়ে দেখা দিল সে'পীয়রীয় রীতি।

নব সভ্যতা সব কিছুতে দ্রুত পরিবর্তন এনে দিচ্ছে—সঙ্গীতের যন্ত্রপাতি থেকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। এ যেন দেশ জয়ের যুদ্ধের মত সংস্কৃতির ক্ষেত্র অধিকার করার আর এক প্রস্তুতি! কিন্তু হলে কি হবে প্রাচীন ধারার অনুসারীগণ—তাঁদের শক্তিতো কম নয়—নব সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁরা পাল্লা দিয়ে চলতে লাগলেন। এবং অবশেষে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? আমরা দেখছি রবীন্দ্র নাটকে যাত্রার আঙ্গিক গ্রহণ। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"নাট্য কাব্য দর্শকদের কল্পনার উপরে দাবী রাখে, চিত্র সেই দাবীকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকদেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবাণ, গতিশীল, দৃশ্যপটটা তার বিপরীত; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থানু; দর্শকদের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে। মন যে জায়গায় আপন আসন নেবে সেখানে একটা পটকে বসিয়ে মনকে বিদায় দেওয়ার নিয়ম যান্ত্রিক যুগে প্রচলিত হয়েছে, পূর্বে ছিলনা। আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভীড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে, কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয়না। এই কারণেই যে-নাট্যাভিনয়ে আমার কোনোও হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিই নে। কারণ, বাস্তব-সত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।" (ভূমিকা—তপতী ১৩৩৬)। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাটকে আনলেন যাত্রার প্রভাব—গানের ছড়াছড়ি, সংলাপে কাব্য, বাউল বা বিবেকের মত ঠাকুর্দা, বিশু পাগলা এঁরা এলেন চরিত্রে। আর দৃশ্যপট—যাত্রার মত মুক্ত, মুক্ত প্রকৃতি, পথ, রাজপথ, অঙ্গন।

এদেশে মঞ্চ নাটকের জোয়ার এসেছিল সত্যি, এখনো নাটক অভিনয় হচ্ছে সত্যি, কিন্তু সে নাটক যাত্রার প্রভাব মুক্ত নয়। গিরিশ ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটক যাত্রায় এবং রঙ্গমঞ্চে দু'-জায়গায় সমান তালে অভিনয় হয়েছে একই অভিনয় ধারায়; যাত্রার মুক্ত অঙ্গন আর নাটকে মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা— এইটুকুই তফাত মাত্র। পরবর্তী অবস্থায় নাটকে অভিনয়ে পার্থক্য আসে আর এই একই সঙ্গে যাত্রা অভিনয়েও পার্থক্য আনা হয়।

এই যে সংঘাত এতে জয়লাভ করেছে যাত্রার আঙ্গিক একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি আধুনিক নাটকের পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের এবং দৃশ্য সজ্জার প্রয়োজন নেই বললেই চলে। বিখ্যাত নাট্যকার-পরিচালক বাদল সরকার তাঁর "অঙ্গন মঞ্চ" নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন সেখানে যাত্রার আসর বা

প্যাণ্ডেলের সঙ্গে কোনো পার্থক্য থাকছে না। এ ক্ষেত্রে আধুনিক নাটক আর যাত্রার মধ্যে কোনো ব্যবধান আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যাত্রায় বরং অনেক পরিবর্তন এসেছে, তবুও যাত্রা তার স্বকীয়তা ত্যাগ করেনি। আর আধুনিক মঞ্চ-নাটকে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে যাত্রার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার চেষ্টাই হচ্ছে। হয় তো সেটা অবচেতন ভাবে নাও হতে পারে। খুব সঙ্গত কারণেই এ পরিবর্তন হচ্ছে—কেননা যাত্রাভিনয়ে কৃত্রিমতার কোনো স্থান নেই। যাত্রায় যে বৃহত্তর জনসংযোগ ঘটান সম্ভব অন্য কোনো মাধ্যমে তা সহজ-সম্ভব নয়। যাত্রা সংস্কৃতি ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরব। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন বলেই যাত্রা আঙ্গিককে শ্রদ্ধা করেছিলেন। বৃহত্তর জনসংযোগের প্রয়োজনেই, অভিনয়ে অকৃত্রিমতার প্রয়োজনেই যাত্রাভিনয়কে অবলম্বন করে যাঁরা তাঁদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে গেছেন বা করছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই পিরানদেল্লো, আয়োনেস্কো, ব্রেশট্, বেকেটকে। শ্রদ্ধা জানাই হ্যারোল্ড পিন্টার, অসবোর্ণ জাজেনে, বাদল সরকার, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে এবং জানা অজানা আরো অনেক প্রতিভাধরদের।

অভিনয়ে কৃত্রিমতা দূর করার ব্যাপারে ব্রেশ্ট্ অনেক এগিয়ে গেছেন। আধুনিক নাটকে আমরা তাঁকে বোঝবার জন্য অনুকরণ করছি, অনুসরণ করছি তাঁর পৃথকীকরণ পদ্ধতি।

যাত্রার খোলা আসরে দু'দিকে দুই চেয়ার, কখনো শুধু চেয়ারই, থাকছে, কখনো বা হচ্ছে রাজ সিংহাসন। অভিনেতা বা দর্শকের মনে কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। নাটকে গতি ব্যাহত হচ্ছে না। আবার দৃশ্য পরিবর্তনে সখীদের নাচ বা চড়া সুরে বেজে উঠা কনসার্ট পূর্ব দৃশ্যে অভিভূত অবস্থা থেকে দর্শক মনকে বিচ্ছিন্ন করছে পরবর্তী বিষয়বস্তুতে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। কোথাও নাটকের বিচ্ছিন্ন অবস্থায় যোগসূত্র রচনা হচ্ছে বাউল বা বিবেকের মাধ্যমে। এ মাধ্যম কত অকৃত্রিম, কত উন্নত চিন্তা-ভাবনার ফল!

নাটক নিয়ে গবেষণার জন্য নেহরু ফেলোশিপের অধিকারী নাট্যকার বাদল সরকার তাঁর 'অঙ্গনমঞ্চ'র মাধ্যমে দেশী যাত্রার দিকে প্রত্যাবর্তনের কথা দ্ব্যর্থহীন ভাবে ঘোষণা করেছেন। (দেশ বিনোদন সংখ্যা ১৩৭৮)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে আধুনিক নাটক গ্রামীণ লোক-সংস্কৃতি অথবা এই প্রাচীন সংস্কৃতি যাত্রাকেই অনুসরণ করছে। ত্রিপুরায় এর উন্নয়নের জন্য ১৯৭৫ সালে এই লেখকের উদ্যোগে যাত্রা সম্মেলনের শুভারম্ভের মাধ্যমে সরকার তথা জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করা হয়েছে। দীর্ঘকাল ধরে পশ্চিমবঙ্গে যাত্রাভিনয়ের আন্দোলন বর্তমানে জনপ্রিয়তার এবং সার্থকতার শীর্ষে উঠেছে, ত্রিপুরায় সেক্ষেত্রে জনসচেতনতার প্রথম প্রয়াস মাত্র। যদি প্রশ্ন করা হয়, কেন এমন হল? জবাব হবে পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। রমাপ্রসাদ গবেষণাগারের তথ্য থেকে

আমরা যা জানতে পারি তা হোল, মহারাজা রাধাকিশোর মাণিক্যের আমলে ত্রিপুরার নিজস্ব যাত্রা সংস্থা সর্বপ্রথম গড়ে উঠে। ওই সময়েই ত্রিপুরায় যাত্রা, থিয়েটার, কবির লড়াই ইত্যাদি প্রচলন দেখা যায়। মহারাজা নিজে এদের উৎসাহ দিতেন, ত্রিপুরার বাইরে থেকে বিভিন্ন দলকে আমন্ত্রণ জানাতেন। রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের আমলে যাত্রাভিনয়ের প্রভাব আরো বাড়তে থাকে। দেশী বাদ্য-যন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজী বাদ্যের প্রয়োগ দেখা দেয়। এই নব সংযোজনের মূলে ছিল বহুমুখী প্রতিভাধর মহারাজাকুমার মহেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকাল হতে মঞ্চ থিয়েটারের প্রচলন বাড়তে থাকে। বহিঃত্রিপুরা থেকে বিভিন্ন যাত্রাদল ত্রিপুরাতে আসলেও এবং ত্রিপুরার সৌখিন যাত্রাদলগুলি বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু যাত্রাপালা অভিনয় করলেও, যাত্রা চর্চা অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। তবে এই সময় উত্তর ত্রিপুরায় আদিবাসীদের দ্বারা গঠিত কিছু কিছু যাত্রাদল দেখা যায় এবং বেশ দীর্ঘকাল অর্থনৈতিক দুরবস্থার সঙ্গে লড়াই করে বাঁচার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়। অন্যান্য দলগুলি একটি দু'টি অথবা তিন-চারটি পালা অভিনয়ের পর একই কারণে ভেঙ্গে পড়ে।

ত্রিপুরার বিভিন্ন অধিবাসী যারা পাহাড় আর সমতলে বাস করছেন তাদের মধ্যে আদিবাসীদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি রয়ে গেছে—লোকনৃত্যে, লোকসঙ্গীতে, লোকগাথার মধ্যে। ত্রিপুরা, মণিপুরী, চাকমা, রিয়াং ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ এবং তাদেব সংস্কৃতি সম্প্রদায়গত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে চলছে। আর ঠিক এখনই ত্রিপুরার এই লোক-সংস্কৃতি ও ভাষাগত বৈচিত্র্যকে মনে রেখেই একটা সমন্বয় ঘটানোর একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান দশকে আর্থিক কারণে, উৎসাহদানের অভাবে ত্রিপুরার লোক-সংস্কৃতি যেন বিনষ্ট না হয়।

ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের ধারা

ত্রিপুরার নাট্য চর্চা মূলত বাংলা নাটক নিয়ে। সে যুগে রাজবাড়ির ছত্রছায়ায় নতুন নাটক, নৃত্যনাট্যর পরীক্ষামূলক অভিনয় হয়েছে খুবই ব্যয়বহুল ভাবে। নাটকগুলির উপস্থাপনা হয়েছে আগরতলার নাগরিকদের কাছে। রাজবাড়ির উৎসাহী রাজকুমার-রাজকুমারীগণ নাগরিকদের নিয়েই নাট্যচর্চা করেছেন। পরবর্তী সময়ে নাট্য-চর্চার পরিধি যখন বিস্তৃত হোল, স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজনে রাজবাড়ির অন্দর থেকে শহরের স্কুল-মাঠ অথবা হলে অথবা কোনো বিশিষ্ট রাজপুরুষের বাগান প্রাঙ্গনে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। 'নাটক রাজবাড়ি থেকে জনগণের কাছে নেমে এলো' এ ধরনের মন্তব্য প্রকাশের কোন গুণগত অর্থ নেই। ত্রিপুরায় বাঙলা নাট্যচর্চার ধারাবাহিকতা নিয়ে শ্রদ্ধেয় অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য মৃণাল কর সম্পাদিত 'সীমান্ত প্রকাশ'-এ ধারাবাহিকভাবে দীর্ঘকাল আলোচনা করেছিলেন। বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কালে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে হুবহু প্রকাশ করা গেল।

ত্রিপুরায় বাংলা নাট্যচর্চা

।। অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য ।।

রাজগী ত্রিপুরায় বাংলা নাট্যচর্চার সূচনা কবে থেকে হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে রাজগী ত্রিপুরায় বাংলার সমকালীন নাট্যগীত, কবির লড়াই, পাঁচালী, পদকীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা প্রভৃতি গৌড়ীয় লোক-সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে একালের যাত্রাভিনয়ের প্রচলন ও প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ঐ সময় লোকনাট্যকর্মে প্রধানত উদার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ত্রিপুরার সংস্কৃতিপরায়ণ নৃপতিগণ। এই সমস্ত নাট্যানুষ্ঠানের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্পীরাও নিজেদের মধ্যে নানা ধরনের অভিনয়ের দল গঠন করে সৌখিন নাট্যচর্চায় মেতে উঠতেন। প্রাচীন ধরনের নাট্যগীত এবং এযুগের যাত্রাভিনয়ের সমাদর ও জনপ্রিয়তা সেদিনের ত্রিপুরায় সমভাবে বিদ্যমান ছিল। এগুলির মধ্যে ধর্মমূলক, মানবিক আদর্শমূলক ও দেশাত্মবোধক পালার সমাদরই ছিল বেশি। মাঝে মাঝে আদি রসাত্মক অশ্লীলতাপূর্ণ নাট্যগীত বা যাত্রাভিনয়ের প্রয়াসও যে হত না একথা বলা যায় না। তবে এ সমস্ত ক্ষেত্রে অভিজাত সমাজের বিরূপ মনোভাব এবং রাজাদেশে এ-গুলির প্রচার রোধ করা হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরু, এই কাল-পরিধির মধ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা গীতিনাট্য, পালা অভিনয় ও অন্যান্য ধরনের লোকনাট্যের অনুশীলন ও জনপ্রিয়তা বেশি করে বিস্তৃত হয়েছিল, এ সময় থেকে বিভিন্ন ধরনের শিল্পরীতির মধ্যে সুখী মৈত্রীবন্ধন ও বৈচিত্র্যের বিকাশ স্থানীয় শিল্পকর্মে অনেকটা সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। গৌড়ীয় ও মণিপুরী শিল্পরীতির সমবায়ে মণিপুরে যে বিশেষ ধরনের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নাট্যগীতির প্রচলন হয়েছিল তার প্রভাব ত্রিপুরার বিমিশ্র নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলে প্রচারিত হয়ে সমাদর লাভ করেছিল। ত্রিপুরায় মণিপুরী গীতিনাট্যের আবির্ভাবের মূলে প্রতিবেশী-সুলভ নৈকট্যই একমাত্র হেতু ছিল না,

উভয়রাজ্যের মানুষদের মধ্যে প্রকৃতিগত ভাবপ্রবণতা, ধর্মপ্রবণতা ও রুচিবোধের সমতা এবং উভয়রাজ্যের রাজপরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক-স্থাপন প্রভৃতি কারণে প্রধানত ত্রিপুরায় মণিপুরী সংস্কৃতির প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। মণিপুরীদের বিখ্যাত রাসলীলাভিনয় ও অন্যান্য নৃত্যগীতাভিনয় স্বদেশের সীমা অতিক্রম করে অবলীলাক্রমে ত্রিপুরা রাজ্যের মিশ্র সংস্কৃতিতে এসে মিশে গিয়েছিল। তার প্রভাব ও সমাদর কালক্রমে আজকের ত্রিপুরায় কিছুটা খর্ব হলেও বিলীন হয়ে যায় নি।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই ত্রিপুরার সংস্কৃতি সাধনার পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীত-বিশারদ মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের ভূমিকা ও কীর্তির কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি ব্যক্তিগতভাবে এবং সামাজিকভাবে যুগপৎ আঞ্চলিক সংস্কৃতি ও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের তীর্থ-পীঠ রচনা করেছিলেন ত্রিপুরার আধুনিক রাজধানী আগরতলায়। প্রাসাদকেন্দ্রিক আভিজাত্যের পরিমণ্ডলেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বীরচন্দ্রের সঙ্গীত-সাধনা মন্দির। সেখানে সাধনায় মগ্ন হয়েছেন সমকালের ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত সাধকেরা। তাঁর এই সঙ্গীতপীঠে যেমন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুশীলন হয়েছিল তেমনি তিনি এই কেন্দ্র থেকেই গৌড়ীয় ও মণিপুরী রীতির সমন্বয়ে অভিনব ধরনের নৃত্যগীত ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পালা অভিনয়ের সূচনা করেছিলেন। বীরচন্দ্রের উদ্ভাবিত এই নৃত্যগীতি ও লীলাভিনয়ের প্রভাব উত্তরকালে স্থানীয় নাট্যকর্ম প্রবাহে বিশেষভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল। মাত্র দুই দশক আগেও ত্রিপুরার আধুনিক নাট্যমঞ্চে, বিশেষত আবহ সঙ্গীতাংশে, সেই উচ্চাঙ্গের ঐক্যতানের ঝংকার শ্রুতিগোচর হয়েছে।

বীরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সংস্কৃতিপরায়ণ সুযোগ্য পুত্র রাধাকিশোর মাণিক্য রাজপাটে অভিষিক্ত হন ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে। সাহিত্য-সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকরূপে তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেও ত্রিপুরার প্রবহমান সংস্কৃতি চর্চার পৃষ্ঠপোষক রূপেও তাঁর অবদান ও উৎসাহ কম ছিল না। তিনি যাত্রাভিনয়, কবির লড়াই এবং প্রচলিত লোকনাট্য চর্চার পোষকতাই করেছেন বেশি। তাঁর রাজত্বকালে আগরতলায় ঢাকা-বরিশালের যাত্রাদলের ভাবাদর্শে দুটি অপেরাপার্টি গড়ে উঠেছিল। এগুলি ছিল আধাপেশাদারী দল। কাঁসারিপট্টি ও আচার্য পাড়ার যাত্রাপার্টি নামেই দলদুটির পরিচয় ছিল। বাংলার সমকালীন জনপ্রিয় ধর্মমূলক নাটকের অভিনয় তাঁরা করতেন শহরে ও গ্রামেগঞ্জে। শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলেই এঁদের অভিনয় অধিকতর সমাদৃত হত। এঁদের সংশ্রবে প্রভাবান্বিত হয়ে আদিবাসীরাও দু'-একটি বাংলা যাত্রার দল গঠন করেছিল বনাঞ্চলে।

রাধাকিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালেই ত্রিপুরায় পাশ্চাত্যরীতির রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠে।

ত্রিপুরার আদি থিয়েটার 'উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ' এর সমৃদ্ধি রাধাকিশোরের পৃষ্ঠপোষকতাতেই সূচিত হয় ১৮৯৭ সাল থেকে। বাংলার বিখ্যাত 'স্টার থিয়েটার' নানা উপলক্ষ্যে ত্রিপুরায় এসে অভিনয় করতেন। স্টারের নাট্যরীতি অনুসরণ করেই উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ তাঁদের অভিনয়ের রীতিনীতি নির্ধারণ করতো। এই নাট্য সংস্থার অন্যতম সংগঠক মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মা রচিত পঞ্চাঙ্কের নাটক 'পতিব্রতা'-এর অভিনয়ের মাধ্যমেই তাঁদের নিয়মিত নাট্যচর্চার পর্ব শুরু হয়। 'পতিব্রতা' নাটক ত্রিপুরার নাট্যকারের প্রথম রচনারূপে পরিগণিত। এটি মুদ্রিত হয় ১৮৯৭ সালে। পরবর্তী নাট্যানুরাগী মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্যের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজ অধিকতর সমৃদ্ধ ও জনপ্রিয় হয়। এঁদের মঞ্চে কবিগুরুর নাটক 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে কয়েকবার। এছাড়া তাঁরা দ্বিজেন্দ্রলাল, অমৃতলাল, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট নাট্যকারদের রচিত বহু নাটকের অভিনয় করতেন। দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধক নাটকের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই সংস্থা 'ত্রিপুর গৌরব' নাটক রচনা করে অভিনয় করেন। 'ত্রিপুর-গৌরব' ত্রিপুরার নাট্যকারের রচিত দ্বিতীয় মৌলিক নাটক। এটি ছিল হস্ত লিখিত, তার নিদর্শনও আজ বিলুপ্ত। উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজের কোনো নাটকের অভিনয় তিন দিনের কম হত না। প্রথম দিন হত বিশিষ্ট দর্শকদের জন্য, দ্বিতীয় দিন দেখতেন মহিলারা এবং তৃতীয় দিনের দর্শক হত জনসাধারণ।

রাধাকিশোর মাণিক্যের মৃত্যুর পর বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্য ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুণ ও প্রতিভায় তিনিও পিতৃ-পিতামহের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী ছিলেন। বিশেষত চিত্র-শিল্প, সঙ্গীত ও নাট্য-বিদ্যায় তাঁর অধিকার ছিল অসাধারণ। প্রচলিত লোকনাট্য প্রয়াসে তিনি উদার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন পিতৃপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই। তবে আধুনিক মঞ্চ-নাটকের প্রতিই তাঁর অনুরাগ অধিকতর প্রবল। পাশ্চাত্য রীতির মঞ্চ-নাটকের সমৃদ্ধির সূচনা বস্তুত রাধাকিশোরের আমল থেকে হলেও তার পরিপূর্ণ বিকাশ এবং স্থানীয় অপরাপর শিল্পী সমাজে মঞ্চ নাটকের প্রসার ঘটে বীরেন্দ্র কিশোরের আমল থেকেই। বীরেন্দ্র কিশোর প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন প্রথমে উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের সঙ্গে, পরে নিজেই একটি মঞ্চ গড়ে তোলেন 'পুষ্পবন্ত নাট্য-সমাজ' নাম দিয়ে। বীরেন্দ্র কিশোর একাধারে নাট্যকার, সঙ্গীতকার, শিল্পী ও পরিচালক ছিলেন পুষ্পবন্তের। তাঁর রচিত কয়েকটি উন্নত মানের ধর্মমূলক গীতিনাট্য বিশেষ সমারোহে অভিনীত হয়েছিল পুষ্পবন্তের মঞ্চে। বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের সান্নিধ্যে নাট্যচর্চার প্রেরণা লাভ করে রাজপরিবার, রাজ-বংশীয় ঠাকুর সমাজ এবং স্থানীয় বাঙালি ও মণিপুরী সমাজের শিল্পী ও অভিনেতারা নাট্যচর্চায় সোৎসাহে মেতে উঠেন। ফলে সে সময়ে বেশ কয়েকটি অভিজাত সৌখিন থিয়েটার পার্টি-র উদ্ভব

হয়েছিল রাজধানী আগরতলায়।

মহারানী প্রভাবতী দেবীর নেতৃত্বে একটি মহিলা নাট্যমঞ্চও গড়ে উঠেছিল রাজবাড়িতে। তারপর ১৯১৭ সাল থেকে ক্রমে গড়ে উঠে 'রণবীর কর্তার থিয়েটার', লেবু কর্তা, সুরেন্দ্র কর্তা ও নরসিংহ কর্তার ঘরোয়া নাটকের দল। এগুলি নামে সৌখিন থিয়েটার হলেও মূলত সৃষ্টিধর্মী নাট্যচর্চার কেন্দ্ররূপেই পরিগণিত ছিল। লেবু কর্তা ওরফে ব্রজবিহারী দেববর্মা ছিলেন বীরচন্দ্রের সঙ্গীত তীর্থের খ্যাতিমান যন্ত্রশিল্পী এবং নাট্যানুরাগী। সাধারণ নাট্যাভিনয়ে কত বিচিত্রভাবে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত আরোপ করা যায় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি নাট্যচর্চায় মেতে উঠেছিলেন। তাঁর এই পরীক্ষার সুফল পরবর্তীকালের নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। লেবু কর্তার থিয়েটারে নৃত্যগীতসমৃদ্ধ নাটক ও ধর্মমূলক গীতিনাট্যের অভিনয়ই হত বেশী।

উজ্জয়ন্ত নাট্য-সমাজ ও পুষ্পবন্ত নাট্য-সমাজের পর মঞ্চনাট্য কার্মে রণবীর কর্তার থিয়েটার স্থানীয় নাট্যজগতে সমধিক খ্যাতি অর্জন করে। রণবীরকর্তার নাট্যানুরাগ, শিল্পদক্ষতা ও প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল প্রধানত বীরেন্দ্রকিশোরের সান্নিধ্যগুণেই। প্রায় একদশক কাল তিনি গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় নাট্যচর্চা করেছেন নিজ বাসভবনে সর্বাঙ্গ সুন্দর মঞ্চ তৈরী করে। রণবীর কিশোরের থিয়েটার পার্টির সুপরিকল্পিত নাট্যচর্চার তৎপরতার ফলে ত্রিপুরায় মঞ্চ-নাটকের উৎকর্ষ ও প্রসার বিশেষভাবে সাধিত হয়েছিল। সমাজের অভিজাত সীমারেখা অতিক্রম করে মঞ্চ-নাটকের চর্চার ক্ষেত্র সাধারণ্যে, বিশেষত তরুণ ও ছাত্রসমাজে প্রসারিত হয় প্রথমত রণবীর কর্তার থিয়েটার পার্টির অনুপ্রেরণা ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফলেই।

১৯২৩ সাল থেকে গড়ে উঠে উমাকান্ত একাডেমী ছাত্রনাট্য সংস্থা, এড্ওয়ার্ড মেমোরিয়াল মেডিক্যাল ইনস্‌টিটিউটের থিয়েটার, শ্রীপাটের তরুণ সংঘ, স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের নাট্য শাখা এবং বিলোনীয়া ছাত্র নাট্য সংস্থা। এগুলির মধ্যে স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের নাট্য শাখাই সমৃদ্ধতম সংস্থারূপে ত্রিপুরায় লোকায়ত নাট্যচর্চার পথিকৃত।

উমাকান্ত একাডেমীর নাট্য সংস্থা নিয়মিত নাট্যচর্চার সূচনা করে ১৯২৩ সালে নাট্যবিদ ক্রীড়াশিক্ষক দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর তত্বাবধানে। কিশোর অভিনেতাদের উপযোগী করে দীনেশবাবু 'ভীষ্ম' নামে একটি নাটক রচনা করে দেন। ১৯২৫ সালে একাডেমী হলের বিরাট মঞ্চে 'ভীষ্ম' নাটকের অভিনয় হয়। বস্তুত তখন থেকেই ত্রিপুরায় বিদ্যালয়-ভিত্তিক নাট্যচর্চার সূচনা হয়। সরকারীভাবে বিদ্যালয়গুলির নাট্যচর্চার ব্যবস্থা না থাকলেও উমাকান্ত একাডেমীর সংস্কৃতিপরায়ণ প্রধান শিক্ষক শীতলচন্দ্র চক্রবর্তী

বিদ্যানিধি মহাশয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং নাট্যানুরাগী শিক্ষক দীনেশচন্দ্র চৌধুরীর ঐকান্তিক প্রযত্নে একাডেমীতে নিয়মিত নাট্যচর্চা চলতে থাকে বহুকালাবধি। পরবর্তী কালে একাডেমীর নাট্যানুরাগী শিক্ষক মণ্ডলীর মধ্যে অধ্যাপক ভূপেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, শিক্ষক সতীশ চন্দ্র চক্রবর্তী, ইন্দুবিকাশ চৌধুরী, অনিল কুমার দাশগুপ্ত প্রমুখ শিক্ষকগণ স্ব স্ব কালে এই নাট্য চর্চার ধারাকে অব্যাহত রাখেন। উমাকান্ত একাডেমীর নাট্যচর্চার প্রভাব ক্রমান্বয়ে ত্রিপুরার অন্যান্য উচ্চবিদ্যালয়ে সঞ্চারিত হয়। মফঃস্বলের বিদ্যালয়গুলির মধ্যে বিলোনীয়ার বি. কে. ইনস্টিটিউশনের ছাত্র সংস্থায় নাট্যচর্চার উৎসাহ, উদ্দীপনাই ছিল সর্বাধিক। এই সংস্থার নাট্যচর্চার উদ্যমের মূলে ছিলেন বিদ্যালয়ের নাট্যানুরাগী প্রধান শিক্ষক অক্ষয়কুমার ঘোষ। পরে পরবর্তী প্রধান শিক্ষক কালীহর বসু ভক্তিসাগর অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দের সহযোগিতায় আরব্ধ নাট্যানুশীলনে উৎকর্ষ সাধন করেন।

ভক্তি সাগর মহাশয় ছাত্রদের অভিনয়ের জন্য দুটি নাটক অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করে দিয়েছিলেন। প্রথমটি 'সুধন্বা বধ' ও দ্বিতীয়টি 'বালী বধ' (পাণ্ডুলিপি)। এই বিদ্যালয়ের নাট্যানুরাগী ছাত্র বিপিনবিহারী দত্ত, বিপিনবিহারী চক্রবর্তী সাংখ্যতীর্থ, মহেন্দ্র পাল, যোগেশ দত্ত অন্যান্য নাট্যানুরাগীদের সহযোগিতায় পরিণত বয়সে বিলোনীয়া শহরে 'যোগমায়া' নাট্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ত্রিশের দশকে ত্রিপুরায় আঞ্চলিক নাট্যকর্মক্ষেত্রে যোগমায়া নাট্য সমাজের অবদান উল্লেখযোগ্য।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন'র প্রতিষ্ঠা। অতীতের নাট্যমঞ্চে এই এসোসিয়েশনের নাট্যশাখার অবদান ত্রিপুরার গৌরবময় নাট্যেতিহাসে নবযুগের এক উজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে। এই নাট্য সংস্থার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত ত্রিপুরার নাট্যজগতে গিরিশযুগের প্রভাব প্রবল ছিল। এ সংস্থার শিল্পী অভিনেতারাও পুরাতনের প্রভাব কাটিয়ে নব নাট্যধারার প্রবর্তন করেন ত্রিপুরার নাট্যাঙ্গনে। সে সময়ে বাংলায় শিশির ভাদুড়ীর নেতৃত্বে নবনাট্য আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। নাট্যাচার্যের অভিনব ও অনন্য সাধারণ অভিনয় কলা এবং নবভাবনা-সম্ভূত যুগান্তকারী নাট্যরীতির সন্দীপন প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবানিন্বত হয়েছিলেন স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের শিল্পী ও অভিনেতা গোষ্ঠী। ত্রিপুরায় শিশির যুগের নব নাট্যধারা ভগীরথের মতো প্রথম নিয়ে আসেন স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন তাঁদের মঞ্চাবতরণের কয়েক বছরের মধ্যেই। সূচনাকাল থেকে ১৯৩৪। ৩৫ সাল পর্যন্ত এই এসোসিয়েশনের নাট্য শাখাই ত্রিপুরায় সৃজনধর্মী শ্রেষ্ঠনাট্য সংস্থা। এ সময়ে রণবীর কর্তার থিয়েটার অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছিল।

স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের প্রভাবে রাজধানীতে এবং ত্রিপুরার কয়েকটি মহকুমা শহরে কয়েকটি সৌখিন থিয়েটারের দল সংগঠিত হয়। ত্রিপুরার দীর্ঘকালীন প্রাসাদ-কেন্দ্রিক

নাট্যচর্চার ধারাকে সর্বপ্রথম ব্যাপকভাবে সাধারণের আঙিনায় নিয়ে আসেন স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের অভিনেতা ও নাট্যকর্মীরাই। স্বল্পব্যায়ে শোভন মঞ্চসজ্জায় অভিনয় চর্চার রীতি প্রবর্তন করেন তাঁরাই, যার ফলে অন্যান্য নাট্য সংস্থার চর্চার পথও সুগম হয়ে যায়। নানাভাবে সাহায্য-সহায়তার মাধ্যমে তরুণ সমাজে নাট্যানুরাগ বৃদ্ধির জন্য এই সংস্থা যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন।

স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের মঞ্চাবতরণের দু বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার অন্যতম নাট্যানুরাগী মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য ১৯২৮ সালে সিংহাসনে আরোহন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই অবলুপ্ত প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার পুনরুজ্জীবনে মনোযোগী হন। কয়েক বছর আগে থেকেই পুরনো ও নতুন শিল্পী ও অভিনেতার সমন্বয়ে তিনি নতুন থিয়েটার পার্টি গঠন করে নাম দিয়ে ছিলেন—'ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী'। নাট্য-বিদ্যায় বীরবিক্রম কিশোর পিতা বীরেন্দ্র কিশোরের মতই গুণী ও প্রতিভাবান ছিলেন। বাংলা ও মণিপুরী এবং বাংলা সংলাপের সমন্বয়ে তিনি কয়েকটি গীতি-নাট্য ও নৃত্যনাট্য রচনা করে নিজ মঞ্চে অভিনয় করিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে 'চাঁদ কুমুদিনী' ও 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে 'শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস' কলকাতায় 'ত্রিপুরা হাউসের' মঞ্চে সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছিল। বীরবিক্রম কিশোরের আমলে রাজ অন্তঃপুরের মঞ্চেও স্থানীয় নাট্যকার রচিত অনেকগুলি গীতিনাট্যের অভিনয় হয়েছে। এগুলির মধ্যে 'বিপ্রলব্ধ', 'রাগ-আলাপ', 'শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের ঝুলন' প্রভৃতি ধর্মমূলক গীতিনাট্যগুলি প্রসিদ্ধ। এগুলি ছিল বাংলা সংলাপযুক্ত মণিপুরী রীতির নৃত্যগীত-প্রধান। ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনীর মঞ্চে সমকালীন জনপ্রিয় নাট্যকারের বহু নাটকের অভিনয় হয়েছে। তন্মধ্যে মহাতপচন্দ্র ঘোষের বিখ্যাত 'আত্মদর্শন' নাটকের সাড়ম্বর অভিনয়ই এই সংস্থার শ্রেষ্ঠতম নাট্য কীর্তিরূপে প্রশংসা অর্জন করেছিল। ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনীর উদ্যোগে ত্রিপুরার ইতিহাসাশ্রিত দেশাত্মবোধক নাটক 'জয়াবতী বা ত্রিপুর সতী' রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। স্থানীয় নাট্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনের জন্য ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী তাঁদের মঞ্চকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি আদর্শ কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলেছিলেন। মহারাজার অকৃপণ অর্থানুকুল্যে মঞ্চ-সজ্জা, রূপসজ্জা, আলোক সজ্জা প্রভৃতি আঙ্গিকে অভিনবত্ব ও সমৃদ্ধি এনেছিলেন এ সংস্থার দক্ষ শিল্পীরা। বিশেষত নাটকের অর্কেষ্ট্রা পার্টিটি হয়েছিল সর্বাপেক্ষা উন্নত মানের। ত্রিপুরার খ্যাতিমান সঙ্গীতশিল্পী অনিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মুখ্য নেতৃত্বে বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, বিপিনবিহারী দেববর্মা, সুরেশকৃষ্ণ ঠাকুর, হেমন্তকিশোর দেববর্মা প্রমুখ সঙ্গীত শিল্পীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাটকের এই সঙ্গীতশাখাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। ত্রিপুরার নাট্যেতিহাসের সমৃদ্ধ সঙ্গীত-আঙ্গিকে এই সংস্থার অবদান অতুলনীয়। প্রায় সাত বছর

অবিরাম নাট্যচর্চা অন্তে এই সংস্থাটির অবলুপ্তি ঘটে।

মহারাজ বীরবিক্রমের আমলে ত্রিপুরায় কয়েকটি যাত্রা ও ঢপযাত্রার দল গড়ে উঠেছিল। যাত্রার দলগুলির মধ্যে আগরতলার 'লক্ষীনারায়ণ অপেরা পার্টির' সুনাম ও কর্মতৎপরতাই ছিল সর্বাধিক। যাত্রা ও ঢপযাত্রার চর্চা, প্রসার ও জনপ্রিয়তা শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলেই ছিল বেশী।

১৯৩৬ সালে ত্রিপুরার নাট্যামোদী রাজমন্ত্রী রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশনের কয়েকজন প্রাক্তন শিল্পী-অভিনেতার সহযোগিতায় আগরতলায় 'মাতৃমন্দির' নাট্য সংস্থার আবির্ভাব হয়। পূর্বসূরীদের তুলনায় মাতৃমন্দিরে শিল্পী অভিনেতারা অভিনয় শৈলীতে অধিকতর প্রগতিশীল ছিলেন। কয়েকবছর সগৌরবে নাট্যচর্চার পর তাঁরা যুগের তাগিদে চর্চার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ফলতঃ মাতৃমন্দিরের নাট্যকর্মকান্ডের নীতি ও প্রকৃতিগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। প্রাচীন ও নবীনের সমন্বয়ে মাতৃমন্দির রূপান্তরিত হয় 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' নাট্য সংস্থায়। মুখ্য নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ত্রিপুরার নাট্য জগতের যুগসন্ধিক্ষণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাধক ত্রিপুরেশ মজুমদার। শুধু খ্যাতিমান অভিনেতা রূপেই নয়, ত্রিপুরার নাট্যান্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগঠক রূপেও ত্রিপুরেশ মজুমদার অবিস্মরণীয়। ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ধারাটিকে সার্বিকভাবে লোকায়ত করবার জন্য ত্রিপুর শিল্পায়তন নানাভাবে চেষ্টা করেছে। কিশোরদের মধ্যে নাট্যচর্চার প্রবল প্রেরণা সঞ্চারিত হয় এই সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতার ফলেই। এ সময়ে ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমা শহরেই প্রবীন ও নবীনদের সৌখিন চর্চাধর্মী নাটকের দল গড়ে উঠে। ত্রিপুর শিল্পায়তনের শিল্পী ও অভিনেতারা ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে, অথবা দলগতভাগে মফঃস্বলে গিয়ে নাটকাভিনয় করে ত্রিপুরার নাট্যচর্চার প্রগতিশীল প্রবাহকে অনেকটা গণমুখী করে দেন।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে অধ্যাপক জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত চারটি বাংলা নাটক রচনা করেন—'বাংলাদেশের মাটি', 'আর্য-অনার্য', 'ত্রিপুর গৌরব' এবং 'চিতোর সন্ধ্যা'। এ-গুলির মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের মাটিই মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। অপর তিনটি নাটক ছোটদের অভিনয়ের জন্য লেখা হয়েছিল।

বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে দু তিন বছর ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় ভাঁটা পড়ে। ত্রিপুর শিল্পায়তন, পুলিশ ড্রামাটিক ক্লাব এবং মফস্বঃল শহরের দু' একটি সংস্থা ছাড়া এই সময়ে অন্যান্য দলগুলির অবলুপ্তি ঘটে।

১৯৪৭ সালের পর ভারত বিভাগের ফলে ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ বাঙালি শরণার্থীর সমাগম ও পুনর্বাসন হয়। পুরনো অধিবাসী ও নবাগত শিল্পী অভিনেতার সমন্বয়ে

নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। কয়েক বছরের মধ্যেই রাজধানী আগরতলায় এবং মহকুমা শহর বিলোনীয়া, সোনামুড়া, উদয়পুর, খোয়াই, কৈলাসহর, কলপুর ও ধর্মনগরে অনেকগুলি আধুনিক সৌখিন নাট্যসংস্থার উদ্ভব হয়। এই সংস্থাগুলির অধিকাংশই রীতি ও প্রকৃতিতে বাংলার সমকালীন নব-নাট্য আন্দোলনের সমর্থক ও অনুসারী ছিলেন।

পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরার
নাটকের একটি দৃশ্য

১৯৪৮ সালে কয়েকজন তরুণ নাট্যানুরাগী শিল্পী ও অভিনেতার সম্মিলিত চেষ্টায় রাজধানী আগরতলায় গড়ে উঠে শিল্পী সংসদ। তরুণদের মধ্যে আধুনিক নাট্যচর্চায় উৎসাহ সঞ্চার ও নাট্যাভিনয়ের প্রসারের মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে নাট্যক্ষেত্রটি উর্বর করেছিলেন। তারপর ক্রমে গড়ে উঠে 'লোকশিল্পী সংসদ' 'শিল্পায়ন' এবং আরো কয়েকটি প্রগতিশীল চর্চাধর্মী নাট্য সংস্থা। ১৯৫৫ সালে লোকশিল্পী সংসদের সূচনা। পুরাতনকে অস্বীকার না করে নবনাট্য রীতি অনুসরণে নাট্যচর্চার গতিকে প্রসারিত করার উদ্দেশ্য নিয়েই এ সংস্থাটি ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। ইতিপূর্বে ত্রিপুরার সমস্ত নাটকাভিনয়েই স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ অভিনেতারা অংশগ্রহণ করতেন। কোন কোন নাট্য সংস্থায় দু' একটি নাটকে দু একজন অভিনেত্রীর দেখা মিললেও তা ছিল রীতির ব্যতিক্রম। লোকশিল্পী সংসদই নাটকের সমস্ত স্ত্রী ভূমিকায় অভিনেত্রী নিয়োগের ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। ফলত সে সময় থেকেই ত্রিপুরার সমস্ত নাট্য সংস্থায় অভিনেত্রীদের মঞ্চাবতরণ নিয়মে পরিণত হয়।

এই আন্দোলনের ফলেই দীর্ঘকালীন সংস্কারের সংকোচ কাটিয়ে নাটমঞ্চে ত্রিপুরার নারীরা দলে দলে যোগদান করেন পুরুষদের সহযোগী অভিনেত্রী রূপে। এ সময়ে ত্রিপুরার কোথাও নাটকাভিনয়ের উপযুক্ত স্থায়ী মঞ্চ বা প্রেক্ষাগৃহ ছিল না। স্কুল কলেজের ক্যামপাস বা কোনো বড় হলঘরে অথবা উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে প্রচুর অর্থব্যয় এবং পরিশ্রম করে মঞ্চ বানিয়ে নাট্যকর্ম সম্পন্ন করতে হত। ছোট বড় সমস্ত চর্চাধর্মী সৌখিন নাট্য সংস্থার পক্ষেই এটি ছিল বিরাট সমস্যার বিষয়। লোকশিল্পী সংসদ এবং অন্যান্য অপেশাদার স্থানীয় নাট্য সংস্থা একক ভাবে এবং যৌথভাবে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের জন্য নানাভাবে আন্দোলন করেছেন। ঐ সমস্ত আন্দোলনে বিশেষ সুফল প্রসূত না হলেও ইদানিং 'রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আগরতলার নাট্য সংস্থাগুলির অভিনয় চর্চার পক্ষে কিছুটা সুযোগ এসেছে। লোকশিল্পী সংসদ শুরু থেকেই ত্রিপুরার শিল্প ঐতিহ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে বাংলার সমকালীন নবনাট্য

আন্দোলনের আদর্শে নাট্যচর্চায় ব্রতী হয়েছিল। অভিনয়ের মান উন্নয়নে তাঁদের যেমন আগ্রহ ছিল তেমনি স্থানীয় প্রবীন ও নবীন শিল্পীদের সহযোগিতায় নাটকের রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, আলোক সজ্জা, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি আঙ্গিকের উৎকর্ষ সাধনের দিকেও সমান লক্ষ্য ও যত্ন ছিল। অতি অল্প খরচে মনোহর ও চমকপ্রদ মঞ্চ রচনার শিল্প কৌশলে লোকশিল্পী সংসদ ত্রিপুরার সমকালীন নাট্যজগতে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নাটকের দল নিয়ে গ্রাম-গঞ্জ-শহর পরিক্রমা করে নাট্যচর্চার প্রেরণা সঞ্চারেও এ সংস্থার কৃতিত্ব সর্বাধিক। সমকালে শিল্পায়ন নাট্য সংস্থাও নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে অনুসরণ করে ত্রিপুরার নাট্য ক্ষেত্রকে উর্বর করেছে। চর্চাধর্মী সংস্থাগুলির মধ্যে এ সময়ে সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ কিছুটা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু অশোভন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাবকে কেউ প্রশ্রয় দিতেন না।

১৯৫৮ সালে আগরতলার 'প্রাচ্যবাণী পরিষদ' নাট্যচর্চায় অংশগ্রহণ করে। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় নাট্যকারের নাটকের অভিনয় করা। দেবেন্দ্র কুমার ভৌমিক এঁদের অভিনয়ের জন্য 'বাস্তুহারা', 'ঝড়ের সংকেত', 'পাঞ্চজন্য' প্রভৃতি নাটক রচনা করে দিয়েছিলেন। এ সময় 'ত্রিপুর শিল্পী সংহতি' সংস্থাও কিছুদিন নৃত্যনাট্য ও স্থানীয় লেখকদের নাটক-নাটিকার অভিনয় করে নাট্যজগতে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল।

নবনাট্য ধারার প্রেরণায় এ সময় থেকে আগরতলায় ছোট বড় অনেকগুলি সখের নাট্যদল গড়ে উঠে; তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য—নাট্যশিল্পী সংসদ, শিল্পশ্রী, শিল্পীবাসর, শিল্পীসমাজ, কালচার‍্যাল ইউনিট, পঞ্চপ্রদীপ, শিল্প সন্ধানী, কলাকার গোষ্ঠী, কৃষ্টি গোষ্ঠী, কল্লোল গোষ্ঠী, মুকুল সংঘ, আমরা সবাই, রসচক্র, বনমালীপুর ইয়ুথ এসোসিয়েশন, অগ্রগতি সংসদ, উত্তরায়ণ, রবীন্দ্র পরিষদ প্রভৃতি। এই নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে অধিকাংশের নাট্যানুশীলনের খুব একটা বৈশিষ্ট্য বা নূতনত্ব না থাকলেও যুগোপযোগী নাট্যচর্চার পরিমণ্ডলকে তাঁরা মুখর করে রেখেছিলেন। এ সময় থেকে কেন্দ্রীয় কারাবাসীদের নৈতিক সংস্কারের পরিপূরক হিসাবে জেলে নাট্যচর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন কয়েকজন নাট্যবিদ কারাকর্মী। চর্চার ক্ষেত্রে এই সীমিত প্রচেষ্টার কথাটিকেও অবহেলা করা যায় না। সাধারণ নাট্যচর্চার অঙ্গন থেকে নাট্যানুরাগী সরকারী কর্মচারীগণও দূরে সরে থাকতে পারেন নি। এ সময় থেকে ত্রিপুরার সদর ও মফস্বলের বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী কর্মচারীগণ রিক্রিয়েশন ক্লাবের মাধ্যমে নিয়মিত নাট্যচর্চার সূচনা করেন। এছাড়া ত্রিপুরার সর্বত্র শহর ও জনপদে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাট্যসংস্থার উদ্ভব হয়। এগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়ী দলের সংখ্যাই বেশি। আয়ুষ্কাল পাঁচ বছরের বেশি এমন সংস্থার সংখ্যা কম। একটি সংস্থা ভেঙ্গে দুটি বা তিনটিতে রূপান্তরিত হয়েছে এমন নিদর্শনও আছে। এরূপ বিভাজন-প্রবণতার ফলে নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে লাভের চেয়ে লোকসানই হয়েছে বেশি।

ত্রিপুরার চর্চাধর্মী সৌখিন নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ রক্ষা, ভাব বিনিময় এবং নাট্য চর্চার উদ্যম সংবর্ধনের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার শিক্ষা বিভাগ একবার 'নিখিল ত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করেছিলেন ১৯৬৭ সালের জুন মাসে। নাট্যচর্চা উন্নয়নে এটাই এখানকার প্রথম সরকারী উদ্যোগ। মহকুমা শহর খোয়াই, কৈলাসহর, উদয়পুর সোনামুড়া এবং রাজধানী আগরতলা ও শহরতলির মোট উনিশটি সৌখিন নাট্য সংস্থা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিল। এই উদ্যোগের ফলে আঞ্চলিক নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার প্রবণতা বেড়ে যায় সত্যি কিন্তু শিল্পোৎকর্ষের পক্ষে বিশেষ সুফল প্রসূত হয়নি। ফলত পরের বছর থেকে ঐ প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তারপর ১৯৬৯ সাল থেকে ত্রিপুরা মহাকরণের পৃষ্ঠপোষকতায় বার্ষিক নাটকাভিনয়ের নিয়মিত প্রতিযোগিতা প্রবর্তিত হয় কিন্তু এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র সারা ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীদের বিনোদন সংস্থাগুলির মধ্যেই সীমিত রাখা হয়।

ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ নাটকের শাখা সংগঠন করেন ১৯৬৯ সালে লোকরঞ্জন ও লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে। এর আগেও প্রচার বিভাগে স্থানীয় নাট্য সংস্থাগুলিকে সাহায্য ও উৎসাহদানের উদ্দেশ্যে কয়েকবছর ধরে পরিকল্পনা-প্রদর্শনীর অঙ্গস্বরূপ নাট্য উৎসবের ব্যবস্থা করতেন। এতে শিল্পের কোনরূপ প্রত্যক্ষ উন্নতি হত না বটে, কিন্তু আর্থিক আনুকুল্যে সৌখিন নাট্য সংস্থাগুলির উপকার হত। যাত্রা, ঢপযাত্রা, লোক-নৃত্যনাট্য প্রভৃতি লোকসংস্কৃতিমূলক সংস্থাগুলিও সরকারী আর্থিক সহায়তা লাভ করে কর্মতৎপরতা বাড়াতে পারতেন ঐ সমস্ত উৎসবে যোগ দিয়ে।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার উন্নয়ন, অপেশাদার নাট্যসংস্থাগুলির মধ্যে সংহতি রক্ষা, আর্থিক ও অন্যান্য সমস্যা বা প্রতিবন্ধকতা হতে সংস্থাগুলির পরিত্রাণের উপায় চিন্তা, বিপন্ন নাট্যশিল্পীগণকে নানাভাবে সাহায্য দান প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসূচী নিয়ে ১৯৬৫ সালে আগরতলায় 'ত্রিপুরা সম্মিলিত চারু শিল্পী কল্যাণ সংসদ' সংগঠিত হয়েছিল। লক্ষ্যের তুলনায় সামান্য মাত্রই তাঁদের অবদান।

১৯৬৫ সাল থেকে ত্রিপুরার নাট্যজগতে আধুনিক রীতির নাট্যচর্চার গতি প্রবলতর হয়। এসময় থেকে নব নব নাট্যরীতির অনুসারী বেশ কয়েকটি নতুন নাট্য সংস্থা সংগঠিত হতে থাকে। অতি সাম্প্রতিক কালের আধুনিক প্রগতিশীল নাট্যরীতির প্রবর্তক তাঁরা। এই দলগুলির মধ্যে রঙ্গম, রূপারোপ, রূপম, তিয়াস, ঘরোয়া, ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ, মুখোস, নির্মোক, রূপায়ণ, নেপথ্য, অনামী, লিটল ড্রামা গ্রুপ, রঙবেরঙ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

এঁদের মধ্যে কোনো কোনো সংস্থা এখনও দু'চারটি ট্রাডিশন্যাল নাটক মঞ্চস্থ করেন, কিন্তু তাঁদের সকলেরই প্রধান লক্ষ্য আধুনিক প্রয়োগরীতি-প্রধান প্রগতিশীল নাটক

অভিনয়ের দিকে। মূলত কলকাতার আধুনিক নাট্যরীতির অনুসারী হলেও এঁদের প্রযোজিত নাটকের আঙ্গিকে অল্পবিস্তর আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের আঁচ থাকে। দলগুলিতে অনেক দক্ষ অভিনেতা আছেন যাঁরা অভিনয়ে স্বকীয়তার পরিচয় দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। মঞ্চের প্রায়োগিক কলা-কৌশলে এই সংস্থাগুলি যতটুকু কলকাতার আদর্শকে অনুসরণ করেন, অভিনয় কলায় তার চেয়ে বেশি স্বকীয়তা রক্ষার চেষ্টা করেন। এই প্রচেষ্টা দ্বারা আঞ্চলিক অভিনয় চর্চার ক্ষেত্রে সুফল প্রসূত হচ্ছে বলা যায়। আধুনিক বাংলা নাটকের প্রযোজনায় বাংলার বাইরের কোন অঞ্চলে কলকাতার প্রয়োগরীতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে স্বতন্ত্ররীতির প্রবর্তন করবার সুযোগ খুবই কম। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও একই কথা। এই অবস্থায় ত্রিপুরার শিল্পীরা, অভিনেতারা নিজেদের প্রযোজনায়, অভিনয় বা মঞ্চশৈলীতে যে স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করছেন তা সামান্য হলেও প্রগতিশীল চর্চার নিরিখে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দর্শকদের চাহিদা, সমলোচকদের বিচার-বিশ্লেষণ এবং নাট্যকর্মীদের অভিনব সৃষ্টির প্রেরণা থেকে স্থানীয় নাট্য প্রযোজনায় ক্রমশ স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির প্রয়াস বেড়ে চলেছে, এটি শুভ লক্ষণ। সম্প্রতিকালের স্থানীয় নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে ব্যক্তি প্রাধান্যের সংকীর্ণতা প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছে। ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী বড় এ চেতনা জাগরূক হয়েছে। যে জাতের নাটকই হোক না কেন, সংঘ চেতনা ব্যতিরেকে যে নাট্য প্রয়াস সুষম ও সফল হতে পারে না—এ তত্বকে সব দলই স্বীকার করে নিয়েছে বলা যায়।

আজকের নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে ত্রিপুরার প্রধান সব কয়টি দলই অল্প-বিস্তর অবদান রেখে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা যেতে পারে। এখানে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে বলা যায়—রঙ্গম্ সংস্থা ট্র্যাডিশন্যাল ও আধুনিক প্রতীকধর্মী, নানাধরনের নাটকের অভিনয়ই করে থাকেন। প্রধানত নাটক নির্বাচন, প্রয়োগরীতিতে ও শিল্পশৈলীতে সমন্বয় সাধন করে তাঁরা নাটক প্রযোজনা করেন। সর্বশ্রেণীর বোধগম্য অথচ শিল্পগুণসমৃদ্ধ নাটক এঁরা নির্বাচন করেন বেশি।

'রূপারোপ' সংস্থা প্রধানত ট্র্যাডিশনাল রীতিতে আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে আধুনিক নাটকের প্রযোজনায় আগ্রহী। মঞ্চসজ্জায় নতুন ও পুরনো রীতির মিলন ঘটিয়ে এবং নাটকের কোন কোন দৃশ্যে ছায়াচিত্রের সমাবেশ ঘটিয়ে চমক লাগানো দৃশ্যের অবতরণায় এ সংস্থা সিদ্ধহস্ত। বিচিত্র আলোক সম্পাতে মঞ্চে ইন্দ্রজাল সৃষ্টির দক্ষতাও এ-দলের সমধিক। জটিল মনস্তত্বমূলক নাটকের প্রতি এঁদের ঝোঁক কম। বাস্তবানুগ নাটকই এরা বেশি মঞ্চস্থ করেন।

রূপম নাট্যসংস্থা প্রধানত প্রতীকধর্মী আধুনিক নাটকের সমর্থক হলেও নবপ্রবর্তিত অ্যাবসার্ড নাটকের অভিনয়েই তাঁদের উৎসাহ প্রবল। বস্তুত ত্রিপুরার মঞ্চে প্রথম অ্যাবসার্ড নাটকের প্রবর্তন ও সফল অভিনয় তাঁরাই করেন।

'মুখোশ' সংস্থা হালে প্রতীকধর্মী নাটকের প্রযোজনাই বেশি করেছেন। মঞ্চশৈলীতেও তাঁদের নৈপুণ্য যথেষ্ট।

'ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ' নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে জনজীবনের খুব কাছাকাছি এগিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের হালের নাটক নির্বাচনও সেই নিরিখেই হচ্ছে। আঙ্গিকের দিকে তাঁরা আধুনিক প্রচলিত রীতির অনুসারী।

'রূপায়ণ' নাট্য সংস্থা সম্প্রতি স্বতন্ত্র ধরণের নাটক অভিনয়ের পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যাচ্ছেন। নাটকের প্রচলিত ট্রাডিশনকে পরিবর্তিত করে সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী নতুন ধারার নাটক ও অভিনয়ের প্রবর্তন করা যায় কিনা তারই দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁরা করে যাচ্ছেন। এ কারণে ত্রিপুরায় 'রূপায়ণ' একটি বিতর্কিত নাট্য সংস্থারূপে সর্বমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাটকের বৈচিত্র্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁরা কোনো কোনো নাটকে মূকাভিনয়ের সংযোজনও করে থাকেন।

'তিয়াস' নাট্যসংস্থা প্রধানত সহজ বুদ্ধিগ্রাহ্য মনস্তত্ত্বমূলক ও সমস্যামূলক আধুনিক নাটক নির্বাচন করে থাকেন। আঙ্গিক অপেক্ষা সুষ্ঠু অভিনয়শৈলীর দিকেই এঁদের মনোযোগ বেশি। আধুনিক নাটকে সমন্বয় সাধনে এঁরা যত্নশীল।

ঘরোয়া, নির্মোক, নেপথ্য প্রভৃতি নাট্যসংস্থা মোটামুটি প্রায় একই ধারার শিল্পশৈলী অনুসরণে আধুনিক নাটকের অভিনয় করে যাচ্ছেন; মঞ্চ সজ্জা ও প্রতীক ব্যবহারে এঁদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত তারতম্য কিছুটা থাকে মাত্র। রাজধানী আগরতলা এবং মহকুমা শহরের অন্যান্য প্রগতিশীল আধুনিক নাট্য সংস্থাগুলি প্রায় একই নাট্যরীতিকে অবলম্বন করে চর্চার প্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এতদিন সদর ও মফঃস্বলের সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ কমই ছিল, নাট্যমেলা ও প্রতিযোগিতার ফলে পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমশ বেড়ে চলেছে। আঞ্চলিক নাট্যচর্চার ব্যাপকতার জন্য এই সম্পর্কের অধিকতর বিস্তার অপরিহার্য। ত্রিপুরায় সম্প্রতিকালে তিনটি নাট্যমেলার অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রথমটি হয় রঙ্গম নাট্যসংস্থার উদ্যোগে ১৯৭২ সনের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে। এই অনুষ্ঠানের ত্রিপুরার ছয়টি নাট্যসংস্থা (অপেশাদার) যোগদান করে মোট সাতটি নাটকের অভিনয় করেছিলেন। দ্বিতীয় নাট্যমেলার অনুষ্ঠান করেন রূপায়ণ নাট্য সংস্থা। ১৯৭৩ সনের জানুয়ারিতে। এটি ছিল তাঁদের সংস্থার একক নাট্যোৎসব।

তৃতীয় নাট্যমেলাটি হয় ১৯৭৩ সনের এপ্রিল মাসে ''ত্রিপুরেশ নাট্য মেলা'' নামে। আগরতলায় ত্রিপুরেশ স্মৃতিচারণ সংস্থা এই নাট্যমেলার উদ্যোক্তা। এতে ত্রিপুরার চোদ্দটি নাট্য সংস্থা আঠারোটি নাটকের অভিনয় করেছিলেন। নাট্য চর্চার উৎসাহ

বর্ধনে, অভিনয়ের উৎকর্ষসাধনে এবং সংস্থাগুলির মধ্যে ভাব বিনিময়ে এই সমস্ত নাট্যমেলার অনুষ্ঠান যে নাটকাভিনয় প্রতিযোগিতা অপেক্ষা অধিকতর ফলপ্রসূ, একথা অস্বীকার করা যায় না।

আগেকার দিনে সৌখিন নাট্যসংস্থাগুলি নাট্যামোদী ধনবান ব্যক্তিদের আর্থিক সহায়তা উপর নির্ভর করে নাট্যানুষ্ঠান করতেন। বর্তমান যুগে সংস্থাগুলি ব্যয় সংকুলান করেন নিজেদের চাঁদার টাকায়। আগরতলায় রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে স্থায়ী মঞ্চ তৈরী হওয়ায় প্রবেশমূল্যের বিনিময়ে অভি য় দেখাবার রেওয়াজ হয়েছে। এতে মাত্র আগরতলার নাট্যসংস্থাগুলি আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন, মফঃস্বলের মঞ্চে সে সুযোগ অনুপস্থিত।

বাংলা নাট্যচর্চার প্রসার ও প্রভাবে ইদানীং মণিপুরী, ত্রিপুরী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার নাটকও কিছু কিছু রচিত ও অভিনীত হচ্ছে। ১৯৭২ সনে আগরতলার মণিপুরী ললিতকলা পরিষদ একটি সামাজিক মণিপুরী নাটক (আয়না) মঞ্চস্থ করেন এবং ঐ সনেই 'কক্‌বরক্ সাহিত্য সভার' উদ্যোগে ত্রিপুরী ভাষায় নামানি হমচাং (পথের আলো) নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি লিখেছেন অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা। এই দু'টি নাটকই আধুনিক বাংলা নাটকের রীতি ও প্রয়োগ কৌশল অনুসরণ করা হয়েছিল। 'নামানি হমচাং' নাটক এখনও ত্রিপুরার গ্রামে বনাঞ্চলে নিয়মিত প্রদর্শিত হচ্ছে। সম্প্রতি শ্রী নিশিকান্ত দেববর্মা 'বলংকর সাদি' নামে একটি ত্রিপুরী ভাষায় নাটক রচনা করেছেন। এটিও কক্‌বরক্ সাহিত্যসভার প্রযোজনায় বাংলা নাট্যরীতিতে গ্রামে গ্রামে নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে। আধুনিক বাংলা মঞ্চ নাটকের আদর্শ অনুসরণে উপজাতীয় ভাষায় নাটকাভিনয়ের একটা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা চলছে; ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতিতে এ জাতীয় প্রয়াসের গুরুত্ব কম নয়, অবহেলা করবারও নয়।

ইদানিং ত্রিপুরার শহরতলি ও গ্রাম জ পদে যাত্রা ও ঢপযাত্রার দল আবার কিছু কিছু গড়ে উঠছে। হাল বাংলার নতুন রীতি-নীতির অত্যাধুনিক যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে ত্রিপুরার এই যাত্রাদলগুলির সংযোগ এখনও ঘটেনি, তাই পুরনো রীতিতেই তাঁরা অভিনয় করে যাচ্ছেন। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেই এই দলগুলির কর্মতৎপরতা এবং বেশি সমাদর। এই সমস্ত লোকনাট্যের সঙ্গে শহরবাসীদের মানসিক দূরত্ব এখনও যথেষ্ট রয়ে গেছে।

ত্রিপুরার নাট্যকারের লেখা নাটকের অভিনয় অতীতের উজ্জয়ন্ত নাট্য সমাজের কাল থেকেই শুরু হয়েছে। সম্প্রতি নাটক রচনার চেষ্টা আবার চলেছে। নাট্য সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লেখকরাই প্রধানত নিজেদের চর্চার তাগিদে এ বিষয়ে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। কয়েক বছরের মধ্যে মৌলিক, অনুবাদ, ছায়া এবং গল্পাদির ভাব ও বিষয় অবলম্বনে বিভিন্ন গোত্রের নাটক রচনা করেছেন এবং করছেন হাল ত্রিপুরার

লেখকরা। এগুলির মধ্যে অনেক নাটক-নাটিকাই মঞ্চস্থ হয়েছে এবং হচ্ছে। কয়েকটি মুদ্রিতও হয়েছে। পাণ্ডুলিপির সংখ্যাই বেশি। বিশ বছরের মধ্যে আগরতলার মঞ্চে ত্রিপুরার নাট্যকারদের লেখা যে সমস্ত বাংলা নাটক-নাটিকা অভিনীত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঠাকুর নগেন্দ্র দেববর্মার 'প্রকৃতি', হরিনারায়ণ রায়ের 'যুগবলি', হীরেন্দ্রনাথ নন্দীর 'স্বর্গ থেকে বিদায়', 'দেবতার জাগরণ', 'বিপ্লবী অরবিন্দ', 'নেতাজী ফিরে এস', অগ্নি আচার্যর 'যাত্রা হল শুরু', মৃন্ময় রায়ের 'হাতী সিংএর রং তুলি', 'উপযুক্ত সহকারী', গোপাল দের 'আমার দেশ', 'রক্ত স্বাক্ষর', 'ষড়বর্গ', 'মহিমের সংসার', 'অতীত ডাকে', 'রামরাজত্ব', 'শেষ কোথায়', 'সমন্বয়', অজিত মজুমদারের 'ঝংকার', আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চিকিৎসা সংকট', পরিতোষ দাসের 'হাসির আড়ালে', 'সংস্কার', নিখিল ভট্টাচার্যর 'সেই বৃদ্ধ লোকটি', বামাপদ মুখোপাধ্যায়ের 'আ-পাস্যাত', 'ছুটির ফাঁদে', জলধর মল্লিকের নাট্যরূপ 'কমলাকান্তের জবানবন্দী', 'বিনে পয়সার ভোজ', নিরোদ দেবনাথের 'নিশাচর', ননী দেবের 'জাগো রে', বিমলগুপ্তের 'নোনাজল মিঠে মাটি', মাণিক চক্রবর্তীর 'মস্তটান', 'অজ্ঞাতবাস', 'ডাঃ ওয়াং এর গোপন সংকেত', 'চোর', 'প্রসেস্' 'থিয়েট্রোন', দীপক বড়ুয়ার 'স্কেচ'। এগুলি ছাড়া মঞ্চস্থ হয়নি এমন নাটকের দু'একটি মুদ্রিত গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির সন্ধান মেলে। এগুলির মধ্যে বাঙালির সাধারণ সমাজ ও জীবন-চিত্রের ভিত্তিতে রচিত নাটক নাটিকাই বেশি, ত্রিপুরার আঞ্চলিক বিচিত্র বিষয়বস্তুকে উপজীব্য করে খুব কম নাটকই লেখা হয়েছে। সম্প্রতি সামাজিক তাগিদে ত্রিপুরার বিষয়বস্তুভিত্তিক নাটক রচনা ও অভিনয়ের আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে। সমবেত প্রচেষ্টায় এই আবেগ বাস্তবে সহজেই রূপায়িত হতে পারে, হওয়া আবশ্যক। বাংলা নাট্যচর্চাক্ষেত্র থেকে এরূপ অঞ্চলিক বিষয়বস্তুসম্পৃক্ত বাংলা নাটক ও অভিনয় সম্প্রসারিত হলে উপজাতীয় ভাষার সাম্প্রতিক নাট্যপ্রয়াসেও সমৃদ্ধি আসবে এমন প্রত্যাশা স্বাভাবিক নিয়মেই করা যায়।

অধুনা ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় কর্মতৎপরতা ও প্রবল গতিবেগ দেখা যাচ্ছে। সে তুলনায় গঠনধর্মী নাট্যসমালোচনার আয়োজন কম। এখানে সাময়িক পত্র-পত্রিকাই নাট্যসমালোচনার প্রধান মাধ্যম। কিন্তু নাটকাভিনয়ের প্রচারধর্মী আলোচনাই প্রকাশিত হচ্ছে বেশি। প্রকৃতপক্ষে দর্শকদের নাট্যানুরাগ বর্ধনে এবং নাট্যকর্মীদের চর্চার উৎকর্ষ সাধনে সৎ সমালোচনার প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে ত্রিপুরার নাট্যানুরাগীরা ভাবছেন।

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার প্রয়োজনীয়তা, প্রসার ও সার্বিক উন্নয়নের বিষয়ে আজ সংস্কৃতিপরায়ণ সর্বমহলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে, জাতীয় সংস্কৃতির সম্যক পরিপুষ্টি ও অগ্রগতিতে যা একান্তভাবেই বাঞ্ছিত।

।। এখানেই স্বর্গীয় অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর আলোচনা শেষ করেছেন। অনিলচন্দ্রের আলোচনাকে সূত্র হিসাবে ধরে নিয়ে তার বিশ্লেষণে যাওয়া যেতে পারে। এবার দ্বিতীয় ধারার আলোচনা। ।।

রাজছত্রছায়া থেকে নাটকাভিনয় এখন প্রজাদের অথবা স্বাধীন গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষের তত্ত্বাবধানে এসে গেছে। এবার আমরা শুরু করবো স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে। আগরতলার নাট্যচর্চায় তখন দেখা যাচ্ছে দুটি সংগঠনকে, স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন এবং ত্রিপুর শিল্পায়তন। স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন যাত্রাধর্মী অভিনয়ের ধারাকে বাঁচিয়ে রাখছে আর 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' শিশির ভাদুড়ীর নবধারার অভিনয়কে আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করেছে।

এরপর লোক শিল্পী সংসদ পুরনো দিনের গড়ে ওঠা ধ্যান ধারণাকে ওলট পালট করে দিয়ে দ্বিতীয় ধাপের নাট্যান্দোলনকে জোরদার করার প্রয়াস শুধু নেয়নি, শক্ত আঘাতে নাট্যধারণাকে তছনছ করে দিয়েছিল—যেমন দিয়েছিল আন্দোলনের তৃতীয় ধাপে সংসদের সদস্যরাই 'রূপারোপ' নাট্যসংস্থা গঠন করে ত্রিপুরা তথা আগরতলার নাট্যসংস্থাগুলির তথাকথিত আধুনিকতাবাদের উপর চরম আঘাত হেনে। সে আলোচনায় আমরা পরে আসছি। তার আগে লোকশিল্পী সংসদ সম্পর্কে ত্রিপুরার প্রখ্যাত গবেষক এবং গবেষণাগারের আধিকারিক রমাপ্রসাদ দত্তের দীর্ঘ প্রবন্ধটি এখানে হুবহু তুলে দেওয়া হল। এর কিছু অংশ ১৯৯৩ সনের জানুয়ারি মাসে 'পুষ্পাঞ্জলি' দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

নবনাট্য আন্দোলনে ত্রিপুরার লোকশিল্পী সংসদ
(Centre of Mass Culture)

।। রমাপ্রসাদ দত্ত ।।

ত্রিপুরায় শতাব্দীর নাট্য আন্দোলনের ধারায় রাজ আমলের অবদানের কথা কমবেশী সবারই জানা আছে। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত সে ধারা কখনও বৃদ্ধি পেয়েছে কখনও স্তিমিত হয়েছে।

দেশবিভাগের পর ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরায় বহু বাঙালি শরণার্থীর আগমন ও পুনর্বাসন হয়। স্থানীয় অধিবাসী ও নবাগত শিল্পী অভিনেতার সমাবেশে ত্রিপুরার নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে নবযুগের সূচনা হয়। গড়ে উঠে বহু নাট্য সংস্থা। সে সব সংস্থার মধ্যে অন্যতম নাট্য সংস্থা ছিল 'লোকশিল্পী সংসদ'।

আজকের প্রজন্ম বিশেষ করে যাঁরা নাটক করেন, তাদের কাছে লোক শিল্পী সংসদের ইতিহাস অজানা। ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের জন্মলগ্ন থেকেই লোকশিল্পী সংসদ পুরাতনকে অস্বীকার না করে নবনাট্যরীতি অনুসরণে নাট্যচর্চাকে প্রসারিত করার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করে। অভিনয়ের মান উন্নয়নে তাঁদের যেমন আগ্রহ ছিল তেমনি স্থানীয় প্রবীণ ও নবীন নাট্য শিল্পীদের সহযোগিতায় নাটকের রূপসজ্জা, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা, সঙ্গীত, আবহসঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি আঙ্গিকের উৎকর্ষ সাধনের দিকেও সমান লক্ষ্য ও যত্ন ছিল।

অতি অল্প খরচে মনোহর ও চমকপ্রদ মঞ্চ রচনার শিল্প কৌশলে লোকশিল্পী সংসদ সেদিন ত্রিপুরার সমকালীন নাট্য জগতে আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। নাটকের দল নিয়ে গ্রামে গ্রামে, শহরে গঞ্জে পরিক্রমা করে নাট্যচর্চার প্রেরণা সঞ্চারেও এ সংস্থার কৃতিত্ব ছিল সমধিক।

সে সময় ত্রিপুরার চর্চাধর্মী সমস্ত নাট্য সংস্থাগুলির মধ্যে ছিল সুস্থ প্রতিযোগিতার পরিবেশ। ছিল না ঈর্ষার কোনরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তখন অশোভন আচরণকে কেউ পছন্দ করত না। তাই দেখেছি প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও, সবাই যে কোনো নাটক দলেরই হোক না কেন এক সঙ্গে আড্ডা গল্প করতেন এবং সে আড্ডায় গঠনমূলক নাট্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রত্যেকেই তাঁদের স্ব স্ব সংস্থার অভিনয়ের দোষগুণের বিচার বিশ্লেষণ করতেন। সেদিন মেলার মাঠের নারায়ণ ভট্টাচার্যের চায়ের দোকানে ছিল আড্ডার স্থান। সেখানে আসতেন ত্রিপুরার সেদিনকার খ্যাতিমান অভিনেতা ত্রিপুরেশ মজুমদার, যিনি একাধারে ছিলেন 'ত্রিপুর শিল্পায়তনের' মুখ্য পরিচালক এবং ত্রিপুরা নাট্যান্দোলনের অন্যতম সংগঠক। থাকতেন সুধাংশুমোহন দত্ত, যিনি সেদিন নাট্যজগতের সবার কাছে বড়দা হিসাবে পরিচিত ছিলেন এবং বহু অভিনীত নাটকের পরিচালক হিসাবে নাটক পরিচালিত করেছেন। আসতেন 'শিল্পায়ন' নাট্য সংস্থার পরিচালক শিবদাস ব্যানার্জী, খ্যাতিমান শিল্পী শক্তি হালদার এবং আরো অনেক নাট্যামোদী। সেদিন ভিন্ন ভিন্ন নাট্য সংস্থার অভিনেতাদের মধ্যে ছিল একটা আত্মিক সম্পর্ক। আড্ডায় তীব্র নাটক সমালোচনার মধ্যেও কেউ কারো প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন না।

লোকশিল্পী সংসদ গড়ে ওঠার পেছনেও একটা ইতিহাস আছে। একথা সবারই জানা আছে, যে কোনো সংস্থার গড়ে উঠার পেছনে থাকে কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তিত্ব। লোকশিল্পী সংসদের গড়ার পেছনে ছিল শিল্পী শক্তি হালদার, সাহিত্যিক ও নাট্য সমালোচক অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য, নাট্যপ্রিয় সূত্রধার নরেশ পোদ্দার, মঞ্চ পরিকল্পনার বিশেষ অধিকারী অমরেশ দত্ত, রূপসজ্জাকার হরেন্দ্র হালদার, অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক পরেশ ভাদুড়ী, রমা প্রসাদ দত্ত, কেশব ভট্টাচার্য, রসময় রাউথ, লীলা দেব প্রমুখ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সুধিজন।

বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় শক্তি হালদার, কেশব ভট্টাচার্য, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য ও নরেশ পোদ্দারকে।

লোকশিল্পী সংসদের একটি পশ্চাদপর ইতিহাস আছে, আর সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় উত্থান-পতনের ত্রুটি বিচ্যুতির ইতিহাস।

পূর্ব-উল্লিখিত পাঁচের দশকে (১৯৫৫ খ্রিঃ) যে সংস্থা ত্রিপুরায় সাংস্কৃতিক জগতে কী সাহিত্যে, কী নাটকে, কী সঙ্গীতে যে অবদান রেখেছিল, তা আজ ২০০১-এ সুরু এই দশকের অনেকের কাছেই অজ্ঞাত রয়ে গেছে। বিশেষ করে তিরিশের নীচে যাঁদের বয়স তাঁদের কাছে তো বটেই।

আজ যেখানে নেতাজী সুভাষ রোডে রিজিওন্যাল কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে সেটা ছিল গেঁদু মিঞার বিরাট লনযুক্ত বাড়ি। ত্রিপুরা প্রশাসনের শিক্ষা বিভাগ পূর্বতন

বাড়ির মালিক গেঁদু মিয়া সাহেব-এর থেকে বাড়িটি ক্রয় করে সেখানে শিক্ষা বিভাগের অফিস স্থাপন করেছিল।

সে অফিসে শিল্পী হিসেবে সেদিন কাজ করতেন শক্তি হালদার মহোদয়। বয়সে তরুণ, মুখে আভিজাত্যের ছাপ, স্বভাবে কথায় নম্র এবং সদা হাস্যময়। সেই অফিসে কাজ করতেন কেশব ভট্টাচার্য। দেখতে ছোটখাট, কথাবার্তা বলতেন আস্তে এবং ধীরে ধীরে। সব সময় দার্শনিকের ন্যায় চিন্তায় মগ্ন থাকতেন।

শ্রী হালদার শুধুমাত্র শিল্পীই ছিলেন না, তিনি ভাল আবৃত্তি, নাটক অভিনয় এবং কবিতা লিখতে পারতেন। বিশেষভাবে তিনি নাট্যরসিক ও অভিনয়ে পারদর্শী ছিলেন। তাই তিনি গতানুগতিক ধারা থেকে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে জীবনকে চালিত করার অভিপ্রায়ে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলার চিন্তা করতে লাগলেন। সঙ্গী হিসেবে কেশব ভট্টাচার্যকে তাঁর মনের কথা বললেন এবং প্রতিদিন অফিসের কাজের অবসরে, চায়ের দোকানে বসে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গড়ে তোলা যায় কিনা এ নিয়েই আলোচনা করতেন।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দের কোন এক সন্ধ্যায় প্যারাডাইস চৌমুহনীর এক চায়ের দোকানে (নাম তার প্যারাডাইস) বসে আমাকে (রমাপ্রসাদ দত্ত) এবং রসময় রাউত কে তাঁদের পরিকল্পনার কথা জানালেন এবং এ কথাও তাঁরা বললেন— ইতিপূর্বে সবার কাছে বলে সংস্কৃতি সংস্থার গড়ার প্রাথমিক ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করে রেখেছেন। এখন শুধু সহযোগিতার প্রয়োজন। উল্লেখ থাকে এখানে, কৌতুক অভিনেতা সদা হাস্যময় রসময় রাউত শিক্ষা বিভাগের কর্মী ছিলেন।

এরপর সম্ভাব্য সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রস্তুতি/পর্ব শুরু হল ঐ চায়ের স্টলে বসেই। ত্রিপুরায় সে সময়ের সাহিত্যিক ও নাট্য সমালোচক অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য আমাদের আহ্বানে একদিন এলেন। ঐ চায়ের স্টলে বসেই ঠিক হল, প্রবেশ মূল্য নিয়ে নাটক করে সংস্থার আর্থিক তহবিল তৈরী করা হবে। মঞ্চস্থ করা হবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্তকরবী' নাটকটি। আলোচনায় আরো সিদ্ধান্ত হল সংস্থার নাম রাখা হবে 'লোকশিল্পী সংসদ', ইংরেজীতে লেখা হবে 'Center of Mass Culture'। এবং শহরের কিছু সংস্কৃতি সম্পন্ন মরমী মানুষের সঙ্গে এ বিষয়ে মত বিনিময় করতে হবে। সংসদের সাময়িক কাজকর্ম করার জন্য স্থান নির্বাচন করা হল নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন।

একদিন সবাই মিলে নেতাজী বিদ্যানিকেতনে সে সময়কার প্রধান শিক্ষক হীরেন্দ্রনাথ নন্দী মহাশয়ের নিকট যাওয়া হল। হীরেন্দ্র নন্দীকে দেখে মনে হল যেন আর এক গান্ধী, সামান্য বস্ত্র পরিধানরত, সাধারণ চাল-চলনে এক বিরাট ব্যক্তিত্ব। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন সুভাষবাদে বিশ্বাসী। আমাদের কথা সব শুনে তিনি বললেন—"আমাদের

বিদ্যালয় আপনাদের সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্র হলে আমি সুখী হব।"

এর কয়েকদিন পর নেতাজী বিদ্যানিকেতনে সভা আহ্বান করা হল। সে সভায় সে দিন উপস্থিত ছিলেন—কেশব ভট্টাচার্য, শক্তি হালদার, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, অমরেশ দত্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত, রসময় রাউত, দেবেন্দ্র ভৌমিক, লীলা দেব, স্মৃতি গুপ্তা প্রমুখরা। সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল, রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটিই অভিনীত হবে।

কিন্তু প্রশ্ন দেখা দিল নাটকের কুশীলব সংগ্রহ নিয়ে। শ্রী শক্তি হালদার ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে অভিনয় করায় বিরোধিতা করলেন। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন—সে সময় ত্রিপুরায় সমস্ত নাট্য সংস্থাই স্ত্রী চরিত্রের অভিনয় পুরুষদের মেয়ে সাজিয়েই করতেন। এবং কোনো কোনো সংস্থা ছেলেকে মেয়ে সাজিয়ে এবং মেয়ে উভয়েরই সংমিশ্রণে অভিনয় করতেন। শ্রী হালদারের আপত্তি ছিল সেখানেই।

এ সমস্যার সমাধান শ্রী হালদার নিজেই করলেন। তিনি লীলা দেব এবং স্মৃতি গুপ্তাকে অভিনয় করার জন্য অনুরোধ করলেন। লীলা দেব অভিনয় করতে রাজী হলেন কিন্তু স্মৃতি গুপ্তা রাজী হলেন না। তবে তিনি সংস্থাকে ভালবেসে, তার উদ্দেশ্যের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তাঁর কলেজে পাঠরতা ছোট বোন যূথিকা গুপ্তাকে অভিনয়ের জন্য রাজী করালেন।

এর পর প্রস্তুতিপর্ব শুরু হল। প্রাথমিক খরচ নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে করা হল। তার সিংহভাগই বহন করেছিলেন শক্তি হালদার। এরপর এল অভিনয়ের কুশীলব ঠিক করা। লীলা দেব ও যূথিকা গুপ্তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। লীলা দেব গান জানতেন এবং শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। যূথিকা গুপ্তা নাচ গান সবই জানতেন এবং কলেজে পড়তেন। যূথিকা গুপ্তার পিতা ছিলেন সে সময়কার ত্রিপুরা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট। নাম শ্রীবিধুভূষণ গুপ্ত। সেদিন তাঁর বাড়িটি ছিল আগরতলায় সাংস্কৃতিক চর্চার অন্যতম পীঠস্থান। যূথিকাকে নন্দিনীর ভূমিকায় এবং লীলাকে 'চন্দ্রা'র ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। শক্তি হালদার নিজে নিলেন বিশু পাগলের চরিত্র রূপায়ণের ভার। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য যাঁদের মনোনীত করা হয়েছিল তারা হলেন, অধ্যাপকের ভূমিকায় দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক। তিনি 'প্রাচ্যবাণী পরিষদ' নামে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা গঠন করেছিলেন। তিনিও শিক্ষা বিভাগে চাকরি করতেন। বড় সর্দারের ভূমিকায় সে সময়কার ত্রিপুরা সরকারের

লীলা দেব যিনি রক্তকরবীতে চন্দ্রার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন

আয়ুর্বেদ হাসপাতালের প্রধান কবিরাজ মনীন্দ্র ভট্টাচার্যকে মনোনীত করা হয়।

সে সময় 'শিল্পী সংসদ' নামে অপর একটি নাটকের সংস্থা থেকে তিনজনকে 'রক্তকরবী' নাটকের জন্য মনোনীত করা হয়েছিল। তারা হলেন পি. ডব্লিউ. ডি.-তে কর্মরত তপেশ রায় রাজার ভূমিকায়, হিরণ্ময় চক্রবর্তী ফাগু লালের ভূমিকায়, গোপাল চক্রবর্তী গোঁসাই-এর ভূমিকায়। মেজো সর্দার হিসাবে মনোনীত হয়েছিল মানিক চক্রবর্তী। মোড়ল বিচিত্র সাহা, গোকুল সুশীল চৌধুরী। তিনি সে সময়ে শিক্ষা বিভাগের স্কুলের ব্রতচারীর শিক্ষক ছিলেন। পুরাণবাগীশের ভূমিকায় রসময় রাউত। পালোয়ান রঞ্জিত পাল। ছোট সর্দার নীলু চক্রবর্তী, চিকিৎসক সমরেন্দ্র চৌধুরী, কিশোর দুর্গানাথ চক্রবর্তী, রঞ্জন রমাপ্রসাদ দত্ত।

এরপর ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে লোকশিল্পী সংসদের পক্ষ থেকে আমন্ত্রণ পত্র ছাপান হল। আমন্ত্রণ পত্রটি ছিল এরূপ ঃ

সুধী,

লোকশিল্পী সংসদের প্রথম নিবেদন 'রক্তকরবী' নাটক আগামী ২৫শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ খ্রিঃ সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় স্থানীয় ছায়াবাণী হলে মঞ্চস্থ করা হইবে। নাটকটি উদ্বোধন করিবেন শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এম. এ. মহোদয়। যথা সময়ে আপনার সহৃদয় উপস্থিতি ও সাহচর্য আন্তরিক কামনা করি।

ইতি, ৪।২। ৫৬ ইঃ
নিবেদক
লোকশিল্পী সংসদের সভ্য ও সভ্যা।
আগরতলা।

(আমন্ত্রণ পত্রটি ডোনেশন কার্ড হিসাবে ব্যবহৃত হয়)

রক্তকরবী অভিনীত

এ কথা সত্য যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা মূলতঃ কাব্য-প্রতিভা। তা সত্বেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। নাট্য শিল্পে তিনি যে ধারার প্রবর্তন করলেন তা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই অভিনব। যাঁরা মনে করেন রবীন্দ্রনাটকে নাটকত্বের অভাব সুতরাং এগুলি নাটকই নয়, তাঁদের আমরা সবিনয়ে এটুকু বলতে পারি যে কাটাকাটি, মারামারি, হত্যা, পতন ও মূর্চ্ছা, সন্ধি বিগ্রহের ঘনঘটার অভাব রবীন্দ্র নাটকে আছে, কিন্তু ওটাই কি নাটকত্বের পরিচয়, বাইরের ছন্দটাই কি সব, *অন্তর্দ্বন্দ্ব কি নাটকে গতি সঞ্চার করে না? মানবমনের বিচিত্রভাব, সূক্ষ্ম অনুভূতি এবং*

সুখদুঃখের ঘাতপ্রতিঘাত কি নাটকের সুষ্ঠু সংস্থান রচনা করে না? এটা মনে রাখতে হবে নাট্য শিল্পের উচ্চতর নিদর্শন চরম উৎকর্ষ এখানেই, স্থূল বহির্দ্বন্দ্বটাই সব কিছু নয়, রবীন্দ্রনাটকের সূক্ষ্মসৌন্দর্য এবং গভীর আবেদন বিশ্বের সুধীমণ্ডলের অন্তরের অন্তঃস্থলে এ জন্যই শাশ্বত আনন্দলোকের সৃষ্টি করেছে।

কবিগুরুর নাটক 'রক্তকরবী'র আবেদন-ও মানবমনের সেই নিভৃত মণিকোঠায়। রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকগুলির মধ্যে রক্তকরবীর একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। আর রয়েছে সংবেদনশীল কবি মনের একটি বিশেষ ভাবধারার প্রকাশ। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একদিন পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'দেখুন প্রাণের জন্য ভয় নেই। উপনিষদ বলেন—প্রাণই সত্য, তার মৃত্যু নেই। ভয় ছিল ঝড়ের জন্য। বিজ্ঞান বলছেন প্রকৃতির হাতে রচিত যে বস্তু, তারও মৃত্যু নেই। আর যত সব মানুষের রচিত কৃত্রিম অসত্য বস্তু। 'রক্তকরবী'তে আমি সে কথা বলেছি। হাজার বাঁধনে বেঁধেও, শত চাপা দিয়েও প্রাণকে কবে মারতে পেরেছ? আমার ঘরের কাছে একটি মাত্র লোহা-লক্কড় জাতীয় আবর্জনার স্তূপ ছিল। তার নীচে একটা ছোট্ট করবী গাছ চাপা পড়েছিল। কিছুকাল পরে হঠাৎ একদিন দেখি ঐ লোহালক্করের জাল জঞ্জাল ভেদ করে একটি সুকুমার করবী শাখা উঠছে একটি লাল ফুল বুকে ধরে। নিষ্ঠুর আঘাতে যেন তার বুকের রক্ত মধুর হয়ে অন্তরের গভীর প্রীতির সম্ভাষণ জানাতে এল। তখন আমার মনের মধ্যে এ বিষয়ের প্রকাশ বেদনা দিল। নাটকটাকে তাই 'যক্ষপুরীর নন্দিনী' প্রভৃতি বলে আমার মন তৃপ্ত হয়নি, তার নাম দিলাম 'রক্তকরবী'।

এ হল রক্তকরবীর পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানসের এক অনিন্দ্যসুন্দর অভিব্যক্তি। আর নন্দিনী তথা 'রক্তকরবী' হল প্রাণের ও প্রেমের আনন্দের ও সৌন্দর্যের মৃত্যুজয়ী শক্তির প্রতীক। রক্তকরবীর ছোট্ট চারাটির মতন নন্দিনীর জীবনও যক্ষপুরীর জড় জঞ্জালকে বিদীর্ণ করে প্রাণ ও প্রেমের আনন্দ ও সৌন্দর্যের মুক্তির পথ সুগম করে দিয়েছে। যন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠায় কৃত্রিম নিয়মতন্ত্রের প্রাধান্য মানুষের হৃদয়মনকে কিরূপে অনড় করে ফেলে, কৃত্রিমতায় আচ্ছন্ন হৃদয় কিরূপে শুভবুদ্ধি হারায় এবং বুদ্ধি লোপ পেলে সকলের নিকট দুর্বল নিপীড়িত হয়, অবশেষে মানুষের শাশ্বত মৃত্যুঞ্জয়ী প্রাণধর্ম কিরূপে এ অন্যায় অসত্যের জাল ছিন্ন করে মুক্তির আলোক পায়, 'রক্তকরবী' নাটক তারই রূপায়ণ। স্থূলতঃ নন্দিনী ও রক্তকরবী এক ও অভিন্ন। মানুষের প্রাণশক্তির প্রতীক নন্দিনী, আর নন্দিনীর নির্যাস রক্তকরবী।

রবীন্দ্রনাথের এই সুকঠিন নাটকটি (রক্তকরবী) স্বাধীনোত্তর যুগে ত্রিপুরার নাট্যমঞ্চে সর্বপ্রথম লোকশিল্পী সংসদই মঞ্চস্থ করে। ঐ সময় ত্রিপুরার নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলে নাট্য সংস্থাকে যে প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হত এ সম্পর্কে কিছু কথা বলে নিতে হয়।

এ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরায় বিশেষ করে রাজধানী আগরতলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল স্বভাবতঃই আজকের মত ছিল না। সেদিন ত্রিপুরার নবনাট্য আন্দোলন সবে মাত্র হাঁটি হাঁটি পা পা। নাট্যমঞ্চ বলতে তখন আগরতলা শহরে একটিও ছিল না। তবু সে সময় নাটক যাঁরা মঞ্চস্থ করতেন তাদের সবাইকে নীলমনিধন উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের স্বল্প-প্রশস্ত হল ঘরের মধ্যেই করতে হত। অথবা কোনো সিনেমা হল ভাড়া করে।

সে সময় জনসাধারণও নাটক সম্পর্কে আজকের মত আগ্রহান্বিত হওয়া দূরে থাক বরং নাটকে অভিনয় করাকেই মনে করতো এক ধরনের অপরাধ। এ মনোভাবের জন্য বিশেষ করে মেয়েদের অভিনয় করার অনুমতি পারতপক্ষে অভিভাবকরা দিতেন না। যার ফলশ্রুতি হিসেবে সেদিন অধিকাংশ নাট্যসংস্থাতেই মেয়েদের চরিত্র রূপায়ণে পুরুষের সাহায্য নিতে হত। এবং সে জন্য সেদিন স্ত্রী ভূমিকার পুরুষ দ্বারা অভিনয় রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল, সে কথা পূর্বে বলেছি।

আবহসঙ্গীত, আলোক নিয়ন্ত্রণ, মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা কোনটাই সেদিন আজকের মত উন্নত হয়নি। এ ব্যতীত ছিল অভিনয়ে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সাজ-পোষাকের অপ্রতুলতা—এসব বাধা বিঘ্নকে মেনে নিয়েই সেদিন নাট্যরসিকদের নাটক মঞ্চস্থ করতে হত।

পূর্ব-উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনে বিশিষ্ট নাট্যসংস্থা লোকশিল্পী সংসদ এসব বাধাবিঘ্ন সামনে রেখেই 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। নাটক হয়েছিল, আজ যেখানে রূপসী সিনেমা হল তার পাশে অমূল্য মার্কেট অবস্থিত, সেখানে সেদিন ছিল—'ছায়াবাণী' সিনেমা হল। এই সিনেমা হলেই প্রথম লোকশিল্পী সংসদের 'রক্তকরবী' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ২৫ শে এবং ২৬ শে ফেব্রুয়ারি তারিখে।

সেদিন মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন শক্তি হালদার মহোদয়। তিনি মঞ্চের সামনে একটি মাকড়সার জাল রচনা করেছিলেন। ছায়ানৃত্যের পরিচালনায় ছিলেন রাজকুমার ইন্দ্রজিৎ সিংহ এবং তাঁর সম্প্রদায়। যন্ত্রশিল্পে ছিলেন কুমার প্রবীর দেববর্মণ, প্রবোধ দেববর্মণ, ঠাকুর নবদ্বীপ দেববর্মণ ও দেবল দেববর্মণ। সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন শান্তিনিকেতন থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশারদ ব্রজগোপাল সিংহ এবং সহযোগিতায় ছিলেন তাঁর স্ত্রী নিভাননী সিংহ।

এখানে বলা প্রয়োজন, লোকশিল্পী সংসদ যখন 'রক্তকরবী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার উদ্যোগ নেয় তখন সে সময়কার আগরতলার নাট্যরসিক জনগণের একাংশ বলতে লাগলো, এ দুরূহ নাটক কিছুতেই সাফল্যের দুয়ারে পৌঁছবে না, সাধারণ দর্শকের মন আকর্ষণ করতে পারবে না।

কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল দর্শকের প্রশংসা কুড়াতে সক্ষম হয়েছিল লোকশিল্পী সংসদ।

স্থানীয় এবং বহির্ত্রিপুরার সংবাদপত্রগুলি উচ্ছ্বসিতভাবে অভিনয়কে স্বাগত জানিয়েছিল। সেদিন 'যুগান্তর' সংবাদপত্রের ১৯৫৬-র ১৯ শে মার্চ তারিখের সংখ্যায় রক্তকরবীর অভিনয় সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিল, নিম্নে তা দেওয়া গেল:—

"সম্প্রতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটির সার্থক অভিনয় হয়ে গেল শহরের নব প্রতিষ্ঠিত 'লোকশিল্পী সংসদ' কর্তৃক পর পর দু'দিন। উদ্বোধন করলেন 'সাহিত্য-বাসর'-এর সভাপতি ও স্থানীয় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের অধ্যাপক শ্রী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। নাটকটির অন্তর্নিহিত ভাবধারার সঙ্গে শ্রোতৃবর্গের পরিচয় করিয়ে তিনি একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেন এবং বলেন—একমাত্র শান্তিনিকেতন ব্যতীত কবিগুরুর ভাবগম্ভীর এই দুরূহ নাটকটি কেউ মঞ্চস্থ করেছে বলে জানা নেই। উভয়দিনের অভিনয়েই মফঃস্বলের উক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি বস্তুতঃ সার্থকতার দাবী করতে পারে। অভিনয়ের বৈশিষ্ট্যের আকর্ষণে রসবেত্তাগণ প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নাট্যরস উপভোগ করেছেন। সতর্ক সমালোচকের দৃষ্টিতে দোষ-ত্রুটি হয়তো কিছু কিছু ধরা পড়েছে। কিন্তু তবু অভিনয় ও উদীয়মান শিল্পী শক্তি হালদারের পরিকল্পিত মঞ্চসজ্জার সর্বাত্মক সুষ্ঠু শিল্পশৈলীর অকুণ্ঠ প্রশংসা অবশ্যই করতে হয়। যাঁরা অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশের কৈশোর অতিক্রান্ত হয়নি। অভিনয় জগতেও তাঁরা নবাগত। অথচ প্রত্যেকেই স্ব স্ব ভূমিকায় নাটকের প্রতিটি চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। নন্দিনী ও চন্দ্রার ভূমিকায় যথাক্রমে কিশোরী অভিনেত্রী যূথিকা গুপ্তা ও লীলা দেব অভিনয় চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।"

১৯৫৬ খ্রিঃ ৭ই মার্চ জাগরণ পত্রিকায় রক্তকরবী অভিনয় সম্পর্কে লেখা হল—

"কবিগুরুর এই সুকঠিন সর্বশ্রেষ্ঠ 'রক্তকরবী' নাটকটি বিগত ২৫ শে ও ২৬ শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭-৩০ ঘটিকায় স্থানীয় 'ছায়াবাণী' হলে বিশিষ্ট সুধীমণ্ডলীর সমাবেশে গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে (উভয়রজনী) লোকশিল্পী সংসদ কর্তৃক পরিবেশিত হয়। বস্তুতঃই এই নাটকটি সুধীজনের মহলে বেশ একটু আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। যেদিন শুনলাম আগরতলা শহরের শিল্পীরা এ নাটকটি অভিনয় করবার মানসে মহড়া দিচ্ছেন, সেদিন আমি বিস্মিত হয়েছিলাম এ চিন্তা করে না জানি এ দুঃসাহসিক কার্যে আগরতলা হেন জায়গায় শিল্পীরা হস্তক্ষেপ করলেন কোন ভরসায়— আর উদ্বেলিত হয়েছিলাম—এ চিন্তা করে না জানি এ নাটকটি অভিনয় করতে গিয়ে লোকশিল্পী সংসদ কোন চরম অবস্থার সম্মুখীন হয়। যা হোক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার থেকে বলতে পারি অভিনয় বিষয়ে বিবিধ ধারায় কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও 'রক্তকরবী' নাটক অভিনয়ে লোকশিল্পী সংসদ সত্যিই সাফল্যের দাবী করতে পারে। অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিবেশন উচ্চাঙ্গের হয়েছে।

এরপর ঐ বৎসরই (১৯৫৬ খ্রিঃ) ভারতের প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর তহবিলের

সাহায্যার্থে 'রক্তকরবী' নাটকের অভিনয় করার উদ্যোগ নেয় লোকশিল্পী সংসদ।

দ্বিতীয় বার রক্তকরবী অভিনয় করার পূর্বে লোকশিল্পী সংসদ কিছু অভিনেতাকে নূতন ভাবে গ্রহণ এবং কিছু কুশীলবকে অদলবদল করে। প্রথমবারে নন্দিনীর চরিত্র রূপায়ণে ছিল যূথিকা গুপ্তা, দ্বিতীয়বার যূথিকার বদলে অভিনয় করে লীলা দেব। প্রথমবার লীলা দেব করেছিল চন্দ্রার ভূমিকায়, সে স্থানে দ্বিতীয়বার অভিনয় করে মায়া দেব। প্রথমবার ফাগুলাল চরিত্রে অভিনয় করেছিল হিরণ্ময় চক্রবর্তী, দ্বিতীয়বার সে চরিত্রে অভিনয় করে নরেশ পোদ্দার। প্রথম রক্তকরবী অভিনীত হবার সময়ই লোকশিল্পী সংসদে এসে দু'একদিন রিহার্সাল দিয়ে অনিবার্য কারণবশতঃ কুমিল্লায় চলে যাওয়ায় অভিনয় করতে পারেন নি নরেনবাবু। দ্বিতীয়বার অভিনীত হবার পূর্বে ফিরে আসায় তাঁকে ফাগুলালের চরিত্রের অভিনয় করার জন্য মনোনীত করা হয়।

প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন, লোকশিল্পী সংসদের ইতিহাসে শক্তি হালদার ও কেশব ভট্টাচার্য-র অবদানের সঙ্গে নরেশ পোদ্দারের অবদান সংযোজন হবার পর সংসদ একটি আলাদা শক্তি সঞ্চয় করল। কি রূপ সজ্জায়, কি মঞ্চ তৈরী, কি দৃশ্য সজ্জায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এই তিনজন ছিল সংসদের প্রাণ পুরুষ। তাছাড়া এই সময় এসে যোগ দেন অমরেশ দত্ত এবং হরেন্দ্র হালদার, রমাপ্রসাদ দত্ত, হরিপদ দাস প্রমুখরা। সর্বোপরি, সংসদ সেদিন উপদেষ্টা হিসেবে পেয়েছিল অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ও নাট্যপ্রেমী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহোদয়কে।

পূর্ব কথায় ফিরে আসি—দ্বিতীয়বার রক্তকরবী অভিনয়ে অন্যান্য কুশীলবরা ছিলেন—রসময় রাউত সেজ সর্দার, স্টেট ব্যাঙ্কে কর্মরত গিরীন্দ্র ভৌমিক মোড়ল, বিমান মুখার্জী গোঁসাই। নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত পালোয়ান, জ্যোতি দাশগুপ্ত চিকিৎসক, দীপক ভৌমিক কিশোর, রঞ্জন পল্টু চৌধুরী; এ ব্যতীত অন্যান্য ভূমিকা পূর্বের ন্যায়ই ছিল।

নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন তারা হলেন, সঙ্গীত পরিচালনায়—ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ। যন্ত্র শিল্পে—জয়চন্দ্র দেবনাথ, প্রবোধকুমার দেববর্মা. ঠাকুর নবদ্বীপ দেববর্মা নিমাই দেববর্মা, অংশুমান রায়, কিরণ দেববর্মা। আলোকসম্পাতে বিনয় মহলানবিশ, ইউনির্ভাসেল সার্ভিস। রূপ সজ্জায় রবি ভট্টাচার্য।

নির্দিষ্ট দিনে উমাকান্ত একাডেমীর হলে রাত্রি ৮ ঘটিকায় রক্তকরবী অভিনীত হয়। অভিনয়ের টিকিটের বিক্রয়লব্ধ অর্থ সেদিন লোকশিল্পী সংসদ নেহরু ফাণ্ডে দান করেন।

দ্বিতীয়বারের রক্তকরবীর অভিনয়ও সেদিন ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। সেদিনকার পত্র-পত্রিকায় সমালোচনাতে তার সাক্ষ্য মেলে। নিম্নে পত্রিকার সমালোচনা তুলে ধরা হোল।

''Aga-.ala, Oct. 12 --The local 'Loko Shilpi Sansad' staged Tagore's drama 'Rakta Karabi' for two nights in aid of 'Prime Minister's Relief Fund.'

Lila Deb played the role of 'Nondini, Ajit Kumar as 'Bishu Pagal', Sakti Haldar as 'Raja' and Miss Maya Deb as 'Chandra'. Manindra Bhattacharya, Naresh Podder, Arindam, Biman Mukherji, Sushil Choudhury, Debendra Bhowmik and others also pariticipated in the drama. Professor Narendra Bhattachrya of the local M.B.B College inaugrated the show. (Hindusthan standard, Wednesday, Oct. 17, 1956)

আনন্দবাজার পত্রিকা— ত্রিপুরার পত্র

সহরে 'লোকশিল্পী সংসদ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান আছে। মধ্যে মধ্যে এই সংসদ কর্তৃক নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। গত ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' অভিনয়ে এই সংসদ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিল। গত ৯ই ও ১০ই অক্টোবর আবার সেই রক্তকরবীর অভিনয় হয় প্রধানমন্ত্রী নেহরুর তহবিলের সাহায্যার্থে। এবারে অভিনয়ে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই নবাগত হইলেও তাঁহারা যে অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছিলেন তাহা সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

নাটকটি পরিচালনা করিয়াছিলেন কেশব ভট্টাচার্য। সর্বাগ্রে তাঁহাকে অকুণ্ঠ প্রশংসা জানাইতে হয়। নন্দিনীর ভূমিকায় শিক্ষিকা শ্রীমতী লীলা দেবের অভিনয় অনবদ্য হইয়াছিল। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় সাফল্যও উল্লেখযোগ্য। আনন্দবাজার পত্রিকা। ২রা কার্তিক ১৩৬৩ বাং অশোবর ১৯, ১৯৫৬ খ্রিঃ।

যুগান্তর—আগরতলার চিঠি

গত ৯ই এবং ১০ই অক্টোবর স্থানীয় লোকশিল্পী সংসদের প্রযোজনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সিম্বলিক নাটক 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হয় টিকিট করে। সংগৃহীত অর্থ নেহরু তহবিলে যাবে। এই সংসদ কর্তৃক গত ফেব্রুয়ারি মাসে এই নাটক অভিনীত হয় এবং বলতে বাধা নেই, অভিনয় রসোত্তীর্ণ হয়েছিল। এবারকার অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের অধিকাংশই নবাগত। তবু বলতে হবে তাঁরা সাফল্য দাবী করতে পারেন। নন্দিনীর ভূমিকায় শ্রীমতী লীলাদেবীর অভিনয় বিশেষ প্রশংসালাভ করেছিল। চন্দ্রার ভূমিকায় শ্রীমতী মায়া দেবের অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য। পরিচালক কেশব ভট্টাচার্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।'

(যুগান্তর। ১০ই কার্তিক, ১৩৬৩ বাং ২৭শে অক্টোবর ১৯৫৬ ইং)

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে লোকশিল্পী সংসদ তৃতীয়বার রক্তকরবী অভিনয় করে

উমাকান্ত একাডেমী হলে। তৃতীয়বারের অভিনীত রক্তকরবীর বিভিন্ন চরিত্রে সেদিন রূপদান করেছিলেন—রাজা—শক্তি হালদার, বিশু পাগল—তপেশ রায়, সর্দার—শিশু সেন, নন্দিনী—স্নিগ্ধা হালদার, চন্দ্রা—মানসী রায়, অধ্যাপক—বিশ্বজিৎ সেনশর্মা। তাছাড়া অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন—অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল চৌধুরী, অজিত ভট্টাচার্য, ডঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, রূপেন মজুমদার, সন্তোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মনীন্দ্র সাহা। কণ্ঠ সঙ্গীতে ছিলেন ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ। মঞ্চ পরিকল্পনায় অমরেশ দত্ত। আলোকসম্পাতে প্রাণধন মুখার্জী, রূপ সজ্জায়—হরেন্দ্র হালদার। ব্যবস্থাপনায় অনাথবন্ধু ঘোষ, অধ্যাপক পরেশ ভাদুড়ী ও রমাপ্রসাদ দত্ত। পরিচালনায় শক্তি হালদার। নাট্য সঞ্চালক শিশু সেন।

তৃতীয়বার রক্তকরবীতে রাজার ভূমিকায় শক্তি হালদার

তৃতীয়বার রক্তকরবী নাটকের অভিনয়ের পর বর্হিত্রিপুরার সংবাদ পত্রে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিল—"বাংলার নব নাট্যআন্দোলনের যে জোয়ার এসেছে তারই ভগ্নাংশ ত্রিপুরার অরণ্যেও উদ্দীপনার তরঙ্গ তুলেছে। বিশেষ করে ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় নাট্যপ্রচেষ্টা একটা নির্দিষ্ট পথে চলছে। যে কয়টি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনগ্রসর ত্রিপুরায় বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারে যত্নবান হয়েছেন তার মধ্যে 'লোকশিল্পী সংসদ' অন্যতম। সম্প্রতি এই সংসদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত নাটক রক্তকরবীর সার্থক অভিনয় করেছে। রক্তকরবীর মত কঠিন ও ভাবময় সাংকেতিক নাটক রূপায়ণ কলকাতার মঞ্চ ছাড়া মফঃস্বলের সহরে প্রত্যাশা করা কঠিন। কিন্তু আশার কথা এই যে এই কঠিন বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে অভিনীত হয়ে সংসদের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। (নতুন খবর, ২৮শে মে ১৯৬০)

দুই

এদিকে চরৈবেতি চরৈবেতি করে এগুচ্ছে লোকশিল্পী সংসদ একের পর এক অনুষ্ঠান করে ও নাটক করে, কিন্তু ঢাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার এর মত অবস্থা অর্থাৎ তখন পর্যন্ত সংসদের কোনো কার্যকরী সমিতি বা নিজস্ব কোনো ঘর ছিল না। তাই উদ্যোক্তারা প্রথমেই সংসদের কার্যকরী সমিতি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সে অনুয়ায়ী ১৯৫৬ খ্রিঃ-এর ২১শে নভেম্বর লোকশিল্পী সংসদের প্রথম কার্যকরী সমিতি গঠন করা হল নিম্নলিখিত ব্যাক্তিগণকে নিয়ে ঃ—সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যুগ্ম সম্পাদক কেশব ভট্টাচার্য ও স্মৃতি গুপ্তা, কার্য্যালয় সম্পাদক—নরেশ পোদ্দার, প্রচার সম্পাদক—অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। সদস্য মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্ত, শক্তি হালদার, লীলা দেব, রসময় রাউত ও দেবেন্দ্র কুমার ভৌমিক।

সমিতি গঠন করার পূর্বে অফিস লেনে ১৫ (পনের) টাকা ভাড়ায় সংসদের অস্থায়ী অফিসের জন্য একটি টিনের ঘর নেওয়া হয়। ঘর ভড়া সদস্যদের নিকট হতে একটাকা করে চাঁদা তুলে দেওয়া হবে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এরপর এই সংসদে সদস্যপদ নেওয়ার জন্য পত্রিকা মারফৎ একটি আবেদন জানান হয়েছিল যার বয়ান ছিল এইরূপ—-

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যমণ্ডিত ত্রিপুরার বর্তমান কালে সুনিয়ন্ত্রিত কৃষ্টি সংস্থার অপ্রতুলতার বিষয় চিন্তা করে এর অপনোদন প্রয়াসে একবৎসর কাল পূর্বে আগরতলায় 'লোকশিল্পী সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধানতঃ লোকশিল্পী সংসদ নাটক ও চিত্রানুষ্ঠানের কর্মসূচী গ্রহণ করে কৃষ্টি অনুশীলন আরম্ভ করেছে। এগারজন সদস্য নিয়ে এর একটি শক্তিশালী কার্য্যনির্বাহী সমিতি গঠিত হয়েছে এবং সম্প্রতি সেক্রেটারিয়েট ভবনের নিকটবর্তী অফিস লেনে

আমাদের গ্রাম নাটকে মঞ্চ তৈরিতে ব্যস্ত নরেশ পোদ্দার, সুশীল চৌধুরি প্রমুখরা

এর কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় শিল্প ও কৃষ্টি পরায়ণ ভদ্রমন্ডলী এ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং সদস্যভুক্ত হয়ে মহৎ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করে তুলুন এটাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতসরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয় হতে প্রকাশিত হিন্দি নাটক 'হামারা গাঁও'এর বাংলা সংস্করণ 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি অভিনয় করার জন্য ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রচার বিভাগ লোক শিল্পী সংসদকে অনুরোধ জানায়। অনুরোধ পেয়ে লোকশিল্পী সংসদ মনস্থ করে নাটকটি মঞ্চস্থ করার। সে পরিকল্পনা অনুযায়ী লোকশিল্পী সংসদ সেদিন নূতন ভাবে অভিনয়ের পরিকাঠামো তৈরী করতে উদ্যোগী হলেন। যেহেতু রক্তকরবীর অভিনয়ের অনেক অভিনেতাই সে সময়ে কার্য্যপোলক্ষে অন্যত্র চলে গেছেন তাই বাধ্য হয়ে সংসদকে কিছু কুশীলব নতুন করে সংগ্রহ করে অভিনয় কার্য চালাতে হয়।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১শে মার্চ তারিখে মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে প্রথমবার 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি মঞ্চস্থ করে লোকশিল্পী সংসদ।

সেদিন নাটকটির রূপসজ্জা করেছিলেন প্রফুল্ল সেন ও হরেন্দ্র হালদার। মঞ্চ সজ্জায় ছিলেন বিমান মুখার্জী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, সুশীল চৌধুরী। আলোক সম্পাতে— সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, পরিচালনায়— নগেন্দ্রতৎপুরুষ। চরিত্র রূপায়ণ ছিল নিম্নরূপ ঃ

চরিত্র		পরিচয়		অভিনেতা ও অভিনেত্রী
জগবন্ধু	—	গ্রামের বিভ্রান্ত চাষী	ঃ	কবিরাজ মণীন্দ্র ভট্টাচার্য
সুমতি	—	ঐ স্ত্রী	ঃ	লীলা দেব
কানাই	—	ঐ পুত্র	ঃ	স্বপন মজুমদার
অনুপ	—	সুমতির বোনপো	ঃ	
		সহরের যুবক	ঃ	নরেশ সাহা (T.C.S)
গোপীনাথ	—	গ্রামের মোড়ল	ঃ	দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক
দয়াময়	—	কবিরাজ	ঃ	ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার
রমেশ	—	গ্রাম্যযুবক	ঃ	রণজিৎ পাল
মধু	—	পরামানিক	ঃ	সুশীল চৌধুরী
গোপেশ	—	গ্রামের চাষী মজুর	ঃ	গিরীন্দ্র ভৌমিক
তরঙ্গিনী	—	গ্রাম্য প্রধানা স্ত্রীলোক	ঃ	স্মৃতি গুপ্তা
রাধা	—	গোয়ালিনী	ঃ	মায়া দেব

নাটকটি অভিনীত হবার পর আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিন জাগরণ পত্রিকা লিখেছিল--

"স্থানীয় তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয প্রাঙ্গনে ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রচার বিভাগের

পৃষ্ঠপোষকতায় এবং প্রযোজনায় লোকশিল্পী সংসদ কর্তৃক 'আমাদের গ্রাম' নাটকখানি অভিনীত হয়। উক্ত নাটকখানি ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় হতে প্রকাশিত হিন্দি নাটক 'হামারা গাঁও'-এর বাংলা সংস্করণ। কাহিনীটি শিক্ষাপ্রদ সন্দেহ নেই, বিশেষ করে সমাজ সেবক কর্মীগণ গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করতে পারেন।'

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গীত ও নাট্যবিভাগ-এর প্রযোজনায় লোকশিল্পী সংসদ দ্বারা অভিনীত হয় দ্বিতীয়বার আমাদের গ্রাম নাটকটি মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ হলে। সেদিনের অনুষ্ঠানে দিল্লী হতে আগত আঞ্চলিক ডিরেক্টর শ্রী কৌশিক মিত্র উপস্থিত ছিলেন।

দ্বিতীয়বার আমাদের গ্রাম অভিনয়ের সময় অনুপ এবং রমেশের ভূমিকায় পূর্বতন নরেশ সাহা ও রণজিৎ পালের বদলে মৃণাল মজুমদার ও খগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী অভিনয় করেন।

এই বছরের ৩রা নভেম্বর তৃতীয়বার বিশ্রামগঞ্জে বাজার এলাকায় থানার মাঠে আমাদের গ্রাম অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে কোনো কোনো চরিত্রের কুশীলব পরিবর্তিত হয়। জগবন্ধু—শক্তি হালদার, অনুপ—শিশু সেন, গোপীনাথ—খগেন চক্রবর্ত্তী, রমেশ—বেণুধর গোস্বামী।

এরপর ৫ই নভেম্বর বিশালগড়ে চতুর্থবার এবং ৭ই নভেম্বর জিরানিয়ায় পঞ্চমবার আমাদের গ্রাম লোকশিল্পী সংসদ দ্বারা অভিনীত হয়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র দিবসের উৎসব পালন উপলক্ষ্যে ২৮শে জানুয়ারি মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে পুনরায় লোকশিল্পী সংসদ আমাদের গ্রাম মঞ্চস্থ করে। সেদিনের নাটকের পরিচালনায় ছিলেন নরেশচন্দ্র সাহা, টি.সি. এস; ব্যবস্থাপনায়—কবিরাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, নৃত্য পরিচালনায় আভারাণী পাল। মঞ্চসজ্জায় ও আলোক নিয়ন্ত্রণে—নরেশ চন্দ্র পোদ্দার ও শক্তি হালদার; স্মারক ভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও নরেশ পোদ্দার, রূপসজ্জায় হরেন্দ্র হালদার, সহকারী সত্যেন্দ্র রায় চৌধুরী ও স্মৃতি গুপ্তা; মঞ্চাধ্যক্ষ অনিল চন্দ্র ভট্টাচার্য ও লীলা দেব; নেপথ্য ও আবহ সঙ্গীতে ব্রজগোপাল সিংহ, প্রবীর দেববর্মা, দেবদাস

আমাদের গ্রাম নাটকটিকে মঞ্চস্থ করার জন্য লোকশিল্পী সংসদ চলেছে ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে

গাঙ্গুলী, ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, বীরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, নিভারাণী সিংহ, আভারাণী পাল, আশা নাগ; নৃত্যাংশে কুমারী লীলা সেন, চন্দনা গুপ্তা, সিপ্রা সেন, অলকা গুপ্তা, বন্দনা গুপ্তা ও অর্চ্চনা সাহা; চরিত্র রূপায়ণে—নরেশচন্দ্র সাহা, ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক, সনৎকুমার গোস্বামী, শিশু সেন, আভারাণী পাল, সুশীল চৌধুরী, লক্ষ্মী সাহা, গিরীন্দ্র ভৌমিক, মীনা সাহা ও মৃণাল চৌধুরী (পিকু)।

এখানে উল্লেখ থাকে যে 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি সেদিন ত্রিপুরার গ্রামে গঞ্জে বিভিন্ন সময়ে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু আজ থেকে চল্লিশ বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে নাটক অভিনীত করা একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল। বহু বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন হতে হত। সেদিন পথঘাট আজকের মত সুগম ছিল না।

গ্রামের অধিকাংশ জনসাধারণ কৃষক বা খেটে খাওয়া মানুষ। তাই গ্রামে নাটক হলে অধিকাংশ দর্শক রাতের খাবার খেয়ে রাত দশটা এগারটার সময় নাটক দেখতে আসতো। নাট্যমঞ্চ তৈরী করতে হতো কোনো স্কুলের মাঠে বা গ্রামের কোনো ফাঁকা জায়গায়। গ্রামবাসী বা স্কুল থেকে চৌকি নিয়ে এসে বহু কষ্টে স্টেজ তৈরী করতে হতো। স্টেজের তিনদিক খোলা থাকতো। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে আলোর ব্যবস্থা করতে হোত। হ্যাজাকের মাপে টিনের চোঙ্গা করে একদিকে মোটর গাড়ীর হেড লাইটের কাঁচ লাগিয়ে নিয়ে স্পট লাইট হিসাবে ব্যবহার করা হতো। স্টেজ বাঁধা, রূপসজ্জা, সূত্রধর, নাটকের হিসাবনিকাশ, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা সবই নরেশ পোদ্দার, অমরেশ দত্ত, শক্তি হালদার প্রমুখরাই করতেন। নরেশ পোদ্দার একাধারে সবকাজে পারদর্শী ছিলেন। মধ্যে মধ্যে থাকতেন অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুশীল চৌধুরী প্রমুখরা। নাটক শেষ হত রাত প্রায় দুটো তিনটেয়। তা সত্ত্বেও একটা অনাবিল আনন্দ সবার মাঝে বিরাজ করতো। গ্রামে গঞ্জে বেশীর ভাগ নাট্যানুষ্ঠানে অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সোৎসাহে যেতেন এবং নাটক শুরু হওয়ার আগে গ্রামের মানুষের কাছে সহজসরলভাবে গ্রাম গড়ে তোলার উপর তাদের সাধারণ কর্ত্তব্য, এই দুঃখময় দিনগুলো থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য প্রাথমিক কর্ত্তব্য কি, সে সম্পর্কে সচেতন করতে বক্তব্য রাখতেন। এক প্রবীন অধ্যাপকের মানুষের প্রতি ভালবাসা প্রতিটি নাট্যানুষ্ঠানে প্রকাশ পেত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত পণ্ডিত ব্যাক্তিকে পেয়ে লোক শিল্পী সংসদ গণসংস্কৃতিচেতনার কাজে অনেক এগিয়ে যেতে পেরেছিল নিঃসন্দেহে।

তিন

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬, ১৭ই অক্টোবর নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়) বিরচিত 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটি মঞ্চস্থ করলেন লোকশিল্পী সংসদ।

'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটি ছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে পুরাতন যুগের সঙ্গে বর্তমান যুগের যে বিরাট ব্যবধান তা নিয়েই। 'সে যুগের রাজনীতির সঙ্গে এযুগের অনেক তফাৎ'। পূর্বে লোকে রাজনীতি করতো দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কিন্তু আজ করে নিছক ক্ষমতা লিপ্সায়—এটাই নাট্যকারের আসল বক্তব্য।

ধীরাজবাবু অগ্নিযুগের একনিষ্ঠ বিপ্লবী কর্মী। বর্তমানে রাজনীতি হতে অবসর গ্রহণ করে বিশ্রাম নিচ্ছেন। পাঁচটি প্রাণী নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার—তিনি স্বয়ং, দুই পুত্র স্বরূপ আর ধ্রুব এবং বিপ্লবী যুগের সহকর্মী শঙ্করের বিধবা স্ত্রী সতী ও তার কন্যা শান্তা।

জ্যেষ্ঠ স্বরূপ কঠোর পরিশ্রমী হলেও ছোটভাই ধ্রুবকে বঞ্চিত করে সমস্ত সম্পত্তি সে একা গ্রাস করতে চায় এবং সে উদ্দেশ্যে সে এক সাধুজীর সাহায্যে বিষ প্রয়োগে ধ্রুবকে পাগল করে দেবার চক্রান্ত করে। তাছাড়া শান্তার উপরও তার লোভ ছিল এবং সে কারণে সে নিজের সাধ্বী স্ত্রী মায়াকেও তাচ্ছিল্য করতে থাকে। কিন্তু ধ্রুব ও শান্তা পূর্ব হতেই পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যেমন পুত্র স্নেহে অন্ধ ছিলেন, ধীরাজবাবুও তেমনি পুত্র স্নেহে অন্ধ। তাই স্বরূপের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই তিনি বিশ্বাস করেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বরূপের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে।

পূর্ব-উল্লিখিত নির্দিষ্ট দিনে নাটকটি অভিনীত হয়। উদ্বোধনী ভাষণ দিয়েছিলেন লোকশিল্পী সংসদের সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। পরিচালনায় ছিলেন সুধাংশুমোহন দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় রবি নাগ, সহ সঙ্গীত পরিচালনায় আমিনুল ইসলাম, মঞ্চ সজ্জা—শক্তি হালদার, নরেশ পোদ্দার, রঞ্জিত ভৌমিক নিখিলরঞ্জন নাথ। আলোকসম্পাতে বিনয় মহলানবীশ। রূপসজ্জা ও প্রসাধনে হরেন্দ্র হালদার, সহযোগী লীলা দেব এবং স্মৃতি গুপ্তা, স্মারক—শিশু সেন ও নরেশ পোদ্দার। আবহ সঙ্গীতে—মহারাজকুমার বঙ্কিম বিহারী দেববর্মা, মহারাজ কুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা, ঠাকুর ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, নিমাই দেববর্মা, আশা নাগ, প্রবীর দেববর্মা। মঞ্চাধ্যক্ষ—নরেশচন্দ্র সাহা, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। ব্যবস্থাপনায়—মণীন্দ্র ভট্টাচার্য ও রমাপ্রসাদ দত্ত।

নাটকটির চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, মৃণালকান্তি ভৌমিক, শক্তি হালদার, শান্তি রায়, রঞ্জিৎ ভৌমিক, গোপাল চ্যাটার্জী, সনৎকুমার গোস্বামী (বেণু), খগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এস. বি. চ্যাটার্জী, নরেশচন্দ্র সাহা, স্নিগ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, অঞ্জলি দাশগুপ্তা ও অন্যান্য।

এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে সেদিন দর্শকদের অভিমত ছিল—'লোক শিল্পী সংসদ'-এর শিল্পীগণের অভিনয় নৈপুণ্যে নাটকের বক্তব্য সুন্দর রূপে পরিস্ফুট হয়েছে। দু

একটি পার্শ্বচরিত্র ব্যতীত প্রত্যেকেই ভাল অভিনয় করেছেন, অবশ্য কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রও অতি সুন্দর ভাবে অভিনীত হয়েছে। অভিনয়াংশে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয় মলয়ার ভূমিকায় বিজয়া সাহার নাম। এ কঠিন চরিত্রটি রূপায়ণে শ্রীমতী সাহা প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এছাড়া মতিবাবুর ভূমিকায় বেণু গোস্বামী, প্রভাতের বাবার ভূমিকায় গোপাল চ্যাটার্জী, ধ্রুবের ভূমিকায় শক্তি হালদার, সতীর ভূমিকায় অঞ্জলি দাসগুপ্ত এবং শান্তার ভূমিকায় স্নিগ্ধা হালদার মনে রাখার মত অভিনয় করেছেন। ধীরাজের ভূমিকায় ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার বাস্তবধর্মী অভিনয়ে মানুষকে মুগ্ধ করতে পেরেছেন।

ধৃতরাষ্ট্র নাটকে মলয়ার ভূমিকায় বিজয়া সাহার নাম উল্লেখ করতে হয়

সেদিন 'মানুষ' পত্রিকাও 'ধৃতরাষ্ট্র'-র অভিনয় সম্পর্কে লিখেছিল,—মলয়ার ভূমিকায় বিজয়া সাহার অভিনয় সার্বিক অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য। প্রভাতের বাবার ভূমিকায় গোপাল চ্যাটার্জী, ধ্রুবের ভূমিকায় শক্তি হালদার এবং সতীর ভূমিকায় অঞ্জলি দাশগুপ্ত বলিষ্ঠ অভিনয় করেছেন। মোটের উপর প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নাটকখানি উপভোগ্য হয়েছিল। দিলীপ জর্দা কোম্পানীর প্রতিনিধি দু দিবসেই দর্শকদের পান ও জর্দার কৌটা উপহার দেন।

প্রথমবার ধৃতরাষ্ট্রের অভিনয় দেখে স্থানীয় অগ্রগতি পত্রিকার সম্পাদক নেপাল দে লোকশিল্পী সংসদকে অনুরোধ করেন যে তাঁর পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সাহায্যার্থে যেন পুনরায় ধৃতরাষ্ট্র নাটকটি অভিনীত করা হয়।

অগ্রগতি পত্রিকার অনুরোধ রক্ষার্থে পুনরায় ধৃতরাষ্ট্র নাটকটি মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিল লোকশিল্পী সংসদ। সে অনুয়ায়ী ধৃতরাষ্ট্রের রিহার্সেল চলল। কয়েকদিন রিহার্সাল দেওয়ার পর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর 'রূপছায়া' সিনেমা হলে পুনরায় নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। সেবারও নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন সুধাংশুমোহন দত্ত (বড়দা)। কণ্ঠ সঙ্গীতে ছিলেন রবি নাগ, ব্রজ গোপাল সিংহ ও স্মৃতি গুপ্তা। যন্ত্রসঙ্গীতে সত্য বিশ্বাস, দেবদাস গাঙ্গুলী, আশা নাগ সঙ্গীতে, মঞ্চে শক্তি হালদার, নরেশ পোদ্দার, রঞ্জিত ভৌমিক, নিখিলরঞ্জন নাথ। আলোক নিয়ন্ত্রণে ইউনিভার্সাল সার্ভিস। রূপসজ্জায় হরেন্দ্র হালদার, সহযোগী লীলা দেব এবং স্মৃতি গুপ্তা। স্মারক নরেশ পোদ্দার, ব্যবস্থাপনায় অগ্রগতি পত্রিকা (সাহিত্য বিভাগ)।

চরিত্র রূপায়ণে—শিশু সেনগুপ্ত, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, মৃণালকান্তি ভৌমিক, শক্তি হালদার, শান্তি রায়, রঞ্জিত ভৌমিক গোপাল চ্যাটার্জী, সনৎ কুমার গোস্বামী, খগেন্দ্র চক্রবর্ত্তী,

উত্তমাচরণ চক্রবর্ত্তী, এস. বি, চ্যাটার্জী, প্যারীমোহন চক্রবর্ত্তী, স্নিগ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, অঞ্জলি দাসগুপ্তা, নয়নরঞ্জন মজুমদার এবং আরও অনেকে।

লোকশিল্পী সংসদের অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করে পত্রিকা লিখেছিল,—যন্ত্র সঙ্গীত চলছিল. পর্দ্দা সরে যাবার সঙ্গে যন্ত্র সঙ্গীত থেমে মূল বই আরম্ভ হল। বৃদ্ধ রাজনীতিক স্বরূপের পিতার ভূমিকায় নয়নরঞ্জন মজুমদার বৃদ্ধই। স্বরূপ—শিশু সেনগুপ্ত, তাঁর স্বরূপ তিনি দেখিয়েছিলেন, শিশু তিনি মোটেই নন। সেয়ানা পাগল ধ্রুব—শক্তি হালদার পাগল নয়, ছলনাময়। মহিমবাবু সনৎকুমার গোস্বামী, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্বরূপের উপযুক্ত বাহন বটে। অজয় মৃণাল ভৌমিক আরো মুক্ত হতে পারলে ভাল হতো। বিপ্লবী বিনয় ভূপেন চক্রবর্তী ও বৃদ্ধ উত্তম চক্রবর্তী অভিনেতাই বটে। শান্তা স্নিগ্ধা হালদার শিক্ষিতা মেয়ে, বড়াই নেই, শান্ত অথচ কঠিন, সুন্দর অভিনয়। সতী—অঞ্জলি দাশগুপ্তার মুখে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা সুন্দর ফুটেছে। মলয়া—বিজয়া সাহা বিজয়িনীর গৌরব অর্জন করেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় মোটামুটি সবাই ভাল অভিনয় করেছেন। কলকাতার দিলীপ জর্দ্দা কোম্পানীর প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়া সাহাকে অভিনয়ে প্রথম পুরস্কার একটি কাপ উপহার প্রদান করেছিলেন।

ধৃতরাষ্ট্র নাটকে শান্তার ভূমিকায় স্নিগ্ধা হালদার

সেদিন অভিনয়ের টিকিট বিক্রয়লব্ধ অর্থ সংগ্রহ হয়েছিল মোট ৪০০ টাকার মত। খরচপত্র বাদ দিয়ে দুইশত টাকা অগ্রগতি পত্রিকার তহবিলে জমা দেওয়া হয়।

সেদিন কলকাতার পত্রিকা ধৃতরাষ্ট্রের অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল : 'স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র 'অগ্রগতির' সাহিত্য বিভাগে সাহায্যকল্পে রূপছায়া প্রেক্ষাগৃহে ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'লোকশিল্পী' সংসদের সভ্য-সভ্যাগণ ধনঞ্জয় বৈরাগী লিখিত ধৃতরাষ্ট্র নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। ইদানিংকালের সৌখিন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে এ পর্যন্ত এখানে যতগুলি নাট্যাভিনয় হয়েছে তন্মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা সাফল্যমণ্ডিত অভিনয় বলে দর্শকদের অভিমত। নাটকে অন্যতম প্রধান চরিত্র মলয়ার ভূমিকায় শ্রীমতী বিজয়া সাহা অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। দিলীপ জর্দ্দা কোম্পানীর পক্ষ হতে শ্রীমতী সাহাকে একটি রূপোর কাপ দেওয়া হয়। স্বরূপের ভূমিকায় শিশু সেন, ধ্রুব—শক্তি হালদার, ধীরাজ—ডাঃ নয়ন মজুমদার আকর্ষণীয় অভিনয় করেন। এছাড়া পার্শ্ব চরিত্রাভিনয়ে সনৎকুমার গোস্বামী নিপুণতার সঙ্গে মিল ম্যানেজার মতির খল চরিত্রে রূপদান করেন। নাটক পরিচালনা করেন সুধাংশুমোহন দত্ত। অভিনয় শেষে সংসদ সভাপতি অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় ভাষণ প্রদান করেন। উক্ত লোকশিল্পী সংসদই অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গীত নাটক বিভাগ কর্ত্তৃক অনুমোদিত ত্রিপুরার একমাত্র

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। (নতুন খবর ১২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ই ইং)
এখানে উল্লেখ থাকে যে, নেপাল দে সম্পাদিত অগ্রগতি পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সাহায্যার্থে ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি তৃতীয়বারের মত লোকশিল্পী সংসদ 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকটি মঞ্চস্থ করেছিলেন।

ধনঞ্জয় বৈরাগী প্রণীত 'রূপোলী চাঁদ' নাটকটির বিষয় বস্তু হল, রাজেন মল্লিক নামক জনৈক পুঁজিপতি গ্যারেজ মালিক তার গ্যারেজের কর্মচারীদের প্রতি চরম অবহেলা দেখাতো এবং সময়মত বেতন দেবার ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন ছিল। এতে বিশ্বনাথ নামে একজন মিস্ত্রীর নেতৃত্বে শ্রমিকগণ নিজেরা একটি স্বতন্ত্র গ্যারেজ গড়ে তুললো। অল্প সময়ের মধ্যেই শ্রমিকদের পরিচালিত প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা অর্জন করে তুলছে দেখে রাজেন মল্লিক নবপ্রতিষ্ঠিত বিশ্বনাথ গ্যারেজের জনৈক কর্মচারী সতীশকে হাত করে তার সাহায্যে কিছু চোরাই মাল রেখে ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ নিল। কিন্তু অপর শ্রমিক সতুর আত্মত্যাগ ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করল। এই ঘটনাটিকে অনেক প্রেম প্রীতি অভাব অভিযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবেশনই নাটকের বিষয় বস্তু। শুধু টাকার জোরেই যে আজ ধনিক শ্রেণী খেটে খাওয়া মানুষকে দাবিয়ে রাখছে, সেটাও নাটকের অপর প্রধান বক্তব্য।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই, ১৮ই ১৯শে এপ্রিল তারিখে লোকশিল্পী সংসদ ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপোলী চাঁদ' নাটকটি মঞ্চস্থ করল নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে।

নাটকটি সেদিন পরিচালনা করেছিলেন সুধাংশু মোহন দত্ত। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, তপেশ বোস, অনিল কুমার ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্ত, পারুল হালদার। সঙ্গীত রচনা, সুর ও পরিচালনা করেছিলেন দেবদাস গাঙ্গুলী। কণ্ঠ দিয়েছিলেন রবি নাগ, স্মৃতি গুপ্তা। আলোক নিয়ন্ত্রণে বিনয় মহলানবীশ, ধনঞ্জয় দেববর্মা, নির্মল দেব। স্মারক নরেশ পোদ্দার, বুদ্ধদেব রায়। নাট্য সঞ্চালক—শিশু সেন ও সুশীল চৌধুরী। যন্ত্র সঙ্গীতে—অনিল বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য স্মরজিৎ গোস্বামী, পুষ্পরাণী সেন, প্রবীর দেববর্মা, কালীপদ চৌধুরী। মঞ্চ সহায়ক ছিলেন—রঞ্জিৎ ভৌমিক, নরেশ পোদ্দার, অমরেশ দত্ত, নিখিলরঞ্জন নাথ। রূপসজ্জায় হরেন্দ্র হালদার।

শ্রীমতী পারুল হালদার

নাটকের অভিনয়ে ছিলেন শিশু সেন, শক্তি হালদার, নীলরতন গাঙ্গুলী, আশু রায়, খগেন চক্রবর্ত্তী, মৃণাল ভৌমিক, ভূপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুখেন দে, গোপাল চ্যাটার্জী, সুশীল

চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক, শান্তি রায়, সনৎ গোস্বামী, শোভন ব্যানার্জী, হরেন্দ্র হালদার, অনিল দে, গিরীন্দ্র ভৌমিক, রমাপ্রসাদ দত্ত (পিন্টু চৌধুরী) প্রফুল্ল, সতী দাসগুপ্তা, বিভা রায়, বীণা রায়।

এই নাটকে তিনটি গান রচনা করেছিলেন দেবদাস গাঙ্গুলী এবং সুরারোপ করেছিলেন রবি নাগ ও দেবদাস গাঙ্গুলী যৌথভাবে। গান তিনটি নিম্নে দেওয়া গেল—

রূপোলী চাঁদ নাটকে সরযুর
ভূমিকায় সতী দাশগুপ্তা

(১)

বন্ধুরে, হায়রে হায়
এই দুনিয়ায় টাকাই যে সব
টাকা ছাড়া আর কিছুই নাই।
টাকাই শান্তি টাকা অশান্তি
টাকাই মা বাপ ভাই।
রূপোলী ঐ চাঁদের বুকে
কলঙ্ক যে আছে
হাত বাড়ায়ে ধরতে গেলে
দুঃখ পাবিই মিছে।
বসন্তেরি কোকিল যারা
থাকলে টাকা আসবে তারা
এই দুনিয়ার মালিক যে সব
করবে যাচাই।

(২)

গুণ গুণ গুণ মিতালী ফাগুন
অলির রঙ্গিন পাখায়
পিয়ালি শাখায় শাখায়
স্বপ্ন দোদুল হাস্না হানা
কোন সে যাদু জানে
ফুল ফুল ফুল চম্পা পারুল
ঘুমিয়ে আছে সাত ভাই
পারুল বোনের ঘুম নাই।
ঝুমকো লতা সে রূপকথা
হয়তো সবই জানে।

(৩)

এই বসন্ত যায় যদি ফুরিয়ে
যাক্ ফুরিয়ে যাক।
দুদিনের এই স্মৃতি টুকু
থাক শুধু পড়ে থাক।
জানি আবার এ বসন্ত আসবে ফিরে
তাইতো আমার স্বপ্ন যে রয় তোমায় ঘিরে
জানি নাতো শুনবো কবে
এই বসন্তেরি ডাক।

নাটকটি অভিনীত হবার পর স্থানীয় পত্র পত্রিকা কর্তৃক অত্যন্ত উচ্চ প্রশংসিত হয়। সেদিনকার স্থানীয় পত্রিকা সেবক লিখলেন—১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে এপ্রিল লোকশিল্পী সংসদের সভ্য ও সভ্যাগণ কর্তৃক ধনঞ্জয় বৈরাগীর লিখিত সামাজিক নাটক 'রূপোলীচাঁদ' নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে মহাসমারোহে অভিনীত হয়েছে। বহুদিন পরে একখানি উচ্চাঙ্গের নাটক আগরতলার দর্শক সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করতে সক্ষম হয়েছে। নিখুঁত দৃশ্য সজ্জা, অপরূপ রূপসজ্জা এবং উন্নত অভিনয়ের একত্র সমাবেশ সৌখিন সম্প্রদায়ের নাটকে খুবই কম দেখতে পাওয়া যায়। সেদিক দিয়ে লোক শিল্পী সংসদ এবার অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছে। অভিনয়ের বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে বিশুর ভূমিকায় শিশু সেন, খুড়োর ভূমিকায় নীলু গাঙ্গুলী, নিত্যানন্দের ভূমিকায় সুশীল চৌধুরী, সরযূর ভূমিকায় সতী দাশগুপ্তা, মায়ার ভূমিকায় বীণা রায়, সাবিত্রীর ভূমিকায় অঞ্জলি রায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। অন্যান্য ভূমিকাগুলিও সুঅভিনীত হয়েছে। নাটকখানি পরিচালনা করেছেন ত্রিপুরার সর্ব্বজনপ্রিয় প্রবীন অভিনেতা ও পরিচালক সুধাংশুমোহন দত্ত। (তথ্যসূত্র সেবক। ৬ষ্ঠ বর্ষ ৭ম সংখ্যা ২৭শে এপ্রিল ১৯৫৮)।

স্থানীয় 'মানুষ' পত্রিকা এই অভিনীত নাটক সম্পর্কে লিখলেন—সংসদের সভ্যসভাগণের এ অভিনয় এখানকার নাট্যালোকে যুগান্তর সৃষ্টি করেছে বলা চলে। সূক্ষ্ম সমালোচনার তূলাদণ্ডে আলোচ্য অভিনয়েও কিছু কিছু সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি হয়তো ধরা পড়বে। কিন্তু একথাও ঠিক যে এর চাইতে সুষ্ঠু ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নাট্যাভিনয় (স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা) ইতিপূর্বে এখানে খুব কমই দেখা গেছে। বিশেষতঃ শেষ দিবসে সহরের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিগণ এ অভিনয় দেখেছেন এবং তাঁরা সংসদের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীগণের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সংসদ মাত্র মাস দেড়েক পূর্বে এ নাটকে হাত দেয়। (মানুষ/৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫১ সংখ্যা। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৫৮)

রূপোলী চাঁদের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিল বিশ্বনাথ—শিশু সেন, অজিত—খগেন চক্রবর্ত্তী, সরযূর ভূমিকায়—সতী দাশগুপ্ত খুড়ো—নীলরতন গাঙ্গুলী, হরিপদ—শক্তি হালদার মায়া—বীণা রায়, সাবিত্রী—বিভা রায়।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর লোকশিল্পী সংসদ শারদীয় উৎসবের অঙ্গ হিসাবে একটি শিশু নাটিকা নৃত্যের মাধ্যমে পরিবেশন করেছিল। শিশু নাটিকাটি রচনা করেছিলেন রমাপ্রসাদ দত্ত। অতিরিক্ত সংযোজনা করেন অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, সঙ্গীত পরিচালনায় দেবদাস গাঙ্গুলী, নৃত্য পরিচালনায় বিহারী সিংহ ও যূথিকা গুপ্তা, শিল্প নির্দেশনায় শক্তি হালদার, রূপসজ্জা হরেন্দ্র হালদার, ব্যবস্থাপনায় শিশু সেন ও অমরেশ দত্ত। পরিচালনা নরেশচন্দ্র পোদ্দার। যন্ত্রসঙ্গীতে—প্রবীর দেববর্মা, অখিল বিশ্বাস, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্য বিশ্বাস ও হরেন্দ্র হালদার। নৃত্যাভিনয়ে স্বপ্না মজুমদার, স্বপ্না হালদার, তন্দ্রা মজুমদার, রীণা দে, শুভ্রা মজুমদার, পূর্ণিমা মজুমদার, চন্দনা গুপ্তা, মণিদীপা চক্রবর্ত্তী, কল্পনা গুপ্তা, মঞ্জুশ্রী ভট্টাচার্য।

এই নাটকটি ঐ সনের ১৮ই নভেম্বর পুনরায় অভিনীত হয়।

রূপোলী চাঁদ অভিনয় করার পর লোকশিল্পী সংসদ নতুন ভাবে চিন্তা করতে শুরু করল। সে সময় ভারতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নয়ণে নতুন নতুন নাটক রচনা এবং নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চলছিল। সেই যুগবাঞ্ছিত সৃষ্টির আন্দোলনে লোকশিল্পী সংসদ সথাসাধ্য অংশগ্রহণ করেছিল। নাট্যমোদী দর্শকসাধারণ নাটক থেকে প্রধানতঃ প্রত্যাশা করেন তাৎপর্য, প্রয়োজনীয়তা, গঠন এবং অভিনয়ে শিল্প কৃতিত্ব। এ কয়টি গুণের সুপ্রকাশ হলেই দর্শকদের মনে রসানুভূতি সৃষ্টি সম্ভব হয়। আধুনিক যুগের নাট্য আন্দোলনের মূল লক্ষ্যের ধারাকে বজায় রেখে লোকশিল্পী সংসদ সেদিন তাদের নাট্যাভিনয় করতেন। বিশেষ করে বাংলার প্রগতিশীল নাট্যসমাজ সেদিন যে ধারা অবলম্বন করে চলছিল সেই ধারাতেই অনুপ্রাণিত হয়ে লোক শিল্পী সংসদও চলছিল।

লোকশিল্পী সংসদের অভিনীত নাটকের একটি বিশেষ মুহূর্ত

উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে লোকশিল্পী সংসদ কিরণ মৈত্রের সামাজিক নাটক 'বারোঘণ্টা' মঞ্চস্থ করেছিল ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে। নাটকের সংগঠনকারীগণের মধ্যে ছিলেন—পরিচালনায়—শক্তি হালদার, ব্যবস্থাপনায়—ডঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, পরেশ ভাদুড়ী, খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, পারুল হালদার, অনাথবন্ধু ঘোষ, অমরেশ দত্ত ও রমাপ্রসাদ দত্ত। গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা—দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চাধ্যক্ষ—অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। মঞ্চসজ্জা—অমরেশ দত্ত, রঞ্জিত ভৌমিক, গিরীন্দ্র ভৌমিক, নরেশ পোদ্দার। রূপ সজ্জা—হরেন্দ্র হালদার। আলোক সম্পাতে বিনয় মহলানবীশ, গৌরদাস ভট্টাচার্য। স্মারক—নরেশ পোদ্দার ও বুদ্ধদেব রায়। প্রচার সহায়তায় ছিদ্দিকের রহমান (রূপরেখা), সঙ্গীতাংশে—রবি নাগ, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রবীর দেববর্মা, অখিল বিশ্বাস, অবিনাশ দাস, নিভারাণী সিংহ, যূথিকা গুপ্তা, কালীপদ চৌধুরী, মেনকা ভট্টাচার্য। নাট্যসঞ্চালক—শিশু সেন ও সুশীল চৌধুরী। চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন—রাজেশ্বর—শক্তি হালদার। অমিয়—শিশু সেন, সুনীল—চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী। অনিল—সুধীন দে। সমর—বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী। নিখিল—শান্তি রায়। জগৎ—ভূপেন চক্রবর্তী। দ্বারিক—নয়নরঞ্জন মজুমদার। অলক—রঞ্জিৎ ভৌমিক। মাণিক—তন্দ্রা মজুমদার শুভ্রা—শুভ্রা মজুমদার। রাধা—যূথিকা গুপ্তা। সন্ধ্যা—বিজয়া সাহা। মায়া-বীণা রায়। গোয়ালা-সঞ্জিত সেন। পরেশ—রাজু। ডাক্তার—অজিত ভট্টাচার্য। ডাঃ বোস—হরেন্দ্র হালদার। পেন্টার ম্যান—অনামী। জনতা—সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক।

পরপর দুইরাত্রি অভিনয়ের পর 'বারো ঘণ্টা' নাটকের আলোচনা প্রসঙ্গে স্থানীয় পত্রিকা লিখলেন—নির্দিষ্ট তারিখে (১৭ই, ১৮ই জানুয়ারি ১৯৫৯ খ্রিঃ) স্থানীয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান লোক *শিল্পী সংসদ কর্তৃক কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘণ্টা' নাটকটি অভিনীত হয়। আজকালকার দিনের একটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনীই নাটকের উপজীব্য। বাঙালি* নিম্নমধ্যবিত্তসমাজ যে আজ ধ্বংসের পথে তা কল্পনা নয়, মর্মন্তুদ বাস্তব। তাই রাজেশ্বরের মুখে শুনতে পাই—'হোল মিড্‌ল ক্লাস ফ্যামিলী উইল পেরিশ; কেন জানিস? দারিদ্র্য—পভার্টি, পভার্টি! দারিদ্র্য মানুষকে অমানুষ করে তোলে। সৎকে করে অসৎ। এই দারিদ্রের জন্যই রাজেশ্বর অফিসের ক্যাশের টাকা ভাঙে, অনিল করে চুরি। এরকম সংসার আজকালকার সমাজে খুঁজে বের করতে হয়না, হামেশাই চোখে পড়ে। এই যুগ-পরিচায়ক মর্মান্তিক বিষয়বস্তুটিই লোকশিল্পী সংসদের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা নিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। নাটকটি মনকে অহেতুক অবসন্ন করেনা, দেখায় আশার আলোক।

করুণ ভাবাতিশয্যে আচ্ছন্ন থাকলেও নাটকের সংলাপ অনেকাংশে প্রশংসনীয়। অভিনয়ের ক্ষেত্রে সকলের আগে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাজেশ্বরের চরিত্রায়ণে পরিচালক স্বয়ং শক্তি হালদার। কণ্ঠস্বরের বিভিন্ন বিস্তার ও অভিব্যক্তিতে তিনি যেভাবে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তা বাস্তবিকই প্রশংসার যোগ্য। তারপরে মনে আসে রোগশয্যায় শায়িত রাধার চরিত্রে যূথিকা গুপ্তার অন্তরাল থেকে কণ্ঠস্বরের সাহায্যে নিপুণ অভিনয়। তাছাড়া বড় ভাই অমিয়ের চরিত্রে শিশু সেন। মেজ ভাই অনিলের চরিত্রে সুধীন দে, সন্ধ্যার চরিত্রে বিজয়া সাহা, জগৎ-এর চরিত্রে ভূপেন চক্রবর্ত্তী, দ্বারিকের চরিত্রে নয়নরঞ্জন মজুমদার, অলকের চরিত্রে রণজিৎ ভৌমিক প্রশংসার দাবী রাখেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র চিত্রায়ণ হচ্ছে অন্ধ সুনীলের চরিত্রে চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী। মায়ার চরিত্রে বীণা রায়ের অভিনয়েও আন্তরিকতা ছিল। (মানুষ। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯ ইং)

...কের ভূমিকায় প্রশংসার দাবী রেখেছিলেন ডঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ত্রিপুরা' সেদিন এ নাটক সম্পর্কে লিখেছিল—"স্থানীয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে প্রখ্যাত লেখক কিরণ মৈত্রের সামাজিক নাটক 'বারো ঘণ্টা' (১৭, ১৮ই জানুয়ারি) অভিনীত হয়। নাটকটিতে অংশ গ্রহণ করেন স্থানীয় প্রখ্যাত নাট্য সংস্থা লোকশিল্পী সংসদের সভ্য-সভ্যাগণ। নাটকটি উভয় দিন সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। পরিচালনায় পরিচালক শ্রীশক্তি হালদার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। বারো ঘণ্টা একটি সামাজিক নাটক। একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের নাটকীয় কাহিনী অবলম্বনে রচিত। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ যে অভিনয় করেছেন তাতে সংসদের পূর্ব-সুনাম রক্ষিত হয়েছে। অমিয়ের ভূমিকায় শ্রী শিশু সেনের, দ্বারিকের ভূমিকায় ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার ও অনিলের ভূমিকায় সুধীন দের অভিনয় প্রশংসার দাবী রাখে। স্ত্রী চরিত্রে সন্ধ্যার ভূমিকায় বিজয়া সাহার অভিনয় মন্দ হয়নি। বাস্তবিকই ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর নাটক বলা যেতে বারে। আমরা লোকশিল্পী সংসদের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। (তথ্যসূত্র—ত্রিপুরা/২৬শে জানুয়ারি ১৯৫৯ ইং)

এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালক দেবদাস গাঙ্গুলী লেখকের অনুমতি নিয়ে স্ব-রচিত তিনটি গান সংযোজন করেন-শুধু মাত্র অভিনয়ের জন্য। গান তিনটি হলো :

(১)

এখনো ব্যাকুল সন্ধ্যা কাঁদিছে
আমার আঙিনা ঘিরে।
কত বসন্ত আঁখি ছলছলি
নীরবে গিয়েছে ফিরে,
আগেকার মত আজিও আকাশে
শুক্লা তিথির চাঁদ ওঠে।
আজও মালঞ্চে বিরহ ব্যথায়
সূর্য্যমুখী ফুল ফোটে।
সুর হারা মোর ভাঙ্গা বীণা কাঁদে
বেদনার ঝংকারে।

(২)

দিনের আলো আর রাতের কালো
চিরপাশাপাশি দুই প্রান্তে,
সুখের স্বপনে আছে দুঃখের বেদনা
চিরদিনই হবে তারে আনতে।
কালো আছে পাশে তাই
সাদা এত আলো
দুঃখ আছে বলে
সুখ এত ভালো
এই কথা হবে তোরে জানতে।

(৩)

কি ছিল আর কি হইলরে
কান্দে সদাই এ অন্তর
দুঃখের প্লাবনে বুঝি
ভাঙলো চোরা-বালির চর।
ধনে জনে পূর্ণ ছিল সোনার যে সংসার
(সেথা) কোন নিদারুণ অভিশাপে
ঘনাইলরে অন্ধকার।
মিথ্যে কেন ভাবিসরে তুই
দেখিয়া এই দুঃখের ঝড়
কি ছিল আর কি হইল রে।

পরিচালক দেবদাস গাঙ্গুলী

'লোকশিল্পী সংসদ' তাদের নিজস্ব নাটক অভিনয় করা ছাড়াও মাঝে মাঝে অনুরোধে অন্যদের নাটকও অভিনয় করতো, যেমন ২৫০২তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষ্যে আগরতলা বুদ্ধ মন্দিরের অনুরোধে সংসদ ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা মে 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নামে একখানা একাঙ্কিকা মঞ্চস্থ করেছিল। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট নেতাজী বিদ্যা নিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে সংসদ কৌতুক নাট্য 'মানভঞ্জন' অভিনয় করেছিল। সেদিনের অভিনয়ে প্রেক্ষাগৃহের দর্শকেরা আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়ে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৬ই নভেম্বর উমাকান্ত একাডেমী হলে তথ্য ও বেতার মন্ত্রনালয়ের প্রয়োজনায় লোকশিল্পী সংসদ কর্তৃক 'মঙ্গু' নাটকটি অভিনীত হয়। নাটকের বিষয়বস্তু ছিল গ্রামোন্নয়নের সংকল্প নিয়ে সহর হতে আগত জনৈক গ্রামসেবক কি ভাবে গ্রামের মহাজন ও প্রভাবশালী জমিদার শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা প্রতিপদে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল ও গ্রাম সেবকের প্রভাবে কি ভাবে দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দার মঙ্গুর পবিবর্তন সাধিত হয়েছিল তারই কাহিনী।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে লোকশিল্পী সংসদ যথাক্রমে কাতলামারা বাজারে ও মনতলা চা বাগানে মামা বরেরকরের লিখিত 'আউর ভগবান দেখতা রাহা' নাটকের বাংলা অনুবাদ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিল। সেদিন দুই স্থানেই নাট্যাভিনয় দেখার জন্য প্রচুর লোকের সমাবেশ হয়েছিল। নাটকটি প্রযোজনা করেছিল ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাট্য বিভাগ।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগের প্রযোজনায় ১৬ই আগষ্ট তারিখে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে 'জটা গঙ্গার বাঁধ' নাটকটি সংসদ মঞ্চস্থ করে। নাটকটি পরিচালনা করেন সুধাংশুমোহন দত্ত।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে শিশুদের নৃত্যনাট্য 'ভারত মাতা' ও 'শরতের আহ্বান' দুটি নৃত্যনাট্য সংসদ পরিবেশন করে। পরিচালক ছিলেন নরেশচন্দ্র পোদ্দার।

লক্ষ্মী-প্রিয়ার সংসার

নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ী বলেন স্বাধীনতার পরবর্ত্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ সংসার চালানোর দায়িত্ববোধ, সুরুচি ও সুনীতিবোধ তাদের সাধারণ মজদুরের মত শুধু নিজের চিন্তায় জীবন যাপন করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই যে পরিবারের কর্ম সংস্থান আছে তার ঘরে পোষ্য বেকার সংখ্যাও যথেষ্ট। গৃহকর্ত্রী সবাইকে জড়িয়ে রাখবার জন্যে পদে পদে নিজেকে বঞ্চনা করছে এবং গৃহকর্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের উপর বীতরাগ হচ্ছে।

এই সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে পরস্পরের প্রীতির সম্পর্ক অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ ও বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। এ ব্যাধির মুক্তি সন্ধান দেবার মত লোকের একান্ত অভাব। তবু এরি ভেতরে সংখ্যায় নগন্য হলেও কিছু লোক মানুষ হয়ে বাঁচার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এসব নৈরাশ্যে দিক্‌ভ্রান্ত জনগণ কখনো কখনো দুরন্ত দুর্যোগের রাত্রিতে চপলার ক্ষণিক চমকের মত এই সব জীর্ণ ভাঙ্গাবুকে মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে।

এদের নিয়েই 'লক্ষ্মী প্রিয়ার সংসার'। শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়। আজকের দুর্দিনও কেটে যাবে—তার ইঙ্গিত এ নাটকে আছে।

এই নাটকটি লোকশিল্পী সংসদ ১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করেছিল। সেদিন অভিনীত নাটকের সংগঠনকারীদের মধ্যে ছিলেন : পরিচালনায় শক্তি হালদার; ব্যবস্থাপনায় ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, অনাথবন্ধু ঘোষ, পরেশচন্দ্র ভাদুড়ী, অমরেশ দত্ত, রমাপ্রসাদ দত্ত। গীত রচনা ও সঙ্গীত পরিচালনা—দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়। মঞ্চাধ্যক্ষ অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য; মঞ্চসজ্জা—অমরেশ দত্ত, নরেশ পোদ্দার, সুবীর দাস, সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, রঞ্জিত ভৌমিক; রূপসজ্জা হরেন্দ্র হালদার; আলোক সম্পাত—নরেশ পোদ্দার, অমরেশ দত্ত, সাধন কর্মকার; স্মারক—ভূপেন চক্রবর্ত্তী; প্রচার সহায়তায় ছিদ্দিকের রহমান (রূপরেখা); কথা সঙ্গীতাংশে আশা নাগ, প্রবীর দেববর্মা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, বিমল কর; নাট্য সঞ্চালক—শিশু সেন।

চরিত্র রূপায়ণে ঃ

ইন্দ্রনাথ	—	জনৈক দরিদ্র ভদ্রলোক	ঃ	শক্তি হালদার
বিশু	—	ইন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র	ঃ	শিশু সেন
ছোটকা	—	কনিষ্ঠ পুত্র	ঃ	জিঞ্জির সেন
হরিসাধন	—	প্রতিবেশী	ঃ	বিশ্বজিৎ সেন
বামাচরণ	—	প্রৌঢ়	ঃ	অজিত ভট্টাচার্য
ন্যাপলা	—	একজন শ্রমিক	ঃ	সুশীল চৌধুরী
অনাথ	—	চানাচুরওয়ালা	ঃ	গিরীন্দ্র ভৌমিক
মিনতি	—		ঃ	রীণা দে
দুলাল	—		ঃ	তন্দ্রা মজুমদার
আশু	—	পাঠশালার ছাত্রছাত্রী	ঃ	স্বপ্না হালদার

বিশু	—		ঃ	মিতালী চক্রবর্ত্তী
আকাইল্যা	—	তারিণীর পুত্র	ঃ	কল্পনা গুপ্তা
বাচ্চা মেয়ে	—	মুসলমান রমনীর মেয়ে	ঃ	শুভ্রা মজুমদার
মহাবীর সাউ	—	জনৈক মদ্য ব্যবসায়ী	ঃ	বিজয় রায়
শশাঙ্ক	—	গুণ্ডা সর্দার	ঃ	রণজিৎ ভৌমিক
মাণিক	—	শশাঙ্কের সহযোগী	ঃ	সাধন কর্মকার
চৌধুরী	—	ছদ্মবেশী পুলিশ অফিসার	ঃ	সুবীর দাস
শিউকিষণ	—	সহকারী পুলিশ অফিসার	ঃ	অভিজিৎ
লক্ষ্মীপ্রিয়া	—	ইন্দ্রনাথের স্ত্রী	ঃ	যূথিকা গুপ্তা
বাণী	—	কন্যা	ঃ	মীনা চক্রবর্ত্তী
পুঁটিমাসি	—	বামাচরণের স্ত্রী	ঃ	রেণুকা সিংহ রায়
তারিণী	—	প্রতিবেশিনী	ঃ	অলকা গুপ্তা
মুসলমান রমণী	—		ঃ	পূর্ণিমা বর্মন

এই নাটকে স্বরচিত সঙ্গীত সংযোজন করেন লোকশিল্পী সংসদের সঙ্গীত পরিচালক দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়। গানটি হোল—

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটকের একটি দৃশ্য

মনরে সাঁঝের বাতি জ্বলল ঘরে ঘরে
আমার ঘরে জ্বলল না
বৈঠা ধইরা বইস্যে রইলাম
তবু কুলে তরী ভিড়ল না
ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে শুইয়ে
দেখলাম সুখের স্বপ্ন কত শত।
উজান বাইয়াই গেলাম জীবন ভর
ভাঁটায় তরী পড়ল না।

লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার নাটকের অভিনয়ে সেদিন নাম ভূমিকায় যূথিকা গুপ্তা এবং শক্তি হালদার, শিশু সেন, মীনা চক্রবর্ত্তী, রেণুকা সিংহ রায় দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন।

এরপর লোকশিল্পী সংসদ 'রাণী জয়াবতী' নাটকটি মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনা নেয়। এই পরবর্তী নাটকের কাল খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ; বিষয়বস্তু হুমায়ুন আর

শেরসাহের উত্থানপতন; পাঠানমোগলের দ্বন্দ্ব; ঠিক এমনি সময়ে ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ত্রিপুর কুলতিলক বিজয় মাণিক্য স্বদেশের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন; তাঁর স্বপ্ন ছিল অত্যাচারী বহিরাগত শাসনের কবল থেকে মুক্ত করে স্বীয় রাজ্যসহ সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে একটি সুদৃঢ় দেশীয় মিত্ররাজ্যপুঞ্জে সংঘবদ্ধ করা; নিয়তির চক্রে তাঁর সে মহান স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি সত্য, কিন্তু তাঁর শুভ প্রচেষ্টা ইতিহাসে একটি গৌরবময় অধ্যায়রূপে চিহ্নিত হয়েছিল।

'রাণী জয়াবতী' নাটকের ঐতিহাসিক উপাদান বিজয় মাণিক্যের রাজত্বের শেষ ভাগ থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই সময়টিতে ত্রিপুর রাজত্বে এক জটিল বিপর্যয়কর অবস্থা চলছিল। বিজয়মাণিক্যের দয়ায় দীন নগণ্য গোপীপ্রসাদ ত্রিপুরার প্রধান সেনাপতি রূপে উন্নতির চরম সোপানে উপনীত হয়। ক্রমে তার লোভ জাগে সিংহাসনের প্রতি। শুরু হয় জঘন্য চক্রান্ত। বিজয়মাণিক্য বুঝতে পারেন তাঁর অবর্তমানে যুবরাজ অনন্ত মাণিক্যের সিংহাসনলাভ দুরাশা হয়ে উঠতে পারে। তিনি সমস্যার সমাধান চিন্তা করলেন। সেনাপতি গোপীপ্রসাদের কন্যা জয়াবতীর সঙ্গে যুবরাজ অনন্তের বিয়ে দিলেন। ভাবলেন স্বীয় জামাতাকে বঞ্চিত করে গোপীপ্রসাদ হয়তো বা সিংহাসনের প্রতি লোভ করবে না। কিন্তু ফল হলো বিপরীত। বৃদ্ধ বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সিংহাসন নিয়ে জঘন্য চক্রান্ত আত্মপ্রকাশ করলো। অবশেষে জামাতা হত্যা করেই সেনাপতি গোপীপ্রসাদ রাজা হলেন। নিজের নাম পরিবর্তন করে উদয়মাণিক্য নাম গ্রহণ করলেন। নিজ নাম অনুসারে রাজধানীর নাম উদয়পুর রাখলেন। তারপর সুরু হলো অত্যাচার, নির্যাতন ও ভোগবিলাস। প্রজা সাধারণ অস্থির হয়ে উঠলো। জয়াবতী পিতার এ অন্যায়কে সহ্য করলেন না। প্রতিজ্ঞা করলেন—দুরাচারী পিতাকে বিনাশ করে প্রকৃত উত্তরাধিকারী অমরদেবকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করতে হবে। রাণী জয়াবতীর প্রবল আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ত্রিপুরার সর্বজাতির প্রজাসাধারণ বিদ্রোহী হয়ে উঠলো। এই ভয়াবহ বিদ্রোহের আগুনে উদয়মাণিক্যের সমস্ত চক্রান্ত ভস্মীভূত হয়ে গেল। ক্রমে প্রাচীন ত্রিপুরার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন মহারাজা অমরমাণিক্য। রাণী জয়াবতী তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করলেন। ত্রিপুরার ইতিহাসে এই সতী বীরাঙ্গনার নাম স্বর্ণাক্ষরে চিরসমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

রাণী জয়াবতীর উপরে বর্ণিত ঐতিহাসিক আখ্যানভাগকে উপজীব্য করে মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী 'জয়াবতী বা ত্রিপুর সতী' নাটকটি রচনা করেন। এই সম্মিলনী ত্রিপুরায় অন্যতম বিদ্যোৎসাহী শিল্পরসিক মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষিত সংস্থা রূপে একদা ত্রিপুরার শিল্পজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল। এই সম্মিলনীর অদম্য উৎসাহে নাটকটি রচিত ও মুদ্রিত হয়েছিল।

নাটকটির সংলাপ ও দৃশ্য বিন্যাসে কিছুটা পরিমার্জন ও পরিবর্তন আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায় সেদিন লোকশিল্পী সংসদ সদস্য অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য নাটকে কিছু সংলাপ সংযোজন করেন মূল নাটকের তথ্য ও কৃতিত্বকে সামনে রেখে।

পূর্বেই বলেছি এ নাটকটি ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়েছিল ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী কর্ত্তৃক। এরপর দ্বিতীয়বার ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই ও ১০ই জানুয়ারি লোকশিল্পী সংসদ পুনরায় এই নাটক অভিনয় করে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের 'সংস্কৃতি ভবন' মঞ্চে।

সেদিন অভিনীত নাটকের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, অনাথবন্ধু ঘোষ, পরেশচন্দ্র ভাদুড়ী, রমাপ্রসাদ দত্ত, অমরেশ দত্ত, পারুল হালদার, অজিত ভট্টাচার্য। মঞ্চাধ্যক্ষ—অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, মঞ্চসজ্জা—অমরেশ দত্ত, রঞ্জিত ভৌমিক, গিরীন্দ্র ভৌমিক, সুশীল চৌধুরী, সুবীর দাস, নরেশ পোদ্দার। রূপসজ্জায় ছিলেন—হরেন্দ্র হালদার, প্রবীর দেববর্মা। পরিচ্ছদ সহায়—বিনোদ দেববর্মা। আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন— নরেশ পোদ্দার, অজিত ভট্টাচার্য, গৌরদাস ভট্টাচার্য, সাধন কর্মকার। কণ্ঠ সংঙ্গীতে ছিলেন—মালবিকা, পূর্ণিমা, বুলি, স্বপ্না, পথিকা, কল্পনা, তন্দ্রা, চিনু, রেণুকা ও উমা। যন্ত্র সংঙ্গীতে প্রবীর দেববর্মণ, হিরু সাহা, আশা নাগ, হরিধন সাহা। নৃত্যে ছিল— অপর্ণা, অপরিজিতা, শীলা, শিপ্রা, স্বপ্না, মণিকা ও রীণা। প্রচার সহায়তায়—ছিদ্দিকুর রহমান (রূপরেখা) ও আর্ট হাউস। নৃত্য পরিচালনায় হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা। সঙ্গীত পরিচালনায় রবি নাগ ও দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালনা—শক্তি হালদার। নাট্য সঞ্চালক—শিশু সেন।

রূপায়ণে ছিলেন— নাম ভূমিকায় চিনু বর্মন, শক্তি হালদার, শিশু সেন, তপেশ রায়, বিশ্বজিৎ সেন, বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, রূপেন্দ্র মজুমদার, রণজিত ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্ত্তী, সুশীল চৌধুরী, সর্বানন্দ ভট্টাচার্য, সন্তোষ ব্যানার্জী, সুবীর দাস, নিখিল ভট্টাচার্য ও আরও অনেকে। কমলাবতীর ভূমিকায় মানসী রায়।

এই নাটকে তিনটি গান সংযোজন করা হয়। প্রথম গানটি লেখেন বেদমণি সিংহ ঠাকুর। সুর দেন শৈলেন্দ্রকুমার মুখার্জী। গানটি হোল—

ধ্রুপদ (চৌতাল)

জয় জয় জয় শিব শঙ্কর

জয় জয় ত্রিপুরারি।

কণ্ঠ সর্প মাল, বাল চন্দ্র মুকুট সাজে।

প্রিয় গৌরী শৈলসুতা

বামনে বিরাজে।

ভূত প্রেত সঙ্গ নিয়ে তিন নেত্র ধারী।

দ্বিতীয় গানটির রচয়িতা মহেন্দ্র দেববর্মা। সুর দিয়েছিলেন রবি নাগ। গানটি হলো—

বসন্ত (ত্রিতাল)

ফাগুয়া খেলন তু কিঁউ আয়ে

বন বন মে ফুল হাসতি

সারি জগতমে ছাই বাহার

ইতনি দিন গুজারী সইয়া

তুম বিনা অকেলি

ম্যায় হি খেলু ফাগ তুমহারি সাথ

কিউ আজ আয়ে।

তৃতীয় গানটির কথা ও সুর উভয়ই দেবদাস গাঙ্গুলী কৃত ছিল। গানটি হল—

ভজন —(দাদরা)

নমঃ নমঃ নমঃ ত্রিপুরা সুন্দরী নমঃ

তুমি মা ভক্তি, তুমি মা শক্তি

তুমি মা মুক্তিদায়িনী।

তুমিই সৃষ্টি তুমিই স্থিতি

তুমিই প্রলয়কারিণী।

সেদিনও অভিনীত নাটকে লোকশিল্পী সংসদকে বিভিন্ন সাহায্য করেছিলেন, শিক্ষাবিদ সত্যরঞ্জন বসু, শিল্পী বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, শিল্পী বিপিনবিহারী দেববর্মা, শিল্পী বিনোদবিহারী দেববর্মা, প্রধান শিক্ষিকা যোগমায়া রাহা, ইন্দুভূষণ দেববর্মা।

সেদিন স্থানীয় পত্রিকা 'সমাচার' 'রাণী জয়াবতী'র নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আলোচনায় লিখেছিলেন, লোকশিল্পী সংসদ কর্তৃক ত্রিপুরার ঐতিহাসিক নাটক রাণী জয়াবতী' সাড়ম্বরে অভিনীত হয়েছে এবং দর্শকমণ্ডলী প্রভূত আনন্দলাভ করতে পেরেছেন এই শিল্প কৃত্য থেকে। এ জাতীয় অনুষ্ঠানের গুরুত্ব আছে। দেশের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয়চিত্র এবম্প্রকার ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়ে জনচিত্তে সহজেই দাগ কাটতে পারে। নাটক তাই ইতিকথার আদর্শ বাহন। ঐতিহ্যময় ত্রিপুরার ইতিবৃত্তকে অবলম্বন করে অতি অল্প সংখ্যক নাটকই রচিত হয়েছে। বিশ্বকবি

রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' এবং ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনীর 'জয়াবতী' এই দুটি নাটকই মুদ্রিত হয়ে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপ পেয়েছে। এরপর হস্ত-লিখিত ত্রিপুর গাথা'ও কয়েকবার সহরের মঞ্চে অভিনীত হয়েছে। তাছাড়া আরো দু-একটি হস্ত-লিখিত নাটকের নাম শোনা যায়, অভিনীত হয়েছে কিনা জানা যায় না।

ত্রিপুরার ইতিহাসে রাণী জয়াবতীর পরিচয় স্বর্ণাক্ষরে বিঘোষিত হয়েছে। দেশাত্মবোধের ও বীরত্বের মহিমায় যে সমস্ত বীরাঙ্গনা বিশ্বের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁদের অন্যতমরূপে জয়াবতীর নাম আমরা সগৌরবে উচ্চারণ করতে পারি। নাটকের মাধ্যমে তাঁর আলেখ্য দেখতে পেয়ে তাই আমাদের আনন্দ হয়। শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়। নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করি।

এমন একটি নাটক মঞ্চস্থ করে প্রশংসিত সংসদ তাঁদের নাট্যকৃত্যের গৌরবের সঞ্চয় বাড়িয়েছেন। অভিনীত এই নাটক সম্পর্কে সূক্ষ্মভাবে সমালোচনার কিছু আমাদের নেই। আমরা জানি একটা মর্মান্তিক প্রতিকূল পরিবেশকে অবিরাম প্রতিহত করতে করতেই সংসদ তাঁদের সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। সংসদ তাঁদের সীমিত শক্তি দ্বারা স্বল্পকালীন গণ্ডীর মধ্যে স্থানীয় শিল্পক্ষেত্রে যে সুকৃতির পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর এবং প্রশংসনীয়। সমাচারের কলা-কৃষ্টি সমীক্ষণের দৃষ্টি এই দিকটার উপরই গুরুত্ব দিচ্ছে।

রানী জয়াবতী নাটকের অভিনয় সর্বাঙ্গিক হিসাবে সুন্দর হয়েছে। দৃশ্য সজ্জা, রূপ সজ্জা ও পোষাক পরিচ্ছদ মনোরম হয়েছে। আলোকসজ্জা নিখুঁত হয়েছে। সঙ্গীতাংশ প্রশংসনীয়। টিম ওয়ার্ক ভাল হয়েছে। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলির রূপায়ণ যথোচিত হয়েছে। বিশেষতঃ স্ত্রী-ভূমিকায় জয়াবতীরূপে চিনু বর্মন এবং কমলাবতীরূপে মানসী রায় অপূর্ব অভিনয় করেছেন। বয়সের তুলনায় তাঁদের শিল্পনিষ্ঠা ও দক্ষতা আশার ইঙ্গিত বহন করে। নৃত্যাংশে কিশোরী শিল্পীদের মনোরম শিল্পকৃত্যের জন্য নৃত্য পরিচালক প্রশংসার দাবী করতে পারেন। দৃশ্য পরিবর্তনে অত্যধিক সময় ব্যয়িত হওয়ায় মাঝে মাঝে দর্শকমণ্ডলীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলেও নাটকের গতি ব্যাহত হয় নি। পরিচালকের কৃতিত্বে অভিনয়টি সার্থকরূপ পেয়েছে একথা আমরা অনায়াসেই বলতে পারি। সংসদের এবম্প্রকার কল্যাণকর উদ্যম উত্তরোত্তর সার্থক হোক, আমরা এই আশাই সর্বান্তঃকরণে করতে পারি।
(তথ্যসূত্র সমাচার ১৭ই জানুয়ারি ১৯৬০ খ্রিঃ)

মেঘদূত নৃত্যনাট্য :

এরপর লোক শিল্পী সংসদ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের ২২ শে ও ২৩ শে জুন তারিখে উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যটিকে নৃত্যের মাধ্যমে

অভিনয় করেন। সেদিন মেঘদূত নৃত্যনাট্যের নৃত্যরূপ পরিকল্পনায় ও পরিচালনায় ছিলেন হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (হরিকর্তা)। সঙ্গীত পরিচালনায় কুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা, কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা। যন্ত্রবাদন— কুমার বিপিন বিহারী দেববর্মণ, কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মণ, নবদ্বীপ দেববর্মা, কুমার প্রবোধ দেববর্মা, প্রবীর দেববর্মা। নৃত্য পরিচালনায়—বিহারী সিংহ ও দিলীপ দেববর্মা। কণ্ঠসঙ্গীতে— রবি নাগ, আশা নাগ, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়; নৃত্যাংশে— অনন্ত দেববর্মা, কুমারী অপর্ণা দেববর্মা, কুমারী বন্দনা দেববর্মা, কুমারী চিত্রা দেববর্মা, কুমারী মীনাক্ষী দেববর্মা, কুমারী মণিকা দেববর্মা এবং আবৃত্তি করেছিলেন অধ্যাপক বঙ্কিম ভট্টাচার্য। মঞ্চ পরিকল্পনা— অমরেশ দত্ত, শক্তি হালদার, রঞ্জিত ভৌমিক; রূপসজ্জায়--- হরেন্দ্র হালদার, উর্মিলা দেববর্মা, রত্নপ্রভা দেববর্মা, পদ্মিনী দেবরর্মা, আলোক নিয়ন্ত্রণে--- তপেশ রায় ও পার্টি। অভ্যর্থনায়--- অনাথবন্ধু ঘোষ, শিশু সেন, পরেশ ভাদুড়ী ও রমাপ্রসাদ দত্ত। মঞ্চাধ্যক্ষ— অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সেদিন লোকশিল্পী সংসদের মেঘদূত নৃত্যনাট্য দেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সংস্কৃত সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য 'নৃত্যনাট্য মেঘদূত' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন—তাই ছিল লোকশিল্পী সংসদের নিকট আশীর্বাদ। সেদিন তিনি কি লিখেছিলেন, সে লেখা আজ লুপ্তির পথে, তাই আজ পাঠকের কৌতূহল নিবারণার্থে নিম্নে মূল্যবান প্রবন্ধটি হুবহু মুদ্রিত করা হোল।

সাংস্কৃতিক আলোচনা ঃ নৃত্যনাট্য মেঘদূত
অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

গত সপ্তাহে ত্রিপুরা লোকশিল্পী সংসদ কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতকে নৃত্যনাট্যে রূপায়িত করিয়াছিলেন। খুব সাহসের কাজ করিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মনে উৎসুক্য এবং আশঙ্কা লইয়া সেই অনুষ্ঠান দেখিতে গিয়াছিলাম। লিরিক ও মহাকাব্যধর্মী এই অমর কাব্যকে কিভাবে নৃত্যরূপ দেওয়া হইয়াছে— তাহা দেখিতে ঔৎসুক্য ছিল। সঙ্গে ভয় ছিল কি জানি মেঘদূতের অপরূপায়ণই হয়তো দেখিতে হইবে। কিন্তু নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি, নৃত্যানুষ্ঠান দেখিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং সংসদকে এই সৎ সাহসের জন্য অভিনন্দিত করিতেছি।

মেঘদূত নববর্ষার শ্রেষ্ঠ কাব্য। বিরহেরও শ্রেষ্ঠ কাব্য। পূর্বমেঘে বর্ষাপ্রকৃতির অপূর্ব বর্ণনা হইয়াছে। সেখানে প্রকৃতি প্রধান। মানুষ হইতে আরম্ভ করিয়া তির্য্যক প্রাণী পর্যন্ত সবকিছুই প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্লীন হইয়াছে।

উত্তর মেঘে মানুষ প্রধান। তাহার বিরহ মিলনের কথা—তাহার অন্তর বেদনা যেখানে

প্রকৃতি পরিব্যপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব মেঘ মহাকাব্যের গম্ভীরতাময়, উত্তরমেঘে লিরিকের দুঃখ বেদনা আশা নিরাশার অনুভূতি। সমগ্র কাব্য মেঘমন্দ্র মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত হইয়া বর্ষাপ্রকৃতি এবং বিরহবিদুরতাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বমেঘে রামগিরি হইতে যক্ষের দূত হইয়া মেঘ অলকার দিকে চলিয়াছে শ্রবণ সুভগ গর্জন করিয়া, 'যক্ষের বিরহ চলে অলকার পথে'। কবির প্রতিভার যাদুস্পর্শে মেঘ এবং সমগ্র জড়প্রকৃতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছে। মেঘ যক্ষের দূত। যক্ষ বিরহী। সমস্ত প্রকৃতি যেন যক্ষের বিরহে কাতর হইয়া উঠিয়াছে। সকলে মিলিয়া মেঘকে সাহায্য করিতেছে। সমগ্র জড়জগৎ যক্ষের দুঃখে এক প্রাণ হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরমেঘে অলকার বর্ণনা। কিন্তু তাহার মধ্যে বিরহশীর্ণা যক্ষপত্নীর মূর্তি আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলে। তাহার পর আছে যক্ষের স্তোত্র গেয় সন্দেশ। অশ্রুসজল সেই বাণী পাইত যেমন আর্তি, তেমনি আশ্বাস, কয়টা দিন চোখ বুজিয়া কাটাইয়া দাও, দুঃখ কি তোমার একার? আমার দুঃখ তোমাকে কি করিয়া বুঝাইব?

সমগ্র পূর্বমেঘ এবং উত্তরমেঘে যক্ষ প্রিয়ার বর্ণনা পর্যন্ত প্রতিটি শ্লোক এক একটি সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের চক্ষুর সম্মুখে তুলিয়া ধরে এবং আমাদের হৃদয় বেদনায় ভরিয়া উঠে।

মেঘদূত আরম্ভ হইয়াছে রামসীতার কাহিনী লইয়া যেখানে বিরহ প্রধান আর তাহা শেষ হইয়াছে অলকায়। এই অলকা কৈলাস শিখরে যেখানে হরগৌরীর নিত্য মিলন। মেঘদূত বিরহ ও মিলনের কাব্য।

মেঘদূতে প্রধান চরিত্র তিনটি। যক্ষ, যক্ষপত্নী এবং মেঘ। মেঘ অচেতন। অপ্রধান ভাবে আছে জড়প্রকৃতি এবং তির্যক প্রাণী। কিন্তু মহাকবির প্রতিভায় ইহারই মধ্যে একটি নাটকীয় রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। নৃত্যনাট্যে ইহাকে রূপায়িত করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। তাই বলিতেছিলাম, লোকশিল্পী সংসদ খুব সাহসের কাজ করিয়াছেন।

নৃত্যনাট্যে পশ্চাদভূমিতে আবহ সঙ্গীতের ব্যবস্থা ছিল। পূর্বমেঘের এগারটি এবং উত্তর মেঘের তিনটি শ্লোককে বিভিন্ন উচ্চ মার্গের রাগে যুক্ত করিয়া গীত গাওয়া হইয়াছিল। এই রাগগুলি অধুনা অপ্রচলিত আভোগী, মীরাবাঈ কী মল্লার ইত্যাদি। যাঁহারা সঙ্গীত পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা কৃতিত্বের দাবী রাখেন। গানের শ্লোকগুলি এমনভাবে চয়ন করা হইয়াছিল যাহাতে সমগ্র কাব্যের ভাবরূপটি পাওয়া যায়। প্রতিটি শ্লোক গীত হইবার সমসময়ে নৃত্যে শ্লোকগুলি রূপায়িত হইতেছিল। অন্যদিকে মূল শ্লোকগুলির আবৃত্তি হইতেছিল। মাঝে মাঝে বাংলা অনুবাদের আবৃত্তিও ছিল।

মূল নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল "প্রত্যাসন্নে নভাসি" ইত্যাদি শ্লোকের রূপায়ণ হইতে। *বিভিন্ন দৃশ্যে পথিক জনতা, জনপদবন্ধু এবং পুষ্পালম্বী নারীগণের মেঘদর্শনের*

হাবভাবকে নৃত্যে রূপ দেওয়া হইয়াছিল। সব দৃশ্যই সার্থক হইয়াছিল এমন নয়। তৎকালীন নারীদের পোষাক পরিচ্ছদ কেমন ছিল তাহা মোটামুটি সংস্কৃত সাহিত্য কিম্বা বাৎস্যায়ণের সূত্র হইতে জানিলেও ঠিক ঠিক ভঙ্গীটি আমাদের অজ্ঞাত। সেদিনের অভিনয়ে কোনো কোনো দৃশ্যে বস্ত্র পরিধানের আধুনিক রীতি দৃষ্টিকটু হইয়াছিল। মেঘদূতের বর্ষার সঙ্গে জড়াইয়া আছে হংস বলাকা, চাতক, ময়ূর, হরিণ প্রভৃতি তির্যক প্রাণী, আর আছে শিলীন্ধ্র, কুটপ, কদম্ব আর আছে শ্যাম জম্বুবান, আছে বিভিন্ন নদনদী বেত্রা, শিপ্রা, নির্বিন্ধ্যা প্রভৃতি। নৃত্যে উহাদিগকে ফুটাইয়া তোলা কঠিন যদিও ময়ূর নৃত্যের একটু আভাস একটি দৃশ্যে ছিল, বিদ্যুৎ চমক-ও কিছুটা ছিল কিন্তু মেঘগর্জন ছিল না। উহা একটি বড় ত্রুটি। কারণ মেঘদূতে শ্রবণ সুভগ মেঘগর্জন না থাকিলে বর্ষার রূপটি ধরা পড়িবার কথা নয়।

পূর্বমেঘের নৃত্য রূপায়ণে যক্ষের আকুতি এবং আর্তি মোটামুটি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। উত্তরমেঘের অভিনয় হ্রস্ব হইয়াছে। দুই তিনটি দৃশ্যে যক্ষ পত্নীর আবির্ভাব ও তিরোভাব অতি দ্রুত শেষ করা হইয়াছিল। উত্তর মেঘে মেঘ-সন্দেশের যে আর্তি ও ব্যাকুলতা তাহা আর একটু স্পষ্ট হইলে ভাল হইত। সম্ভবতঃ শিল্পী সংখ্যার অল্পতা হেতু উত্তরমেঘে অনেকখানি বাদ দিতে হইয়াছে। সেখানে আরো তিন চারটি শ্লোককে নৃত্যে রূপায়িত করিলে অভিনয়টি সর্বাঙ্গ সুন্দর হইত কারণ যখন উহা শেষ হইল তখন মনে হইতেছিল যেন অকস্মাৎ যবনিকা পতন হইল।

এই সকল সামান্য দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও— লোকশিল্পী সংসদের এই নৃত্যানুষ্ঠান প্রশংসনীয় কারণ মেঘদূতের মতন একটি দুরূহ কাব্যকে নৃত্যে রূপ দেওয়া সহজ কাজ নহে।'

এই মেঘদূত নৃত্য অনুষ্ঠান দেখে সেদিন **'গণরাজ'** পত্রিকা আলোচনাক্রমে বলেছিল, 'আধুনিক যুগবাঞ্ছিত কলাকৃষ্টির অনুশীলনে ত্রিপুরায় যে কয়টি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সংস্থা এগিয়ে চলেছেন তার মধ্যে লোকশিল্পী সংসদ-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কলাকৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সম্প্রতিকালে তাঁরা যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন তাতে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটা প্রাণবন্ত পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই সাংস্কৃতিক উদ্যম আমাদের সমাজ জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর ও কল্যাণজনক সন্দেহ নেই।'

লোকশিল্পী সংসদের সাম্প্রতিক অবদান মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত নৃত্যনাট্য। অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২২ শে এবং ২৩ শে জুন, ১৯৬০খ্রিঃ উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলের মঞ্চে। এই অনুষ্ঠানের গুরুত্বের দু'টি দিক আছে। একটি হল তিথিমহিমা। অপরটি শিল্প কৃতিত্ব। প্রাচীন ভারতের কাব্য-সাহিত্য-সংস্কৃতি নিয়ে আমরা যে গর্ব অনুভব করি তার মূলে যে সমস্ত মনীষীর সাধনা বিদ্যমান তাঁদেরই

মধ্যে একজন অমর স্রষ্টা হলেন মহাকবি কালিদাস—ভারতীর বরপুত্র রূপে যিনি আজ বিশ্ব পরিচিত। লোক শিল্পী সংসদ কালিদাসের স্মরণ উৎসবকে মহিমাময় করে তুলেছেন তাঁরই অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য মেঘদূতের নাটকীয় রূপায়ণ করে। মেঘদূতের নাট্যরূপ ও তার অভিনয় সাধারণ ব্যাপার না—এ প্রচেষ্টাকে দুরূহ প্রচেষ্টাই বলে মানতে হয়। কর্মীদের উৎসাহ ও পরিচালকের সুপরিচালনার গুণে এই কঠিন নাটকটি মঞ্চস্থ হতে পেরেছে—স্থানীয় শিল্প ও নাট্যরসিক দর্শককুলের পক্ষে এটা পরম লাভ এবং সংসদের সংস্কৃতির আন্দোলনের পক্ষে সৎসাহসের পরিচয়।

মেঘদূতের নৃত্যনাট্যরূপ রচনা করেছেন পরিচালক হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মণ। মূলগ্রন্থের সমস্ত শ্লোকই বিকশিত হয়েছে আবৃত্তি, নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে। নৃত্যগুলি খুবই মনোরম হয়েছে। বিশেষ করে হর-পার্বতী নাচে অনন্ত দেববর্মা ও কুমারী বন্দনা দেববর্মা দর্শকবৃন্দকে অভিভূত করেছেন। নৃত্যশিল্পীদের রূপসজ্জা ও পরিচ্ছদ সুন্দর ও রুচিসম্মত হয়েছে। আচার্য শ্রী বঙ্কিম ভট্টাচার্য মহাশয় মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং কতকাংশ বাংলা পদ্যানুবাদ আবৃত্তি করেছেন। তাঁর বাংলা আবৃত্তি ভালো হয়েছে তুলনামূলক হিসেবে। বস্তুত শ্রী ভট্টাচার্যের উপর গুরুভার চাপান হয়েছে। কারণ মেঘদূতের এতগুলো সংস্কৃত মন্দাক্রান্তা ছন্দের শ্লোকসহ অতিরিক্ত বাংলা শ্লোক প্রায় অবিরাম আবৃত্তি করা এক ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়—রসভঙ্গ এতে খুবই স্বাভাবিক। অনুষ্ঠানের সঙ্গীতাংশ নাটকে আভিজাত্য ও মহিমাকে যথোচিতভাবেই বাড়িয়েছে। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন কুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা, কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা ও নবদ্বীপ দেববর্মা। অধিকাংশ গানেই অধুনা অপ্রচলিত রাগ ও তাল আরোপ করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁরা। বীরচন্দ্র মাণিক্যের সঙ্গীত আসরে এবং তৎকালীন ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজে এই সমস্ত রাগ ও তালের অনুশীলন খুবই হতো। কিন্তু আধুনিক ত্রিপুরার সঙ্গীত সমাজে সেই ধারা আজ আর প্রবাহিত হতে দেখা যায় না। এ জন্যেই অপ্রচলিত ও অভিনব বলছি। কণ্ঠসঙ্গীতসমূহ সুখশ্রাব্য হয়েছে। মঞ্চসজ্জা পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর হলেও লোক শিল্পী সংসদের সঙ্গতি অনুযায়ী সমৃদ্ধ হয়েছে বলতে পারলাম না। আলোকসজ্জা সংযত হয়েছে। জানা যায় এই মনোরম নৃত্যনাট্য দিল্লী ও ভারতের অন্যান্য স্থানে প্রদর্শনের ইচ্ছা আছে।* (গণরাজ ৫ই জুলাই ১৯৬০ ইং)

এরপর লোকশিল্পী সংসদ ১৯৬১ ইং সনের ১৮ই জানুয়ারি মহাকবি কালিদাসের অন্যতম কাব্য **'কুমারসম্ভব'**-এর নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করে। এই অনুষ্ঠানটি সেদিন ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রচার সংস্থা কর্তৃক প্রযোজিত হয়েছিল সারা ভারত পরিকল্পনা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে। নৃত্যনাট্যটি সংসদ সঙ্গীত- ভারতীর সহযোগিতায় করেছিল উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে।

কুমারসম্ভব নৃত্যনাট্যের সংগঠনকারীগণ হিসেবে সেদিন ছিলেন—

নৃত্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায়—বিহাররঞ্জন সিংহ।

গ্রন্থনা—নরেশচন্দ্র পোদ্দার।

সঙ্গীত পরিচালনায়—রবি নাগ।

সহযোগিতায় 'সঙ্গীত ভারতীর' শিল্পীবৃন্দ।

যন্ত্রসঙ্গীতে— কুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্ম্মা, কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, হরিশঙ্কর দেববর্মা, বিহাররঞ্জন সিংহ, অশোকা গুপ্তা, শিপ্রা দাস।

তবলা সহযোগিতায়— বীরেন রায়।

কণ্ঠ সঙ্গীতে— রবি নাগ, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, মণিদীপা গঙ্গোপাধ্যায়, নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, অজয়শঙ্কর চক্রবর্তী ও হিরণ্ময় রায়।

বাংলা আবৃত্তি (অনুবাদ)—শক্তি হালদার।

সংস্কৃত শ্লোক— দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

শিল্প নির্দেশনায়— শক্তি হালদার।

মঞ্চসজ্জায়—রবীন্দ্র চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক।

রূপসজ্জায়—হরেন্দ্র হালদার।

রূপসজ্জায় (সহযোগী)—শক্তি হালদার, স্বপন নন্দী।

আলোকসম্পাত ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ—হরিপদ দাস।

পরিচ্ছদ সজ্জায়—রবীন্দ্র চৌধুরী, স্বপন নন্দী, কালীপদ চৌধুরী, সীমা চক্রবর্তী, প্রতিমা সেন, গীতা সেন।

ব্যবস্থাপনায়—অনাথবন্ধু ঘোষ, ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, পারুল হালদার, অজিত ভট্টাচার্য, শিশু সেন, অমরেশ দত্ত, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, বিজয়া সাহা, মাণিক ভট্টাচার্য, ফণী সেনগুপ্ত।

পরিচালনায়—নরেশ পোদ্দার।

চরিত্র রূপায়ণে— শিবানী চক্রবর্তী, পাপড়ী নন্দী, ইলা সেন, শীলা সেন, কল্পনা গুপ্তা, শিপ্রা সেন, মিতালী চক্রবর্তী, পদ্মিনী চক্রবর্তী, মণিদীপা চক্রবর্তী, পূর্ণিমা বর্মণ, চন্দনা গুপ্তা।

১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে—২৯ শে অক্টোবর শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র বিরচিত

সামাজিক নাটক **'কাঞ্চনরঙ্গ'** উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে লোকশিল্পী সংসদ অভিনয় করে। সেদিন এই নাটকের সংগঠনকারী হিসাবে ছিলেন—

পরিচালনা— শক্তি হালদার। ব্যবস্থাপনা— ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, অনাথবন্ধু ঘোষ, অমরেশ দত্ত, নরেশ পোদ্দার, পরেশ ভাদুড়ী, সুশীল চৌধুরী, বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিত ভট্টাচার্য, রমাপ্রসাদ দত্ত। মঞ্চাধ্যক্ষ—অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য। মঞ্চসজ্জা—রঞ্জিত ভৌমিক, মন্টু দাশগুপ্ত। রূপসজ্জা—হরেন্দ্র হালদার। আলোকসম্পাত—পরেশ চ্যাটার্জী, ধীরেন্দ্র দেবনাথ। আবহসঙ্গীত—রবি নাগ ও আশিস বর্মণ। স্মারক—ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশ পোদ্দার। নাট্য সঞ্চালক— শিশু সেন। চরিত্র রূপায়ণে—সূত্রধর—ভূপেন চক্রবর্তী, অভিনেত্রী—মুকুল ভট্টাচার্য, পাঁচু—শক্তি হালদার, তরলা—মহুয়া ভট্টাচার্য, গিন্নি—লীলা দেব, কর্তা—তপেশ রায়, সীমা—অপর্ণা রায় চৌধুরী, অমর—শিশু সেন, সমর—রঞ্জিত ভৌমিক, বটু—সন্তোষ ব্যানার্জী, বরকর্তা—নয়নরঞ্জন মজুমদার।

এরপর ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা ও ৫ই জুলাই শক্তিপদ রাজগুরু বিরচিত **'মেঘে ঢাকা তারা'** অভিনীত হয় লোকশিল্পী সংসদ কর্তৃক নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে। সে দিনের সংগঠনকারীদের মধ্যে ছিলেন ঃ পরিচালনা—বিজিতা গাঙ্গুলী। ব্যবস্থাপনায়—ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার, সন্তোষ গাঙ্গুলী, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র ভৌমিক। সহকর্মীবৃন্দের মধ্যে ছিলেন—তাপস বর্ধন, বিমল চৌধুরী, নীহার চৌধুরী, প্রদীপ চক্রবর্তী, প্রশান্ত চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্র ভৌমিক, নারায়ণ ভৌমিক, প্রফুল্ল পোদ্দার, হবিলাল, পুলক দে, সুজিত দে। নাট্য সঞ্চালক—সুশীল চৌধুরী। সঙ্গীত সঞ্চালক—সুপ্রকাশ বড়ুয়া। মঞ্চাধ্যক্ষ—শক্তি হালদার। রূপসজ্জা—হরেন্দ্র হালদার। স্মারক—ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, নরেশ পোদ্দার। সঙ্গীত পরিচালনায়—রবি নাগ। যন্ত্র ও কণ্ঠ সঙ্গীতে—মহেন্দ্র দেববর্মা, ধীরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা, নিত্যরঞ্জন দাস।

চরিত্রলিপিতে শিল্পীরা ছিলেন :

মাধব মাষ্টার—বৃদ্ধ উদ্বাস্তু শিক্ষক—ডাঃ নয়ন মজুমদার।

শঙ্কর—ঐ (জ্যেষ্ঠ পুত্র)—শক্তি হালদার।

মন্টু— ঐ (কনিষ্ঠ পুত্র)—কমল চক্রবর্তী।

মদন ডাক্তার—কলোনীর ডাক্তার—দেবেন্দ্র ভৌমিক।

সনৎ—শিক্ষিত যুবক—সন্তোষ গাঙ্গুলী।

মেসের ম্যানেজার—মণীন্দ্র ভট্টাচার্য।

হরিদাস—বোর্ডার—মিন্টু দাস।

মধু—কলোনী যুবক—রঞ্জিত ভৌমিক।

পরেশ—কলোনী যুবক—অমরেন্দ্র ভৌমিক।

সিনেমার এ্যাসিস্টেন্ট—সুপ্রকাশ বড়ুয়া।

বংশী—চায়ের দোকানদার—আশু রায়।

কাদম্বিনী—মাধব মাষ্টারের স্ত্রী—বকুল বড়ুয়া।

নীতা—মাধব মাষ্টারের বড় মেয়ে—বিজিতা গাঙ্গুলী।

গীতা—মাধব মাষ্টারের ছোট মেয়ে—অমিতা চক্রবর্তী।

নার্স—দেবলা মজুমদার।

মেঘে ঢাকা তারায় নার্সের ভূমিকায় দেবলা মজুমদার

সাধারণ বাঙালি পরিবারের মর্মবেদনা যে সমাজের ভিত্তিটাকেই কাঁপিয়ে তুলেছে তাকে কেন্দ্র করেই লেখা এই 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি।

কলকাতার শহরতলীতে ছিন্নমূল একটি উদ্বাস্তু পরিবারের বাস। বাড়ির কর্তা মাধব মাষ্টার দুঃখের ভারে নুইয়ে পড়েছে। শেষ জীবনের হিসাব নিকাশের খাতায় শূন্য। গড়ে-ওঠা নতুন সমাজের প্রতি তার আশা ছিল অনেক। কিন্তু দিন যতই যায় সবই যেন কি রকম গুলিয়ে যায়। কি একটা অব্যক্ত বেদনা গুমরে ওঠে মনের মাঝে। টাকা নেই, পয়সা নেই, বাড়িতে স্ত্রীর নিত্য গঞ্জনা—অবসর প্রাপ্ত মাধব মাষ্টার তার পাড়ায় পাড়ায় টিউশনি করে বেড়ায় আর—আর তবু মনের কোন একটি আশা সযত্নে পোষণ করে রাখে—দিন আসবে। অভাব আর থাকবে না।

এদিকে বড় মেয়ে নীতা স্কুল মাষ্টারী আর টিউশনি করে সংসারটাকে নতুন করে গড়ে তোলার চেষ্টায় রত। নিত্য অভাবের এই সংসারে একটুখানি হাসি ফোটাবার চেষ্টার অন্ত নেই তার। নিজের খরচ বাঁচিয়ে বেকার বড় ভাই এবং ছোট ভাই ও বোনের বায়না মিটিয়ে দেয়। এর মধ্যে শিক্ষিত যুবক সনতের সঙ্গে যোগাযোগ হয় নীতার। একটি রঙিন আশাকে সফল করে তুলতে মনের কোণে সে সনৎ কে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সনৎ কে আগে বড় হতে হবে, ডিগ্রী পেতে হবে—নীতার এই একমাত্র কামনা। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। রিসার্চ ছেড়ে সনৎ চাকরী নেয়। ইতিমধ্যে নীতার মা কাদম্বিনী নীতাকে নয়, গীতাকেই ভিড়িয়ে দেয় সনতের মনোপকূলে কারণ সংসারের জন্য নীতার প্রয়োজন আছে। যথাসময়ে সনৎ ও গীতার বিয়েও হয়। এ আঘাত নীতার পক্ষে মর্মান্তিক, তবু একে ভুলতে সে মা, বাবা এবং দুর্ঘটনায় আহত ছোট ভাইয়ের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু মনেরই অজান্তে সনৎ কে হারানোর অব্যক্ত বেদনা তাকে পীড়া দেয়। আর অতিরিক্ত পরিশ্রম ও মানসিক চিন্তার ফলে দুর্বিসহ ক্ষয়রোগের কবলে পড়ে শয্যাশায়ী

হয়। নতুন-পাওয়া অর্থের কারণে বড় ভাই শঙ্কর ছাড়া সবাই নীতার কাছ থেকে সরে পড়ে দূরে। সনৎ এসে ভুল স্বীকার করে— যাহা চাই, ভুল করে চাই। আর শেষ মুহূর্তে শঙ্করের কোলে ঢলে পড়ে নীতা, বলে যায়— ভাল ভাবে একটু বাঁচতে চেয়েছিলাম দাদা। দাদা, আমি বাঁচতে চাই। কিন্তু উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় একটি জীবন কালের কালোমেঘে ঢাকা পড়ে গেল।

লোকশিল্পী সংসদের
পরিবেশিত নাটকের দৃশ্য

উপরোক্ত কাহিনীর অভিনয় দুরূহ সত্য। তা সত্ত্বেও সেদিনকার স্থানীয় পত্রিকায় অভিনয় সম্পর্কে লিখেছিল— সু-অভিনয়ের জন্য প্রথমেই যাঁদের নাম উল্লেখ করতে হয় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— পরিচালিকা-অভিনেত্রী বিজিতা গাঙ্গুলী; সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি মেয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব তিনি অতি নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। বিশেষত শেষ দৃশ্যে তাঁর অভিনয় অপূর্ব। কিন্তু মাঝে মাঝে অতিরিক্ত উচ্ছ্বাস ও উচ্চারণ-জড়তা নায়িকার এই মুখ্য চরিত্রের অভিনয়কে ব্যাহত করে দিয়েছে। তারপর উল্লেখ করতে হয় মাধব মাষ্টারের বড় ছেলে শঙ্করের ভূমিকায় শক্তি হালদারের প্রাণবন্ত অভিনয়। একদিকে আত্মভোলা সঙ্গীত শিল্পী ও অন্যদিকে ছোটবোনের প্রতি স্নেহের টান, তিনি কথায় ভাবে ভঙ্গীতে আশ্চর্য কুশলতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন বিখ্যাত সমালোচকের মতে—অভিনেতা যখন নিজেকে অভিনেতা মনে না করেন—তখনই সু-অভিনয়ের সৃষ্টি হয়। সুখের কথা শক্তি হালদারের অভিনয়ে এর যথার্থতা খুঁজে পেয়েছি।

মাধব মাষ্টারের ভূমিকায় ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার আমাদের হতাশ করেছেন, এই কঠিন চরিত্রটিতে মাঝে মাঝে আবেগ, আশা ও নিরাশার সুষ্ঠু রূপায়ণ ঘটে উঠতে পারেনি। অবশ্য এর জন্য পরিচালকও অনেকাংশে দায়ী।

উচ্চশিক্ষিত যুবক সনতের ভূমিকায় সন্তোষ গাঙ্গুলীর অভিনয় মানানসই। মাধব মাষ্টারের ছোট মেয়ে গীতার ভূমিকায় অমিতা চক্রবর্তী সাফল্য অর্জন করেছেন। আধুনিক স্টাইলের প্রতি তৃষ্ণা ও প্রতিহিংসাপরায়ণতা তার ভূমিকায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। কলোনীর যুবকরূপী মধুর ভূমিকায় রঞ্জিত ভৌমিকের সু-অভিনয় আমাদের বহুদিন মনে থাকবে। মেসের ম্যানেজারের ভূমিকায় মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যর ভূমিকা মোটামুটি ভালই বলা যায়। মাধব মাষ্টারের স্ত্রী কাদম্বিনীর ভূমিকায় বকুল বড়ুয়া অভিনয়ের প্রথমাংশ প্রাণহীন ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ। অন্যান্যদের অভিনয় সাধারণ স্তরের।

মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাত গতানুগতিক। আবহসঙ্গীত অতি উচ্চাঙ্গের। বস্তুতঃপক্ষে আবহসঙ্গীতই ছিল নাটকটির প্রাণ। বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলতে যন্ত্রসঙ্গীত প্রভূত সহায়তা করেছে। দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও লোকশিল্পী সংসদের এই উদ্যমকে আমরা অভিনন্দন জানাই। (তথ্যসূত্র 'গণরাজ' ৮ই জুলাই ১৯৬৪ ইং)

এরপর ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে প্রথম নিখিল ত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতা উপলক্ষে লোকশিল্পী সংসদ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেশাত্মবোধক একাঙ্ক নাটক 'গেটম্যান' ১৮ই জুন তারিখে মঞ্চস্থ করে।

নাটকটি পরিচালনায় ছিলেন— শক্তি হালদার। ব্যবস্থাপনায়— ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার ও বিশু সেন। রূপসজ্জায়— হরেন্দ্র হালদার। আবহসঙ্গীত পরিচালনায়— সুপ্রকাশ বড়ুয়া। যন্ত্রসঙ্গীতে— গোপাল রায়, মতিলাল দেবনাথ, বিপুল সেন। কণ্ঠসঙ্গীতে— দেবদাস গাঙ্গুলী। আলোকসম্পাতে— হরিপদ দাস ও নরেশ পোদ্দার। মঞ্চাধ্যক্ষ— কুমুদরঞ্জন চক্রবর্তী।

গেটম্যানের কাহিনীটি ছিল ঃ লম্বা রেল লাইনের উপর দিয়ে আড়াআড়িভাবে একের পর এক পার হয়ে গেছে যানবাহন আর লোক চলাচলের রাস্তা। রেলের দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য এইসব লেবেল ক্রসিং বা সংযোগস্থলগুলিতে লাইনের দুই পাশে দু'টি গেট বসানো থাকে আর এই গেট বা ফটক খোলা বন্ধের ভার থাকে একজন করে গেটম্যানের উপর। বিপত্নিক বৃদ্ধ গুপী রেল কোম্পানীর এমনিই এক পুরানো অতি বিশ্বস্ত কর্তব্যপরায়ণ কর্মী। এই গেটের কাছে গুমটিতে তার বাস। বুড়ি পিসি ও সদ্য যুবক ছেলে হারাধনকে নিয়ে তার সংসার। আর দু'টো লাল-সবুজ ঝাণ্ডা, একটা লাল-সবুজ বাতি এবং মস্ত দু'খানা গেট নিয়ে তার জীবন। নিরক্ষর গেটম্যান গুপীচরণের সুখ-দুঃখ ও তার আশা আনন্দ কর্তব্য নিয়ে এ কাহিনী।

সমাজবিরোধী কার্যকলাপে নিযুক্ত কয়েকজন যুবক হারাধনকে টাকার লোভ দেখিয়ে রেল লাইনের ফিস প্লেট সরিয়ে রাখে ট্রেনকে লাইনচ্যুত করে ক্যাশ-ভ্যান লুট করার উদ্দেশ্যে। হুঁসিয়ার গুপীচরণ এই মারাত্মক অপকর্ম শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলে। নিজের জীবন বিপন্ন করেও সে ট্রেন থামাতে যায়। পিতার কর্তব্য পালনে বাধা দিতে যায় পুত্র। পিতা-পুত্রে সংঘর্ষ বাধে এবং সেই উত্তেজনার মুহূর্তে আহত পুত্রের মৃত্যুতে নাটকের পরিসমাপ্তি। এ হত্যা নয়, অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা।

নিজের জীবন বিপন্ন করে এবং একমাত্র সন্তান-'হারা'কে হারিয়েও সহস্র দেশবাসীর প্রাণরক্ষা করে কর্তব্যনিষ্ঠার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেয় দরিদ্র নগণ্য গেটম্যান গুপীচরণ।

এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন—

গুপীচরণ -রেলের বৃদ্ধ গেটম্যান—অজিত মজুমদার।

হারাধন—গুপীচরণের পুত্র—গোপাল দেব।

চরণ ঘোষ—গ্রাম্যবৃদ্ধ—মতিলাল দেবনাথ।

তিনকড়ি—গ্রামবাসী—সত্যেন্দ্র লস্কর।

তরুণ—সমাজবিরোধী—রূপেন চক্রবর্তী।

কুনাল—সমাজবিরোধী—সুধাংশু লস্কর।

পাগলা—ছদ্মবেশী বিশু—শক্তি হালদার।

বুধন—রেলের ঠেলাওয়ালা—হারাধন দত্ত।

ডাক্তার—গ্রামের চিকিৎসক—নয়নরঞ্জন মজুমদার।

অফিসার—রেলপুলিশ—ভানু পোদ্দার।

ইঞ্জিনকর্মী—চন্দন বিশ্বাস।

পিসিমা (গুপীর)—ঊষা চক্রবর্তী।

লোকশিল্পী সংসদের অভিনীত শেষ নাটক হোল এই গেটম্যান। এরপর লোকশিল্পী সংসদের কিছু সংখ্যক সদস্য বিভিন্ন চাকুরী ক্ষেত্রে অন্যত্র চলে যান। তাতে স্বাভাবিকভাবেই সংসদ ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। সে-সময় কিছু সংখ্যক সদস্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে যখন নতুন করে সংসদকে গড়ে তুলতে পারেন না তখন তাঁরা নবভাবে '**রূপারোপ**' নামে আর একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। সে ইতিহাস অন্য।

এখন প্রশ্ন হোল, উপরোক্ত লোকশিল্পী সংসদের ইতিহাস থেকে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের কতটুকু চিত্র আমরা পাই? তার আবেদনই বা কি? একটু পিছন ফিরে যেতে হয়।

পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুরার একটি নাটকের দৃশ্য

দেশ স্বাধীন হবার পর সেই চল্লিশের দশকে ত্রিপুরায় যে কয়জন নাট্যব্যক্তিত্ব দেখা গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সুধাংশুমোহন দত্ত, ত্রিপুরেশ মজুমদার, শক্তি হালদার, শিবদাস ব্যানার্জী। এদেরকে নাটক-পাগল বললেও ভুল বলা হবে না। ত্রিপুর শিল্পায়তন, শিল্পায়ন এবং লোকশিল্পী সংসদ যথাক্রমে মজুমদার, হালদার ও ব্যানার্জী এই তিন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হত সে কথা প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বলেছি।

ত্রিপুর শিল্পায়তন এবং শিল্পায়নে ছিল বিশেষ করে পরিচালন ক্ষেত্রে প্রবীণদের প্রাধান্য কিন্তু লোকশিল্পী সংসদ ছিল একেবারেই টগবগে তাজা যুবকদের দ্বারা পরিচালিত একটি সংস্থা। সুতরাং এক হিসাবে বলতে গেলে লোকশিল্পী সংসদকে প্রতিষ্ঠিত হতে হয়েছিল তাঁদের অভিনয়ে নিষ্ঠা, কর্মকুশলতা, নাট্যানুশীলন এবং সর্বোপরি সম্মিলিত নাট্য-চেতনার দ্বারা। সেটা সম্ভব হওয়ার পেছনে দ্বিতীয় কারণ হিসাবে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলা যায় সে সময় 'টিম ওয়ার্ক' লোকশিল্পী সংসদে যা দেখা গেছে, অধিকাংশ নাট্যসংস্থায় তা পাওয়া যায়নি। পরিচালক শক্তি হালদার এবং নরেশ পোদ্দার নাটকের প্রতিটি বিভাগে প্রতিটি কর্মে ছিলেন পারদর্শী। লোকশিল্পী সংসদের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সে সময় এই সংস্থায় ছিলেন রূপসজ্জায় রবি ভট্টাচার্য এবং হরেন্দ্র হালদার এবং মঞ্চ পরিকল্পনায় অমরেশ দত্ত। প্রখ্যাত নাট্যসমালোচক অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য ছিলেন লোকশিল্পী সংসদের সর্বসময়ের পরামর্শদাতা। রাজ পরিবারের প্রসিদ্ধ শিল্পী সেতার ও এস্রাজ বাদক মহারাজকুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা এবং বিপিনবিহারী দেববর্মার ন্যায় উচ্চাঙ্গ যন্ত্রশিল্পী সেদিন সংসদের প্রতিটি নাট্যনুষ্ঠানে আবহ সঙ্গীত পরিচালনা করতেন। পরবর্তী সময়ে হরিপদ দাসের মত প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী আলোক ব্যবস্থা পরিচালনা করে নাটককে আরো প্রাণবন্ত করেছেন। কৌতুক অভিনয়ে নীলু গাঙ্গুলী, রসময় রাউত, সুশীল চৌধুরী, রঞ্জিত ভৌমিক, বেণুধর গোস্বামী নাটককে সমৃদ্ধ করেছেন। সঙ্গীত-রচনা এবং সুরারোপে দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায় এবং ওস্তাদ রবি নাগ তাঁদের সুরের মাধুরী মিশিয়ে নাটককে আরো প্রাণবন্ত করেছেন। কণ্ঠ সঙ্গীতে আশা নাগ, স্মৃতি গুপ্তা, সুপ্রকাশ বড়ুয়া, দেবদাস গাঙ্গুলী নাটকের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। অভিনেত্রী শিল্পীদের মধ্যে লীলা দেব, মায়া দেব, যূথিকা গুপ্তা, স্নিগ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, সতী দাশগুপ্তা— এঁদের ভালবাসা, নিষ্ঠা নাটকের গতিকে অব্যহত রেখেছে। ত্রিপুরার প্রবীন অভিনেতা শিল্পী সুধাংশুমোহন দত্ত তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি উজাড় করে সংসদের নাটকগুলির মান উন্নত করেছেন। ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার এবং সরকারী কবিরাজ মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, টিসি এস নরেশচন্দ্র সাহার মত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সংসদে শিল্পী হিসাবে যোগদান করে সংস্থার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। সর্বোপরি এই সংস্থার সভাপতি হিসাবে সর্বসময়ে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বজনশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য যিনি আগে মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। সেই সময় এই সংসদ ছিল ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের দ্বারা স্বীকৃত একমাত্র সাংস্কৃতিক সংস্থা।

তাই সে সময় দেখা গেছে লোকশিল্পী সংসদ নাটক অভিনয় করছে একথা জানার সঙ্গে

সঙ্গে প্রেক্ষাগৃহে দর্শক উপচে পড়ত এবং সেদিন এটাও লক্ষ্য করেছি অভিনয় চলাকালীন হলে দর্শক কখন কোনরকম গোলমাল করেনি। নাটক চলেছে নিঃশব্দে দ্রুত গতি নিয়ে। নাটক হয়েছে ডোনেশন এবং টিকিট বিক্রি করে।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে সেই পঞ্চাশের দশকের নাট্যসংস্থা লোকশিল্পী সংসদ আজ নতুন প্রজন্ম নব্বুই দশকের নাট্যামোদীদের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। আজকাল যারা নাট্য সমালোচনা বা নাটকের ইতিহাস লেখেন তাঁদের লেখায়, তাঁরা লোকশিল্পী সংসদ বা ত্রিপুর শিল্পায়তন বা শিল্পায়ন-এর নাম কদাচ উল্লেখ করেন। এটা এ যুগের লেখকদের জেনে না জানার ভান করে ইচ্ছাকৃত ত্রুটি, না, সত্য-সত্যই সে যুগের ইতিহাস জানেন না? যদি তাই হয়ে থাকে তবে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যই আমাদের এ লেখা। কারণ এ কথা ভুললে চলবে না যে, সেদিনের যে অল্পসংখ্যক উপরিল্লিখিত নাট্যসংস্থা ত্রিপুরার নাটকের ধারাকে বহমান রেখেছিল, সেই বহমান ধারার উত্তরসূরী আজকের নাট্য সংগঠনগুলি। অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমান চলতে পারে না। সুতরাং সেদিক থেকে বর্তমান নাট্যগোষ্ঠীর সজাগ থাকতে হবে। অতীতকে বাদ দিয়ে বর্তমানের ইতিহাস রচিত হয় না। তাতে ইতিহাসকে অবমাননা করা হয়—মনে রাখা উচিত ইতিহাস কাউকে ক্ষমা করেনা। সে তার আপন গতিতে চলে। সুতরাং লোকশিল্পী সংসদ বেঁচে থাকবে এবং ত্রিপুরার নাট্য ইতিহাসে তার স্বাক্ষর মুছে যাবে না।

এ লেখা শেষ করার পূর্বে এখানে বলে রাখা ভাল যে সে দিনের লোক শিল্পী সংসদে শুধুমাত্র নাটক অভিনীত হত না। এ সংসদে 'সাহিত্য ও সঙ্গীত' বিভাগও ছিল। এ লেখায় শুধু নাটকের দিক তুলে ধরা হোল। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য এবং সঙ্গীতে সংসদের অবদানের কথা লেখার ইচ্ছা রাখি।

পরিশিষ্ট—১

লোকশিল্পী সংসদের কার্যকরী সমিতি, ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/সভাপতি
অধ্যাপক পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য / সহ-সভাপতি
শ্রী কেশব ভট্টাচার্য/সাধারণ সম্পাদক
শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/সদস্য
শ্রী শক্তি হালদার/সদস্য
শ্রী লীলা দেব/সদস্যা
শ্রী মতী আশা নাগ/সদস্যা
শ্রী মতী স্মৃতি গুপ্তা/সদস্যা
শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/সদস্য
শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য/সদস্য
শ্রী নরেশ পোদ্দার/সদস্য
শ্রী রসময় রাউত/সদস্য
শ্রী দেবেন্দ্র কুমার ভৌমিক/সদস্য

১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ

লোকশিল্পী সংসদের কার্যকরী সমিতি

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/সভাপতি
ডঃ হীরালাল রায়/সহ-সভাপতি
অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভাদুড়ী/সহ-সভাপতি
শ্রী খগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদক 'রুদ্রবীণা')/সাধারণ সম্পাদক
শ্রী শক্তি হালদার/সহ-সম্পাদক (সংগঠন)
শ্রী নরেশচন্দ্র পোদ্দার/সম্পাদক (কার্যালয়)
শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/সম্পাদক (প্রচাব)
শ্রী অমরেশ দত্ত/কোষাধ্যক্ষ
শ্রী শিশু সেন/সঞ্চালক (নাট্যবিভাগ)
শ্রী সুশীল চৌধুরী/সহ-সঞ্চালক
শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/সঞ্চালক (সাহিত্যচক্র)
শ্রীমতী লীলা দেব/সহ-সঞ্চালক (সাহিত্য চক্র)
শ্রী দেবদাস গাঙ্গুলী/সঞ্চালক (সঙ্গীত বিভাগ)
শ্রীমতী স্মৃতি গুপ্তা/সহ-সঞ্চালক
শ্রীমতী পারুল হালদার/সঞ্চালক (মহিলা বিভাগ)

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ

লোকশিল্পী সংসদের কার্যকরী সমিতি

ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার/সভাপতি

শ্রী অনাথবন্ধু ঘোষ/সহ-সভাপতি

শ্রী পরেশচন্দ্র ভাদুড়ী/সাধারণ সম্পাদক

শ্রী নরেশচন্দ্র পোদ্দার/সহ-সম্পাদক (কার্যালয়)

শ্রী শক্তি হালদার/সহ-সম্পাদক (সংগঠন)

শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/প্রচার সম্পাদক

শ্রী অমরেশ দত্ত/কোষাধ্যক্ষ

শ্রী শিশু সেন/সঞ্চালক নাট্য শাখা

শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/সঞ্চালক সাহিত্য চক্র

শ্রী দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়/সঞ্চালক, সঙ্গীত শাখা

শ্রী সুধীন দে/সদস্য

শ্রীমতী যূথিকা গুপ্তা/সদস্যা

শ্রী অজিতকুমার ভট্টাচার্য/সদস্য

লোকশিল্পী সংসদের কার্যকরী সমিতি, ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ

শ্রী নয়নরঞ্জন মজুমদার/সভাপতি

শ্রী অনাথবন্ধু ঘোষ/সহ-সভাপতি

শ্রী পরেশ ভাদুড়ী/সহ-সভাপতি

শ্রী অজিতকুমার ভট্টাচার্য/সাধারণ সম্পাদক

শ্রী অমরেশ দত্ত/সহ-সম্পাদক, কার্যালয়

শ্রী শিশু সেন /সহ-সম্পাদক (সংগঠন) এবং নাট্য সঞ্চালক

শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/প্রচার সম্পাদক

শ্রী শক্তি হালদার/কোষাধ্যক্ষ

শ্রী নরেশ পোদ্দার/সাহিত্য সঞ্চালক

শ্রী দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়/সঙ্গীত সঞ্চালক

শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/সদস্য

শ্রী ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী/সদস্য

শ্রী রঞ্জিত ভৌমিক/সদস্য

১৯৬১ খৃষ্টাব্দ
লোকশিল্পী সংসদ কার্যকরী সমিতি

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/সভাপতি
শ্রী নরেশচন্দ্র সাহা টি.সি.এস/সহ-সভাপতি
কবিরাজ মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য-এম এ এস এফ /সাধারণ সম্পাদক
শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/প্রচার সম্পাদক
শ্রী নরেশচন্দ্র পোদ্দার/কার্যালয় সম্পাদক
শ্রী শক্তি হালদার/কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক রণেন্দ্রনাথ দেব/সদস্য
ক্যাপ্টেন ডাঃ হীরালাল রায়/সদস্য
শ্রীমতী লীলা দেব/সদস্যা
শ্রীমতী আশা নাগ/সদস্যা
শ্রীমতী স্মৃতি গুপ্তা/সদস্যা
শ্রী দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক/সঞ্চালক, সাহিত্য চক্র
শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/সঞ্চালক, সাহিত্য চক্র

১৯৬২ খৃষ্টাব্দ
লোকশিল্পী সংসদ কার্যকরী সমিতি

অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/সভাপতি
শ্রী নরেশচন্দ্র সাহা/সহ-সভাপতি
শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য/সাধারণ সম্পাদক
শ্রী অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য/প্রচার সম্পাদক
শ্রী নরেশচন্দ্র পোদ্দার/কার্যালয় সম্পাদক
শ্রী শক্তি হালদার/কোষাধ্যক্ষ
অধ্যাপক রণেন্দ্রনাথ দেব/সদস্য
ক্যাঃ ডাঃ হীরালাল রায়/সদস্য
শ্রী দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক/সঞ্চালক, সাহিত্য চক্র
শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত/সঞ্চালক, সাহিত্য চক্র
শ্রীমতী আশা নাগ/সদস্যা
শ্রীমতী লীলা দেব/সদস্যা
শ্রীমতী স্মৃতি গুপ্তা/সদস্যা

১৯৬৩ খৃষ্টাব্দ
লোকশিল্পী সংসদ কার্যকরী সমিতি

ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার/সভাপতি

শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য/সাধারণ সম্পাদক

শ্রী দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক/সদস্য

শ্রী সুপ্রকাশ বড়ুয়া/সদস্য

শ্রী সুশীল চৌধুরী/সদস্য

শ্রীমতী লীলা দেব/সদস্যা

শ্রীমতী দেবলা মজুমদার/সদস্যা

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দ
লোকশিল্পী সংসদ কার্যকরী সমিতি

ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার/সভাপতি

শ্রী রবীন মজুমদার/সহ-সভাপতি

শ্রী মণীন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য/সাধারণ সম্পাদক

শ্রী দেবেন্দ্র ভৌমিক/সঞ্চালক, সাহিত্য বিভাগ

শ্রী সুপ্রকাশ বড়ুয়া/সঞ্চালক, সঙ্গীত বিভাগ

শ্রী সুশীল চৌধুরী/সঞ্চালক, নাট্য শাখা

শ্রী সন্তোষ গাঙ্গুলী/সদস্য

শ্রী কেশব ভট্টাচার্য/সদস্য

শ্রীমতী বিজিতা গাঙ্গুলী/কোষাধ্যক্ষ

শ্রীমতী লীলা দেব/সদস্যা

শ্রীমতী দেবলা মজুমদার/সদস্যা

পরিশিষ্ট—২

লোকশিল্পী সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান

১৯৫৬ খ্রিঃ ২০ শে মে কবিগুরুর জন্মদিনে 'কবিপক্ষ' উদ্‌যাপিত। সভাপতি— শ্রী নিবারণচন্দ্র ঘোষ, এডভোকেট। নৃত্য, গীত, আবৃত্তি ও স্বরচিত কবিতা পাঠ।

১৯৫৬ খ্রিঃ ১৫ই অক্টোবর বিজয়া সম্মিলনী।

সভাপতি— অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

বক্তৃতা— অধ্যাপক পরেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। আবৃত্তি— অঞ্জু চৌধুরী, মৈত্রী চক্রবর্তী, ত্রিপুরেশ মজুমদার। সেতারবাদন— আশা নাগ। নৃত্য— কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্বরচিত কবিতা পাঠ— অশ্বিনী আঢ্য, শক্তি হালদার, রমাপ্রসাদ দত্ত, বিমল চৌধুরী। রবীন্দ্রসঙ্গীত— আশা নাগ, নিভারাণী সিংহ, ব্রজগোপাল সিংহ। ভজন— রাণী রায়। বাঁশী ও বেহালা— অরবিন্দ দেব। ভাটিয়ালী—আভা পাল।

১৯৫৭ খ্রিঃ ৮ই মে

সারাদিন ব্যাপী রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান

সঙ্গীত—গগনে গগনে ধায় হাঁকি— ব্রজগোপাল সিংহ।

বাঁশি— অরবিন্দ দেব।

প্রবন্ধ পাঠ—রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা সমস্যা— দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক।

সঙ্গীত -ওরে আমার হৃদয় তোমার— নিভারাণী সিংহ।

সঙ্গীত—অরূপ তোমার বাণী— আশা নাগ।

আবৃত্তি—'দুঃসময়'— দীপক ভৌমিক।

সঙ্গীত—'তুমি কেমন করে'— আশা নাগ

সেতার— পুষ্পরাণী সেন।

প্রবন্ধ পাঠ—জীবনস্মৃতি থেকে— শক্তি হালদার।

সঙ্গীত—'অগ্নিশিখা এসো এসো'— গীতশ্রী রায়।

আবৃত্তি—'শঙ্খ'— দেবেন্দ্রকুমার ভৌমিক।

রবীন্দ্র রচনা পাঠ— রমাপ্রসাদ দত্ত।

সঙ্গীত—'হৃদয় মন্দ্রিল'— ব্রজগোপাল সিংহ।

এস্রাজ— আশা নাগ।

আবৃত্তি—'প্রণাম'— স্বপন মজুমদার।

সঙ্গীত—'ফিরে চল মাটির টানে'— সুপ্রকাশ বড়ুয়া।

আবৃত্তি—'সবলা'— গীতশ্রী রায়।

সঙ্গীত— স্মৃতি গুপ্তা।

সেতার— আশা নাগ।

বেহালা— অরবিন্দ দেব।

রবীন্দ্র রচনা পাঠ— নরেশ পোদ্দার।

স্বরচিত কবিতা পাঠ— রমাপ্রসাদ দত্ত।

সঙ্গীত—'মধ্য দিনে যবে গান'— আশা নাগ।

প্রবন্ধ—'বিদেশীর চোখে রবীন্দ্রনাথ'— অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।

সঙ্গীত—'অমল আলোর কমলখানি'— ব্রজগোপাল সিংহ।

এস্রাজ— জয়ন্ত দেবনাথ।

প্রথম অধিবেশন সকাল ৭টা থেকে ১২টা
দ্বিতীয় অধিবেশন বিকাল ২টা থেকে বেলা ৫টা

এস্রাজ— অরবিন্দ দেব।

সঙ্গীত—'দারুণ অগ্নিবাণে'— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।

কথোপকথন—'কর্ণকুন্তী সংবাদ'— স্মৃতি গুপ্তা ও তপন ভট্টাচার্য।

কথোপকথন—'গান্ধারীর আবেদন'— স্মৃতি গুপ্তা ও দেবেন্দ্র ভৌমিক।

আবৃত্তি—'প্রতিনিধি'— স্বপন মজুমদার।

সঙ্গীত—'পাছে সুর ভুলি'— গীতশ্রী রায়।

কথোপকথন—'বিদায় অভিশাপ'— গীতশ্রী রায় ও শক্তি হালদার।

তবলা লহরা— হরেন্দ্র হালদার।

রবীন্দ্র রচনা পাঠ— নরেশ পোদ্দার।

শ্রুতিনাটক প্রযোজনা—'লোকশিল্পী সংসদ'— শক্তি হালদার, লীলা দেব, দেবেন্দ্র ভৌমিক, মণীন্দ্র ভট্টাচার্য, নরেশ পোদ্দার, দীপক ভৌমিক, সুশীল চৌধুরী, বিমান মুখার্জী।

বাউল সঙ্গীত— খায়েরুজ্জমান।

তৃতীয় অধিবেশন সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত

উদ্বোধনী ভাষণ— অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

উদ্বোধনী সঙ্গীত—'মহামানব আসে ঐ'— ব্রজগোপাল সিংহ।

প্রধান অতিথি শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়ের ভাষণ।

ঋতু সঙ্গীত

১। 'বৈশাখ হে মৌনী তাপস'— ব্রজগোপাল সিংহ।
২। 'বহুযুগের ওপার হতে'— গীতশ্রী রায়।
৩। 'শরতে আজ'— নিভারাণী সিংহ।
৪। 'হিমের রাতের ঐ গগনের'— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।
৫। 'শীতের হাওয়ার লাগল নাচন— ব্রজগোপাল সিংহ এবং স্মৃতি গুপ্তা।
৬। 'ঝরা পাতাগো'— রাণী রায়।
সঙ্গীত— রবি নাগ ও স্মৃতি গুপ্তা।
আবৃত্তি—'বলাকা'— দেবেন্দ্র ভৌমিক।
আবৃত্তি—'ছেলেটা'— শক্তি হালদার।
এস্রাজ— মহারাজকুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা।
প্রবন্ধ পাঠ— রমাপ্রসাদ দত্ত।

সমবেত যন্ত্র সঙ্গীত

এস্রাজ— মহারাজ কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা।
বেহালা— ধীরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।
মেণ্ডেলিন— মহারাজকুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা।
বাঁশী— নির্মল দেববর্মা।
আবৃত্তি—'দেবতার গ্রাস'— নরেশচন্দ্র সাহা।
আবৃত্তি—'ভারত তীর্থ'— গীতা সেন।
সেতার— পুষ্প সেন।
সভাপতির ভাষণ— নিবারণচন্দ্র ঘোষ।
সমাপ্তি সঙ্গীত—'তব বিচিত্র আনন্দ'— ব্রজগোপাল সিংহ।

১৬ই জুন ১৯৫৭— মেঘদূত উৎসব

সভাপতি— অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
উদ্বোধন সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।
মেঘদূত সম্পর্কে ভাষণ— নিবারণচন্দ্র ঘোষ, এড্‌ভোকেট।
আবৃত্তি— শক্তি হালদার, দেবেন্দ্র ভৌমিক, স্বপন মজুমদার।
সঙ্গীত— আমিনুল ইসলাম, রবি নাগ, সন্তোষ গাঙ্গুলী, নিভারাণী সিংহ ও ব্রজগোপাল সিংহ।

আলোচনা— পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

১৯৫৭ খ্রিঃ ১০ই আগষ্ট— এই তারিখে লোকশিল্পী সংসদ অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ হতে অনুমোদন লাভ করেছিল।

১৯৫৭ খ্রিঃ ৭ই অক্টোবর বিজয়া প্রীতি সম্মিলনী

সভাপতি— অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।
প্রধান অতিথি— অধ্যাপক নীলমাধব সেন।
উদ্বোধনী সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।
আবৃত্তি— স্বপন মজুমদার, শক্তি হালদার।
সঙ্গীত— আমিনুল ইসলাম, বীণা গুপ্তা, স্মৃতি গুপ্তা, ননীগোপাল চ্যাটার্জী, কালু ভট্টাচার্য, দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, চিদানন্দ গোস্বামী, মদন গোস্বামী, হীরেন দেববর্মা।
এস্রাজ— আশা নাগ।
কবিতাপাঠ— নরেশচন্দ্র সাহা, মিহির দেববর্মা, চিদানন্দ গোস্বামী।
সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

১৯৫৯ খ্রিঃ ৫ই এপ্রিল মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী শেফালী সেন মহাশয়ার বিদায় সম্বর্ধনা।

উদ্বোধন সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।
মানপত্র পাঠ ও অর্পণ— শক্তি হালদার।
সঙ্গীত— দেবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬০ খ্রিঃ ১১ই অক্টোবর বিজয়ার প্রীতিসম্মিলনী

সভাপতি— অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
বক্তৃতা— অপরাজিতা রায়।
সঙ্গীত— সঙ্গীতভারতী ও তাব ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত— ওস্তাদ রবি নাগ।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দ ৩১ শে মে সিনেমা জগতের কিম্বদন্তী সুশীল মজুমদারের সম্বর্ধনা

সভাপতি— অনাথবন্ধু ঘোষ।

১৯৬০ খৃষ্টাব্দ ৮ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী

সভাপতি— অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৯৫৯ খ্রিঃ ৯ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী

সভাপতি ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর।
প্রধান অতিথি— সত্যরঞ্জন বসু।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ ২৫ শে এপ্রিল নববর্ষ উৎসব

সভাপতি— সত্যরঞ্জন বসু।
প্রধান অতিথি— জেলা জজ— শৈলেশ চন্দ্র তালুকদার।
বক্তা— মৃণাল চক্রবর্তী।
সঙ্গীত—শান্তিনিকেতনের রেখা বসু।
রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা— সঙ্গীতভারতীর ছাত্রছাত্রীগণ।

১৯৫৯ খ্রিঃ ২৮ শে জুলাই— পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক ডিরেক্টর বড়ঠাকুরকে সম্বর্ধনা

১৯৫৯ খ্রিঃ ২৮ শে মে নজরুল জয়ন্তী

সভাপতি— পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।
বক্তা— অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য।
আবৃত্তি— দীপা সেন, শক্তি দত্তরায়, সবিতা সিংহ, হাসান জান, সুদর্শন মুখার্জী।
স্বরচিত কবিতাপাঠ— ঊষারঞ্জন দেববর্মা।
সঙ্গীত— দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়, হিরণ মিএগ, ব্রজগোপাল সিংহ, নিভারাণী সিংহ.।

১৯৬০ খ্রিঃ ২৬ শে মে নজরুল জয়ন্তী

সভাপতি— মৃণালকান্তি চক্রবর্তী।

লোকশিল্পী সংসদ
পরিশিষ্ট-৩
সাহিত্যচক্রের উদ্বোধন
১ম অধিবেশন ।। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ, ২৬ শে ফেব্রুয়ারি

সভাপতি— অধ্যাপক নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

প্রধান অতিথি— অধ্যাপক রণেন দেব।

উদ্বোধন সঙ্গীত— 'আমাদেব যাত্রা হোল শুরু'— ব্রজগোপাল সিংহ এবং নিভাবাণী সিংহ।

(স্বরচিত) গল্পপাঠ— সুখময ঘোষ।

(স্বরচিত) কবিতা— চিদানন্দ গোস্বামী।

সংগৃহীত প্রবন্ধ পাঠ— অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য।

আবৃত্তি—'ফাঁকি'— দেবেন্দ্রকুমাব ভৌমিক।

বাংলা সাহিত্য বিষযক আলোচনা— পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, এড্‌ভোকেট নিবাবণ চন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল।

(স্বরচিত) ছোট গল্প পাঠ— সুবিমল বায।

সভাপতিব ভাষণ।

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।

১৯৫৭ খ্রিঃ ১৪ই এপ্রিল নববর্ষ অনুষ্ঠান

সভাপতি— অধ্যাপক নবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য।

প্রধান অতিথি— অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল।

উদ্বোধন সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।

নৃত্য— চন্দনা গুপ্তা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত— গীতশ্রী রায়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত— নিভারাণী সিংহ।

ভজন— রাণী বায়।

আবৃত্তি—'বৈশাখ'— স্বপন মজুমদার।

আধুনিক— আভা পাল।

বেহালা— অরবিন্দশেখর দেব।

সেতার— আশা নাগ।

নৃত্য— চন্দনা গুপ্তা।

সঙ্গীত— সুপ্রকাশ বড়ুয়া।

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

সাহিত্য চক্রের তৃতীয় অধিবেশন ২৮ শে এপ্রিল ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

সভাপতি— পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা।

প্রধান অতিথি— অধ্যক্ষ শান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

উদ্বোধন সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।

প্রধান অতিথির ভাষণ— বিষয় : প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পটভূমিকায় বুনিয়াদী শিক্ষার ভবিষ্যৎ।

কণ্ঠ সঙ্গীত— সুপ্রকাশ বড়ুয়া।

সভাপতির ভাষণ।

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

সাহিত্য চক্রের ৪র্থ অধিবেশন

নজরুল জয়ন্তী (২৫ শে মে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ)

উদ্বোধন সঙ্গীত— আভা পাল।

আবৃত্তি— দীপক ভৌমিক, গীতশ্রী রায়, শক্তি হালদার, দেবেন্দ্র ভৌমিক, তপন ভট্টাচার্য।

সঙ্গীত— নিভারাণী সিংহ, গীতশ্রী রায়।

সভাপতি অধ্যাপক রণেন দেব— ভাষণ

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ ও নিভারাণী সিংহ।

সাহিত্যচক্রের ৫ম অধিবেশন
৯ই জুলাই, ১৯৫৭ খ্রিঃ

সভাপতি— অধ্যাপক পরেশ ভাদুড়ী।

উদ্বোধন সঙ্গীত— গীতশ্রী রায়।

আলোচনা—বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি— অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল।

সমাপ্তি সঙ্গীত— গীতশ্রী রায়।

সাহিত্য চক্রের ষষ্ঠ অধিবেশন ।।
বাউল সঙ্গীত ।। ২২ শে জুন ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

সভাপতি— ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার।

প্রধান অতিথি— অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল।

উদ্বোধন-সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

বাউল-সঙ্গীত— বিপিন বাউল, নরেন্দ্রনাথ বাউল, ক্ষিতীশ বাউল।

প্রধান অতিথির ভাষণ— বাউলসঙ্গীত সম্পর্কে।

বাউল সঙ্গীত— বিপীন বাউল ও সম্প্রদায়।

সঙ্গীত— রচনা দেববর্মা, বিজয়া সাহা।

সভাপতির বাউল তত্ত্ব সম্পর্কিত ভাষণ।

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

সাহিত্য চক্রের ৭ম অধিবেশন ।। গল্প পাঠ ।।
২৮ শে নভেম্বর ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দ

সভাপতি— অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভাদুড়ী।

স্বরচিত কবিতা—'রবীন্দ্রনাথকে' বেণুধর গোস্বামী।

স্বরচিত গল্প—মেঘলা সেনের চিঠি— শক্তি হালদার।

স্বরচিত কবিতা—দু'টি সুর— সুদর্শন মুখার্জী।

স্বরচিত কবিতা—অভিশপ্ত— সত্যব্রত চক্রবর্তী।

স্বরচিত কবিতা—বিভীষিকা— হরিপদ দেবনাথ।

স্বরচিত গল্প—ভুল— দেবদাস গাঙ্গুলী।

স্বরচিত গল্প—ফেয়ার ওয়েল— পরেশ ভাদুড়ী।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দ ২রা এপ্রিলের সাহিত্য চক্রের অধিবেশন

সভাপতি— অধ্যাপক ধীরাজ চৌধুরী।

উদ্বোধন সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

কবিতা— শক্তি হালদার।

কবিতা— দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

গল্প— পরেশ ভাদুড়ী।

প্রবন্ধ—কালের যাত্রায় রবীন্দ্রনাথ— রমাপ্রসাদ দত্ত।

স্বরচিত সঙ্গীত— দেবদাস গঙ্গোপাধ্যায়।

আবৃত্তি—বনলতা সেন— শক্তি হালদার।

আলোচনা— মৃণাল চক্রবর্তী।

সমাপ্তি সঙ্গীত— ব্রজগোপাল সিংহ।

রমাপ্রসাদ গবেষণাগারের কীর্তিমান ব্যক্তিত্ব রমাপ্রসাদ দত্ত প্রামাণিক তথ্য ঘেঁটে সাহিত্যচক্রের অধিবেশনের খুঁটিনাটি এখানে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু দীর্ঘ সাহিত্য-চর্চার আরো বিভিন্ন অধিবেশনের প্রামাণ্য সূত্র যেহেতু পাওয়া যায়নি তাই তিনি তাঁর রচনা অসম্পূর্ণ রেখেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে এই মুহূর্তে কিছু করার নেই। যে সমস্ত তথ্য প্রকাশিত হোলনা তার প্রামাণিক তথ্য যদি কারো জানা থাকে তবে তা আমাদের কাছে পাঠালে তা অবশ্যই সংযোজিত করা হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লোকশিল্পী সংসদের বহুমুখী কর্মধারার তথ্য রমাপ্রসাদ গবেষণাগারে ছিল বলেই অসম্পূর্ণ হলেও বহু তথ্য সংসদ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা গেল।

সংসদের কর্মধারার দিকে তাকালে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা, অধ্যাপক বৈদ্যনাথ শীল, অধ্যক্ষ শান্তিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রণেন দেব, অধ্যাপক কবি পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র সাহিত্যে সুপণ্ডিত সত্যরঞ্জন বসু, শিক্ষাবিদ মৃণাল চক্রবর্তী, অধ্যাপক ধীরাজ চৌধুরী, অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, গল্পকার সুবিমল রায়, অধ্যাপক সুখময় ঘোষ, কে নয়, সবাই প্রায় লোকশিল্পী সংসদের

কর্মধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছেন কোনো না কোনোভাবে। সারা দিনব্যাপী সঙ্গীতানুষ্ঠান জমিয়ে রাখা খুব সহজ কাজ নয়—লোকশিল্পী সংসদ তা করেছে। কোনো অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত করা সংসদের সদস্যদের কাছে খুব সহজ কাজের মত মনে হয়েছে। চিন্তাধারার বহুমুখিতা ঐ সময়ে লোকশিল্পী সংসদের মত আর কোনো সংস্থার কর্মধারায় দেখা যায় নি। নাটকের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী দিয়ে যাত্রা শুরু করে শেষ পর্যন্ত 'শুধু নাটকের জন্য নাটক নয়' এই চিন্তা এবং সমাজের সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে সংসদ নাটক নির্বাচন করেছে এবং অভিনয় করে মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। প্রশংসনীয় এবং গ্রহণযোগ্য চিন্তাধারা এবং কর্মকুশলতা মানুষের মনে দাগ কেটেছে বলেই সংসদের ডাকে গুণী-জ্ঞানীজনেরা সাড়া না দিয়ে পারেন নি। মানুষের আন্তরিক ভালবাসাই সংসদকে গৌরবের আসনে বসিয়েছে।

রমাপ্রসাদ দত্ত-র আলোচনাতেই দেখা যাচ্ছে সংসদ যখন ত্রিপুরার মোরাম মাটিতে রস টেনে নিজের ডালপালাকে পুষ্ট করতে পেরেছে, তখন মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য-র ছদ্মনামে প্রকাশিত নাটক (ত্রিপুর সতী' বা 'জয়াবতী' সাহিত্যিক এবং নাট্যসমালোচক পণ্ডিত পুত্র অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য পুনর্লিখিত করে এবং যুগোপযোগী করে সংস্থার সামনে অভিনয়ের জন্য তুলে ধরলেন। ত্রিপুরার রাজাদের রাজচিহ্ন থেকে শুরু করে পোষাক-আশাক সবই নিখুঁতভাবে রক্ষা করে নাটকটি মঞ্চস্থ করা হয়েছিল—শুধুমাত্র নাটক অভিনয়ের জন্য নয়—ত্রিপুরার নবাগত মানুষের কাছে ত্রিপুরার রাজাদের ঐতিহ্য, আচার অনুষ্ঠান এবং প্রজানুরঞ্জক মনোভাবকে তুলে ধরাই ছিল নাটকের উদ্দেশ্য।

লোকশিল্পী সংসদের সদস্য, সদস্যা এবং পৃষ্ঠপোষকগণ সবাই কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক চিন্তাধারায় থাকতে পারেন কিন্তু সংস্থা দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে থেকে মানুষের মঙ্গল চিন্তায় তাদের নাটক নির্বাচন করেছে এবং অভিনয় করেছে।

ত্রিপুর শিল্পায়তন

লোকশিল্পী সংসদ যখন রকেটের গতিতে ত্রিপুরার গ্রামে পাহাড়ে নাটকাভিনয় করে চলেছে তখন তার আগে পিছে দু'টি বিখ্যাত নাট্যসংস্থা নাটকের ক্ষেত্রে তাদের কর্মধারা অব্যাহত রেখেছিলেন। আগে ছিল— ত্রিপুর শিল্পায়তন, যার নেতৃপুরুষ ত্রিপুরেশ মজুমদার এবং পিছে আছে শিল্পায়ন— যার প্রাণপুরুষ শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ত্রিপুরেশবাবু ঐতিহাসিক নাটকের ঝোঁক সবে পরিত্যাগ করতে শুরু করেছেন—তখন শিল্পায়ন শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাটকের সার্থক রূপায়ণে যাত্রাপথ মসৃণ করেছে।

আলোচনার প্রথমেই ত্রিপুরেশ মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে শুরু করা যেতে পারে যদিও ত্রিপুরেশবাবু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে গেলে ত্রিপুরার প্রখ্যাত নট সুধাংশুমোহন দত্ত, বি এ. (তিনি লিখতেন) তাঁকে নিয়েও কিছু বলতে হবে। ধীরে ধীরে একে একে মঞ্চের পর্দা উন্মোচন করা যাক।

অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখিত প্রবন্ধই এখানে তুলে ধরা গেল।

ত্রিপুরার নাট্য-লোকে একটি অবিস্মরণীয় নাম— ত্রিপুরেশ মজুমদার।

ত্রিপুরার মঞ্চ নাটকের আন্দোলনে আধুনিক কালে যে কয়জন নাট্যরসিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে স্বর্গত ত্রিপুরেশ মজুমদার অন্যতম। তিনি যেমন সু-অভিনেতা ছিলেন তেমনি ছিলেন সংগঠন কর্মী।

ত্রিপুরেশ মজুমদার জন্মগ্রহণ করেন ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৮ শে আশ্বিন (অক্টোবর, ১৯১২ খ্রিঃ)। তাঁর পিতৃদেব ডাঃ ললিতমোহন মজুমদার ছিলেন ত্রিপুরা রাজসরকারের চিকিৎসক এবং আগরতলার একজন বিশিষ্ট নাগরিক। বালক বয়স হতেই ত্রিপুরেশ মজুমদারের নাট্যানুরাগ বিশেষভাবে প্রকটিত হয়। তিনি ছিলেন আগরতলার উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্র। ১৯২৩ সন থেকে একাডেমীতে নাট্যশিক্ষক ৺দীনেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের পরিচালনাধীনে ত্রিপুরার ছাত্রনাট্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। ত্রিপুরেশ মজুমদারের অভিনয় বিদ্যায় হাতেখড়ি এখান

তৎকালীন সময়ে মঞ্চস্থ একটি নাটকের দৃশ্য

থেকেই। তখন তার বয়স দশ কি বারো। তখন আগরতলার সাধারণ মঞ্চ নাটকের ক্ষেত্রে রণবীর কর্তার থিয়েটার পার্টির প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রবল। এই দলের অভিনয় কৃত্যের প্রভাব স্বাভাবিক কারণেই তার মনে যথেষ্ট প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। স্কুল-জীবন সমাপ্তির পর আঠারো বৎসর বয়সে ত্রিপুরেশ মজুমদার সর্বপ্রথম অভিজাত নাট্য সংস্থা 'ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী'র মঞ্চে পার্শ্ব চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩০ সনে দুর্গোৎসব উপলক্ষে উক্ত নাট্য সম্মিলনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক, রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লক্ষহীরা'তে তিনি স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছিলেন। অভিনয় মঞ্চে সেদিন থেকেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনীর অবলুপ্তির পর তিনি 'মাতৃমন্দির', 'ত্রিপুর শিল্পায়তন, শিল্পায়ন প্রভৃতি বিশিষ্ট নাট্যসংস্থায় বহু নাটকের শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করে স্বনামধন্য হন। তাঁর নাট্যচর্চার প্রধান পীঠস্থান ছিল 'ত্রিপুর শিল্পায়তন'। এই নাট্যসংস্থাটির অন্যতম প্রধান সংগঠনকারীরূপে তিনি প্রভূত সুনামের অধিকারী হয়েছিলেন। 'মাতৃমন্দির' এবং 'ত্রিপুর শিল্পায়তনে'র পৃষ্ঠপোষক ছিলেন ত্রিপুরার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর। ত্রিপুর শিল্পায়তনের প্রথম পর্বের অভিনয় রীতি ছিল প্রধানতঃ শিশির-যুগ প্রভাবান্বিত। ত্রিপুরার প্রাসাদকেন্দ্রিক নাট্যচর্চার ধারাটিকে সাধারণের অঙ্গনে প্রসারিত করবার প্রথম প্রয়াস যদিও রণবীর কর্তার থিয়েটার পার্টির, তবু বলতে হয়, এ ধারাটি সামগ্রিকভাবে লোকায়ত করবার প্রথম কৃতিত্ব ত্রিপুর শিল্পায়তনের। আর এ কাজ সবচেয়ে বেশী করেছেন ত্রিপুরেশ মজুমদার। বস্তুতঃ সেকালে সাধারণ সমাজের যে কয়জন প্রগতিপন্থী অভিনেতা ও নাট্য-আন্দোলনকারীর অক্লান্ত পরিশ্রম ও একনিষ্ঠতার গুণে অত্যল্পকালের মধ্যে ত্রিপুর শিল্পায়তন একটি লোকায়ত্ব আধুনিক নাট্যসংস্থায় পরিণত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ত্রিপুরেশ মজুমদারের ত্যাগ, নিষ্ঠা ও অবদান সর্বাধিক, এ কথা বললে অত্যুক্তি হয় না। তিনি এ সংস্থার অনেক নাটকের দক্ষ পরিচালক রূপেও শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। জীবনের শেষভাগে প্রবল প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি সমান উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অভিনয় ও নাটক পরিচালনা করে গেছেন। তীব্র প্রতিযোগিতার পরিবেশে কোনো কোনো নাটকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীনও তাঁকে হতে হয়েছে। কোনো কোনো সময় ভাব প্রবণতায় তিনি ক্ষুব্ধও হয়েছেন, কিন্তু কোন সময়েই নিরুদ্যম হননি। 'মন্ত্রং বা সাধয়েম শরীরং বা পাতয়েম' এই ছিল তাঁর নাট্য সাধনার পরম অবলম্বন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি অবিচল থেকে স্বজন সংসার ভুলে সুন্দরের উপাসনা করে গেছেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনেরা আজও সবিস্ময়ে বলে থাকেন—'এমন নাটুকে পাগল আর দেখিনি'! ত্রিপুরেশ মজুমদারের কাছ থেকে শিক্ষা, প্রেরণা বা সহযোগিতা লাভ করে ত্রিপুরার অনেক তরুণ অভিনেতা এবং কোনো কোনো তরুণ নাট্যসংস্থা উত্তরকালে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। তাঁর আশীর্বাদধন্য অনেক তরুণ

অভিনেতা সেকথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আজও স্মরণ করে থাকেন।

আগরতলা মঞ্চে অভিনয় করে ত্রিপুরেশ বাবু যে কয়টি ভূমিকায় সর্বাধিক সুনাম অর্জন করেছিলেন সেগুলি হল— 'রীতিমত নাটক'এ দিগম্বর, 'সাজাহান' নাটকে সাজাহান, 'তটিনীর বিচার' নাটকে ডঃ ভোঁস, চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য, 'সংগ্রাম ও শান্তি' নাটকে রায়বাহাদুর, পি-ডব্লিউ-ডি-তে মিঃ সেন, 'প্লাবন' নাটকে নীলাম্বর, বিসর্জনে রঘুপতি এবং 'কর্ণার্জুন' নাটকে শকুনি। তাছাড়া তিনি সারা জীবনে অর্ধশতাধিক নাটকে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। ১৯৬৩ সনে 'বিপ্রদাস' নাটকে তিনি শেষ অভিনয় করেন। তখন থেকে তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর জীবনদীপ নিভে আসে। ১৯৬৬ সনের ২১শে মার্চ (৮ই চৈত্র) নাটক পাগল আত্মভোলা মানুষটির জীবননাট্যের যবনিকাপাত হয়। ত্রিপুরার নন্দন-কাননে একটি শুভ্র সুবাসিত ফুল অকালে ঝরে পড়লো। তাঁর কীর্তির কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। (সীমান্ত ।। ২৩ শে অক্টোবর, ১৯৬৮ ইং প্রথম বর্ষ ।। ৪র্থ সংখ্যা)

অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্যর লেখার ভিতর দিয়ে নাটক পাগল ত্রিপুরেশ মজুমদার সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা পাঠকের কাছে তুলে ধরা হোল। ত্রিপুরেশ মজুমদারের সম্পর্কে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা টুকরো ঘটনাগুলোই শুধু উল্লেখ করলে আর একটি পুস্তক রচনা করতে হবে। সুতরাং সেই আলোচনায় না গিয়ে তাঁর বিশাল কর্মধারার কিছু কিছু এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্যর আলোচনায় দেখা যাচ্ছে ত্রিপুরেশ বাবুর অভিনীত প্রযোজিত ও পরিচালিত নাটক—রীতিমত নাটক, সাজাহান, তটিনীর বিচার, চন্দ্রগুপ্ত, সংগ্রাম ও শান্তি, পি ডব্লিউ ডি, প্লাবন, বিসর্জন, কর্ণার্জুন, বিপ্রদাস। এছাড়া তাঁর প্রযোজিত এবং অন্য সংস্থায় তাঁর পরিচালিত নাটকের সংখ্যাও কম নয়। সন অনুসারে এখানে অভিনীত বিভিন্ন সংস্থার নাটকের তালিকা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক লোকশিল্পী সংসদের সঙ্গে ত্রিপুরেশ মজুমদারের খারাপ ছিল না বরং যথেষ্ট আন্তরিক বলা চলে। লোকশিল্পী সংসদের সাহিত্যচক্রের অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থেকেছেন সময় পেলে এবং কোনো কোনো অনুষ্ঠানে আবৃত্তিও করেছেন। শিল্পী অভিনেতা এবং পরিচালক হিসাবে পরিচালক শক্তি হালদারের সঙ্গে তার হৃদ্যতার কোন কমতি ছিল না। দু'চার দিন পর পরই তিনি চলে আসতেন আড্ডাস্থলে, মেলার-মাঠে নারায়ণ ভট্টাচার্যর চায়ের দোকানে যেখানে সবসময়েই সুধাংশুমোহন দত্তকে পাওয়া যেত। নাটক নিয়ে আলোচনা উঠলে তার গতি তির্যক হতে বাধ্য ছিল কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেখানে তাঁর সম্মানহানিকর কোন মন্তব্য থাকতো। লোকশিল্পী সংসদ যদিও পঞ্চাশের দশকে ত্রিপুর শিল্পায়তনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী দল, তবুও সম্প্রীতির অভাব ছিল না। তবুও লোকশিল্পী সংসদের ধ্বসে-পড়া অবস্থার কিছু

আগে এই নিষ্ঠাবান শিল্পীর সঙ্গে যে সামান্য সংঘাত কথায় কথায় সৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তাঁর মানসিক কষ্ট লাঘব করার জন্য লোকশিল্পী সংসদের প্রধান কর্মধারার একজন হয়েও, সংসদের নাট্যপরিচালক হিসাবে থেকেও, ত্রিপুর শিল্পায়তনের ঐতিহাসিক নাটক সাজাহান-এ সাধারণ এক সেনাপতির চরিত্রে অভিনয় করে শক্তি হালদার ক্ষমা ভিক্ষা চেয়েছিলেন। আসলে তিনি একজন শিল্পী হিসাবে এই আপন-ভোলা শিল্পীকে শ্রদ্ধা ভালবাসায় ভরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিলেন।

বিষয়টা নিয়ে একটু বিশদভাবে লেখা যেতে পারে— ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭৩-তে। ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা ত্রিপুরেশ চন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থে আগরতলা শহরের ১৬টি নাট্যসংস্থার উদ্যোগে একটি ঐতিহাসিক নাট্যমেলা। এই নাট্যমেলার প্রধান উদ্যোগ শক্তিবাবু নিয়েছিলেন দু'টি কারণে। এক হোল ১৯৬৬-র ২২ শে মার্চ নাটক- পাগল আত্মভোলা মানুষ ত্রিপুরেশ মজুমদারের জীবন নাট্যের যবনিকাপাত হয়েছিল। ১৯৬৩ সনে তাঁর শেষ অভিনীত নাটক বিপ্রদাস, সে কথা আগেও উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি 'ক্যানসার' রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম বিপর্যস্ত অবস্থায় শেষ দিন পর্যন্ত কাটালেন অথচ ত্রিপুরায় নাট্যসংস্থাগুলির দায়িত্ব ছিল কিছু করার, কিন্তু তেমন কিছু করা হয়নি। এ বড় নির্মম সত্য। শক্তিবাবুর কথায়—

আমরা তখন লোকশিল্পী সংসদ নিয়ে মেতে আছি। খগেন চক্রবর্তী 'রুদ্রবীণা' পত্রিকার সম্পাদক; তিনি আবার লোকশিল্পী সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। ত্রিপুরেশ বাবু চালাচ্ছেন ত্রিপুর শিল্পায়তন। মূলতঃ ঐতিহাসিক এবং কিছু কিছু সামাজিক নাটক নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

লোকশিল্পী সংসদ রবীন্দ্রনাটক দিয়ে শুরু করে ধনঞ্জয় বৈরাগী ওরফে তরুণ রায়ের নাটক নিয়ে মেতে আছে। নাটকে কোনো না কোনো নতুনত্ব নিয়ে সংসদ তাঁদের নাটকগুলিকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলছে।

ত্রিপুর শিল্পায়তনে এ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এবং অঘোষিতভাবে লোকশিল্পী সংসদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। সাহিত্যিক কবিরাজ বিমল চৌধুরীর কবিরাজখানার আড্ডায় একদিন বিকালে ত্রিপুরেশ বাবুর সঙ্গে সংসদের সম্পাদক খগেনবাবুর নাটকাভিনয় নিয়ে বেশ উত্তপ্ত আলোচনা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকলো যে হাতাহাতি হবার উপক্রম। অবশ্য বিমলবাবু এবং অন্যেরা তাঁদের শান্ত করে অবস্থাটা সামাল দিতে পেরেছিলেন। এ নিয়ে ত্রিপুর শিল্পায়তনের সদস্যরা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিষয়টা আমাকে স্বাভাবিক ভাবেই পীড়া দিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, সংস্থার নাট্য পরিচালক হিসাবে আমার কিছু করা উচিত।

বেশ কয়েকদিন ভাবনা-চিন্তা করে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা সংসদের সদস্য বন্ধুরা অনুমোদন করলেন না, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তে অবিচল। সিদ্ধান্ত হোল, ত্রিপুর

শিল্পায়তনের মহড়া চলছে 'সাজাহান' নাটকের। সাজাহান নাটকে সেনাপতি হোক আর মরা সৈনিক হোক— মোট কথা ওদের সঙ্গে আমি অভিনয় করে আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবো। প্রস্তাবটা যখন ওঁদের মোটরস্ট্যাণ্ডের দোতলায় মহলাকক্ষে গিয়ে দিলাম তখন সবাই হৈ চৈ করে উঠলো এটা আমার একটা কূটচাল বলে। কেউ কেউ বলে উঠলেন— 'কি, শেষে আপনি আমাদের ঘরে এসে অপমান করছেন?' বললাম, না, আমাদের সঙ্গে আপনাদের কোনরকম সংঘাত থাক, তা আমি চাইনা। তাই আপনাদের সঙ্গে অভিনয়ে অংশ নিয়ে আমাদের দুই দলের মধ্যে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই।

শাজাহান নাটকের একটি দৃশ্যে
প্রতিমা চৌধুরী, শক্তি হালদার প্রমুখরা

খুব একটা হৈ চৈ আরম্ভ হোল। শেষে বন্ধুদা মানে ধূর্জটিপ্রসাদ খুবই ঠাণ্ডাভাবে বললেন— শক্তিবাবুর প্রস্তাবতো খারাপ নয়। অভিনয় নিয়ে অশান্তি, অভিনয় দিয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে আমরা সাধুবাদ দেব।

ধাবলবাবু মানে পীযূষবাবু আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু অবাক বিস্মিত ত্রিপুরেশবাবু ধীরে ধীরে বললেন অনেকটা সাজাহানের মত— তবে তাই হোক। শক্তিবাবুকে সেনাপতির পার্টটা দাও। আমাকে বললেন— আপনার আপত্তি আছে?

মনে মনে বললাম, আপত্তি? কিসের আপত্তি! আমি ধন্য, ধন্য তোমাদের কাছে নয়, ধন্য এই বৃদ্ধ নাট্যজগতের ব্রাহ্মণের কাছে, যাঁর হৃদয়ে জেগে আছে এক অপমানের জ্বালা; সেই জ্বালা যদি কিছুমাত্র প্রশমিত করতে পারি তবে আমি ধন্য। নির্দ্বিধায় ছোট একটি চরিত্র নিয়ে শেষ পর্যন্ত অভিনয় করলাম। নাটক মঞ্চস্থ হোল এম বি বি কলেজের রবীন্দ্রমঞ্চে।

এদিকে তো শান্তি প্রতিষ্ঠা হোল। কিন্তু আর এক দিকে নিজের ঘরে তখন আগুন লেগে গেছে। লোকশিল্পী সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদ ত্যাগ করেছেন খগেন চক্রবর্তী অপমান বোধ করে। শক্তিবাবুকে নিয়েই আমরা লড়াই করেছি এখন তিনি ভালমানুষ হয়ে যাবেন এ হতে পারে না— সুতরাং তিনি আর সংসদে থাকবেন না। অমরেশ দত্ত তখন লোকশিল্পী সংসদের সংগঠনের এক প্রধান স্তম্ভ, তিনিও অসন্তুষ্ট; অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য— তিনি সংসদের পরামর্শদাতা, তিনিও ভাল মনে নিতে পারছেন না। সকলের একই কথা, এটা সংসদের আত্মসম্মানের ব্যাপার। সংসদের নাট্য পরিচালক কিনা অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী সংস্থায় সাধারণ এক চরিত্রে অভিনয় করছে! এ আমাদের সবার অপমান।

কাউকেই আমি বোঝাতে পারলাম না, কাউকেই আমি শান্ত করতে পারলাম না। শুনলোনা যে, এই সিদ্ধান্তে আমিও লজ্জা অপমানকে মাথায় তুলে নিয়েছি; তবুও এক সাধক পুরুষ, নাটক যাঁর জীবনের ধ্যান-জ্ঞান, নাটকের জন্য যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন— ঘর সংসার, ব্যবসা বাণিজ্য সব, তাঁকে সম্মান দিতে আমার অসম্মান কিছুই নয়।

ত্রিপুরেশবাবুর প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব কোনো দিনই আমার ছিলনা। নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব দলবদ্ধভাবে ছিল, এর বেশী কিছু নয়। তাই লোকশিল্পী সংসদের ক্ষোভ দুঃখ সবই বুঝেছিলাম, কিন্তু আমার করার কিছু ছিল না।

ত্রিপুরেশ বাবুর একজন গুণগ্রাহী এবং সমালোচক এককালের প্রধান শিক্ষক পরে ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা অনিলকুমার দাশগুপ্তকে সভাপতি করে আমরা ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা করেছিলাম। সংগঠন সকল দলকে নিয়েই করা হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল—ত্রিপুরেশ স্মৃতিচারণ সংস্থা। নাট্যমেলার স্মারক গ্রন্থে অনিল দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছিলেন—যদি দেখেন একজন সুপুরুষ শুভ্র পোষাকে রি'ার উপর পা তুলে বসে আনমনা—এক পলক দেখেই আপনার মনে একটা কিন্তু দেখা দিয়েছে—তখনই মনে করতে হবে উনি আর কেউ নন, নাটক পাগল ত্রিপুরেশ মজুমদার। সত্যিই নাটকের পাগল ছিলেন ত্রিপুরেশচন্দ্র। ত্রিপুরার নাট্যজগতে যেদিন থেকে তাঁকে দেখেছি—নাটক তার ধ্যান জ্ঞান প্রাণ; সকাল থেকে রাত্র, হয়তো ঘুমের মধ্যেও তিনি স্বপ্ন দেখতেন নাটকের। আগেই লেখা হয়েছে ত্রিপুরার নাট্যচর্চা রাজবাড়ি থেকে শুরু, কারণ রাজারা এ ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় করতেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এত অর্থব্যায় সম্ভব ছিল না। কিন্তু সৃষ্টির প্রেরণা যাকে পাগল করে তুলছে সবসময়, সেই ত্রিপুরেশচন্দ্র নিজেকে আর স্থির রাখতে পারেনি—ঝাঁপিয়ে পড়েছেন নতুন চেতনা নিয়ে, সাধারণের ভিতর প্রতিভা খুঁজে বেড়িয়েছেন, গড়ে তুলেছেন দক্ষ কারিগরের মত নতুন নতুন শিল্পী। রাজবাড়ির চত্বর থেকে জনতার রাস্তায় জনতার নাটক নেমে এলো। মূল্য দিতে হোল এর জন্য প্রচুর। অনেক অনেক অর্থ উপার্জন করেও মৃত্যুর সময় প্রচণ্ড অর্থাভাবে দিন কাটিয়েছেন। কারণ নাটকের টাকা জুগিয়ে সর্বস্বান্ত তখন ত্রিপুরেশ মজুমদার।

১৯৬৩ সনে ত্রিপুরেশবাবুর চিরবিদায়ের পর মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিয়ে মেলার মাঠের চায়ের দোকানের আড্ডায় বড়দা সুধাংশু দত্তকে বলেছিলাম, অন্তত কিছু ঋণ শোধ করার চেষ্টা করি, আসুন। বড়দা সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। জন্ম নিয়েছিল কিছু দিনের আয়ু নিয়ে এক কল্যাণকামী সংস্থা। 'ত্রিপুরা সম্মিলিত চারুশিল্প কল্যাণ সংস্থা'। সংস্থা ৩রা এবং ৪ঠা এপ্রিল সলিল সেনের 'মৌচোর' নাটকটি সুধাংশু দত্তের পরিচালনায় এম. বি. বি. কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে সংগৃহীত অর্থ

ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

মৌচোর নাটক থেকে সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ বেশী কি কম সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হোল এই সর্বপ্রথম ত্রিপুরেশ মজুমদারকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তাঁরই নামে সকলে একটি পাটাতনে এসে দাঁড়াবার প্রয়োজন অনুভব করেছিলাম। আর এই সহমর্মিতা থেকে পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা সংগঠিত হতে পেরেছিল। সে আলোচনায় পরে আসা যাবে।

ত্রিপুর শিল্পায়তনের একজন প্রাণপুরুষ ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত। তাঁকে নিয়ে কিছু লেখার আগে ত্রিপুরেশবাবুর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, তাঁরই সমসাময়িক শ্রী সুধাংশুমোহন দত্ত (বড়দা) সম্পর্কে কিছু আলোচনা প্রয়োজন।

সুধাংশুমোহন দত্ত বি.এ.

সুধাংশু দত্ত শিশুকালেই পিতৃহীন। বৈমাত্র ভাইয়েরা যদিও ছিল তবুও সব ছেড়েছুড়ে মা চারুবালা দত্ত রাজান্তঃপুরের মহারাজকুমারীদের শিক্ষিকা হয়ে ত্রিপুরাতে আসেন, সেই থেকে তিনি 'গুরুমা' হয়ে যান। গুরুমা চারুবালা দত্ত কবি ছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি একটি কাব্যগ্রন্থ 'আশীর্বাদ' প্রকাশ করেছিলেন। এই কবিতার বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব আমার উপর ছিল এবং আমি অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং রমাপ্রসাদ দত্ত-র সহযোগিতায় বইটি প্রকাশ করতে যথাসাধ্য করেছিলাম। ফলে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশনার জন্য তিনি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয় আয়ু তাঁকে সে সুযোগ দেয়নি। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে তিনি সব আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে অনেক দূরে সরে গেলেন। চারুবালা দত্তর কনিষ্ঠ সন্তানের মৃত্যু হয় এবং সেই কারণে সুধাংশুমোহন দত্ত মার অপত্য স্নেহে বড় হয়ে ওঠেন। 'মেঘ না চাইতে জলে'র মত যখন তিনি যা চেয়েছেন বিধবা মা তা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। ফলে বি. এ. পাশ করার পর আর লেখাপড়া না করে তিনি নাটক নিয়ে মেতে ওঠেন। শিশির ভাদুড়ী-অনুরাগী সুধাংশুমোহন ত্রিপুরেশচন্দ্রের মত নাটক নিয়েই জীবন কাটিয়েছেন।

আগরতলায় এসে প্রথম যে ব্যক্তির সুনজরে পড়লেন, তিনি হলেন মন্ত্রী রাজাসাহেব রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর। মন্ত্রীবাহাদুরের মজলিসে প্রধান এবং প্রতিদিনের সর্বক্ষণের সদস্য হলেন সুধাংশুমোহন দত্ত। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কন্ট্রাক্টারি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন তিনি। এই সময়েই রাজ-মন্ত্রী রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্টুডেন্টস এসোসিয়েশনের কয়েকজন প্রাক্তন শিল্পী-অভিনেতার সহযোগিতায় আগরতলায় 'মাতৃমন্দির' নাট্য সংস্থার জন্ম হয়েছে। এই মাতৃমন্দিরে বেশ কিছু সফল নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। এখানে সুধাংশুমোহন এবং ত্রিপুরেশচন্দ্র এক সঙ্গে অভিনয় করেছেন এবং সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৩৪ সালে যদিও সীতা

নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে ত্রিপুর শিল্পায়তনের গোড়াপত্তন হয়েছিল, কিন্তু প্রকাশ্যভাবে মাতৃমন্দির দু'ভাগ হয়ে যাওয়ার পর ত্রিপুরেশ মজুমদারের উদ্যোগে 'ত্রিপুর শিল্পায়তন' এই সময় থেকেই নিয়মিত নাটক অভিনয় শুরু করে। সুধাংশুমোহন দত্ত রাজা সাহেবের উৎসাহে আরো কিছু দিন মাতৃমন্দিরে নাটক প্রযোজনার পর 'মাতৃমন্দির' ভেঙ্গে যায়। আসলে সুধাংশুমোহন পরিচালক হিসাবে যত দক্ষ ছিলেন, সংগঠক হিসাবে তত দক্ষতার প্রমাণ তিনি রাখতে পারেননি। তাই শুধু লোকশিল্পী সংসদের পরিচালকের দায়িত্বে নয়, বহু ছোট বড় নাট্যসংস্থায় তিনি নাটক পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে অভিনেতা এবং অভিনেত্রী গড়ে তুলেছেন।

ত্রিপুরেশচন্দ্রের মধ্যে শুধু পরিচালন দক্ষতা নয়, সঙ্গে সংগঠন দক্ষতা তাঁকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে। যত দীর্ঘকাল ত্রিপুরেশচন্দ্র নিজে মঞ্চে অভিনয় করে দর্শককে অভিভূত করেছেন, তত বেশী নিজে অভিনয় থেকে সরে গেছেন সুধাংশুমোহন দত্ত। তবে তিনি যে দক্ষ অভিনয় শিক্ষক একথা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

ধূর্জটি দাশগুপ্ত

ত্রিপুর শিল্পায়তনের প্রাণপুরুষ ধূর্জটি দাশগুপ্ত (বঙ্কুদা)। তাঁর কথায়—প্রথম দিকে ত্রিপুরেশবাবু মেয়েদের পার্ট করতেন। মাতৃমন্দির থাকলেও---রাজমন্ত্রী রাণা বৌধজঙ্গ বাহাদুরকে সভাপতি করে ত্রিপুর শিল্পায়তনের নব প্রকাশ ঘটলো। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তখন পূজার সময় যারা নাটক করতো তাদের অনুদান দিতেন এবং দুর্গাবাড়ির পূব দিকে 'মঞ্চ' তৈরি করে সেখানে নাটক করার সুযোগ করে দিতেন। এর পরবর্তী সময়ে মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর দুর্গাবাড়ির পশ্চিম দিকে টিনের সেড দিয়ে একটি পাকা মঞ্চ করে দেন। এখানে ত্রিপুর শিল্পায়তন কর্ণার্জুন নাটক মঞ্চস্থ করে। মঞ্চে ঘোড়া তুলে নাটকে অভিনবত্ব আনা হয়েছিল। এই মঞ্চেই সুধাংশুমোহন দত্ত অনুরূপা দেবীর 'মা' অভিনয় করেন। বছর দুয়েকের মধ্যে মঞ্চটি ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সংস্কারের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

ত্রিপুর শিল্পায়তন ১৯৩৪ সালে 'সীতা' নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করে। সেখানে রামের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গোবিন্দ চক্রবর্তী (নৃপেন)। তিনি কলকাতার স্টেজে অহীন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে বহু অভিনয় করেছেন। তিনি রাজপুরোহিতবাড়ির আত্মীয় হিসাবে ত্রিপুরায় এসেছিলেন। এই সময় বঙ্কুবাবুর অল্পবয়স, নানান কাজে সাহায্য করাই ছিল তাঁর কাজ। সীতা নাটকে ত্রিপুরেশবাবু লব এবং তুঙ্গভদ্রার চরিত্রে অভিনয় করেন।

কর্ণার্জুন নাটকে কর্ণের চরিত্রে **শ্রী স্মরজিৎ চক্রবর্তী** দারুণ অভিনয় করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী এবং ত্রিপুরেশচন্দ্র শকুনি চরিত্রে অভিনয় করেন।

এরপর চন্দ্রগুপ্ত নাটক অভিনয় হয়। চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্য চরিত্রে তিনি অভিনয় করেন। এই নাটকটির পর দুর্গাবাড়ির নাটমণ্ডপটি ভেঙ্গে পড়ে। এর আগে এই মঞ্চে ত্রিপুরেশচন্দ্র 'কারাগার' নাটক পরিচালনা করেন এবং 'কঙ্কন' চরিত্রে অভিনয় করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ নাগাদ ত্রিপুরেশ মজুমদার 'পতিব্রতা' নাটক মঞ্চস্থ করেন। এখানে তিনি গোবিন্দ্র চক্রবর্তীকে অভিনয়ের জন্য আমন্ত্রণ জানান। এই নাটকটি আখাউড়াতে কয়েকরাত্রি অভিনীত হয়।

বঙ্কুবাবুর কথায় : *আমি তখন বরিশাল কলেজে পড়া শেষ করেছি। সেই সময় পতিব্রতা অভিনীত হয়। পতিব্রতার পর 'মাটির ঘর' নাটক মঞ্চস্থ করলেন ত্রিপুরেশচন্দ্র। এই নাটকে সত্যপ্রসন্ন (বাবা) চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। এই নাটকে ইঞ্জিনিয়ার অনিল সেনগুপ্ত, প্রধান শিক্ষক সুধীর দত্ত, রাজমন্ত্রীপুত্র রত্ন হুজুর (রাণা ডাহাল জঙ্গ বাহাদুর) প্রমুখরা অভিনয় করেছিলেন।*

জেনারেল পোষ্ট অফিসের আগে সি. আই. বি.-র যে অফিস আছে সেখানে আগে হরি কর্ত্তার (হরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা) বাবা থাকতেন; উনি এই বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ায় এখানে ত্রিপুর শিল্পায়তন প্রথম ২২ শে শ্রাবণ অনুষ্ঠান করে।

এরপর ত্রিপুর শিল্পায়তন যাত্রা-পালায় ফিরে আসে - অভিনীত হয় 'ভারতবর্ষ' এবং 'স্বামী স্ত্রী' দুটি নাটক। যদুগোপাল ব্যানার্জীর শ্যালক অতুল চক্রবর্তী ঢাকা থেকে এখানে আসেন। নারী চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে বিস্মিত করেছেন তিনি। যদিও নারী চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করতেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, সুবীর দাস প্রমুখরা।

১৯৪৫ সাল নাগাদ কলেজে পড়া শেষ করে ধূর্জটিপ্রসাদ ত্রিপুর শিল্পায়তনে সর্বপ্রথম 'প্লাবন' নাটকে একটি ছোট চরিত্র 'লাঠিয়াল'-এ অংশ গ্রহণ করেন। এই নাটকে 'নীলাম্বর' চরিত্রে অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার। এরপর ত্রিপুরেশচন্দ্র 'সাজাহান' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। এখন যেখানে হেমন্তকর্ত্তার বাড়ি প্যারাডাইস, সেখানে আগে গোপাল ঠাকুরের একটা সিনেমা হল ছিল। এই হলে মঞ্চ করে সাজাহান নাটক অভিনীত হয়। সাজাহান ত্রিপুরেশ মজুমদার, দিলদার অনিল দাশগুপ্ত (হেডমাষ্টার) এবং শান্তি রায় বিশেষ উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনয় করেন। পরে সাজাহান নাটক যখন 'বেঙ্কোয়েট' হলে হয়, তখন ধূর্জটিপ্রসাদ যশোবন্ত চরিত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনয় করেন। যুদ্ধের পরবর্তী সময় ত্রিপুর শিল্পায়তন দ্বারা উমাকান্ত একাডেমীর লাইব্রেরী হলে 'রীতিমত নাটক', 'কালিন্দী' প্রভৃতি অভিনীত হয়।'

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোরের অকাল প্রয়াণ হল ১৭ই মে ১৯৪৭ সালে। রাজবাড়িতে এক অস্থির অবস্থা। তবুও তারি মধ্যে রাজমন্ত্রী রাণা বোধজঙ্গ বাহাদুর সংস্কৃতি চর্চা

ক্ষেত্রে অর্থ সাহায্য বন্ধ রাখেননি। এই সময় 'রীতিমত নাটক' মঞ্চস্থ হয়। ধূর্জটিপ্রসাদ দিব্যেন্দু চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই সময়ে অভিনেতা হিসাবে এবং বিভিন্ন ভাবে যাঁরা ত্রিপুর শিল্পায়তনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিলেন তাঁরা হলেন অনিলকুমার সেন, অনিল দাসগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত, সুধীর দত্ত, রত্ন হুজুর, সৌরিণ দাশগুপ্ত, ইন্দ্রকুমার রায়, ডাঃ দীগেন ব্যানার্জী, কানু ব্যানার্জী, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, সুখময় সেনগুপ্ত, পরিতোষ মুখার্জী, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, অজিত দেববর্মা, কিরণ দেববর্মা, স্মরজিৎ চক্রবর্তী, শান্তি রায়, গৌরাঙ্গ মুখার্জী, শান্তি সরকার। পঞ্চাশের দশকে আসেন ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, স্বদেশ পাল, দেবব্রত চৌধুরী, প্রশান্ত দাশগুপ্ত প্রমুখরা।

তারকেশ্বর রায়, লক্ষ্ণৌতে সঙ্গীত জগতের প্রণম্য ওস্তাদ। তিনি ত্রিপুরার ছেলে। ত্রিপুর শিল্পায়তনে তিনি 'কারাগার' নাটকে বিবেকের চরিত্রে অভিনয় করেন। বিপিন কর্তা, বঙ্কিম কর্তা— এঁদের সহযোগিতা ত্রিপুর শিল্পায়তন সব সময় পেয়েছে।

পরবর্তী সময়ে তরুণ শিল্পীদের আগমন ঘটে। সংস্থায় যোগদান করে—আশিস চক্রবর্তী, ধ্রুবজ্যোতি মুখার্জী, অমল ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য ও অন্যান্যরা।

পঞ্চাশের দশকে এসে নারী চরিত্রে মেয়েরা অভিনয় করতে থাকে। প্রথমে আসে রুবি রায় এবং একে একে মঞ্চে দেখা যায় বৃন্দা রায়, প্রতিমা চৌধুরী, সবিতা সিংহ রায়, নমিতা সিংহ রায়, ইরা ব্যানার্জী এবং অন্যান্যদের।

ধূর্জটিপ্রসাদ বলেন : বিসর্জন নাটকে জয়সিংহ চরিত্রে অভিনয় করে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেয়েছি। সাজাহানে ঔরঙ্গজেব চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি খানিকটা চ্যালেঞ্জ হিসাবে। কারণ সুধাংশুমোহন দত্ত বলেছিলেন 'তুই কখন রুক্ষ চরিত্রে অভিনয় করিসনি, কারণ তোর মধ্যে যে কোমলতা আছে তাতে এই চরিত্র প্রকাশিত হবে না।' তাই ঔরঙ্গজেব চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকের অকুণ্ঠ প্রশংসা যেমন পেয়েছি, আমি নিজেও তেমন তৃপ্ত হয়েছি। সরকারী প্রচার নাটক 'মহাভারত,' আমি মহাভারত চরিত্রে অভিনয় করে খুব শান্তি পেয়েছিলাম। গ্রাম্য চরিত্র গুলিতে অভিনয় করতে আমার খুব ভাল লাগতো, ভাল লাগতো এই মাটির সঙ্গে মিশে থাকা।

ঘরোয়া আলোচনায় হেডমাষ্টার অনিল দাশগুপ্ত বার বার বলতেন : শিশির ভাদুড়ীর চাণক্য আমরা দেখেছি কিন্তু ত্রিপুরেশবাবুর চাণক্য অদ্বিতীয়।

সুখময় সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল ত্রিপুর শিল্পায়তনের সভাপতি ছিলেন, কালিন্দীতে অচিন্ত্যর ভূমিকায় অভিনয় করে খুবই প্রশংসা কুড়িয়েছেন। উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র-সম্মিলনিতে 'তরণীসেন বধ' নাটকে ত্রিপুরেশবাবু - তরণী সেন, রাবণ - সুধাংশুমোহন দত্ত, বিভীষণ - ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত, রাম - সুখময় সেনগুপ্ত, লক্ষ্মণ - গৌরাঙ্গ মুখার্জী,

মন্দোদরী - কানু ব্যানার্জী এবং সীতা করেছিলেন চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী। নাটকটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। এরপরে এঁরা 'বঙ্গেবর্গি' যাত্রা মঞ্চস্থ করেন উমাকান্তের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। এই নাটকে আলিবর্দি - ত্রিপুরেশ মজুমদার ভাস্কর পণ্ডিত—সুধাংশু মোহন দত্ত, মোহনলাল- ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত এবং এক রাজার চরিত্রে সুখময় সেনগুপ্ত অভিনয় করেছিলেন।

এই সংগঠিত দলটি অভিনয় করে 'দেবলাদেবী।' আলাউদ্দিন - সুধাংশু মোহন দত্ত, মালেক ঠাকুর - ধূর্জটি দাশগুপ্ত এবং দেবব্রত চৌধুরী আলাউদ্দিনের পুত্রের অভিনয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই নাটকে ত্রিপুরেশ মজুমদার এবং সুখময় সেনগুপ্ত অভিনয় থেকে বিরত থাকেন।

ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ সকল শিল্পীদের একত্র করে গিরিশ ঘোষের প্রফুল্ল নাটকটি প্রযোজনা করেন। যোগেশ চরিত্রে অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার। রমেশ - পি এন চ্যাটার্জী, সুরেশ—শিবদাস ব্যানার্জী, ভজহরি - ধূর্জটি দাশগুপ্ত, এবং নারী চরিত্র প্রফুল্ল করেন ডাঃ নীহারকণা দে আর যোগেশের স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন ত্রিপুরেশবাবুর স্ত্রী যূথিকা মজুমদার।

ব্যাঙ্কোয়েট হলে যে 'দুই পুরুষ' নাটক হয়েছিল সেই নাটকে নুটবিহারী চরিত্রে অনিল সেনগুপ্ত অভিনয় করতেন, কিন্তু মাঝ পথে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় রূপেন্দ্র ভট্টাচার্য নিজেকে ঐ চরিত্রে তৈরী করে নেন। জমিদার চরিত্রে সুধাংশুমোহন দত্ত, নায়েব ত্রিপুরেশ মজুমদার, চাষী মহাভারত ধূর্জটি দাশগুপ্ত এবং স্ত্রী বিমলা চরিত্রে প্রথমে অতুল চক্রবর্ত্তী এবং পরে একবার মেঘেন্দ্র মুখার্জী অভিনয় করেন। এই নাটকে অরুণ চরিত্রে গৌরাঙ্গ মুখার্জী স্মরণীয়।

'স্বামী স্ত্রী' নাটকে মহেন্দ্র দেববর্মার সুরারোপিত গান মানুষকে অভিভূত করে রাখে। গানটিতে গলা মিলিয়েছিলেন রত্ন হুজুর। 'মাটির ঘর' নাটকেও মহেন্দ্র দেববর্মার সুরারোপিত গান মানুষকে মুগ্ধ করেছে। এই নাটকে সুশোভন চরিত্রে রত্ন হুজুর 'মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান' গানটি গাইতে গাইতে যখন স্টেজে ঢুকতেন, দর্শককুলে তখন সাড়া পড়ে যেত। ত্রিপুর শিল্পায়তন সকল মানুষের ভিতর, বিশেষ করে উচ্চশ্রেণী, থেকে শিল্পী সংগ্রহ করেছেন এবং তার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন; এর-ই ফলে দেখি পুলিশ অফিসার রামনারায়ণ ভট্টাচার্য, ডি এস পি বি গাঙ্গুলী, ডাঃ এস কে দে প্রমুখ রসিক শিল্পীরা ত্রিপুর শিল্পায়তনে একবার না একবার কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে নিজেদের সংযুক্ত করেছেন।

ঠিক যে সময় ত্রিপুর শিল্পায়তন এবং লোকশিল্পী সংসদ নাটকের ক্ষেত্রে শহর গরম-করা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, ঠিক তখন 'মিলনী' থেকে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থা বেরিয়ে

আসে 'শিল্পায়ন' নাম ধারণ করে। শিল্পায়নের প্রাণপুরুষ শিবদাস ব্যানার্জী। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পায়ন মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়।

এ পর্যন্ত আলোচনায় মনে হতে পারে এই দুটি সংস্থা ছাড়া আর বোধহয় ত্রিপুরায় দ্বিতীয় ধারার নাট্যান্দোলনে কারো কোন ভূমিকা নেই। না, তা নয়। কারণ পঞ্চাশের দশকের প্রথম ভাগে শহর গরম করেছিল নারী গ্রন্থাগার তুলসীবতী স্কুলে রবীন্দ্রনাথের বির্সজন নাটক করে। কৈলাশহর এয়ার ফিল্ড মাঠে শ্রী শ্রী ত্রিপুরেশ্বরী নাট্য সংস্থা কাজলগড় অভিনয় করে নাট্যান্দোলনের শুভ সূচনা করেছে। ১৯৫৪ সনে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকটি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে মঞ্চস্থ করেছে। নাটকটি তাঁদের ৪র্থ অবদান। ১৯৫৪ তে ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমীর প্রথম বার্ষিক প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে 'রীতিমত নাটক'-এর অভিনয় হয়; অভিনয়াংশে ছিলেন শ্রী সুধাংশুমোহন দত্ত, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, পরিতোষ মুখার্জী, শিশু সেন, কানু ব্যানার্জী, কালিদাস বাড়রী, নিত্যানন্দ ঘটক, অঞ্জু বর্ধন, রাণা লক্ষীবীর জঙ্গ, ত্রিপুরেশ মজুমদার, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতিন্দ্র বসু, সুখময় সেনগুপ্ত প্রমুখ।

আর্টিস্ট এসোসিয়েশনের 'কালিন্দী' নাটকে সঙ্গীত রচনা এবং সুরারোপ করেন নিত্যরঞ্জন দাস ও রঞ্জিত ঘোষ। এ সময়েও এঁরা কোনো মহিলা শিল্পী নাটকে নামাতে পারেননি। ত্রিপুরেশবাবুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ১৯৫৪র ২৬শে অক্টোবর নেতাজী স্কুলে বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'মাটির ঘর' নাটকটি আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন মঞ্চস্থ করে। এই বছরেই উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্ররা দীপেন ব্যানার্জীর পরিচালনায় 'তরণীসেন বধ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এদের দিয়ে ত্রিপুরেশ মজুমদারও 'রীতিমত নাটক' উমাকান্ত প্রাঙ্গনে অভিনয় করান। সুতরাং ১৯৫৫ সনে লোক শিল্পী সংসদের আবির্ভাবের আগে নাটকের সংখ্যা বেশী না হলেও নাট্যচর্চা অব্যহত ছিল। ১৯৫৫ সাল নাট্যান্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য বর্ষ। লোকশিল্পী সংসদ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটক দিয়ে আসর গরম করেছিল শুধু নয়, এ বছর নাটকের জোয়ার বয়ে যায় নব উৎসাহে।

এ বছরের ৩রা মার্চ কৈলাশহরের রাধাকিশোর ইনসটিটিউশন মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটক। ১৬ এবং ১৭ই এপ্রিল আগরতলা 'বানী বিদ্যাপীঠের' ছাত্রীবৃন্দ ত্রিপুর ছায়াবানী হলে মঞ্চস্থ করে দেবনারায়ণ গুপ্তের 'শ্যামলী' নাটক। ত্রিপুরার প্রাক্তন সমাজশিক্ষা মন্ত্রী বাসনা চক্রবর্ত্তী, টুকু (দীপালী ভট্টাচার্য), উমা দেব এবং অন্যান্যরা অভিনয় করেন; নাটকটি পরিচালনা করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, তিনিই ছিলেন মেয়েদের মধ্যে একমাত্র পুরষ অভিনেতা। সহপরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন সুবীরকান্তি দাশ।

এইসময়েই বনমালীপুর মহিলা সমিতি ছায়াবাণী হলে অনুরূপাদেবীর 'মা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পরিচালক ছিলেন ত্রিপুরেশ মজুমদার।

২১শে অক্টোবর শিল্পী সংসদ তাদের ৫ম অবদান নীহার রঞ্জনগুপ্তর 'উল্কা' নাটকটি শিশু উদ্যানের মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে। পরিচালকের নাম ঘোষণা করেনি সংসদ।

১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্পোর্টস ক্লাব জলধর চট্টোপাধ্যায়ের পি. ডব্লিউ. ডি. নাটক নেতাজী স্কুলের কাছে মন্ত্রী কুটিরে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে।

এছাড়া হয়তো আরো নাটক ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় অভিনীত হয়েছে যার প্রামাণিক তথ্য হাতে না থাকায় এখানে লিপিবদ্ধ করা গেল না। মোট কথা, লোক শিল্পী সংসদের রক্তকরবী মঞ্চস্থ করে প্রচলিত নাট্যধারা থেকে মানুষের মনে এক নতুন চিন্তা ভাবনা জাগাতে পেরেছিল ১৯৫৬ সনে; ফলে নাটকের প্রযোজনা ১৯৫৭থেকে বাড়তে থাকে।

২৫শে এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬ লোকশিল্পী সংসদ ছায়াবাণী হলে রক্তকরবী মঞ্চস্থ করে আবার। ৩১শে মার্চ তারা মহাসমারোহে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের মুক্ত মঞ্চে প্রথম বার 'আমাদের গ্রাম' নাটক অভিনয় করে সাধারণ দর্শকের আরো কাছে আসতে সক্ষম হয়।

এই বছরে উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ উমাকান্ত স্কুল প্রাঙ্গনে ১৫ই এবং ১৬ই মার্চ মন্মথ মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গে বর্গী' নাটকটির অভিনয় করে। এই নাটকের বিক্রয় লব্ধ অর্থের একাংশ মোটর দুর্ঘটনায় মৃত সাংবাদিক সম্পাদক রাজনীতিবিদ প্রভাত রায়ের স্মৃতি ভাণ্ডারে দেওয়া হয়।

লোকশিল্পী সংসদ আবার প্রবল উৎসাহে নতুন আঙ্গিকে এবং উপস্থাপনায় 'রক্তকরবী' নাটকটি ৯ই এবং ১০ই আক্টোবর, ১৯৫৬ উমাকান্ত একাডেমীতে মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে বিশু পাগল তপেশ রায় এবং নন্দিনী স্নিগ্ধা হালদার-এর সংযত অভিনয় প্রশংসিত হয়। ত্রিপুরা এবং বহিঃত্রিপুরার সংবাদপত্রে নাটকের আলোচনা প্রকাশিত হওয়ায় সংসদের উৎসাহ আরো বর্দ্ধিত হয় এবং শহরের অন্যান্য দলের মধ্যে নতুন নাটক প্রয়োজনার আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ বছর ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাব কর্ত্তৃক অভিনীত হয় 'মেঘমুক্তি' নাটকটি ২রা এবং ৪ঠা নভেম্বর। যতদূর মনে হয়, এই বছরটিকে নবনাট্য আন্দোলনের প্রস্তুতি বছর হিসাবে ধরা যেতে পারে। এই আন্দোলন পরিপূর্ণ রূপ পায় ১৯৫৮ সনে।

১৯৫৭ সনে নাটকক্ষেত্রে প্রাধান্য মোটামুটি লোকশিল্পী সংসদের ছিল। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীরা তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলনে বিদ্যালয়ে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিন্দুর ছেলে' নাটকটি। এখানে সন্ধ্যা

ব্যানার্জী মনে রাখার মত অভিনয় করেছিলেন। ৮ই এবং ৯ই ডিসেম্বর ত্রিপুর শিল্পী সংহতি রাণা ডাহালজঙ্গের নেতৃত্বে উজ্জয়ন্ত রাজপ্রসাদ সংলগ্ন মাঠে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'শ্যামা'। শ্যামার জাঁকজমক পূর্ণ অভিনয় দর্শককে মুগ্ধ করে। লোকশিল্পী সংসদ মোটামুটি মার্চ মাসে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে আমাদের গ্রাম প্রথম অভিনয় করে; তারপর সারা বছর আমাদের গ্রাম নাটক বিশালগড়, বিশ্রাম গঞ্জ, জিরানিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে অভিনয় করে। সেই সঙ্গে ১৬ই এবং ১৭ই অশোবর নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মঞ্চে ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটক সুধাংশুমোহন দত্তের পরিচালনায় নামায়। এই বছরে ৮ই নভেম্বর সকাল ৮টায় রূপছায়া সিনেমা হলে ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। এ সম্বন্ধে রমাপ্রসাদ দত্ত তার আলোচনায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, সুতরাং পুনরুল্লেখ থেকে বিরত হলাম।

১৯৫৮ সালে ৩৮টি প্রযোজনা নাট্য আন্দোলনের পূর্ণ প্রকাশ হিসাবে ধরে নিতে পারা যায়। ২৪শে জানুয়ারি কমল চৌধুরী এবং মায়া দেবের পরিচালনায় চম্পামুড়ার সমাজশিক্ষা কেন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটিকাটি মঞ্চস্থ হয়। ২৯শে জানুয়ারি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' নাটক মঞ্চস্থ করে কমিউনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে শিল্পায়ন সর্বপ্রথম। এবং পরে ৬ই মার্চ শিল্পায়ন ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় 'মহেশ' নাটকটি নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব উপলক্ষ্যে পুনরায় মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে অলোকসম্পাতে ছিলেন রবি সেন এবং রূপসজ্জায় ছিলেন প্রফুল্ল সেন এবং পীযূষ মজুমদার। 'মহেশ' নাটক মঞ্চস্থ হবার পর শহরের বিদগ্ধ মণ্ডলীতে বেশ সাড়া জাগে। এটাই শিল্পায়নের প্রথম নাটক এবং ১৯৫৮ তে শিল্পায়ন নবনাট্য আন্দোলনে সংযুক্ত হয়ে যায়।

১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'ক্ষুধা' নাটকটি শিল্পায়ন মঞ্চস্থ করে রূপছায়া সিনেমা হলে।

প্রগতি শিল্পী বিতান ৬ই ফেব্রুয়ারি মহেন্দ্র গুপ্তর 'কঙ্কাবতীর ঘাট' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ৫ই ফেব্রুয়ারি স্বপন বুড়োর একটি শিশুনাটিকা মঞ্চস্থ হয়।

৭ই মার্চ শিল্পী সংসদ নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের মঞ্চে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকটি অভিনয় করে। ২২ শে মার্চ ত্রিপুর শিল্পায়তন 'মানভঞ্জন' নাটক নামায় ঐ এক-ই মঞ্চে। উদ্যোক্তা ছিল ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ।

১৭ই, ১৮ই এবং ১৯শে এপ্রিল লোকশিল্পী সংসদ 'ধনঞ্জয় বৈরাগী'র' 'রুপোলী চাঁদ' নাটকটি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে মঞ্চস্থ করে।

৪ঠা মে লোকশিল্পী সংসদ মন্মথ রায়ের 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নাটকটি ২৫০২ তম বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে মঞ্চস্থ করে ভিক্ষু আর্য মিত্রের অনুরোধে।

১০ই এবং ১১ই জুন শিল্পী সংগঠনী সুধীন আচার্যর পরিচালনায় 'লাল পাঞ্জা' নাটকটি উমাকান্ত ক্যাম্পাসে প্রথম প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চস্থ করে। ১৫ই জুন উমাকান্ত একাডেমীর শিশু ছাত্ররা রবীন্দ্রনাথের হাস্যকৌতুক 'অন্তেষ্টি সৎকার' বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। ১৭ই জুন জনসেবা সংঘ পশ্চিম চম্পামুড়ায় 'প্রতিদান' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ১৮ই এবং ১৯শে জুন ত্রিপুর শিল্পায়তন সংস্কৃতি ভবনে ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় 'উল্কা' নাটক অভিনয় করে। এই নাটকে আলোকসম্পাতে ছিলেন শিশুতোষ রায়।

১৫ই আগষ্ট কৃষ্ণচন্দ্র বালিকা বিদ্যালয় কমলপুরে মঞ্চস্থ করে 'ঝাঁসীর রাণী'। ১৬ই আগষ্ট লোকশিল্পী সংসদ নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে মন্মথ রায়ের 'জটা গঙ্গার বাঁধ' নাটকটি। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ। ১৭ই আগষ্ট ত্রিপুর শিল্পায়তন সংস্কৃতি ভবনে প্রচার বিভাগের উদ্যোগে 'মান ভঞ্জন' মঞ্চস্থ করে।

১৭ই সেপ্টেম্বর অগ্রগামী সংসদ সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে মন্মথ রায়ের 'মমতাময়ী হাসপাতাল'। ২৩শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর মনোজ বসুর 'প্লাবন' নাটকটি ত্রিপুর শিল্পায়তন ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৮ই অক্টোবর রমাপ্রসাদ দত্ত রচিত এবং নরেশ পোদ্দার পরিচালিত শিশু নাটক 'শরতের আহ্বান' লোকশিল্পী সংসদের প্রযোজনায় সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই অক্টোবর সৌমেন্দ্রপ্রসাদ দাস এর পরিচালনায় মনোরঞ্জন বিশ্বাস রচিত 'কর্মখালি' নাটকটি সংস্কৃতি ভবনে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। ২৯শে অক্টোবর 'পার্থসারথি' কমলপুরে অভিনীত হয়।

১২ই এবং ১৩ই নভেম্বর ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাব বড়দোয়ালী স্কুলে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'কালপুরুষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ১০ই নভেম্বর 'টিপু সুলতান' নাটকটি অমরপুর সরকারী কর্মচারীবৃন্দ অমরপুরে মঞ্চস্থ করে। ১৯শে নভেম্বর 'দাসীপুত্র' নাটকটি শান্তির বাজার ওয়াস্তি কোম্পানীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। ১৭ই নভেম্বর সাহিত্য বাসরের যুগজয়ন্তী উৎসবে ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন দুর্গাবাড়িতে বৈকুন্ঠের খাতা এবং বির্সজনের অংশ বিশেষ অভিনয় করে।

৭ই নভেম্বর সুধীন আচার্য জয়নগর সবুজ সংঘের প্রযোজনায় 'ছুটি' নাটকটি অভিনয় করে জয়নগরের মুক্ত মঞ্চে। ২২শে নভেম্বর 'রাত্রি শেষ' অগ্রগামী শিল্পী সমাজ নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

৭ই ডিসেম্বর শিক্ষিকা অমিতা ভট্টাচার্যর রচনা এবং পরিচালনায় তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয় ত্রিপুরার ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'ত্রিপুরগাথা'।

দর্শকমণ্ডলীর বিচারে নাটকটি বছরের সেরা নাটক হিসাবে বিবেচিত হয়। নাটকটি মঞ্চস্থ করতে লোকশিল্পী সংসদের সদস্যগণ স্টেজ, মেকআপ ইত্যাদি ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করে।

২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর শিল্পায়ন বংশী মুখোপাধ্যায়ের 'শেষ কোথায়' নাটকটি মঞ্চস্থ করে সংস্কৃতি ভবনে। শিবদাস ব্যানার্জী এই নাটকে পরিচালক হিসাবে প্রথম প্রকাশ্যে আসেন। ৩১শে ডিসেম্বর শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জীবনসংগ্রাম' নাটকটি প্রাচ্য ভারতীর শিক্ষকবৃন্দ বড়দোয়ালী স্কুলে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি 'গুরুদেব' ছদ্মনামে পরিচালিত হয়।

এই বছর এম বি বি কলেজের ছাত্ররা অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক মোহিত পুরকায়স্থর পরিচালনায় প্রমথনাথ বিশি রচিত 'ঋণংকৃত্বা' নাটকটির সার্থক অভিনয় করে। রমাপ্রসাদ দত্ত রচিত 'বন বন্দনা' নাটিকাটি নরেশ পোদ্দারের পরিচালনায় লোকশিল্পী সংসদের ছোটদের গ্রুপ 'লিটিল থিয়েটার গ্রুপ' কর্তৃক বড়দোয়ালী স্কুল মঞ্চে অভিনীত হয়।

'শিল্পায়ন' নাট্য সংস্থা কর্তৃক ৯ই এপ্রিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'রামের সুমতি' (নাট্যরূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত) অভিনীত হয় নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে।

এই বছর শরৎচন্দ্রের বিজয়া (দত্তা) নাটকটি মুকুল সংঘ হারাধন দে-র বাড়ির সামনে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে। নাটকটি পরিচালনা করেন হরিহর সাহা ও অজিতচন্দ্র দে।

লোকশিল্পী সংসদ এই বছর ২৮শে জানুয়ারি, ১লা মার্চ, ২রা মার্চ, ৫ই মার্চ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সপ্তাহ উদযাপনে 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি মঞ্চস্থ করে তুলসীবতী স্কুল থেকে শুরু করে, সোনামুড়া, উদয়পুর, তেলিয়া মুড়া, খোয়াই প্রভৃতি জায়গায় এক নাগাড়ে এবং তাদের সাংগঠনিক দক্ষতা প্রমাণ করে। পরিচালনা করেন নরেশচন্দ্র সাহা T. C. S. এবং প্রয়োজনা করে ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাটক মন্ত্রক।

আমাদের হাতে যে প্রামাণিক তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৫৯ সালে নাট্য প্রযোজনার সংখ্যা ৩৮ থেকে ৪১-এ এসে দাঁড়িয়েছে।

এই বছর ১১ই জানুয়ারি শিবনগরের ইয়ংম্যানস ক্লাব শিবনগরের মুক্ত মঞ্চে 'তাইতো' নাটকটি অভিনয় করে। ১লা জানুয়ারি এবং ৩১ শে ডিসেম্বর 'জীবন সংগ্রাম' নাটকের পুনরাভিনয় করেন প্রাচ্য ভারতী স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ। ১৭ই এবং ১৮ই জানুয়ারি লোকশিল্পী সংসদ কিরণ মৈত্রের 'বারো ঘন্টা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে সংস্কৃতি ভবনে। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। আলোক সম্পাতে বিনয় মহলানবিশ। ২৪শে জানুয়ারি নিখিল ত্রিপুরা শিক্ষক সমিতি 'আনন্দ নাড়ু' নাটিকাটি শিশু শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত করায় তাদের সম্মেলনে। ২৯শে জানুয়ারি 'হুগ হুগমানি কৃষি' (জমু

পদ্ধতি) নাটকটি ত্রিপুর শিল্পী সংহতি মঞ্চস্থ করে উমাকান্ত একাডেমীতে। রচনা জিতেন্দ্রমোহন দেববর্মা এবং পরিচালনা করেন মেজর রাজকুমার ডাহাল জং।

১০ই ফেব্রুয়ারি 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি কৈলাসহরে অম্বিকা নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করে।

৭ই এবং ৮ই মার্চ অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'কলরব' নাটকটি মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ তাদের জিম্নেসিয়াম হলে বার্ষিক নাট্যাভিনয় হিসাবে মঞ্চস্থ করে, নাট্যকার হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৮ই মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পূজারিনী' নৃত্যনাট্যটি মেলার মাঠের শিশু শিল্পী সংসদ মেলার মাঠের মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে। এরা সুবিমল ঘোষের 'মালাকার' নাটিকাটিও মঞ্চস্থ করে। ১৪ই মে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পল্লী সমাজ' নাটকটি গোপীরঞ্জন ধরের পরিচালনায় গোবিন্দপুর রিক্রিয়েশন সেন্টার কৈলাশহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ করে।

১৬ই মে 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি লোকশিল্পী সংসদ উদয়পুরের কাকড়াবনে এবং ১৭ই মে পুনরায় রুদ্রসাগর ফিসারী অফিসে মেলাঘরে অভিনয় করে।

২৩শে মে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' শিল্পায়ন বড়দোয়ালী স্কুলে মঞ্চস্থ করে। ২৩শে মে 'কুশধ্বজ' নাটকটি (নাট্যকার যোগেশ বন্দোপাধ্যায়,) হাবাধন সংঘের মাঠে হারাধন সংঘের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

২৪শে মে 'সিঁথির সিঁদুর' মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রীরা অভিনয় করেন তুলসীবতীর মঞ্চে।

১লা জুন জলধর চট্টোপাধায়ের 'সিঁথির সিঁদুর' তুলসীবতীর প্রাক্তন ছাত্রীরা নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে। ১০ এবং ১১ই জুন অধ্যাপক যামিনীমোহন কর রচিত 'প্রহেলিকা' নাটকটি 'মৌচাক' বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ করে। এটাই এদের প্রথম প্রযোজনা। ৩০শে জুন শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' নাটকটি গোপাল দের পরিচালনায় লেকচৌমুহনী হারাধন কুঠির প্রাঙ্গনে মুক্ত মঞ্চে সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়-এর নামে অভিনীত হয়।

৭ই জুলাই - শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' নাটকটি অপরাজিতা রায় জয়নগরের মেয়েদের নিয়ে ওখানে মুক্ত মঞ্চে নামান। ২০শে ও ২১শে জুলাই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে। ১লা এবং ২রা জুলাই দীপনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কেদার রায়' নাটক অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় 'ভারতমাতা' ক্লাব মঞ্চস্থ করে।

১৯শে আগষ্ট 'জন্মতিথি' নাটকটি কাঠালছড়ি স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ সাবরুমে তাঁদের

ক্লাবমাঠের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করেন।

১৮ই আগষ্ট বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'মাটির ঘর' নাটক শ্রী সুনীতি রায় বর্মন এর পরিচালনায় ভাটি অভয়নগর নবনাট্য সংঘ মঞ্চস্থ করে। ২৩শে আগষ্ট 'গ্রামের বুকে' নাটকটি শ্রীশ্রী ত্রিপুরেশ্বরী নাট্য সংস্থা কৈলাশহর এয়ার ফিল্ডে মঞ্চস্থ করে। ২৪শে আগষ্ট এই সংস্থা একই স্থানে 'কাজলগড়' নাটকটিও মঞ্চস্থ করে।

২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর লোকশিল্পী সংসদ শক্তি হালদারের পরিচালনায় তুলসীদাস লাহিড়ী রচিত 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার' সংসার নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে। অনুষ্ঠান আরম্ভ করার আগে তুলসীদাস লাহিড়ীর মৃত্যুতে একটি শোকসভায় শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর মেলাঘরে জুনিয়ার বেসিক স্কুল নিজ প্রাঙ্গনে 'একলব্য' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ২৭শে সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকটি এরা একই স্থানে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই নভেম্বর 'দেশের মুক্তি' নাটকটি ধীরেন্দ্রচন্দ্র সূত্রধরের পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ হয়। ১৫ই নভেম্বর 'লাঙ্গল' নাটক (রচনা মন্মথ রায়) ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় এবং প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ত্রিপুর শিল্পায়তন তুলসীবতীর মঞ্চে অভিনয় করে। ২৩শে নভেম্বর সুধাংশুমোহন দত্তর পরিচালনায় বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'ক্ষুধা' ত্রিপুরা পুলিশ বড়দোয়ালী স্কুল মঞ্চে নামায়। ১৭ এবং ১৮ই নভেম্বর নিশিকান্ত বসুরায় রচিত 'ললিতাদিত্য' নাটক বিমল গুপ্তর পরিচালনায় পঞ্চপ্রদীপ নাট্য সংস্থা রামনগর ৫নং রোডে মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে।

৫ই এবং ৬ই ডিসেম্বর মন্মথ রায়ের 'লাঙ্গল' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে পশ্চিমবঙ্গের বন্যার্তদের সাহাযার্থে। ১লা ডিসেম্বর 'গ্রামের বুকে' অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় গোপালনগর সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রে মঞ্চস্থ হয়। ২৭শে এবং ২৮শে ডিসেম্বর বংশী মুখোপাধ্যায় রচিত 'শেষ কোথায়' নাটকটি শিল্পায়ন নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

এছাড়া ১৯৫৯ সনে আরো নাটকের মধ্যে আছে 'রাত্রিশেষ' (নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত), পরিচালক বিমল গুপ্ত, পঞ্চপ্রদীপ নাট্যসংস্থার উদ্যোগে রাম নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। বিমল গুপ্তের পরিচালনায় 'ললিতাদিত্য' (নাটক রচনা নিশিকান্ত বসুরায়) পঞ্চপ্রদীপের প্রযোজনায় বাণীবিদ্যাপীঠে অভিনীত হয়।

।। ১৯৬০ সাল।।

আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে দেখা যাচ্ছে ১৯৬০ সনে কিছু কমবেশী ৫৭টি প্রযোজনা হয়েছে। ৯ই এবং ১০ই জানুযারী 'রাণী জয়াবতী' (রচনা ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী, পরিমার্জিত নাট্যরূপ অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, পরিচালনায় শক্তি হালদার) লোকশিল্পী সংসদের প্রযোজনায় নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৬শে জানুয়ারি 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক জোলাইবাড়িতে - জোলাইবাড়ি মহিলা প্রগতি সংঘ মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৮শে জানুয়ারি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় 'রীতিমত নাটক'-টি প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যামপাসে মঞ্চস্থ করে। ৩০শে জানুয়ারি লোকশিল্পী সংসদ 'আউর ভগবান দেখতা রহে' (বাংলা অনুবাদ নাটক) ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের প্রযোজনায় মধুবন মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২১শে এবং ২২ শে ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত কৌতুক নাটক 'ভাড়াটে চাই' এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ।

২৬শে এবং ২৭শে মার্চ তুলসীদাস লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' শিল্পায়নের প্রযোজনায় নেতাজী সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে এবং ২৯শে মার্চ 'ডাকবাংলো' (মনোজ বসুর গল্প এবং নাটরূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত) প্রযোজনা করেছিলো ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ইন্‌সটিটিউট, পরিচালক ত্রিপুরেশ মজুমদার; নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে।

৫ই এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যটি অধ্যাপিকা শ্রীমতী নীরা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে আলোকসম্পাতে ছিলেন হরিপদ দাস।

৫ই এপ্রিল শিক্ষিকা অমিতা ভট্টাচার্য রচিত ও পরিচালিত ত্রিপুরার ইতিহাসাশ্রিত গীতিনাট্য 'ত্রিপুরগাথা' পুনরায় মঞ্চস্থ হয় মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হলে। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদ্বারা অভিনীত এই নাট্যানুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।

১০ই মে রবীন্দ্রনাথের 'পেটে ও পিঠে' আগরতলা চিলড্রেন্স ক্লাব মঞ্চস্থ করে। ৮ই মে লোকশিল্পী সংসদ নরেশচন্দ্র সাহার পরিচালনায় 'আমাদের গ্রাম' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ৮ই মে রবীন্দ্রনাথের 'রোগের চিকিৎসা' নাটকটিও চিলড্রেন্স ক্লাব মঞ্চস্থ করে।

১৫ই মে ডঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'উল্কা' নাটকটি শ্রী রাণু রায়ের পরিচালনায়

সোনামুড়ার যুবসমাজ সোনামুড়ায় মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১৫ই এবং ১৬ই মে লোকশিল্পী সংসদ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি কবিপক্ষের অর্ঘ্য হিসাবে উমাকান্তর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১০ই মে রবীন্দ্রনাথের 'পেটে-পিঠে' নাটিকাটি চিলড্রেন্স ক্লাব অভিনয় করে।

১২ই জুন মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' নাটক ১নং জুনিয়ার বেসিকের ছাত্রছাত্রীরা উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। ১৮ই জুন শিশু নাটিকা 'বানী' (রচনা স্বপন বুড়ো) শ্রীমতী পান্না চৌধুরীর পরিচালনায় এ্যাডভোকেট ননী চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় শিশু উদ্যানের কমিউনিটি হলে মঞ্চস্থ হয়। ২৭শে জুন 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক জোলাইবাড়ি মহিলা প্রগতি সংঘ জোলাইবাড়ি মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১৭ই জুন রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটক শ্রীমতী রাণী কর-এর পরিচালনায় মেলারমাঠের ছেলেমেয়েদের নিয়ে মেলারমাঠের অভিনীত মঞ্চস্থ হয়।

২৯শে এবং ৩০শে জুন রবীন্দ্রনাথের 'তপতী' (রাজা ও রাণী) শ্যামল চৌধুরীর (দেবব্রত) পরিচালনায় কালচারাল ইউনিট উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৯ই জুলাই মাধব রায় রচিত 'মহাযাত্রী' নাটকটি ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১০ই জুলাই বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'পিতা ও পুত্র' ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি উমাকান্ত ক্যামপাসে মঞ্চস্থ করে। পরিচালনা করেন পি. এন. চ্যাটার্জী।

১৩ই ও ১৪ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক সুধাংশু দত্তর পরিচালনায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর প্রযোজনায় কবি পক্ষের অনুষ্ঠান হিসাবে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৭ই আগষ্ট দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'দুর্গাদাস' নাটক কসমোপলিটন ক্লাবের প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। ৯ই আগষ্ট বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'পিতাপুত্র' ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৬ই আগষ্ট নিত্যনারায়ণ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'ভুল' নাটক দীপ্তেন্দু সেন ও রঞ্জিত ভট্টাচার্যের পরিচালনায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট-এর প্রযোজনায় ইনস্টিটিউটের সামনে মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়। ২০শে এবং ২১শে আগষ্ট সুনীল দত্ত রচিত 'হরিপদ মাষ্টার' কের চৌমুহনীর সঞ্চারী গোষ্ঠী তাদের প্রথম অবদান হিসাবে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৬শে আগষ্ট 'মহাভারতী', (রচনা মন্মথ রায়, পরিচালনায় ত্রিপুরেশ মজুমদার, প্রযোজক ত্রিপুর শিল্পায়তন) মঞ্চস্থ হয় উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে।

১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প অবলম্বনে 'মহেশ' নাটকটি আসাম দুর্গত সাহায্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কমিটি কর্তৃক নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৯শে এবং ২০শে সেপ্টেম্বর 'প্রফুল্ল' নাটক ইঞ্জিনিয়ার অনিল সেনের পরিচালনায় প্রচার বিভাগের প্রযোজনায়, স্থানীয় শিল্পীদের সহযোগিতায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই অক্টোবর 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি বাণী সংঘ পূর্ব আগরতলা মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে। ৬ই অক্টোবর 'বাঙালি' নাটকটিও এরা মঞ্চস্থ করে। ১৭ই অক্টোবর 'যাত্রা হলো শুরু' নাটকটি অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় গোপালনগর সমাজশিক্ষা কেন্দ্র গোপালনগরের মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে। ১৮ই অক্টোবর রাধামোহন দে-র পরিচালনায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' নাটকটি ত্রিপুরী (ককবরক) ভাষায় অনুবাদ করে লেঙ্গুফা প্রাঃ স্কুল প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করা হয়। উত্তর ত্রিপুরায় নাটকটি আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৫ই অক্টোবর 'মঙ্গু' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় এবং ভারত সরকারের সঙ্গীত ও নাট্যশাখার প্রযোজনায় বিশালগড়ে এবং ১৬ই অক্টোবর বিশ্রামগঞ্জে মুক্তমঞ্চে লোকশিল্পী সংসদের দ্বারা অভিনীত হয়।

৫ই নভেম্বর 'মঙ্গু' নাটকটি লোকশিল্পী সংসদ শক্তি হালদারের পরিচালনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। উদ্যোক্তা ভারত সরকারের সঙ্গীত এবং নাটক বিভাগ।

১৪ই নভেম্বর অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় 'ললিতাদিত্য' নাটক গোপালনগর চা বাগানের কর্মীবৃন্দ গোপালনগরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে। ১৫ই নভেম্বর 'কালাপাহাড়' নাটক নলিনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় গোপালনগর চা বাগানের কর্মীবৃন্দ ঐ স্থানেই মঞ্চস্থ করে।

১৯শে নভেম্বর ধনঞ্জয় বৈরাগীর রচিত 'একপেয়ালা কফি' ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাব বড় দোয়ালীর কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে নভেম্বর 'দিশারী' নাটক শক্তি হালদারের পরিচালনায় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে লোকশিল্পী সংসদ শিশু উদ্যানের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৫শে নভেম্বর সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' ত্রিপুরেশ মজমদারের পরিচালনায় এবং প্রচার বিভাগের উদ্যোগে শিশুউদ্যানে ত্রিপুর শিল্পায়তন মঞ্চস্থ করে।

২৪শে নভেম্বর ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন মন্মথ রায়ের নাটক 'লাঙ্গল' শিশুউদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

১৮ই নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'নটীরপূজা' তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় স্কুল ক্যাম্পাসে অভিনয় করে।

৪ঠা ডিসেম্বর শিল্পায়ন প্রচার বিভাগের উদ্যোগে শিশুউদ্যানে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প অবলম্বনে নাটক 'জীবনস্রোত' মঞ্চস্থ করে।

৬ই ডিসেম্বর বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'অমৃত অতীত' নাটকটি সুধাংশু মোহন দত্তর পরিচালনায় পঞ্চপ্রদীপ প্রযোজনা করে।

১৬ই ডিসেম্বর উমানাথ ভট্টাচর্যর 'জল' নাটকটি প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ত্রিপুরা সরকারী কর্মচারী সমিতি শিশুউদ্যানের প্রদর্শনী মঞ্চে অভিনয় করে।

১৮ই ডিসেম্বর 'শতাব্দীর স্বপ্ন' শক্তি হালদারের পরিচালনায় প্রচারবিভাগের উদ্যোগে লোকশিল্পী সংসদ শিশুউদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই ডিসেম্বর শরৎচন্দ্রের 'মহেশ'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করে শিল্পায়ন প্রচার বিভাগের উদ্যোগে, স্থান শিশুউদ্যানের প্রদর্শনী মঞ্চ।

এছাড়া এবছর 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কুলাই হাইস্কুল কুলাই মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে। ২৯শে মার্চ 'কাজলগড়' নাটক মৃণাল দত্ত ও সুবিমল দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় মোহনপুরের মুক্তমঞ্চে অভিনয়।

রবীন্দ্রনাথের 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য রাণা ডাহাল জঙ্গ বাহাদুর এবং প্রণতি রাণা ও মাধুরী রাণার পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পীসংহতি তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

এবছর বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

মৃণালকান্তি চক্রবর্তীর পরিচালনায় শিশুমহলের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের 'জুতা আবিষ্কার' নাটকটি হয় রবীন্দ্র পল্লীর মুক্তমঞ্চে।

।। ১৯৬১ সাল ।।

১৮ই জানুয়ারি মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' নৃত্যনাট্যটি লোক শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় এবং ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। সঙ্গীত ভারতীর সহযোগিতায় নৃত্যনাট্যটি পরিপূর্ণ রূপ পায়।

১৯শে জানুয়ারি লোকশিল্পী সংসদ মন্মথ রায়ের 'জটা গঙ্গার বাঁধ' নাটকটি প্রবীন পরিচালক সুধাংশুমোহন দত্তর পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। ২৩শে জানুয়ারি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন প্রচার বিভাগের উদ্যোগে বড় দোয়ালীর কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে। ২৯শে জানুয়ারি সরকারী কর্মচারী সমিতির সোসিও-কালচারাল ইউনিট নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'রাত্রি শেষ' নাটকটি প্রচার বিভাগের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে জানুয়ারি 'পরশুরামের চিকিৎসা সংকট' নাটক ভি. এম. হাসপাতালের উদ্যোগে

হাসপাতাল প্রাঙ্গণে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন ডাঃ এস. কে. দে।

৬ই ফেব্রুয়ারি বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তনের প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে পুনরভিনীত হয়। এখানে ত্রিপুরার বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরীকে মূল অভিনেতা হিসাবে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়।

এরপর মার্চ-এপ্রিল মাসে কোনো নাটক অভিনয়ের তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি। নাট্য সংগঠনগুলি তখন রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে যোগদানের জন্য অথবা নিজেরা শতবর্ষ অনুষ্ঠান পালন করার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী নাট্য উৎসব

৫ই মে, ২২শে বৈশাখ এম বি বি কলেজের রবীন্দ্রভবনে কলেজের ছাত্রগণ রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুন্ঠের খাতা' অভিনয় করে।

৬ই মে, ২৩শে বৈশাখ এম বি বি কলেজ হলেই কলেজের ছাত্রীগণ রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি মঞ্চস্থ করে।

৭ই মে, ২৪শে বৈশাখ সাহিত্য-বাসর মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা'।

৮ই মে, ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প 'দালিয়া' (নাট্যরূপ বুদ্ধদেব বসু), মঞ্চস্থ করে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ তাদের সংস্কৃতি ভবনে।

১২ই মে, ২৯শে বৈশাখ 'রাজা রাণী' নাটকটি তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ তাদের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই মে, ৩০শে বৈখাখ রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকটি মহাত্মাগান্ধী স্কুল তাদের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই মে ৩১শে বৈশাখ উমাকান্ত একাডেমী তাদের ক্যাম্পাসে 'শারদোৎসব' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ ১নং নিঃ বুঃ বিদ্যালয় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে রবীন্দ্রনাথের 'পেটে ও পিঠে' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

১৬ই মে, ২রা জ্যৈষ্ঠ 'ডাকঘর' নাটকটি বিজয়কুমার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই মে, ৩রা জ্যৈষ্ঠ 'বীরপুরুষ' নাটক উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে ৪নং নিঃ বুঃ

বিদ্যালয়। এই তারিখেই 'মুকুট' নাটকটি বোধজং ক্যাম্পাসে বোধজং বিদ্যালয় মঞ্চস্থ করে।

১৮ই মে, ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ 'নকল গড়' নাটক প্রগতি বিদ্যাভবন তাদের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৯শে মে, ৫ই জ্যৈষ্ঠ 'মালিনী' নাটক বাণী বিদ্যাপীঠ উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে মে ১০ই, জ্যৈষ্ঠ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি সঙ্গীত ভারতী উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে মে. ১৩ই জ্যৈষ্ঠ শক্তি হালদারের পরিচালনায় ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের কর্মচারী এবং রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী কমিটির দ্বারা 'দালিয়া' মঞ্চস্থ করা হয়। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প দালিয়ার নাট্যরূপ দেন বুদ্ধদেব বসু। এটাই শতবার্ষিকী কমিটির নাট্য উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। উৎসব কমিটি ছাড়াও শহরের বিভিন্ন সংগঠন বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র নাটকের ব্যাপক অভিনয় করতে থাকে।

দালিয়ার একটি দৃশ্য

২৯শে মে, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বিসর্জন নাটকের অংশ বিশেষ ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৬শে মে ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে শিশুমহলের শিশুরা ডাঃ প্রভাসচন্দ্র ধরের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের পদ্য 'জুতা আবিষ্কার' (নাট্যরূপ মৃণাল চক্রবর্ত্তী) অভিনয় করে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে।

বড়দোয়ালী স্কুল পৃথকভাবে রবীন্দ্র শতবর্ষে এক গুচ্ছ নাটক মঞ্চস্থ করে তাদের সংস্কৃতি ভবনে। ৮ই মে 'ডাকঘর' নাটকটি ছাত্রবৃন্দের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়। ১৩ই 'নটীরপূজা' উপহার দেয় ছাত্রীবৃন্দ। ১৪ই মে 'মুকুট' একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা অভিনয় করে। ১৮ই মে 'মুকুট' বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্ররা অভিনয় করে। ২১ ও ২২শে মে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অবশ্য এই মহৎ উদ্যোগের পিছনে বিদ্যালয়ের প্রাণ পুরুষ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব শ্রীযুক্ত বারীন চ্যাটার্জী মহাশয়ের আগ্রহ এবং চেষ্টাই ছিল সমধিক। ১৮ই মে 'নকলগড়' প্রগতি বিদ্যাভবনে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা অভিনয় করে।

২৬শে মে 'মুকুট' নাটকটি ভূপেশ চৌধুরীর পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্কুল প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৬শে মে 'ছুটি' নাটক শিশুমহল উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

রসচক্র ২৫শে মে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য বড়দোয়ালী স্কুল কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

৬ই মে সাবরুম কালচারাল ইউনিট সুবিমল রায় ও নির্মল ভট্টাচার্যের পরিচালনায় 'ঋতুরঙ্গ' নাটকটি সাবরুমে মঞ্চস্থ করে।

২৬শে মে 'সাক্ষী' নাটক কৃষ্টিভবনে মৌচাকের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। ১৭ই মে এরা 'হাস্যকৌতুক' নাটকটিও এই মঞ্চে অভিনয় করে।

১০ই মে কলকাতার সুরমন্দির সংস্থা এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে 'শ্যামা' নৃত্য নাট্যটি মঞ্চস্থ করে। ১১ই মে এখানেই শ্যামা পুনরায় মঞ্চস্থ করে তারা।

১লা জুন 'ছুটি' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সবুজ সাথীর প্রযোজনায় উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ দেন পরিচালক নিজেই।

৩রা, ৪ঠা ও ৮ই জুন বিসর্জন নাটকটি বারীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় রসচক্র বড়দোয়ালী স্কুলপ্রাঙ্গণে কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ করে।

৯ই এবং ১০ই জুলাই 'বিসর্জন' সুধাংশুমোহন দত্তর পরিচালনায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর প্রযোজনায় প্রগতি বিদ্যামন্দিরের জ্ঞানমন্দিরে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে ঠাকুর নবদ্বীপ দেববর্মা সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

২৯শে এবং ৩০শে জুলাই 'শ্রেয়সী' (কাহিনী সুবোধ ঘোষ, নাট্যরূপ দেবনারায়ণ গুপ্ত) সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সঞ্চারীর প্রযোজনায় কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ হয়। রূপসজ্জায় ছিলেন সুখেন গাঙ্গুলী।

২০শে আগষ্ট ভারতীয় জীবনবীমা করপোরেশনের উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' নাটক সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই এবং ৬ই আগষ্ট 'বিসর্জন' নাটকটি শিল্পায়ন মঞ্চস্থ করে নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে রবীন্দ্র শতবর্ষের অঙ্গ হিসাবে। নাটকটি পরিচালনা করেন শিবদাস বন্দোপাধ্যায়।

১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট প্রমথনাথ বিশি রচিত 'পারমিট' নাটকটি মৌচাকের উদ্যোগে কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

এবছরে লোকশিল্পী সংসদ 'শেষরক্ষা' নাটক মঞ্চস্থ করে। শিশুমেলা মঞ্চস্থ করে 'মনসা বন্দনা'। ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাব উপহার দেয় 'মমতাময়ী হসপিটাল'। সবুজ সংঘের উদ্যোগে ভারত যুবসমাজ জয়নগর শাখার প্রযোজনায় এবং সুধীন আচার্যর পরিচালনায় 'গুরু দক্ষিণা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

। ১৯৬২ সাল।

ত্রিপুরা পুলিশ ড্রামাটিক ক্লাব ২৬শে জানুয়ারি বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'মাটিরঘর' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এই মাসে শিল্পী সংসদ ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'এক পেয়ালা কফি' নাটকটি শিশু উদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই ফেব্রুয়ারি সুনীল ভঞ্জ রচিত 'কিন্তু কেন' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় শিশু উদ্যানে। প্রযোজনা ছিল 'সঞ্চারী'-এর এবং রূপসজ্জায় ছিলেন সত্য নন্দী।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ডি এল রায়ের 'সাজাহান' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে। প্রযোজক ত্রিপুর শিল্পায়তন।

১১ই মার্চ মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'মহারাজ নন্দকুমার' নাটকটি হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় কৃষ্টি গোষ্ঠীর প্রযোজনায় কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ হয়। এটি তাদের প্রথম অবদান।

১০ই মে সুনীল দত্ত রচিত 'অঙ্কুর' নাটকটি ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যালয়, তেলিয়া মুড়া-য় মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এবং ১১ই মে 'স্যাক্রিফাইস' (বিসর্জনের ইংরেজি) নাটক বারীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকারের প্রযোজনায় এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

১২ই মে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'বারো ভূতে' নাটকটি ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরীর পরিচালনায় শিল্পনগরীর কর্মীরা শিল্প উপনগরীতে কার্যপরিচালক শ্রীরবীন মজুমদারের বিদায় উপলক্ষে মঞ্চস্থ করে।

৮ই মে রবীন্দ্রনাথের 'চিরকুমার সভা' সাহিত্য বাসবের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

৮ই জুন এবং ৯ই জুন মহারাজ বীরবিক্রম সুরমন্দিরের নবনাট্যম শাখা প্রথম দিন অজিত মজুমদারের পরিচালনায় যুগান্তর এবং দ্বিতীয় দিন পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' সবিতা মজুমদারের পবিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

১৩ই জুন অজিত মজুমদার রচিত এবং পরিচালিত 'পরিণতি' নাটকটি শিল্পশ্রীর প্রথম অবদান হিসাবে মঞ্চস্থ হয়।

এ মাসেই স্থানীয় নাট্যকার ডি এস পি তারকেশ্বর গাঙ্গুলী রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রাতের বন্ধু' সারা ভারত পুলিশ কল্যাণ সংসদ কর্তৃক অভিনীত হয়। নাটকটি শ্রীনগর (কাশ্মীর) নাট্য প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করে।

২রা জুলাই ১৯৬২ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'চৌধুরী বাড়ি' নাটকটি ত্রিপুর শিল্পী সংহতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই জুলাই অজিত মজুমদার রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'কালমেঘ' শিল্পশ্রীর প্রযোজনায় বড়দোয়ালী স্কুল মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৫ই আগস্ট 'বিদ্রোহী' নাটকটি কিরণশশী চৌধুরী এবং অমললাল চৌধুরীর যুগ্ম-পরিচালনায় মোহনপুর তরুণ সংঘ মোহনপুরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে। এর আগে ১লা আগষ্ট 'কার দোষ' নাটকটি ইন্দুভূষণ ব্যানার্জী এবং ফনীভূষণ রায়ের যুগ্ম পরিচালনায় মোহনপুর বিদ্যালয় মাঠে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২০শে সেপ্টেম্বর ভানু চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আজকাল' নাটকটি মানসরঞ্জন ভট্টাচার্যর পরিচালনায় সি টি টি আই তাদের অফিস প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

৮ই অক্টোবর 'সাজাহান' নাটকটি জীবনকুমার সান্যালের পরিচালনায় বিমানঘাঁটি ড্রামাটিক ক্লাব বিমানবন্দর প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

২৮শে এবং ২৯শে অক্টোবর শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র রচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' শক্তি হালদারের পরিচালনায় লোকশিল্পী সংসদ চীনা আক্রমনের প্রতিবাদ সভায় মঞ্চস্থ করে উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে।

২৭শে নভেম্বর 'স্নেহের জয়' নাটকটি যতীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং কানাইলাল দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন মোহনপুরে মঞ্চস্থ করে।

২৮শে নভেম্বর 'অবিচার' নাটক কানাইলাল দত্তর পরিচালনায় মোহনপুরের প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন মোহনপুরে মঞ্চস্থ করে।

এই মাসে অগ্নি আচার্য রচিত এবং সুধীন আচার্য পরিচালিত 'যাত্রা হল শুরু' নাটকটি শিবাজী সংঘের উদ্যোগে জয়নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

গোপীপদ ভট্টাচার্য রচিত 'মুক্তিপথে' নাটকটি এ মাসে সুধীন আচার্যর পরিচালনায় এবং নবোদয় সংঘের উদ্যোগে জয়নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

।। ১৯৬৩ সাল।।

১লা জানুয়ারি অশোককুমার দত্ত পরিচালিত নাটক 'গ্রামেরবুকে' মোহনপুরের প্রাক্তন ছাত্র সংগঠন মোহনপুরে মঞ্চস্থ করে।

৫ই জানুয়ারি দিগীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সীমান্তের ডাক' নাটকখানি ত্রিবেণী শিল্পী সংসদ, সংঘের প্রথম নাটক হিসাবে সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

৩রা ফেব্রুয়ারি 'উত্তরা অভিমন্যু' তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে 'চ্যারিটি শো' হিসাবে অভিনীত হয়। এই নাটক অভিনয় করে বিদ্যালয় প্রতিরক্ষা তহবিলে বারোশত টাকা দান করে।

২১শে ফেব্রুয়ারি 'সীমান্তের ডাক' নাটক অধ্যাপক মোহিত পুরকায়স্থ, অধ্যাপক সুখময় ঘোষ ও বামাপদ মুখোপাধ্যায়-এর যৌথ পরিচালনায় এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ কর্তৃক কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই মে রবীন্দ্রনাথের 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটি কুলাই-এ মঞ্চস্থ হয়। এরা ১১ই মে কুলাই নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকটি অভিনীত হয়।

১৩ই মে 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি সুনীল দের পরিচালনায় সোনামুড়া সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা সোনামুড়ার মুক্তমঞ্চে প্রদর্শন করে।

১লা জুন এবং ২রা জুন অনিলবরণ দত্ত রচিত 'বন্যা' নাটকটি ত্রিপুর শিল্পী সংহতি উত্তরায়ণ শিল্পী সমাজের উদ্যোগে কুমার বঙ্কিমকিশোর দেববর্মা তাঁর লেকচৌমুহনীস্থিত বাড়ির প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করান।

৮ই জুন 'কেদার রায়' নাটক অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় মোহনপুরে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই জুন 'লবনাক্ত' নাটক মঞ্চস্থ হয় আই এ সির আগরতলা শাখার উদ্যোগে তুলসীবতী ক্যাম্পাসে। এঁদের অভিনীত প্রথম নাটক 'দুই মহল'। লবনাক্ত নাটকটি রচনা করেন পৃথীশ সরকার।

৫ই জুন 'শহুরে মামা' নাটকটি অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ মোহনপুরে মঞ্চস্থ করে।

আলোকময় দত্তর পরিচালনায় ২৮শে জুলাই 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি মোহনপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়। ২৯শে জুলাই 'বাংলার শেষ নবাব' নাটকটি মোহনপুর যুবকংগ্রেসের সদস্যগণ মোহনপুরে মঞ্চস্থ করেন। এ নাটকটিও আলোকময় দত্ত পরিচালনা করেন।

১০ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' নৃত্যনাট্য ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের নৃত্যভানুশাখা মহারানী তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে জুলাই আলোকময় দত্তর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি মোহনপুর সরকারী কর্মচারীগণ মোহনপুরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

৬ই আগষ্ট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'বিপ্রদাস' (নাট্যরূপ ও পরিচালনায় অধ্যাপিকা নীরা চট্টোপাধ্যায়) বিচিত্রার উদ্যোগে এবং এই সংস্থার সাহাযার্থে এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

১২ই এবং ১৫ই আগষ্ট বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই আগষ্ট 'সিরাজের স্বপ্ন' সেন্ট্রাল জেলের উদ্যোগে কারাবাসীগণ স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে জেল অভ্যন্তরে মঞ্চস্থ করে।

সেপ্টেম্বর মাসে প্রশান্ত চৌধুরী রচিত 'প্রত্যাবর্তন' নাটক ইঞ্জিনিয়ার অনিল সেন এবং বীরেশচন্দ্র ভট্টাচার্যর পরিচালনায় উদয়পুর পূর্তবিভাগ তাদের অফিস প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদ এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

৭ই নভেম্বর ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'লালপাঞ্জা' নাটক বন্যাত্রাণের জন্য সোনামুড়ার শিল্পীবৃন্দ সোনামুড়ার মুক্তমঞ্চে মঞ্চস্থ করে।

এই বছরে 'ফিরে চল মাটির টানে' পল্লীগীতি নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। রচনা অজিত মজুমদার, পরিচালনা অমিয় দাশ, হিমাংশু চক্রবর্তী এবং অজিত মজুমদার। উদ্যোক্তা সুরমন্দির।

'মায়ের ডাক' নাটক সীমানা মতাই ক্লাবের উদ্যোগে অশোককুমার দত্ত-র পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

।। ১৯৬৪ সাল।।

১১ই এবং ২৮শে জানুয়ারী 'আগাছা' নাটকটি অশোককুমার দত্ত-র পরিচালনায় মোহনপুরের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ মোহনপুর তরুণ সংঘের উদ্যোগে মোহনপুর মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৬শে জানুয়ারী 'বিজয়বসন্ত' নাটক সন্তোষ মজুমদারের পরিচালনায় গোপালনগর প্রাইমারী বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।

২৭শে জানুয়ারী 'নতুন দিনের আলো' নাটকটি অশোক কুমার দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের মহিলা শিল্পীরা মঞ্চস্থ করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী জিতেন্দ্রনাথ বসাক রচিত 'মানুষ' সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিল্পী সংগঠকের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী অনিলবরণ দত্ত রচিত 'বন্যা' নাটকটি উত্তরায়ণ শিল্পী সমাজ শিশু উদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'কবি' নাটক চিদানন্দ গোস্বামীর পরিচালনায় শিল্পীবাসর শিশুউদ্যানের মঞ্চস্থ করে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ।

২৩শে ফেব্রুয়ারী 'আমাদের গ্রাম' এবং দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সীমান্তের ডাক' নাটক দুটি অল ইন্ডিয়া রেডিওর সঙ্গীত ও নাটক বিভাগের উদ্যোগে লোকশিল্পী সংসদের প্রযোজনায় শিশু উদ্যানের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

এমাসে 'বাণী' নাটকটি জনার্দন ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ঈশানপুর বুনিয়াদী বিদ্যালয় মঞ্চস্থ করে। এখানে ভুবন ভৌমিকের পরিচালনায় 'আগাছা' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়।

২রা মার্চ প্রণাবি-র ঋণং কৃত্বা নাটক এ. গুপ্তর পরিচালনায় নরসিংগড় পলিটেকনিক

ইন্সটিটিউট মঞ্চস্থ করে। এখানে ওরা মার্চ 'The Bishops Candlesticks' (রচনা Norman Mckinnel) এস. সি. তলাপাত্রর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই মার্চ 'রাজা সীতারাম' ভূপেশ চৌধুরীর পরিচালনায় মোহনপুরে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই এবং ১২ই মার্চ সলিল সেন রচিত 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি পি. এন. চ্যাটার্জীর পরিচালনায় কৃষ্টি গোষ্ঠির প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৪ই মার্চ 'নীলকণ্ঠ পাখি' নাটক শান্তিরঞ্জন ঘোষের পরিচালনায় মোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ হয়।

২২শে মার্চ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় প্রচার দপ্তরের উদ্যোগে ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই মার্চ তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটি চিদানন্দ গোস্বামীর পরিচালনায় শিল্পীবাসরের প্রযোজনায় ক্যানসার তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে দ্বিতীয়বার মঞ্চস্থ হয়।

৭ই এপ্রিল ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি সাবরুম মহকুমার শিল্পীরা মুখ্যমন্ত্রীর ক্যানসার তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সাররুমে মঞ্চস্থ করে।

১০ই এপ্রিল অজিত মজুমদারের রচনা ও পরিচালনায় 'ফিরে চল মাটির টানে' সুর মন্দিরের প্রযোজনায় রাজপ্রাসাদ চত্বরে মঞ্চস্থ হয়।

এ মাসে কিরণ মৈত্রের 'সংকেত' নাটকটি দক্ষিণ বিভাগ পুলিশ ও গ্রামরক্ষী বাহিনী সোনামুড়ায় মঞ্চস্থ করে। ৬ই মে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' বনশ্রী রায়চৌধুরী এবং বানীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর যৌথ পরিচালনায় এম বি বি কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই মে 'আমি অফিসার হব' (রচনা নিতাই মল্লিক, পরিচালনা প্রাণগোপাল গোস্বামী) নাটকটি শান্তির বাজার বিলোনীয়া শিল্পশিক্ষণ কেন্দ্রে মঞ্চস্থ হয়।

১৪ এবং ১৫ই মে দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত এবং হীরালাল সেনগুপ্ত পরিচালিত 'তাপসী' নাটকটি শিল্পী সমাজের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যামপাসে মঞ্চস্থ হয়। ঘোষিত পরিচালক হিসাবে এই নাটকে শ্রীসেনগুপ্ত প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

১৬ই মে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'এমন দিন আসতে পারে' নাটকটি বি বি সি উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। এই দিন তারা ছোটদের নাটক স্বপনবুড়ো রচিত 'ফুল ফোটার ছন্দ' নাটকটি-ও মঞ্চস্থ করে।

২৬শে মে 'সবাই মানুষ' নাটকটি অশোককুমার দত্ত পরিচালনায় মোহনপুর প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের দ্বারা মোহনপুরে মঞ্চস্থ হয়।

১৪ই জুন ছবি বন্দোপাধ্যায়ের 'স্ট্রীট বেগার' নাটকটি সুরমন্দির উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই জুন নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'উল্কা' নাটকটি সুরবিতানের প্রযোজনায় বিলোনীয়ার ইন্দ্রপুরী প্রেক্ষাগৃহে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই জুন সৌমেন চট্টোপাধ্যায়ের 'শেষ প্রহর' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই জুন শ্যামসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'জীবন সংগ্রাম' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় আগরতলা কের চৌমুহনীর কিশলয় সংস্থার উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে জুন ব্রজেন দে রচিত 'বীর বাঙালী' দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আগরতলা ভট্টপুকুরে শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই জুলাই জলধর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'শক্তির মন্ত্র' নাটকটি দিলীপ সরকার এবং তুলসী দত্তর যৌথ পরিচালনায় ভাইবোন সংঘ বিজয়কুমার স্কুল প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে মেয়েদের দ্বারা অভিনয় করায়।

৪ঠা এবং ৫ই জুলাই শক্তিপদ রাজগুরু রচিত 'মেঘে ঢাকা তারা' নাটকটি লোকশিল্পী সংসদের প্রযোজনায় নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন বিজিতা গাঙ্গুলী। সংসদের তিনিই প্রথম মহিলা পরিচালিকা।

১২ই জুলাই অনিলবরণ দত্ত রচিত 'স্বীকৃতি' নাটকটি আগরতলা ধলেশ্বরের নাট্যশিল্পী সংসদ উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই আগষ্ট 'মাটির ক্ষুধা' নাটকটি করুণাময় সেনের পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই আগষ্ট হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার গ্রন্থনা ও পরিচালনায় পি ডব্লিউ ডি রিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে 'জয়তু ভারত ' গীতি আলেখ্যটি উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই আগষ্ট অশোক দত্তর পরিচালনায় 'গ্রামের বুকে' নাটকটি বিজয়নগর সমাজশিক্ষা কেন্দ্রে মঞ্চস্থ হয়।

৬ই সেপ্টেম্বর কিরণ মৈত্রের 'নাটক নয়' রাধারঞ্জন চৌধুরীর পরিচালনায় তেলীয়ামুড়ার শিক্ষাকর্মীরা স্থানীয় মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১২ই সেপ্টেম্বর 'গভঃ ইনসপেক্টর' নাটকটি দুলাল রায়চৌধুরীর পরিচালনায় সাবরুমের শিক্ষক শিক্ষিকাদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এবং ১১ই সেপ্টেম্বর নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'বহ্নিশিখা' নাটকটি উত্তরায়ণ শিল্পী সমাজের প্রযোজনায় কুমার বঙ্কিমকিশোর দেববর্মার গৃহপ্রাঙ্গণে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৭ই অক্টোবর মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহাক্ষুধা' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় এবং শিল্পী সংগঠনীর প্রযোজনায় নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই অক্টোবর ডি এল রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি নৃপেন পাল ও সন্ধ্যারানী ভট্টাচার্যর যৌথ পরিচালনায় কুলাইবাজার নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই অক্টোবর 'সিরাজদৌল্লা' নাটক গৌরী পুরকায়স্থর পরিচালনায় কুলাইবাজার মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৩১শে অক্টোবর উৎপলেন্দু সেনের 'পার্থ সারথি' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শঙ্কর চৌমুহনীতে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে সূত্রধার ছিলেন হীরালাল সেন।

৭ই নভেম্বর ব্রজেন্দ্র দের 'শেষ আরতি' নাটকখানি বিমল গুপ্তর পরিচলনায় রামনগরে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৭ই এবং ৮ই নভেম্বর শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনী আগরতলা পুলিশ ব্যারাকে মঞ্চস্থ করে। (শিল্পী স্বদেশ পাল, শ্যামল চৌধুরী এবং ইরা ব্যানার্জীর অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল)।

১৯শে এবং ২০শে ডিসেম্বর জলধর চট্টোপাধ্যায়ের 'রীতিমত নাটক' মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের ছাত্ররা তাদের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

২১ শে এবং ২২শে ডিসেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের 'আলিবাবা' নাটকটি অধ্যাপক বিজন চৌধুরী, সরোজ চৌধুরী, জ্যেতির্ময় দত্ত, সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য, বনশ্রী রায়চৌধুরী দ্বারা গঠিত কমিটির পরিচালনায় এম বি বি কলেজের ছাত্রদের দ্বারা অভিনীত হয় কলেজের রবীন্দ্র হলে।

২২শে ডিসেম্বর 'দানবীর হরিশচন্দ্র' নাটকটি মোহরছড়া নাট্য সংস্থা তেলিয়ামুড়ার মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

এ বছরে স্বপনবুড়ো রচিত 'তপস্যা ও মাটির প্রদীপ' নাটকটি বিভূতি চৌধুরীর পরিচালনায় বাগবাসায় মঞ্চস্থ হয়।

'উৎসব' নাটকটি সত্যগোপাল গাঙ্গুলীর পরিচালনায় কলাগাছিয়ায় মঞ্চস্থ হয়।

এবছর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ভাড়াটে চাই' নাটকটি সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়-এর পরিচালনায় কৈলাশহর আর কে ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক সুধীরকুমার দত্তর উদ্যোগে শিক্ষাঙ্গনে মঞ্চস্থ করা হয়। সত্যগোপাল গাঙ্গুলীর পরিচালনায় 'বাণী' নাটকটি কলাগাছিয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়। পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'সর্পিল' নাটক পরেশ নাথ চ্যাটার্জীর পরিচালনায় বীরেন্দ্র ক্লাবের সাহায্যার্থে কৃষ্টি গোষ্ঠির উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

।। ১৯৬৫ সাল ।।

২৮শে জানুয়ারী' ৬৫ অশোক দত্ত পরিচালিত 'গুরু-দক্ষিণা' নাটকটি মোহনপুর প্রাইমারী বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।

মোহনপুরে মহিলা শিল্পীবৃন্দ অশোক দত্তর পরিচালনায় ২৯শে জানুয়ারী 'মাটির ঘর' নাটকটি মোহনপুরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে। ৩০শে জানুয়ারী অশোক দত্তর পরিচালনায় 'স্নেহের জয়' নাটকটি মোহনপুর মৈত্রী সংঘের উদ্যোগে মোহনপুর ব্লক প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৭ই ফেব্রুয়ারী 'বন্দী বীর' নাটকটি ভুবন ভৌমিকের পরিচালনায় ঈশানপুর উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়। ভুবন ভৌমিকের পরিচালনায় 'বাণী' নাটকটি ৮ই ফেব্রুয়ারী এখানে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী 'কয়েদী' নাটকটি সার্ভে-সেটেলমেন্ট বিভাগ মনুবাজারে মঞ্চস্থ করে।

৩রা এবং ৪ঠা এপ্রিল সলিল সেনের 'মৌ-চোর' নাটকটি সুধাংশু দত্ত-র (বড়দা) পরিচালনায় ত্রিপুরা সম্মিলিত চারুশিল্পী কল্যাণ সংসদ এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে। নাটকটির সাংগঠনিক দায়িত্ব ছিল শক্তি হালদারের উপর। এই নাটকে সংগৃহীত অর্থ ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

১৪ই এপ্রিল সুধীন আচার্যর পরিচালনায় 'কেদার রায়' নাটকটি শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে রামনগর ৪নং রাস্তার মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৯ই মে শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে' বিনোদ কিলিকদারের পরিচালনায় ফটিকরায়ে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই মে 'অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাটকটি এন সি সি কমান্ডার মাখন দাসের পরিচালনায় ফটিকরায়ে মঞ্চস্থ হয়।

২০শে মে অরুণকুমার দে রচিত 'কার দোষ' নাটকটি স্বদেশরঞ্জন পাল পরিচালনা করেন; সর্বোদয় নেতা ক্ষীরোদ সেন এবং গান্ধী সেবক সমিতির উদ্যোগে শিবানী সংঘ কর্তৃক আগরতলা জয়নগরে এটি মঞ্চস্থ হয়।

২২শে মে অগ্নিকুমার আচার্য রচিত 'যাত্রা হোল শুরু' নাটকটি জয়নগরে ভারত যুবসমাজ কর্তৃক মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২৩শে মে রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' এল আই সি রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৩শে মে রবিদাস রায় রচিত 'গ্রামের বুকে' নাটকটি ভারত যুবসমাজের মহিলা সদস্যারা জয়নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৪শে মে 'মরার আগে মরব না' নাটকটি ভারত যুবসমাজ কর্তৃক জয়নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২৯শে মে আগন্তুক রচিত 'শতাব্দীর স্বপ্ন' মধুসূদন সাহার পরিচালনায় সাব্রুম যুবশিল্পী গোষ্ঠী সাব্রুম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ করে।

১লা জুন অরুণকুমার দেব রচিত 'কার দোষ' নাটকটি আগরতলা মেলারমাঠ ত্রিবেণী সংঘের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৩রা জুন নিতাই সেনগুপ্ত রচিত 'ছেলে কার' নাটকটি অমলেন্দু রক্ষিতের পরিচালনায় কলাকার গোষ্ঠী বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ করে।

৬ই জুন শৈলেশ গুহ নিয়োগীর 'বৌদির বিয়ে' নাটকটি অগ্রগতি সংসদের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৭ই জুন উৎপল দত্ত রচিত 'মেঘ' নাটকটি অগ্রগতি সংসদের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই জুন 'নীরবে নিভৃতে' নাটকটি খোয়াই টাউন ক্লাবের প্রযোজনায় খোয়াইতে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এবা ১১ই জুন 'লাল পাঞ্জা' নাটক সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে অভিনীত হয়।

১৪ই জুন ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'আগাছা' নাটকটি মানিকলাল সরকারের পরিচালনায় উদয়সংঘ ক্লাব উদয়পুর হাসপাতাল প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

৫ই সেপ্টেম্বর 'বিজয়সিংহ' নাটকটি ছামনুতে মঞ্চস্থ হয়।

৬ই এবং ৭ই সেপ্টেম্বর বিজয়সিংহ নাটকটি সাবরুমের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ সাবরুমে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করেন।

৮ই অক্টোবর নন্দগোপাল রায়চৌধুরী রচিত 'কুরুক্ষেত্রের পরে' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিল্পী সংগঠনীর প্রযোজনায় শঙ্কর চৌমুহনীর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৫ই নভেম্বর অজিত মজুমদার রচিত এবং পরিচালিত 'মায়ের ডাক' নাটকটি ত্রিপুরা রাজ্য ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ একটি দৃশ্যে অংশগ্রহণ করেন। সমিতি ঐ দিন মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৩০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

১৪ই নভেম্বর সাবিত্রী মুখোপাধ্যায় রচিত 'জাগরণ' নাটকটি মেলাঘর সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা মেলাঘরে মঞ্চস্থ করে।

২৬শে এবং ৩০শে ডিসেম্বর ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'সৈনিক' নাটকটি বামাপদ মুখার্জী,

সরোজ চৌধুরী এবং জলধর মল্লিকের পরিচালনায় মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের ছাত্রসংসদের উদ্যোগে কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর 'হরিশ্চন্দ্রের শ্মশান মিলন' নাটক বাইশঘরিয়া জনগণ এবং নঈতালিম বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করেন।

এই বছর 'বাংলার শেষ নবাব' নাটকটি জ্যেতির্ময় দেব-এর পরিচালনায় কমলপুর ব্লক সমাজশিক্ষা শাখার প্রযোজনায় হালহালি জেবি স্কুলে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি ব্লকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

।। ১৯৬৬ সাল।।

১লা জানুয়ারী' ৬৬ রবীন্দ্রনাথের 'গান্ধারীর আবেদন' নাটকটি অধ্যাপক বিজন চৌধুরী, বাণীকন্ঠ ভট্টাচার্য, দীনেশ দাশ, এবং বনশ্রী রায় চৌধুরীর পরিচালনায় এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ কর্তৃক কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

২৪শে, ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ গঙ্গাপদ বসুর 'জীবনায়ন' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকারের বিনোদন সংস্থার প্রযোজনায় সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মঞ্চে অভিনীত হয়।

৭ই এপ্রিল শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি অমলেন্দু রক্ষিত এবং সুধীন আচার্যর পরিচালনায় কলাকার গোষ্ঠীর উদ্যোগে বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১লা মে রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া' ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ এম বি সি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি পরিষদের গৃহনির্মাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই মে বিপন্নপালক বসু রচিত 'দুষ্ট ক্ষুধা' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সবুজসাথী, উত্তর জয়নগরের উদ্যোগে চরকাসংঘের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২২শে মে ব্রজেন দে রচিত 'স্নেহের জয়' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিশুউদ্যানে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এবং ১১ই জুন উৎপল দত্ত রচিত 'মেঘ' এবং মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিবৃত্ত' অগ্রগতির প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই এবং ১২ই জুন ব্রজেন দে রচিত 'স্নেহের জয়' নাটকটি যুগান্তর ক্লাবের প্রযোজনায় রাজকুমার কমলজিৎ সিং এর মঠচৌমুহনী বাসভবনপ্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৩ই জুন 'কুশধ্বজ' নাটক অমর ক্লাবের প্রযোজনায় মঠচৌমুহনীর রাজকুমার

কমলজিৎ সিংএর বাসভবনের সামনে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১২ই জুন উৎপলেন্দু সেন রচিত 'পার্থ সারথি' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় জয়নগর মহিলা সমিতির উদ্যোগে জয়নগরে মঞ্চস্থ হয়।

২রা ও ৩রা জুলাই অরুণকুমার দে এবং ব্রজেন দে রচিত 'ঘূর্নি' নাটকটি ননীগোপাল গণচৌধুরী এবং সুবোধ দত্ত-র পরিচালনায় কল্যাণপুর ক্লাবের উদ্যোগে কল্যাণপুর প্রাক্তন ছাত্র সমাজের প্রযোজনায় কল্যাণপুর জে বি স্কুলের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১০ই অক্টোবর 'অমরাবতী ট্রেনিং কলেজ' নাটকটি ভীষ্মদেব ভট্টাচার্যর পরিচালনায় আগরতলার বিটি কলেজের উদ্যোগে এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের 'মুকুট' নাটকটি অশোককুমার দত্ত-র পরিচালনায় দ্বারিকাপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৭ই অক্টোবর বিধায়ক ভট্টাচার্য এবং বিমল রায় রচিত 'তাহার নামটি রঞ্জনা' নাটকটি দেবব্রত ব্যানার্জীর পরিচালনায় শিল্পী সংগঠনী নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

৩০শে ডিসেম্বর ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'সৈনিক' নাটকটি এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ কলেজের রবীন্দ্রহলে মঞ্চস্থ করে।

এ বছর শৈলেশ গুহনিয়োগীর 'ফ্লু' নাটকটি বঙ্কিম চক্রবর্তীর পরিচালনায় জয়ন্ত সংঘের উদ্যোগে সংস্থার সামনে মুক্তমঞ্চে নামানো হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিজয়া' নাটকটি মহিলা কলেজের ছাত্রীসংসদ কলেজ মঞ্চে অভিনয় করে।

অরুণকুমার দে রচিত 'ভিক্ষুক' নাটকটি সুবোধ দত্ত এবং নারায়ণ দাস-এর পরিচালনায় কল্যাণপুর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রাঙ্গনের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

।। ১৯৬৭ সাল।।

২৩শে জানুয়ারী' ৬৭ আগন্তুক রচিত 'শতাব্দীর স্বপ্ন' নাটকটি নাট্যশিল্পী সংসদ, ধলেশ্বর ৭১ তম নেতাজী জন্ম জয়ন্তীর শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসাবে নেতাজী স্কুলের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে জানুয়ারী শক্তিপদ রাজগুরু রচিত 'শেষাগ্নি' নাটকটি সন্তোষ বিশ্বাসের পরিচালনায় কৃষি ও বন বিভাগের সংস্কৃতি সংস্থা তুলসীবতী স্কুলের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩রা মার্চ নিরুপমা দেবীর 'শ্যামলী' নাটকটি প্রাচ্যভারতী স্কুল মঞ্চস্থ করে।

৮ই মার্চ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'চারমূর্তি' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায়

উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্র সংগঠন তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি আন্তঃস্কুল নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে।

১১ই এবং ১২ই মার্চ বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'বন্দর' নাটক মৌচাক সম্প্রদায় বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে। এটি মৌচাকের একাদশ প্রযোজনা।

১৬ই মার্চ মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত 'টিপু সুলতান' নাটকটি হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগের উদ্যোগে তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই এবং ১৯শে মার্চ রমেশ গোস্বামী রচিত 'কেদার রায়' নাটকটি বড়দোয়ালী স্কুলে শিক্ষকবৃন্দ তাদের কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে, ২৫শে এবং ২৬শে মার্চ গঙ্গাপদ বসু রচিত 'জীবনায়ন' নাটক শিক্ষা বিভাগ বিক্রিয়েশন ক্লাবের উদ্যোগে আগরতলা সরকারী মিউজিক কলেজে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন শক্তি হালদার।

২৬শে মার্চ আনন্দময় রায় রচিত 'মেঘে ঢাকা রোদ' নাটকটি তাঁরই পরিচালনায় ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে কলাকার গোষ্ঠীর প্রযোজনায় বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

এছাড়া ১৪ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' বোধজঙ্গ স্কুল তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। ১২ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন' তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় তাদের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। ১৩ই মার্চ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি বিজয়কুমার স্কুল তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩রা মার্চ 'বংশীদাদুর চাঁদ' নাটক দিয়ে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন প্রতিষ্ঠা দিবস এবং শিক্ষা মেলায় নাট্য উৎসব শুরু করে। ৪ঠা মার্চ 'আগাছা' নাটকটি ছাত্ররা অভিনয় করে। ৫ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' নাটক ছাত্রীরা, ৭ই মার্চ 'লৌহপ্রাচীর' শিক্ষকগণ মঞ্চস্থ করেন নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে তাঁদের শিক্ষা মেলার অনুষ্ঠান হিসাবে।

রামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যামন্দির তাদের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবে ২রা ফেব্রুয়ারী 'কুশধ্বজ' নাটকটি শিক্ষকবৃন্দের দ্বারা এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী স্বামী মেঘানন্দ রচিত 'জটিল' নাটকটি ছাত্রবৃন্দের দ্বারা মঞ্চস্থ করে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে।

১২ই মে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকটি শ্যামল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় যোগেন্দ্র নগরের শিশুশিল্পীগোষ্ঠী যোগেন্দ্রনগরে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১৯৬৭ সনের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রথম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতা।

উদ্যোক্তা ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা অধিকার।
নাটকগুলি ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।

অনুষ্ঠিত নাটক

১। ৩রা জুন' ৬৭—শিল্পী সংগঠনী কৃষ্ণনগর। অনুষ্ঠিত হয় 'অসমাপ্ত' নাটক।

২। ৫ই জুন' ৬৭— নাট্যশিল্পী সংসদ, ধলেশ্বর। মঞ্চস্থ হয় 'উত্তাল তরঙ্গ'।

৩। ৬ই জুন' ৬৭--- উদীয়মান সংঘ, টাউন প্রতাপগড়, অভিনয় করে 'কেদার রায়' নাটক।

৪। ৭ই জুন' ৬৭— সেবক সংঘ, অরুন্ধতী নগর, 'একটি রাত' নাটক মঞ্চস্থ করে।

৫। ৮ই জুন' ৬৭--- ইয়ুথ কয়ার, উদয়পুর, মঞ্চস্থ করে 'কার দোষ' নাটক।

৬। ৯ই জুন' ৬৭— আমরা সবাই সংঘ, বনমালীপুর, আগরতলা, মঞ্চস্থ করে 'রাতকানা' নাটক।

৭। ১০ই জুন' ৬৭—দিশারী সংস্থা মঞ্চস্থ করে 'অন্ধকারায়' নাটকটি।

৮। ১১ই জুন' ৬৭—শিল্পী সংসদ 'চারপ্রহর' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

৯। ১২ই জুন' ৬৭---কল্যাণ সমিতি 'কার দোষ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

১০। ১৩ই জুন' ৬৭—সোনামুড়ার নেহরু ক্লাব মঞ্চস্থ করে 'কার দোষ' নাটক।

১১। ১৪ই জুন' ৬৭---অনিলবরণ দত্ত রচিত 'লৌহপ্রাচীর' নাটকটি অমরেন্দ্র রক্ষিতের পরিচালনায় আগরতলার বটতলা কলাকার গোষ্ঠী মঞ্চস্থ করে।

১২। ১৫ই জুন' ৬৭—জয়ন্তী সংঘ, জয়নগর, মঞ্চস্থ করে 'ফ্লু' নাটকটি।

১৩। ১৬ই জুন' ৬৭---খোয়াই মহকুমার সফলি' নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করে 'বিধান' নাটক।

১৪। ১৭ই জুন' ৬৭---আগরতলা বনমালীপুরের অগ্রগতি ক্লাব মঞ্চস্থ করে 'ইতিবৃত্ত' নাটক।

১৫। ১৮ই জুন' ৬৭---লোকশিল্পী সংসদ মঞ্চস্থ করে জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'গেটম্যান' নাটক।

১৬। ২০শে জুন' ৬৭ —যুবসমাজ মঞ্চস্থ করে 'গুরুভার' নাটকটি।

১৭। ২১শে জুন' ৬৭—কৃষ্টি গোষ্ঠী কিরণ মৈত্র রচিত 'বারোঘন্টা' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম সরকারী পর্যায়ে নাট্য প্রতিযোগিতায় সতেরটি সংগঠন অংশগ্রহণ করে নতুন উৎসাহের সূচনা করে।

২৫শে জুন ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'লালপাঞ্জা' নাটকটি দেবব্রত ব্যানার্জীর পরিচালনায় জয়নগর শিবাজী সংঘের প্রযোজনায় আগরতলায় মঞ্চস্থ হয়।

২২শে এবং ২৩শে জুলাই 'কালিন্দী' নাটকটি সুনীল দে-র পরিচালনায় সোনামুড়ার এন সি ইনস্‌টিটিউশনে মঞ্চস্থ হয়।

৭ই আগষ্ট গোপাল দেব (রুনু) রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'সাহিত্যিক' সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে কল্লোল গোষ্ঠীর প্রথম নিবেদন হিসাবে মঞ্চস্থ হয়।

১৪ই এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর বেসিক-ট্রেনিং কলেজে ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'একপেয়ালা কফি' নাটকটি শিক্ষকগণ কলেজ মঞ্চে অভিনয় করেন।

২রা অক্টোবর রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যটি রাজলক্ষী দেবীর পরিচালনায় বিজয়কুমার স্কুলের প্রযোজনায় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৬ই অক্টোবর ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'কবি চন্দ্রাবতী' নাটকটি দেশবন্ধু ক্লাবের প্রযোজনায় অভয়নগরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২২শে অক্টোবর ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'রাজা দেবীদাস' সুধীন আচার্য এবং দেবব্রত বন্দোপাধ্যায়ের যুগ্ম পরিচালনায় শঙ্কর চৌমুহনীর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

২৭শে অক্টোবর বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'বন্দর' নাটকটি মানস ভট্টাচার্য-র পরিচালনায় সি টি টি আই মহারানী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১লা নভেম্বর রামকৃষ্ণ যুবসংঘ 'বেইমানের খেলা' নাটকটি যোগেন্দ্রনগরের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

৫ই নভেম্বর ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'দেবীদাস' নাটকটি দেবব্রত ব্যানার্জী এবং সুধীন আচার্যর যুগ্ম পরিচালনায় সংহতি ও দেশপ্রিয় ক্লাবের প্রযোজনায় শঙ্কর চৌমুহনীর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৪ই নভেম্বর ব্রজেন্দ্র কুমার দে রচিত 'দুর্গাদাস' নাটকটি মতিলাল দাশগুপ্তর পরিচালনায় মেলাঘর সমষ্টি উন্নয়ন সংস্থা শিশুদিবস উপলক্ষ্যে মেলাঘর নেহরু মঞ্চে অভিনয় করে।

১২ই নভেম্বর ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত রচিত 'উল্কা' নাটকটি কুঞ্জবন টাউনশিপ রিক্রিয়েশন ক্লাব কাঁকুরিয়া টিলায় মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৫শে এবং ২৬শে নভেম্বর গৌরাঙ্গ ভদ্র রচিত 'কঙ্কাল' নাটকটি ধীরেন সেনগুপ্তর পরিচালনায় সোনামুড়ার শিল্পী সংসদ রাধামাধব মন্দিরের মুক্ত মঞ্চে অভিনয় প্রযোজনা করে।

৯ই এবং ১০ই ডিসেম্বর ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'খুনী' নাটকটি বিমল গুপ্তর পরিচালনায় পঞ্চপ্রদীপ নাট্যসংস্থা তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

এছাড়া জুলাই মাসের তিন তারিখে অমূল্যকুমার শুক্লদাসের পরিচালনায় তাঁরই লেখা নাটক 'ভারত দর্শন' বিদ্যালয় পরিদর্শক কার্যালয়ের উদ্যোগে আগরতলা সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়। এ বছরে অন্যান্য প্রযোজনার মধ্যে আছে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা'। উদ্যোক্তা এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ। মঞ্চস্থ হয় কলেজের রবীন্দ্র হলে। 'সরমা' নাটকটি লতিকা দাস এবং কবীন্দ্র বিশ্বাসের পরিচালনায়, কৈলাশহরের ত্রিপুরেশ্বরী নাট্যসংস্থার উদ্যোগে কৈলাশহরে মঞ্চস্থ হয়।

।। ১৯৬৮ সাল।।

২০শে এবং ২১শে জানুয়ারী' ৬৮ এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ দুটি নাটক কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে। প্রথমটি হল বনফুলের 'কবর' এবং দ্বিতীয়টি হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অলীকবাবু'।

২৪শে জানুয়ারী ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'জল্লাদ' নাটকটি অশোক দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর উন্নয়ন সংস্থা মোহনপুর ব্লক অফিস প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী মহেন্দ্র গুপ্ত রচিত নাটক 'ভোলা বিপত্তি' এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় নাট্যকার গোপাল দে রচিত 'সাহিত্যিক' নাটকটি উদিচী বুকব্যাঙ্কের সাহায্যার্থে উদিচীর প্রযোজনায় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী তুলসীদাস লাহিড়ী রচিত নাটক 'ছেঁড়া তার' বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য এবং বামাপদ মুখোপাধ্যায়ের যৌথ পরিচালনায় এম বি বি কলেজের ছাত্রসংসদ এবং শিক্ষক পর্ষদের যৌথ উদ্যোগে কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

২৫শে ফেব্রুয়ারী ভবানী ভট্টাচার্য রচিত 'এক বায়সঃ কথা' সুবোধ দে-র পরিচালনায় ত্রিপুরা মিউজিক অ্যান্ড কালচারেল ইন্‌সটিটিউট এবং প্রচার বিভাগের উদ্যোগে রূপেন নাট্যসংস্থার প্রথম প্রযোজনা হিসাবে মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে।

৩রা মার্চ 'রামের সুমতি' (রচনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং প্রযোজনা নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন) নাটকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাদের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়। এই উপলক্ষে ছাত্রছাত্রীরা অভিনয় করে ৪ঠা মার্চ এবং ৬ই মার্চ 'নাটক নয়' এবং 'চারপ্রহর' নাটক দুটি।

১০ই মার্চ ব্রজেন দে রচিত 'স্নেহের জয়' নাটকটি হারাধন দত্তর পরিচালনায় নাট্যশিল্পী সংসদ শিশুউদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

১৬ই মার্চ ত্রিপুরা সরকারের প্রচার বিভাগ, পুতুল নাচ শাখার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুণা সেন। এই উপলক্ষে হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় 'টিপুসুলতান' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

৩০শে মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' নাটক অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল এবং রনজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিলোনীয়া কলেজ তাদের মঞ্চে প্রযোজনা করে।

৭ই এপ্রিল শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি কলাকার গোষ্ঠী নেতাজী সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই এপ্রিল 'তটিনির বিচার' নাটকটি বিলোনীয়ার নারীপ্রগতি সংস্থা বিলোনীয়ায় মঞ্চস্থ করে।

১৫ই এপ্রিল 'বঙ্গেবর্গি' নাটক বড়দোয়ালী স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করেন।

১৭ই এপ্রিল সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'পঞ্চমিত্র' নাটকটি হীরালাল সেনের পরিচালনায় শিল্পীসংগঠনী তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১১ই এবং ১২ই মে স্থানীয় নাট্যকার গোপাল দে রচিত 'ওপরতলা' এবং অশোক সরকার রচিত 'আসামী সাতজন' নাটক দুটি নান্দীকারের প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই মে স্থানীয় নাট্যকার অজিত মজুমদার রচিত ১৯৬৫ (মায়ের ডাক) এবং ১৮ই মে কিরণ মৈত্র রচিত 'বিশ পঞ্চাশ' এবং ১৯শে মে মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝড়' অজিত মজুমদারের পরিচালনায় নাট্যশিল্পী সংসদের নাট্য উৎসবে মঞ্চস্থ হয়। মায়ের ডাক যখন আলাদাভাবে মঞ্চস্থ হয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ একটি দৃশ্যে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

৫ই জুন ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'রক্তধারা' নাটকটি সুনীলবরণ দের পরিচালনায় সোনামুড়ার বিবেকানন্দ ক্লাব সোনামুড়ার মুক্তমঞ্চে প্রযোজনা করে। নাট্যাভিনয়ে এত বেশী দর্শক সমাগম হয়েছিল যে স্থানীয় মানুষের বিস্ময় সৃষ্টি হয়।

১৬ই জুন জগদীশ চক্রবর্তী রচিত 'প্রতিনিধি' নাটকটি সুবোধ-দের পরিচালনায় রূপম-এর দ্বিতীয় প্রযোজনা হিসাবে তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই এবং ১৮ই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন' ইউনিভার্সাল প্রাউটিষ্ট স্টুডেন্টস ফেডারেশন ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই এবং ১৭ই অক্টোবর অজিত মজুমদার রচিত 'ঝংকার' নাটকটি হারাধন দত্ত এবং অজিত মজুমদারের যৌথ পরিচালনায় নাট্যশিল্পী সংসদ তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৯ই অক্টোবর নন্দগোপাল রায় চৌধুরী রচিত 'শোণিত তর্পন' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প হিসাবে শঙ্কর চৌমুহনীর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। এই মাসে শচীন ভট্টাচার্যর 'সম্রাটের মৃত্যু' নাটকটি সরকারী কর্মচারীদের উদ্যোগে বিশ্রামগঞ্জের মুক্তমঞ্চে প্রযোজিত হয়।

।। ১৯৬৯ সাল।।

৬ই জানুয়ারী ১৯৬৯ বিমল রায় রচিত 'অভিনয়' এবং রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'কালো মাটির কান্না' নাটক দুটি সুবোধ দে-র পরিচালনায় রূপম নাট্যসংস্থা তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। রূপমের এটি তৃতীয় প্রযোজনা।

৩রা মার্চ 'কর্মখালি' নাটকটি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয়ের সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে ১৬শ শিক্ষা মেলায়। এখানেই বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ ৪ঠা মার্চ মঞ্চস্থ করে 'পরিণীতা' নাটকখানি। ৬ই মার্চ অনুষ্ঠিত হয় 'বিবাদ নিবারণী মহৌষধ' নাটক প্রাক্তন ছাত্রীগণের দ্বারা।

৯ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' নাটকটি উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রগণ উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে একাডেমীর ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষ্যে।

২৮ ও ২৯শে মার্চ শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'পাশের ঘরের ভাড়াটে' নাটকটি মৌচাক নাট্যসংস্থা নিখিল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ করে। ২৪শে মে মন্মথ রায় রচিত 'লাঙ্গল' নাটকটি হিরন্ময় চক্রবর্তীর পরিচালনায় ত্রিপুরা প্রদেশ যুবকংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে মিউজিক কলেজ ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২০, ২১ এবং ২৬শে জুলাই শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটি কমলপুর মহকুমা শাসকের পরিচালনায় কমলপুরের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়। এই অনুষ্ঠান হতে কমলপুর দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে ১৩৫০ টাকা সংগৃহীত হয়।

২৭শে জুলাই ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'ঘুর্ণি' নাটকটি বড়দোয়ালীর শিল্পসন্ধানী নাট্যসংস্থা কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

২১ এবং ২২শে আগষ্ট বাদল সরকার রচিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি বিমল গুপ্ত ও সুবোধ দে যৌথ পরিচালনায় বীরচন্দ্র সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার কর্মীদের ত্রাণ তহবিল গঠনের উদ্দেশে তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করেন।

১৪ই অক্টোবর অজিত মজুমদার রচিত এবং পরিচালিত 'ঝংকার' নাটকটি নাট্যশিল্পী সংসদ তুলসীবতী ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি সমবায় আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত।

২২ এবং ২৩শে নভেম্বর উৎপল দত্ত রচিত 'রাতের অতিথি' নাটকটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে। পরিষদের এটি প্রথম প্রযোজনা।

প্রথমবর্ষ আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা

।। ১৯৬৯ সাল।।

প্রথমবর্ষ আন্ত ঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা ২০শে ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়, অংশ গ্রহণ করে দশটি সংস্থা। অনুষ্ঠিত হয় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে।

২০শে ডিসেম্বর 'মহাক্ষুধা'; রচনা মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালনায় জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও সৌমেন্দ্রপ্রসাদ দাস। প্রযোজনা করে ডিষ্ট্রিকট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং কালেকটর অফিস।

২২শে ডিসেম্বর কিরণ মৈত্রর 'বারে ঘন্টা' নাটকটি শিশিরকান্তি দেব-এর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে শিল্প বিভাগ।

২৩শে ডিসেম্বর সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শেষ থেকে শুরু' নাটকটি ব্রজগোপাল রাহা ও প্রিয়তোষ দাস এর যৌথ পরিচালনায় এবং ফুড এণ্ড সিভিল এমপ্লইজ-এর প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

২৪শে ডিসেম্বর কিরণ মৈত্র রচিত 'বুদ্বুদ' নাটকটি অজিতকুমার দাশগুপ্তর (ঝান্টু) পরিচালনায় সেক্রেটারিয়েট রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

২৫শে ডিসেম্বর বিধায়ক ভট্টাচার্য রচিত 'নামটি তাহার রঞ্জনা' নাটকটি রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর পরিচালনায় এবং এয়ারপোর্ট গভঃ এমপ্লয়িজ ড্রামাটিক এসোসিয়েশন কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

২৬শে ডিসেম্বর জগদীশ চক্রবর্ত্তী রচিত 'প্রতিনিধি' নাটকটি সুবোধ দে-র পরিচালনায় পি ডব্লিউ ডি-র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

২৭শে ডিসেম্বর গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'যড়বর্গ' হেলথ সার্ভিসেস স্টাফ ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর শরদিন্দু ব্যানার্জী রচিত 'লালপাঞ্জা' নাটকটি পরিচালক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত এবং ধর্মনগর ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাই দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।

২৯শে ডিসেম্বর পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত নাটক 'ছায়া নায়িকা' এডুকেশন ডাইরেকটরেট রিক্রিয়েশান ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির পরিচালনায় ছিলেন শক্তি হালদার।

৩০শে ডিসেম্বর শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সোনার হরিণ' নাটকটি শিল্পী গোষ্ঠীর দ্বারা পরিচালিত হয় এবং পরিসংখ্যান বিভাগ দ্বারা প্রযোজিত হয়।

এ বছরেই আরো কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ হয়, এদের তারিখ পাওয়া যায়নি। নাটকগুলি হোল—

অন্নদা শঙ্কর রায় রচিত 'হাসব না কাঁদব' এবং 'সত্য মারা গেছে' (নাট্যকার গঙ্গাপদ বসু) নাটক দুটি এম বি বি কলেজের ছাত্রগোষ্ঠী দ্বারা কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়। নাটক দুটি পরিচালনা করেন বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, জলধর মল্লিক, সরোজ চৌধুরী, সাধনা দাশগুপ্ত, অঞ্জলি দত্ত।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত 'বর্গী এল দেশে' নাটকটি ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে এবং সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সংহতি নাট্যসংস্থা কর্তৃক অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইনের মুক্তমঞ্চে দীপান্বিতার উৎসবে অভিনীত হয়।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভাড়াটে চাই' নাটকটি সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক ইন্দ্রকুমার দের উদ্যোগে কাঞ্চনবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথের 'শোধবোধ' নাটকটি মহিলা কালেজের ছাত্রীসংসদ মহিলা কলেজ হলে মঞ্চস্থ করে।

।। ১৯৭০ সাল।।

২৪শে জানুয়ারী অমিয় মিত্র রচিত 'রিদ্‌ম' নাটকটি সুবোধ দে-র পরিচালনায় রূপম নাট্যসংস্থা তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৫শে জানুয়ারী শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রতিধ্বনি' নাটকটি সুবোধ দে-র পরিচালনায় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয। নাটকটি প্রযোজনা করে রূপম নাট্যসংস্থা।

২৬শে জানুয়ারী ডাঃ অরুণকুমার দে রচিত 'কার দোষ' নাটকটি সুধীন আচার্যর পরিচালনায় প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় কারাগারে কারাগারের শিল্পীদের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।

১৪ এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারী 'সম্রাট জাহান্দার শাহ' নাটকটি জনসংযোগ এবং পর্যটন দপ্তর হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৯ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' নাটক (নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়) অজিত দাশগুপ্তর পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমীর অশীতি বর্ষপূর্তি কমিটির উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। পরে নাটকটি কৃষ্টি গোষ্ঠীর প্রযোজনায় ব্যাঙ্গালোর নাট্যপ্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

১২ই এপ্রিল 'নিষ্কৃতি' নাটক (রবীন্দ্রনাথ রচিত এবং বিধায়ক ভট্টাচার্য কৃত নাট্যরূপ, পরিচালনায় অজিত মজুমদার) এবং রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্টমাষ্টার' নাটকটি অজিত মজুমদার এবং হারাধন দত্তর যৌথ পরিচালনায় নাট্যশিল্পী সংসদ মিউজিক কলেজ হলে মঞ্চস্থ করে।

১৬ই মার্চ নিশিকান্ত বসুরায় রচিত 'দেবলাদেবী' নাটকটি সুধাংশু দত্তের পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমী প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ দ্বারা একাডেমীর ক্যাম্পাসে একাডেমীর ৮০তম পূর্তি উৎসবে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই মে অরুণকুমার দে রচিত 'জোনাকি' নাটকখানি নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী এবং অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় রতিয়া উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ উত্তর ঘিলাতলির মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১২ই জুলাই রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' নাটকটি অজিত দাশগুপ্তর পরিচালনায় কৃষ্টি গোষ্ঠীর উদ্যোগে বিবেকানন্দ রেন্টার্স কলোনীর উন্নয়নের জন্য তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৫ই সেপ্টেম্বর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প 'বাগ্দিপাড়া দিয়ে' (নাট্যরূপ মিহির চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা সুবোধ দে) রূপমের প্রযোজনায় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে ডিসেম্বর কিরণ মৈত্র রচিত 'বিশ পঞ্চাশ' নাটকটি প্রতাপগড়ের বিদ্যাদায়িনী সংঘ কর্তৃক তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

এছাড়া এবছর রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তির উপায়' নাটকটি সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় কৈলাশহরের কাঞ্চনবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।
রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' নাটকটিও এরা মঞ্চস্থ করে এ বছরেই।

শিক্ষা অধিকারের বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে আন্তঃ ত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতা ১৯৭০ এ শুরু হয়ে যায়।

প্রথম দিনে অভিনয় করে বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী, ২৩শে অক্টোবর বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর 'আমি ক্রীতদাস', পরিচালনা করেন সুধাংশুমোহন দত্ত। সমস্ত অনুষ্ঠান হয় মহারানী তুলসীবতীর ক্যাম্পাস হলে।

২৪শে অক্টোবর অভিনীত হয় মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ঝড়' নাটকটি। পরিচালনা করেন সত্যেন রায় চৌধুরী এবং হারাধন দত্ত যৌথভাবে, নাটকটি প্রযোজনা করে নাট্যশিল্পী সংসদ।

২৫শে অক্টোবর রতনকুমার ঘোষ রচিত 'অমৃতস্য পুত্র' নাটকটি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে এডুকেশন ইনস্পেকটরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব, ধর্মনগর।

২৬শে অক্টোবর রূপান্তরের 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' এবং 'লিউজি পিরান্দেল্লো'; রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রচিত নাটক দুটি পরিচালনা করেন সবিতা মজুমদার। প্রযোজনায় ছিল লোকশ্রী।

২৭শে অক্টোবর মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মহাক্ষুধা' নাটকটি ধীরেন্দ্র কুমার নাথের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে এডুকেশন ইনস্‌পেকটরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব, কমলপুর।

২৮শে অক্টোবর গঙ্গাপদ বসুর 'অংশীদার' নাটকটি শান্তিপদ ভট্টাচার্য-র পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে বিনোদন সংস্থা, শিল্পবিভাগ।

৩০শে অক্টোবর রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সিঁড়ি' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা রূপারোপ নাট্যসংস্থা।

৩১ শে অক্টোবর মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ইতিবৃত্ত' নাটকটি অগ্রগতির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

১লা নভেম্বর বিমল রায় রচিত 'শেষের পরে' নাটকটি কান্তি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজক শিল্পসন্ধানী।

২রা নভেম্বর পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত নাটক 'ফিঙ্গার প্রিন্ট' সলিল দেববর্মনের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজক আনন্দলোক।

রূপারোপ শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃতি পায় এবং শিক্ষা বিভাগের সারা ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতার এই প্রচেষ্টাকে নাট্যমোদীরা অভিনন্দন জানায়।

।। ১৯৭১।।

বছরের প্রথমেই এবার ২য় বর্ষ আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল।

৩রা জানুয়ারী স্থানীয় নাট্যকার আনন্দময় রায় রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'ওরা চলে গেল' ডাক ও তার বিভাগ কর্তৃক মঞ্চস্থ হল। আন্তঃ অফিস নাট্য প্রতিযোগিতার সবকটি নাটকই তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৪ঠা জানুয়ারী রতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'সকালের জন্য' মৃণাল কান্তি চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে শিক্ষা বিভাগ।

৫ই জানুয়ারী রতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'ভূমিকম্পের পরে' সুবোধ-দের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজক পি ডব্লিউ ডি।

৬ই জানুয়ারী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'কালো মাটির কান্না' নাটকটি দীপেন্দ্রকুমার দাসের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে সিভিল একাউন্টস ডিপার্টমেন্ট।

৭ই জানুয়ারী ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'রজনীগন্ধা' নাটকটি শিল্পীগোষ্ঠীর পরিচালনায় পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

৮ই জানুয়ারী রতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'পিতামহদের উদ্দেশ্যে' রবীন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনা করে এয়ারপোর্ট গভঃ এমপ্লইজ

রিক্রিয়েশন ক্লাব।

৯ই জানুয়ারী গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'মহিমের সংসার' হেলথ্ সার্ভিসেস রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১০ই জানুয়ারী শচীন ভট্টাচার্য রচিত নাটক 'আগ্নেয়গিরি' রমেন্দ্র ভট্টাচার্যর পরিচালনায় এগরিফরেষ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১১ই জানুয়ারী অগ্নিদূত রচিত নাটক 'নরক থেকে ফিরে' নিখিল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় সেক্রেটেরিয়েট রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১২ই জানুয়ারী জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'মুছেও যা মোছেনা' নাটকটি শান্তিপদ ভট্টাচার্যর পরিচালনায় শিল্পবিভাগ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই জানুয়ারী অগ্নিদূত রচিত 'ইস্কাবনের গোলাম' নাটকটি ব্রজগোপাল রাহার পরিচালনায় ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ বিভাগীয় কর্মীবৃন্দের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।

১৪ই জানুয়ারী রতনকুমার ঘোষ রচিত 'ফেরা' নাটকটি আরবান কমিউনিটি পাইলট প্রজে* দ্বারা মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন অমলেশ ঘোষ।

১৫ই জানুয়ারী শ্রী সম্বিৎ রচিত 'বলুন কি নাম দেব' নাটকটি জীবনানন্দ গোস্বামীর পরিচালনায় ত্রিপুরা জেলা আদালত কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১৬ই জানুয়ারী বাদল সরকার রচিত নাটক 'সারা রাত্তির' রবীন্দ্র ভট্টাচার্যর পরিচালনায় কৈলাশহর এমপ্লইজ ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

দ্বিতীয় বর্ষ আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায ১৪টি অফিস ক্লাব অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতাকে জনপ্রিয় করে তোলে।

লক্ষ্য করার বিষয় জানুয়ারী মাসে শহরের কোনো নাট্যসংস্থা নাটক মঞ্চস্থ করতে পারে নি। সংস্থাগুলি ধীরে ধীরে এপ্রিল মাস থেকে আবার একে একে নাট্য প্রযোজনা শুরু করে।

২৪শে এপ্রিল অজিত মজুমদার রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'জয় বাংলা' ঘরোয়ার প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহাযার্থে অনুষ্ঠিত হয় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে।

২রা মে এই নাটক শরণার্থীদের সাহায্যার্থে পুনরায় মঞ্চস্থ হয়।

২৭শে মে ব্রজেন দে রচিত 'কৃপনের ধন' নাটকটি রামনগর নাট্যসংস্থা রামনগরের মুক্তমঞ্চে মঞ্চস্থ করে।

১১ই জুন স্বপন সেনগুপ্ত রচিত নাটক 'কবে বসন্ত আসবে' অমলেন্দু রক্ষিতের পরিচালনায় শিল্প-সন্ধানী বাংলাদেশের মুক্তি যোদ্ধাদের সাহায্যার্থে বড়দোয়ালী মঞ্চে মঞ্চস্থ করে।

২০শে ˈ ুন রমেন লাহিড়ী রচিত 'পলাশের রঙ লাল' নাটকটি পথ শিল্পী গোষ্ঠী দ্বারা শিশুউদ্যানের কমিউনিটি হলে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই জুলাই বিমল বন্দোপাধ্যায় রচিত 'এরা কারা' নাটকটি সুবোধ-দের পরিচালনায় রূপম নাট্যসংস্থা তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১২ই জুলাই বিমল রায় রচিত 'অভিনয়' নাটকটি সুবোধ-দের পরিচালনায় রূপমনাট্য সংস্থা তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে অক্টোবর গোপাল দে রচিত 'রক্ত স্বাক্ষর' নাটকটি হেলথ সার্ভিসেস স্টাফ ক্লাব কর্তৃক তুলসীবতী ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালক ছিলেন নাট্যকার গোপাল দে নিজেই।

ভারত এবং বাংলা দেশে পাক সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ হওয়ায় অনেক সংস্থাই নাটক প্রযোজনা করতে সক্ষম হয়নি।

রূপারোপ নাট্যসংস্থা বাংলাদেশের অসহায় শরণার্থীদের মনোবল বাড়াতে অনুষ্ঠান সংগঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করে—ভারত বাংলাদেশ লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী সহায়ক-সমিতি গঠনের মাধ্যমে।

।। ১৯৭২ সাল।।

পাক বাহিনীর অত্যাচারে জর্জরিত পূর্ববঙ্গের মানুষ মুক্তি পেল। বাঙলাদেশ স্বাধীন হল। ত্রিপুরা তথা আগলতলার মানুষ যে গুরুভার বহন করছিল অসহায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য—তা থেকে মুক্ত হল। হাল্কা মনে শহরের নাট্যসংস্থাসমূহ এবার নাটকের বন্যা বইয়ে দিল।

৭ই জানুয়ারী রাজদূত রচিত নাটক 'ফেরিওয়ালা' সুধীন আচার্যর পরিচালনায় শিল্পম নাট্যসংস্থা স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী এবং রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকীতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'তিলোত্তমা' নাটকটি বিলোনীয়ার জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকার মঞ্চস্থ করে।

৫ই মার্চ রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটক প্রচার বিভাগের প্রযোজনায় বড়জলার মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৩ই এপ্রিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকটি কান্তি চক্রবর্তীর পরিচালনায় শিল্পসন্ধানীর প্রযোজনায় বড়দোয়ালী কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই এবং ৯ই মে রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মী পূজা' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা' মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় কুলাই উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

১০ই মে রাজদূত রচিত 'রক্তে রাঙা নকশাল' নাটকটি শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষ এবং

দেবব্রত পাল এর যৌথ পরিচালনায় কাঞ্চনবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কৈলাশহর-এ অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই মে রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সকালের জন্য' নাটকটি শ্রীমতী মীনাক্ষী ঘোষ এবং দেবব্রত পালের পরিচালনায় প্রধান শিক্ষক কেদারনাথ পালের উদ্যোগে কাঞ্চনবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৫ই মে 'কার দোষ' নাটকটি নতুন নগর বিদ্যোৎসাহী সংঘর উদ্যোগে সুখময় হায়ার-সেকেন্ডারী স্কুলে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই মে 'এবং ইন্দ্রজিৎ' নাটকটি বিমল গুপ্তর পরিচালনায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই জুলাই' ৭২ রতনকুমার ঘোষ রচিত 'ভোরের মিছিল' নাটকটি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ কর্তৃক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই আগষ্ট 'শের আফগান' (নাট্যকার লিউইজ পিরানদেল্ও রূপান্তর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিচালনা সুবোধ দে) রূপমের উদ্যোগে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীর পূর্তি উৎসবে অভিনীত হয়।

১৭ই আগষ্ট বীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'তিলোত্তমা' নাটকটি ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পুতুলনাচ শাখা কর্তৃক রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই আগষ্ট 'সুবড়াই রাজা তাই গড়িয়ালি কথমা' নাটকটি ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে বর্ধমান ঠাকুরপাড়া লোকনৃত্য দল কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট রতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'মহাকাব্য' শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ কর্তৃক তুলসীবতীর মঞ্চে স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী এবং রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মঞ্চস্থ হয়।

২০শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পুতুলনাচ বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৩শে আগষ্ট 'শের আফগান' (নাট্যকার লিউইজ পিরানদেল্ও, রূপান্তর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) সুবোধ দের পরিচালনায় 'রূপম' নাট্যসংস্থা কর্তৃক স্বাধীনতার রজতজয়ন্তীতে তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই সেপ্টেম্বর রতনকুমার ঘোষ রচিত নাটক 'মহাকাব্য' শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ নাট্যসংস্থা শিক্ষক কল্যাণ তহবিলের সাহায্যার্থে রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ করেন।

৫ই সেপ্টেম্বর 'সমুদ্র সন্ধান' নাটকটি রূপায়ণের প্রযোজনায় মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৪ঠা অক্টোবর সুরেশ দাস রচিত 'ঋণ শোধ' নাটকটি সুরেশ দাশের পরিচালনায় উৎসাহী নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা আমবাসা পূর্তবিভাগ প্রাঙ্গনে মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়।

৯ই অক্টোবর রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সকালের জন্য' নাটকটি কৃষ্টি গোষ্ঠীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা করেন হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা।

১৫ই অক্টোবর 'লামানি হোমচাঙ' (পথের আলো)। নাট্যকার অলিন্দ্রলাল ত্রিপুরা, পরিচালক গনেশ দেববর্মা। নাটকটি ককবরগ সাহিত্যসভার উদ্যোগে ককবরগ সাহিত্যসভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

২১শে অক্টোবর কুমারী মাধবী সিংহ রচিত 'মিংসেল' (আয়না) নাটকটি ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পুতুলনাচের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই এবং ৯ই নভেম্বর 'খাঁচা' নাটকটি (রচনা পার্থপ্রতিম চৌধুরী এবং পরিচালনা বিমল গুপ্ত) মুখোশের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

১৯শে এবং ২০শে নভেম্বর রতনকুমার ঘোষ রচিত 'শেষবিচার' এবং পার্থ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'শেষ অঙ্কে নট' নাটক দুটি রূপায়ণ নাট্য সংস্থা মঞ্চস্থ করে মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায়।

২৪শে নভেম্বর রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরীর পরিচালনায় ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট ড্রামা ট্রুপ, আগরতলার বিভিন্ন সংস্থার শিল্পীদের নিয়ে মিলিত ভাবে আমেদাবাদের টেগর মেমোরিয়াল অডিটোরিয়ামে অল ইণ্ডিয়া সিভিল সেক্রেটারিয়েট ড্রামা কম্পিটিশনের অঙ্গ হিসাবে মঞ্চস্থ করে। প্রতিযোগিতায় রঘুপতির ভূমিকায় একমাত্র শক্তি হালদার বিশেষভাবে পুরস্কৃত হন।

এছাড়া ২২শে আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যটি বিজয়কুমার উঃ বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাগণ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করেন।

৩রা জুন অগ্নিদূত রচিত 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না' নাটকটি 'অভাগীর স্বর্গ' নাট্যসংস্থা সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মঞ্চে অভিনয় করে।

১৫ই জুলাই মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজরক্ত' নাটক সুবোধ দের পরিচালনায় রূপম নাট্য সংস্থা রবীন্দ্র ভবনে মঞ্চস্থ করে।

এবছর রানী কর-এর পরিচালনায় 'রূপনগরের রাজকুমার' নাটকটি (নাট্যকার ধীরেন্দ্রলাল ধর), ফ্লাওয়ার্স কর্ণারের উদ্যোগে ত্রিপুরা মিনি থিয়েটার বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ উৎসবের অঙ্গ হিসাবে মঞ্চস্থ হয়।

রঙ্গম আয়োজিত বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি নাট্যমেলা

নাট্যমেলায় একটা স্যুভেনির বার করেছিল রঙ্গম। নাট্যমেলা হয়েছিল ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ থেকে ১লা অক্টোবর, ১৯৭২ পর্যন্ত। সমস্ত নাটকগুলি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিদিন সন্ধ্যা সাতটা থেকে।

১৯৭১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গম নাট্যগোষ্ঠীর পত্তন হয়। গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন— "নাটকের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের নাট্য আন্দোলনের সর্বাধুনিক ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার প্রয়াসই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতিকে বিশ্বাস নয়, সমাজের সর্বাত্মক অবক্ষয় রোধে বলিষ্ঠ জীবনবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে সাহায্য করাই এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

কথার সঙ্গে কাজের একটা খুব অমিল ছিল না রঙ্গমের। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এদের ছিল বহুমুখী কর্মধারা। যেমন, বিভিন্ন ধরণের নাটকাভিনয়, নাট্যমেলার আয়োজন, থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিচালনা, বিশিষ্ট অতিথি নাট্যকারের পরীক্ষামূলক নাট্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, আলোচনা সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন এরা করেছে।

রঙ্গমের প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৭২ সালের ২৪শে মে মিউজিক কলেজ হলে। নাটক মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুষ্পক রথ'। পরিচালনা করেছিলেন অধ্যাপক বাণী কণ্ঠ ভট্টাচার্য।

এই নাটকের পর এরা প্রবল উৎসাহে নাট্যমেলা সংগঠিত করে। রঙ্গমের বক্তব্য 'এবছর বাংলা রঙ্গমঞ্চের একশ' বছর পূর্ণ হল। আমাদের এ উৎসব বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসব হলেও আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস রেওয়াজি আনুষ্ঠানিকতার পরিবর্তে আমরা এই উৎসবের আয়োজন করতে যাচ্ছি ইতিহাসের আলোকে।

আমাদের 'রঙ্গম' একটি ক্ষুদ্র নাট্যসংস্থা। পরিবেশের সীমাবদ্ধতাকে উপেক্ষা করে বৃহৎ কোন পরিকল্পনাকে রূপায়িত করার যোগ্যতা আমাদের নেই। তবু স্থানীয় কয়েকটি সহযোগী সংস্থার অকৃপণ আনুকূল্যে আমরা যে উৎসবের আয়োজন করেছি, তাতে সাতদিন ধরে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের কয়েকটি নাটক উপস্থাপিত করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। এখানে আমাদের স্বকীয় ইতিহাসের গত একশ বছরকে আমরা কয়েকটি যুগে ভাগ করেছি যাতে মোটামুটিভাবে এই সমীক্ষার ধারাবাহিকতাটি বজায় রেখেও উৎসবের কালকে অনাবশ্যক দীর্ঘ করতে না হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের দিন রঙ্গম মঞ্চস্থ করে দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' নাটকটি। পুরোনো সামাজিক নাটক হিসাবে এ নাটক মঞ্চস্থ করা হয়েছে। তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন অধ্যাপক বামাপদ মুখার্জী।

নাটকে অংশগ্রহণ করেছিলেন অমরেন্দ্র রক্ষিত, জলধর মল্লিক, অমিতাভ দেবরায়, শেলী মুখার্জী, প্রমথেশ দেবরায়, রঞ্জিত ভৌমিক, সুখময় ঘোষ, অজয় নন্দী, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, অজিত চক্রবর্ত্তী, আবদুস সালাম মল্লিক, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, মীরা ঘোষ, সুকুমার দাস।

এরপর ২৭শে সেপ্টেম্বর' ৭২ ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ নিবেদন করে রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকটি। নির্দেশনায় ছিলেন বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য। অংশ গ্রহনে ছিলেন - শেলী মুখার্জী, শর্মিলা দেববর্মা, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অজিত চক্রবর্ত্তী, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, নরেশ দাস, দীনেশ দেবনাথ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, জলধর মল্লিক, আবদুস সালাম মল্লিক, প্রমথেশ দেবরায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, সুকুমার দাস, সরোজ চৌধুরী, অমরেন্দ্র রক্ষিত, অজয় নন্দী, অমিতাভ আইচ।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ রূপারোপ নিবেদন করে তুলসীদাস লাহিড়ী রচিত 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। নবনাট্য আন্দোলনের সমস্যাকেন্দ্রিক বাস্তবানুগ নাটক। নাটকটি পরিচালনা করেন শক্তি হালদার। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন শক্তি হালদার, আশিস চক্রবর্তী, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, বিশ্ব সেন, দেবাশিস হালদার, মিত্রারুণ হালদার, দীপঙ্কর পোদ্দার, পদ্মা গোস্বামী, বেণুধর গোস্বামী, সুকুমার সরকার, সমরেশ স্যান্যাল, কল্লোল দত্ত, শুভাশিস হালদার, নবারুণ হালদার, পূর্বিতা হালদার প্রভিতাংশু দাশ, দীপক দে, চিত্ত পাল, শেখর বন্দোপাধ্যায়, বিভাস দেবনাথ, হংসকলি হালদার, দীপা দাশগুপ্তা, দীপ্তি বিশ্বাস, নীলিমা দাস, লক্ষ্মী সিংহ রায়, গৌরী দাশগুপ্তা, স্বপ্না স্যান্যাল।

এই নাটকে রূপারোপের নেপথ্যে ছিলেন ঃ উপদেষ্টা—শোভা বসু, কৃষ্ণপদ দত্ত, মৃণালকান্তি চক্রবর্ত্তী; সঙ্গীত পরিচালনায় অমিয় দাস, বাঁশী রবীন্দ্র দাস, এস্রাজে বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, বেহালায় কন্দর্পনারায়ণ বিশ্বাস, আলো ও শব্দে হরিপদ দাস, সহযোগী সুনীল দেববর্মা ও বিদ্যুৎ চৌধুরী; মঞ্চ পরিচালনায় নরেশ পোদ্দার, সহযোগী ফনীভূষণ চক্রবর্তী, রূপকার হরেন্দ্র হালদার, মঞ্চাধ্যক্ষ সুভাষ চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনায় ছিলেন বীরেন রায় ও নিখিল ভট্টাচার্য।

২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ 'ঘরোয়া' নাট্যসংস্থা নিবেদন করে নাট্যকারের সন্ধানে 'ছ'টি চরিত্র'। নাটকটি পরিচালনা করেন অজিত মজুমদার। বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা ছিলেন - অজিত মজুমদার, সবিতা মজুমদার, রঞ্জিতা মজুমদার, অমূল্য বণিক, অসিত মজুমদার, পার্থ সিংহরায়, মৌসুমী দাস, কমল মজুমদার, রাসবিহারী সাহা, মলিনা সাহা, নিতাই বেলোয়ার, রিতা সিংহরায়, রাখাল লস্কর, অবিনাশ দেবনাথ, শঙ্কর ঘোষ, মাখন দেব এবং দিলীপ সরকার।

নেপথ্য প্রযোজনায় ছিলেন — সঙ্গীত পরিচালনায় গোপাল রায়; রূপসজ্জা রঞ্জিত ভৌমিক; মঞ্চ নির্দেশনায় সুবীর দাস; অলোকসম্পাত বিদ্যুৎ চৌধুরী, নাট্যসঞ্চালনায়

যাদবেন্দ্র মুখার্জী এবং কৃষ্ণকুমার দেববর্মা।

৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তিয়াস নাট্যসংস্থা পার্থপ্রতিম চৌধুরী রচিত 'মলাটের রং মুহূর্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। এটি একটি আধুনিক সমস্যামূলক নাটক।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন : শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরী, ডাঃ এইচ. এস. রায় চৌধুরী, শ্রীমতী রেখা ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত, শংকরসেবক দাস, শেখরেশ ভট্টাচার্য। নাটকটি পরিচালনা করেন ডাঃ এইচ এস রায় চৌধুরী।

নেপথ্যে ছিলেন; মঞ্চ— নীরোদ মজুমদার এবং দিলীপকুমার দাস। শব্দ— দিলীপকুমার দাস, আলো— নারায়ণ সরকার, শিশুতোষ রায়, মাণিক পাল, রূপসজ্জা— চিন্ময় রায়। সহযোগিতায় ছিলেন ডাঃ দীপক মজুমদার। প্রশান্ত ভট্টাচার্য, কমলবরণ চক্রবর্তী, অমর ভট্টাচার্য, প্রদীপ মুখার্জী।

১লা অক্টোবর ১৯৭২, রূপম নাট্যসংস্থা উপস্থাপনা করল দুটি ছোট নাটক — ইন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'টেরোড্যাকটিল' আর Samuel Beckelt এর Waiting for Godot অবলম্বনে 'ঈশ্বর বাবু আসছেন', রূপান্তর প্রদীপ বন্দোপাধ্যায়।

এটা এবসার্ড ড্রামা। এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহন করেছিলেন মানস গাঙ্গুলী, ইরা গাঙ্গুলী, সুবোধ দে, শিশিরকান্তি দেব, সুশীল ভৌমিক, দীপেন্দ্রকুমার দাস, অমল চ্যাটার্জী, অনিতা চক্রবর্ত্তী, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী, অসীম চক্রবর্ত্তী, চিন্ময় রায়।

নাটক দুটি পরিচালনা করেন সুবোধ দে। নেপথ্যে ছিলেন ঃ মঞ্চ— চিন্ময় রায়, আলো ও শব্দ— হরিপদ দাস, রূপসজ্জা— হরেন্দ্র হালদার, কর্মসচিব— শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, ব্যবস্থাপনায় বিশু, সেনগুপ্ত, বদ্রীনাথ ঘোষ। অন্যান্য সহযোগিতায় বিকচকুমার চৌধুরী, সুহাস চক্রবর্তী, প্রবোধলাল রায়, চিত্ত দাস, অচিন্ত্যঘোষ রায়, তরুণ চক্রবর্তী।

এই নাট্যমেলার সময় রঙ্গমের কার্যকরী সমিতি ছিল—

বাণীকন্ঠ ভট্টাচার্য— সভাপতি

বামাপদ মুখোপাধ্যায়— সহ সভাপতি

প্রশান্ত গাঙ্গুলী— সম্পাদক

অজয় নন্দী— কোষাধ্যক্ষ

অমরেন্দ্রনাথ রক্ষিত — সভ্য

সুকুমার দাস— সভ্য

সলিল দেববর্মণ— সভ্য

বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তিতে রঙ্গমের এই নাট্যমেলায় বিশিষ্ট সংস্থাগুলি যোগ দিলেও

সারা বছর ব্যাপী বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন সময়ে শতবার্ষিকী পালন করার বাসনায় বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ করেছে। তবুও রঙ্গমের এ শুভ উদ্যোগ বিদগ্ধ মণ্ডলীর কাছে সাধুবাদই পেয়েছে। এই উৎসব বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের সম্পর্ক দৃঢ় করতে সক্ষম হয়েছে।

এই ১৯৭২ সালেই আরো যাঁরা বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের অঙ্গ হিসাবে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন তাঁরা হলেন—

২৪ই মে পূর্বে উল্লেখিত 'পুষ্পক রথ'। নাট্যকার—মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা—বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, প্রযোজক —রঙ্গম, মঞ্চস্থ হয়েছে মিউজিক কলেজে।

১০ই জুন রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি', নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়। অজিত মজুমদারের পরিচালনায় 'ঘরোয়া' নাট্যসংস্থা বড়দোয়ালীর কৃষ্টি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

১১ই জুন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সওদাগরের নৌকা' নাটকটি ঘরোয়ার উদ্যোগে মিউজিক কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন অজিত মজুমদার।

এবছর ত্রিপুরা ইন্টার অফিস স্পোর্টস এণ্ড কালচারাল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে তৃতীয় ইন্টার অফিস ড্রামা কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা ৭২
স্থান : তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়

৫ই ফেব্রুয়ারী বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস' নাটকটি পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয় এবং নাটকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী বাদল সরকার রচিত 'ত্রিংশ শতাব্দী' নাটকটি বিমল গুপ্তের পরিচালনায় শিক্ষা বিভাগের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে।

৭ই ফেব্রুয়ারী পরশুরাম রচিত 'চিকিৎসা সঙ্কট' নাটকটি তপেশ রায়-এর পরিচালনায় পি. ডব্লিউ. ডি.র প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী 'বর্বরবাঁশী' নাটকটি জহর লস্করের পরিচালনায় কোর্ট এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারী ভোলা দত্ত রচিত 'কিউবা' নাটকটি দীপেন্দ্র দাশের পরিচালনায় সিভিল একাউন্টস এর উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী মিকলস জিয়ারফম-এর রচিত নাটক 'বিশে জুন' (রূপান্তর বীরু

মুখোপাধ্যায়) নির্মলেন্দু দাশগুপ্তর পরিচালনায় ফুড এণ্ড সাপলাইজ ডিপার্টমেন্ট মঞ্চস্থ করে।

১১ই ফেব্রুয়ারী গোপাল দে রচিত 'রক্তস্বাক্ষর' নাটকটি গোপাল দে-রই পরিচালনায় হেলথ সার্ভিসেস স্টাফ ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

১২ই ফেব্রুয়ারী শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'কাঁটাতারের বেড়া' নাটকটি ডি এন দাস এর পরিচালনায় খোয়াই শিক্ষাবিনোদন সংস্থা মঞ্চস্থ করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী বুদ্ধদেব বসু রচিত নাটক 'পুনর্মিলন' রবীন্দ্র ভট্টাচার্যর পরিচালনায় কৈলাশহর এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব মঞ্চস্থ করে।

এছাড়া সাধারনভাবে ৪ঠা অক্টোবর শিশুনাটিকা 'মেঘ কাকলি ও তাল বেতালের রাজা' নাটকটি অজিত মজুমদারের গ্রন্থনায় চিন্ময় রায়ের পরিচালনায় সমাজকল্যাণ বিভাগ বাক-পুনর্বাসন বিভাগের মাধ্যমে মহারানী তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে ও ২৪শে ডিসেম্বর উৎপল দত্ত রচিত 'মেঘ' নাটকটি অশোক চক্রবর্তীর পরিচালনায় লিটল ড্রামা গ্রুপ রবীন্দ্রভবনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষে মঞ্চস্থ করে।

এবছর অনামী নাট্যগোষ্ঠী রতনকুমার ঘোষের নাটক 'সকালের জন্য' পার্থ রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষে মঞ্চস্থ করে।

।। ১৯৭৩ ।।

এবছর উল্লেখযোগ্যভাবে নাটকের সৎ দিকগুলি উন্মোচিত হয়েছে।

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকী উৎসবে। রূপায়ণ প্রযোজিত একাঙ্ক নাট্য উৎসব

এ উৎসবে অন্য সংগঠনের অংশগ্রহণের বিষয়টা ছিল না। বিভিন্ন সংগঠন ছিল দর্শকের ভূমিকায়। 'রূপায়ণ' একক ভাবে মোট ছয়টি নাটক মঞ্চস্থ করে। প্রয়োগ প্রধান একমাত্র মাণিক চক্রবর্তী। এই উৎসবে মাণিক চক্রবর্তী তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতার প্রমান রেখেছেন।

এই উৎসব মোট ৪দিনে অনুষ্ঠিত হয় — ৮ই জানুয়ারী, ৯ই জানুয়ারী, ১০ই জানুয়ারী এবং ১১ই জানুয়ারী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন মঞ্চে।

নাটকগুলি হল ঃ ১। সমুদ্র সন্ধানে—নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ। ২। ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না—নাট্যকার অগ্নিদূত। ৩। শেষ বিচার—নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ। ৪। শেষঅঙ্কে নট — নাট্যকার পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫। তৃতীয়কণ্ঠ—নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ। ৬। অজানা কাহিনী— নাট্যকার দীপ্তিকুমার শীল।

৭ই জানুয়ারী রাজদূত রচিত 'ফেরিওয়ালা' নাটকটি শিল্পম নাট্যসংস্থা স্বাধীনতার রজতজয়ন্তী এবং বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবার্ষিকীতে মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে।

১৬ এবং ১৭ই জানুয়ারী 'কপালকুণ্ডলা' সংস্কৃত এবং দিব্যেন্দু গুহ রচিত 'একটি ঘর কিছু স্বপ্ন' বাঙলা নাটকদুটি চম্পা দাশগুপ্তা এবং বিশ্ব সেনের পরিচালনায় উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারী মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'নিষাদ' নাটকটি পরিসংখ্যান বিভাগের উদ্যোগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই মার্চ রতনকুমার ঘোষের 'যবনিকা পতনের আগে' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১২ই মে রতনকুমার ঘোষ রচিত 'শেষ বিচার' নাটকটি পরিতোষ সাহার পরিচালনায় কাঞ্চনবাড়ী যুবসংস্থা কাঞ্চনবাড়ী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কৈলাশহর-এ মঞ্চস্থ করে।

৯ই জুলাই রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'সওদাগরের দেশে' এবং শ্রী কিশলয় রচিত 'মস্ত টান' নাটক দুটি মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় রূপায়ণ নাট্য সংস্থা শিশুউদ্যানের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

১৩ই আগষ্ট, ২৩শে আগষ্ট এবং ২৭শে আগষ্ট অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'শের আফগান' নাটকটি রূপমের প্রযোজনায় এবং সুবোধ দের পরিচালনায় যথাক্রমে তুলসীবতী ক্যাম্পাস, ডম্বুরনগর, (অমরপুর) এবং রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। এই এক-ই নাটক রবীন্দ্রভবনে পুনরাভিনীত হয় ৯-ই সেপ্টেম্বর।

২৯শে আগষ্ট 'ফাঁসীর মঞ্চে ক্ষুদিরাম' প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ধর্মনগর নাট্যসংস্থা কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে অভিনীত হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর বুদ্ধদেব বসু রচিত 'তপস্বী ও তরঙ্গিনী' নাটকটি বাণীবিদ্যাপীঠের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ শিক্ষককল্যাণ তহবিলের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে সেপ্টেম্বর এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর উৎপল দত্ত রচিত 'ঠিকানা' নাটকটি অশোক চক্রবর্তীর পরিচালনায় লিটল ড্রামা গ্রুপ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকটি ২০শে অক্টোবরও অভিনীত হয়।

২৭শে সেপ্টেম্বর সাধন সাহা রচিত 'অজ্ঞাত বাস' (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য), নাট্যরূপ মাণিক চক্রবর্তী, রূপায়ণ নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১১ই সেপ্টেম্বর বাদল সরকার রচিত 'কবি কাহিনী' বর্ণচোরা পরিচালিত এবং নেপথ্যের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই অক্টোবর শিবাজী রায় রচিত 'বাংলা জাগো' নাটকটি অমলেন্দু চক্রবর্তীর পরিচালনায় শ্যামলাল স্মৃতিসংঘের উদ্যোগে মিউজিক কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়।

২৬শে অক্টোবর মনোজ মিত্র রচিত 'চাকভাঙা মধু' বিমল গুপ্তর পরিচালনায় মুখোশ নাট্য সংস্থা কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৮শে অক্টোবর জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'চিতাভস্ম' নাটক সুধীন দাশগুপ্ত-র পরিচালনায় 'আরাধনা' নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

৩রা ডিসেম্বর গোপাল দে রচিত 'রাম রাজত্বে' নাটকটি শিল্পী সংসদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১০ই ডিসেম্বর বাদল সরকারের 'কবি কাহিনী' নাটকটি নিখিল ভট্টাচার্য-র পরিচালনায় সেক্রেটারিয়েট ড্রামাট্রুপ নতুন দিল্লীর মবলঙ্কর অডিটোরিয়ামে ষষ্ঠ সারাভারত সিভিল সেক্রেটারিয়েট নাটক প্রতিযোগিতায় মঞ্চস্থ করে।

এবছরে শিবাজী রায় রচিত 'নিহত গোলাম' নাটকটি ধর্মনগর নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করে। সুরভারতী নাট্য সংসদ মঞ্চস্থ করে সংস্কৃত নাটক 'রূপান্তরম্'।

১৬ই এপ্রিল কান্তি ভট্টাচার্য রচিত 'পরাজিত পৃথিবী' এবং চেকভ রচিত 'নানা রঙের দিন' (নাট্যরূপ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়) —প্রথমটি দীপেন্দ্রকুমার দাসের পরিচালনায় এবং অন্যটি সুবোধ দের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই জুন সত্যেন ভদ্র রচিত 'যবনিকা কম্পমান' নাটকটি মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় ত্রিপুরা বেকার সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই জুন শ্রী কিশলয় রচিত 'মস্তান' নাটকটি মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় ত্রিপুরা বেকার সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

৪র্থ আন্তঃ অফিস নাট্য প্রতিযোগিতা ১৯৭৩। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী থেকে ২৪শে ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী কোর্ট এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব বিজয় তণ্ডুলকার রচিত নাটক 'চোপ আদালত চলছে' অজিত মজুমদারের পরিচালনায় প্রযোজনা করে।

৫ই ফেব্রুয়ারী মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'দ্বিবর্ণ', কমলপুর কর্মচারী নাট্যসংস্থা কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি পরিচালনা করেন ভুবনচন্দ্র দে ও পবিত্র সিংহ রায়।

৬ই ফেব্রুয়ারী ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব তমাল দাস রচিত 'স্বপ্নসম্ভবা' নাটকটি প্রশান্ত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় প্রযোজনা করে।

৭ই ফেব্রুয়ারী সিভিল একাউন্টস স্পোর্টস এণ্ড কালচারাল ক্লাব নাট্যকার রঞ্জিৎ রায় রচিত নাটক 'ক্যারাবিয়নের স্বপ্ন' দীপেন্দ্র দাসের পরিচালনায় অভিনয় করে।

১০ই ফেব্রুয়ারী স্বাস্থ্য বিভাগ বিনোদন সংস্থা কর্তৃক রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'এই মন সেই মন' নাটকটি পার্থ রায়ের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়।

১১ই ফেব্রুয়ারী ক্রীড়া বিনোদন সংস্থা, শিল্পবিভাগ রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সম্রাট' নাটকটি শিশিরকান্তি দেব-এর পরিচালনায় প্রযোজনা করে।

১২ই ফেব্রুয়ারী খোয়াই এডুকেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'সম্রাটের

মৃত্যু' নাটকটি পরিচালক হিসাবে শিক্ষাবিনোদন সংস্থা নামে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী মহাকরণ বিনোদন সংস্থা কিরণ মৈত্র রচিত 'বার ঘণ্টার পর' নাটকটি নিখিল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী আগরতলার পি ডব্লিউ ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব শম্ভু মিত্র এবং অমিত মৈত্র রচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকখানি মঞ্চস্থ করে। পরিচালনা করেন তপেশ রায়।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ধর্মনগর এডুকেশন ইন্সপেক্টরেট রিক্রিয়েশন ক্লাব 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পরিচালনায় ছিলেন রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্য্য।

১৬ই ফেব্রুয়ারী কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পুষ্পকরথ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পরিচালনায় সলিল দেববর্মা।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরা বিধানসভা বিনোদন সংস্থা অগ্নি মিত্র রচিত 'নিকটে ফাঁদ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পরিচালনা করেন সুধীন আচার্য।

১৮ই ফেব্রুয়ারী অমরপুর সরকারী কর্মচারী বিনোদন সংস্থা গঙ্গাপদ বসু রচিত 'সত্য মারা গেছে' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। পরিচালনায় ছিলেন শিক্ষা বিনোদন সংস্থা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'নিষাদ' নাটকটি মঞ্চস্থ করে পরিসংখ্যান বিভাগ বিনোদন সংস্থা, আগরতলা। পরিচালনায় কারো নাম ছিল না।

২০শে ফেব্রুয়ারী উদয়পুর জেলাশাসক ও সমাহর্তা এবং মহকুমাশাসক অফিসের বিনোদন সংস্থা বিমল রায় রচিত 'শেষের পরে' নাটকটি অমলেন্দু রক্ষিতের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

২১শে ফেব্রুয়ারী এগ্রিঃ ফরেষ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব সুধাংশু দাশগুপ্ত রচিত নাটক 'আমি এ চাইনি' মানস গাঙ্গুলীর পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

২২শে ফেব্রুয়ারী কৈলাশহর এমপ্লয়ীজ রিক্রিয়েশন ব্যুরো ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত নাটক 'পরাজিত নায়ক' মঞ্চস্থ করে। পরিচালনা করেন রবীন্দ্র ভট্টাচার্য।

১৯৭২ সালের আন্তঃ অফিস নাট্য প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে পরিসংখ্যান বিনোদন সংস্থা এবং ২য় স্থান অধিকার করে শিক্ষা বিভাগ বিনোদন সংস্থা। ৩য় স্থান অধিকার করে স্বাস্থ্য বিভাগ বিনোদন সংস্থা। শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী ইরা গাঙ্গুলী (পরিসংখ্যান)। শ্রেষ্ঠ কমেডিয়ান—গোপাল দে (স্বাস্থ্য বিভাগ)। শ্রেষ্ঠ পরিচালনা—পরিসংখ্যান বিভাগ।

এই বছর ত্রিপুরার প্রখ্যাত নট স্বর্গত ত্রিপুরেশ মজুমদারকে স্মরণ করে 'ত্রিপুরেশ স্মৃতিচারণ সংস্থা' নামে একটি স্থায়ী কমিটি গঠিত হয়। সংস্থার সভাপতি নিযুক্ত হন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী অনিলকুমার দাসগুপ্ত মহাশয়। কমিটি ১৯৭৩ সালের ৮ই এপ্রিল থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত 'ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা'র আয়োজন করে।

মেলার প্রথম দিনে ৮ই এপ্রিল রূপায়ণের প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হয় 'তৃতীয় কণ্ঠ' নাটকটি। পরিচালনা করেন মাণিক চক্রবর্তী। অভিনয়াংশে ছিলেন দেবাশিস রায়, উত্তম চক্রবর্তী, প্রদীপ সাহা, মাণিক চক্রবর্তী। আলোক সম্পাত— হরিপদ দাশ এবং রূপকার সত্য নন্দী।

৯ই এপ্রিল মুখোশ সংস্থা নিবেদন করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটক 'রাজরক্ত'। পরিচালনা বিমল গুপ্ত। আলো— দীপক দত্ত। অভিনয়াংশে ছিলেন—বিমল গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার দেববর্মা, নন্দনকুমার ঘোষ, বর্ণালী বিশ্বাস।

১০ই এপ্রিল 'ঘরোয়া' প্রযোজনা করে মনোজ মিত্র রচিত 'টাপুর টুপুর' এবং সুকুমার রায় রচিত 'চলচিত্তচঞ্চরি' নামে দুটি ছোট নাটক। নির্দেশনায় ছিলেন অজিত মজুমদার। আলো—বিদ্যুৎ চৌধুরী, রূপসজ্জায়—নিমাই মজুমদার এবং মঞ্চে—দেবরাজ হালদার। অভিনয়ে ছিলেন—কমল মজুমদার, দিলীপ সরকার, নিমাই মজুমদার, সুবীর দাস, অমূল্য বণিক, অজিত মজুমদার, দেবরাজ হালদার, শঙ্কর ঘোষ, প্রদ্যোৎ সিংহরায় এবং কৃষ্ণপদ রায়। স্ত্রী ভূমিকায়—ডলি মজুমদার।

১১ই এপ্রিল 'অনামী শিল্পীগোষ্ঠী' একাঙ্ক নাটক মঞ্চস্থ করে। রাধারমন ঘোষ প্রণীত 'ইতিহাস কাঁদে' এবং যুবসমাজ প্রযোজিত অগ্নিদূত রচিত 'কিন্তু নাটক নয়' মঞ্চস্থ হয়। 'ইতিহাস কাঁদে' নাটকটি পরিচালনা করেন পার্থ রায়। অভিনয়ে—প্রণব কুমার চন্দ, তুলসী দেব, পার্থ রায়, স্বপন ভট্টাচার্য, কাজল দাশগুপ্ত এবং কল্পনা ভট্টাচার্য।

'কিন্তু নাটক নয়' নাটকটি পরিচালনা করেন কমল রায়। অভিনয়ে ছিলেন বঙ্কিম চক্রবর্তী, বাবুল রায়, তুলসী দে, বিজয় সিংহরায়, রতন দেব, শ্যামল চৌধুরী, স্বপন দাশগুপ্ত, কমল রায়, পার্থ রায়, স্বপন ভট্টাচার্য, কল্যাণ চৌধুরী এবং কল্পনা ভট্টাচার্য।

১২ই এপ্রিল কৃষ্টিগোষ্ঠী তাদের নাটক মঞ্চস্থ করতে না পারায় অনুষ্ঠান বন্ধ থাকে।

১৫ই এপ্রিল 'তিয়াস' প্রযোজনা করে মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত নাটক 'মৃত্যুসংবাদ'। পরিচালক ছিলেন ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, আলো— শিশুতোষ রায়, মাণিক পাল। মঞ্চ—দিলীপ দাস, নীরোদ মজুমদার। অভিনয়ে অনন্যা বন্দোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু দাস, শেখরেশ ভট্টাচার্য্য, তন্ময় দত্ত, হেমেন্দু শঙ্কর রায়চৌধুরী, অলক বন্দোপাধ্যায়, শঙ্করসেবক দাস, বিপ্লব দেবগুপ্ত, প্রণব ভট্টাচার্য এবং অন্যান্যরা।

১৬ই এপ্রিল রূপম নাট্যগোষ্ঠী নিবেদন করে প্রথমে 'পরাজিত পৃথিবী' এবং বিরতির পর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'নানা রঙের দিন'। প্রথম নাটকে অভিনয়াংশে ছিলেন— শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, শিশিরকান্তি দেব, দীপেন্দ্র দাস, বিশু সেনগুপ্ত, ইরা গাঙ্গুলী; পরিচালনা করেন দীপেন্দ্র দাস। পরের নাটকটি পরিচালনা করেন সুবোধ দে;

অভিনয়ে—সুবোধ দে, মানস গাঙ্গুলী।

১৭ই এপ্রিল 'লিটিল ড্রামা গ্রুপ' প্রযোজনা করে দুটি নাটক। প্রথমটি দীপক গোস্বামী রচিত 'বিহান বেলা'। পরিচালক ছিলেন অশোক চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন— অহীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রদীপ দাসগুপ্ত, সন্তোষ বর্ধন, প্রদীপ বসু, হরিপদ ভট্টাচার্য, সাবিত্রী বর্ধন (ভট্টাচার্য), প্রশান্ত দেব এবং অশোক চক্রবর্তী।

দ্বিতীয় নাটক রাধারমন ঘোষ রচিত 'হারাধনের দশটি ছেলে'। পরিচালনায় ছিলেন অশোক চক্রবর্তী। অভিনয়ে অহীন্দ্র চক্রবর্তী, যুগল বৈদ্য, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রশান্ত দেব, অশোক চক্রবর্তী, রত্না সরকার। আলোক সম্পাতে শিশুতোষ রায়, বিষ্ণু দেব। মঞ্চ— সমীর সাহা, কল্যাণ রায়।

১৮ই এপ্রিল রঙ্গম নিবেদন করে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্ত ও তার জবানবন্দী'। নাট্যরূপ এবং নির্দেশনায় ছিলেন জলধর মল্লিক। মঞ্চে—জলধর রায় এবং সলিল দেববর্মা। আলো— বিদ্যুৎ রায় চৌধুরী। অভিনয়ে ছিলেন—অমিতাভ দেবরায়, তারক সাহা, অজয় নন্দী, আবদুস সালাম মল্লিক, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, জলধর মল্লিক, নগেন্দ্র সাহা, অমরেন্দ্র রক্ষিত, প্রমথেশ দেবরায়, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, সলিল দেববর্মা, সুকুমার দাশ ও সবিতা দেববর্মা।

১৯শে এপ্রিল মুখোশ (বি) নিবেদন করে 'ক্যাপ্টেন হুররা'। রচনা মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পরিচালনায়—যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আলো—দীপক দত্ত, মঞ্চ— আশিস মোদক। অভিনয়ে—যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশিস মোদক, পল্লব বর্মন, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, নবেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত মোদক, নন্দনকুমার ঘোষ এবং শিখা রায়।

২০শে এপ্রিল' ৭৩, প্রচ্ছদ সংস্থা রতনকুমার ঘোষ রচিত 'জাল' এবং মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বাজপাখী' নাটক দুটি মঞ্চস্থ করে। (চরিত্রলিপি শুভেনিরে প্রকাশিত না হওয়ার এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হল না।)

২১শে এপ্রিল'৭৩ শিল্পী সংসদ গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রাম রাজত্ব' পরিবেশন করে। অভিনয়াংশে ছিল নবকিশোর বণিক, প্রশান্ত দত্ত, বীরেন রায়, গোপাল দে, অনিতা চক্রবর্তী। আলো ও শব্দে হরিপদ দাস, নৃত্য পরিচালনায় হীরা দে, আবহ সঙ্গীত— বীরেন রায়।

২২শে এপ্রিল'৭৩ ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ 'বিশে জুন' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। (এদের চরিত্র লিপি শুভেনিরে ছাপা হয়নি।)

সমাপ্তি অনুষ্ঠান ২৩শে এপ্রিল'৭৩, 'রূপারোপ' পরিবেশিত নাটক রতনকুমার ঘোষের

'ভূমিকম্পের আগে'। বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন বিশ্ব সেন, শক্তি হালদার, বিভাস দেবনাথ, বৈশুধর গোস্বামী, সুকুমার সরকার, চিত্ত পাল, দীপক দে, কল্লোল দত্ত, নালক ব্যানার্জী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, আশিস চক্রবর্তী, তুলসী দত্ত, মানিক চক্রবর্তী, উত্তম চক্রবর্তী, প্রশান্ত ভট্টাচার্য শেখর ব্যানার্জী, চিরঞ্জীব চক্রবর্তী, গৌরী দাশগুপ্ত। মঞ্চ—নরেশ পোদ্দার। আলো ও শব্দে—হরিপদ দাশ। সঙ্গীত পরিচালক অমিয় দাস। নাটকটি পরিচালনা করেন শক্তি হালদার। পরবর্তী সময়ে এই নাটকে অংশগ্রহণ করে স্বপন নন্দী, যাদব সাহা। নৃত্য পরিকল্পনায় গৌরী দাশগুপ্তা।

রূপারোপ থেকে নাটক শিল্প ও সঙ্গীতের ত্রৈমাসিক পত্র 'খমপুই' এই সময়ে প্রকাশিত হয়।

।। ১৯৭৪ সাল।।

বছরের প্রথমেই শুরু হয়ে যায় ৫ম বার্ষিক আন্তঃ অফিস নাটক প্রতিযোগিতা রবীন্দ্রভবনে।

১২ জানুয়ারী 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র', রচনা পিরানদেলো, রূপান্তর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, পরিচালক অজিত মজুমদার, প্রযোজক কোর্ট এমপ্লইজ রিক্রিয়েশান ক্লাব।

১৩ই জানুয়ারী' ৭৪ নাটক 'অতীত ডাকে' ঃ নাট্যকার ও পরিচালক—গোপাল দে, প্রযোজক হেলথ সার্ভিসেস রিক্রিয়েশন ক্লাব।

১৪ই জানুয়ারী'৭৪। নাটক 'একটি কাপুরুষের কাহিনী'। রচনা—চিত্তরঞ্জন ঘোষ। পরিচালক বামাপদ মুখোপাধ্যায়। প্রযোজক—পরিসংখ্যান বিনোদন সংস্থা।

১৫ই জানুয়ারী'৭৪। নাটক 'ঘুম নেই', রচনা উৎপল দত্ত, পরিচালনা দীপেন্দ্র দাস, প্রযোজক সিভিল একাউন্টস স্পোর্টস এণ্ড কালচারাল ক্লাব।

১৬ই জানুয়ারী' ৭৪। নাটক 'সিঁড়ি', নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ, পরিচালক শক্তি হালদার, উদ্যোক্তা এডুকেশন রিক্রিয়েশন ক্লাব।

১৭ই জানুয়ারী'৭৪। নাটক 'ছায়ায় আলোয়', নাট্যকার শন ও কেসী, রূপান্তর অশোক মুখোপাধ্যায়, পরিচালক মানস গাঙ্গুলী, উদ্যোক্তা এগ্রি ফরেষ্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব।

১৮ই জানুয়ারী'৭৪। নাটক 'রাজা অয়দিপাউস', নাট্যকার সোফোক্লেস, অনুবাদ শম্ভু মিত্র, প্রযোজক কোঃ-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব, পরিচালক সলিল দেববর্মা।

১৯শে জানুয়ারী' ৭৪। নাটক—'ঈশ্বর বাবু আসছেন' নাট্যকার স্যামুয়েল বেকেট। পরিচালক যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক কৈলাশহর এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

২০শে জানুয়ারী'৭৪। নাটক 'খাঁচা'। নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী। পরিচালক—রঞ্জিতকুমার ভট্টাচার্য। উদ্যোক্তা পি. ডব্লিউ ডি রিক্রিয়েশন ক্লাব।

২১শে জানুয়ারী' ৭৪। নাটক 'একটি মনের মৃত্যু'। নাট্যকার—নীরেন্দ্র ঘোষ, পরিচালক—সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। প্রযোজক খোয়াই শিল্প বিনোদন সংস্থা।

২২শে জানুয়ারী' ৭৪। নাটক 'সেই বৃদ্ধ লোকটি'। নাট্যকার অজানা মিত্র। পরিচালক নিখিল ভট্টাচার্য, প্রযোজক—মহাকরণ বিনোদন সংস্থা। এই নাটকটি মঞ্চস্থ হওয়ার পর প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হয়।

জানুয়ারী মাসে শহরের অন্যান্য সৌখিন সংস্থা কোন নাটক প্রযোজনা করতে পারেনি।

৬ই ফেব্রুয়ারী' ৭৪ মঞ্চস্থ হয় 'প্রস্তাব' নাটকটি। রচনা—বাদল সরকার, পরিচালনায় বাদল সরকার। স্থান—শিশু উদ্যান। আয়োজক—রঙ্গম।

১৯শে ফেব্রুয়ারী' ৭৪ নাটক 'প্রচ্ছন্ন মহিমা' বনফুল রচিত, নাট্যরূপ রতনকুমার ঘোষ, পরিচালনা—ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত এবং তপেশ রায়। প্রযোজনা পশুপালন দপ্তর সাংস্কৃতিক সমিতি। স্থান—রবীন্দ্রভবন।

২৫শে ফেব্রুয়ারী' ৭৪ নাটক 'এক বায়সঃ কথা' এবং 'টেরোড্যাকটিল'। নাট্যকার ভবানী ভট্টাচার্য এবং ইন্দ্র উপাধ্যায়। পরিচালক সুবোধ দে। প্রযোজক রূপম। মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে। এই নাটকটি ৩রা মার্চ ঐ একই মঞ্চে অভিনীত হয়।

৮ই মার্চ' ৭৪ নাটক 'বাঘবন্দী', নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক অজিত মজুমদার, উদ্যোক্তা ঘরোয়া। নাটকটি রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা মার্চ' ৭৪ নাটক 'সংস্কার', পরিতোষ দাস রচিত এবং পরিচালিত। স্থান—রবীন্দ্রভবন, উদ্যোক্তা— রঙ বেরঙ।

৪ঠা মার্চ' ৭৪ মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় এবং রূপায়ণের উদ্যোগে চিত্রকথা সিনেমা হলের সামনের রাস্তায় অভিনীত হয় থিয়েট্রিন বা মুহূর্ত নাটক—১। আত্মহত্যা ২। মধ্যবিত্ত সমাজ ৩। কল্পিত শহর ৪। কমিউনিকেশন কুকুর, সিনেমা, ভিক্ষা। নাটকগুলির অভিনবত্ব শহরে আলোড়ন তোলে।

৪ঠা মার্চ' ৭৪ নাটক 'লৌহকপাট', কাহিনী জরাসন্ধ। রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় এয়ারপোর্ট ড্রামাটিক এসোসিয়েশনের উদ্যোগে।

১১ই মার্চ' ৭৪ নাটক 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। পরিচালক দিলীপকুমার রায়, স্থান রবীন্দ্রভবন। উদ্যোক্তা ছিল পূর্বায়ণ সাংস্কৃতিক সংস্থা।

মার্চের মাঝামাঝি রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয় বার্টোলট ব্রেস্ট রচিত এবং লিট্ল ড্রামা

গ্রুপ অভিনীত নাটক নিয়ম/ব্যতিক্রম/সমাধান।

১৬ই এপ্রিল'৭৪ ননী দেব রচিত এবং বিভাস দেবনাথ পরিচালিত নাটক 'জাগোরে' মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে শিবির সংস্থা দ্বারা।

১লা মে'৭৪ জুলিয়াস ফুচিক শিশু উদ্যানের মুক্তাঙ্গন মঞ্চে ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি, সরকারী কর্মচারী সংস্থা কর্তৃক অভিনীত হয়।

২১শে মে' ৭৪ ত্রিপুর ভারতী নাট্যসংসদ কর্তৃক রূপান্তরম নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৭-ই জুন '৭৪' দীপেন সেনগুপ্ত রচিত 'নিহত নিয়তি' নাটকটি অজিত মজুমদারের পরিচালনায় 'ঘরোয়া'-দ্বারা মঞ্চস্থ হয়।

১২ই জুন '৭৪ বিশ্বনাথ দে ও বাবুল দাশগুপ্ত রচিত দুটি নাটক 'প্রকাশকের সন্ধানে ছটি চরিত্র' এবং 'ধ্রুবতারার আলোয়' রূপারোপ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার।

১৯শে জুন'৭৪ শ্যামাকান্ত দাশ রচিত 'অগ্নিগর্ভ লেনা' নাটকটি পার্থ রায়ের পরিচালনায় অনামী নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

এই মাসেই স্থানীয় নাট্যকার ধীরেন দেবনাথ রচিত 'কবর' নাটকটি সংস্কৃতি পরিষদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই জুন' ৭৪ 'অরুণোদয়ের পথে' নাটকটি 'তিয়াস' নাট্যসংস্থার প্রযোজনায় এবং হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরীর পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যকার Lody Grogory, অনুবাদ সলিল চৌধুরী।

২৯শে জুন'৭৪। রতনকুমার ঘোষ রচিত 'যবনিকা পতনের আগে' এবং অজিতেশ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'নানা রঙের দিন' নাটক দুটি উদয়পুর রংরূপ নাট্যসংস্থা উদয়পুরে মঞ্চস্থ করে। নাটক দুটি পরিচালনা করেন সুশীল দে।

৫ই জুলাই' ৭৪। 'উত্তাল তরঙ্গ' নাটক, রচনা শৈলেশ গুহনিয়োগী, পরিচালক হারাধন দত্ত ও শিপ্রা ভৌমিক। নাট্যশিল্পী সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১২ই জুলাই' ৭৪ 'কবর থেকে বলছি' নাটকটি বহুরূপী গোষ্ঠী রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২১ শে জুলাই' ৭৪। 'দুইরাত্রি', নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত, পরিচালক শক্তি হালদার। রূপারোপ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৭শে জুলাই' ৭৪। রূপায়ণ নাট্যসংস্থা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গল্প অবলম্বনে মাণিক চক্রবর্তী রচিত নাটক 'চোর' নবরূপে

রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।।

৭ই আগষ্ট' ৭৪।। মন্টু গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'ঝড়' নাটকটি নাট্যশিল্পী সংসদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।।

৫ই আগষ্ট' ৭৪।। 'দুই রাত্রি' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে পুনরাভিনয় হয়।।

১০ই আগষ্ট' ৭৪ লিটল ড্রামা গ্রুপ রবীন্দ্রভবনে মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ" এবং পরশুরাম রচিত 'চিকিৎসা সঙ্কট' নাটক দুটি অশোক চক্রবর্তী ও মৃণাল দে-র পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

২১শে আগষ্ট' ৭৪ মানিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'চোর' নাটকটি আবার রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।।

১৯ এবং ২০শে আগষ্ট' ৭৪ অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১২ই সেপ্টেম্বর' ৭৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প অবলম্বনে বুদ্ধদেব বসু এবং প্রতিভা বসুর নাট্যরূপ 'দালিয়া' শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।।

১৪ই সেপ্টেম্বর' ৭৪ 'প্রস্তাব' ও 'হইতে সাবধান' (নাটক রাধারমন ঘোষ ও 'চেখভ' কাহিনীর সরোজ চৌধুরী কৃত নাট্যরূপ) নাট্যরূপ সরোজ চৌধুরী, নাটক দুটি মানিক দেব-এর পরিচালনায় নির্মোক সংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে সেপ্টেম্বর' ৭৪ 'কুশাবাজ' নাটকটি ও নং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।।

১২ই অক্টোবর 'প্রসেস' নাটকটি রূপায়ণ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই অক্টোবর' ৭৪ 'দুই রাত্রি' নাটকটি সরকারী কর্মচারী কল্যাণ তহবিলের সাহায্যার্থে যৌথ কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে রূপারোপ কর্তৃক অভিনীত হয় রবীন্দ্রভবনে।। নাটকটি পরিচালনা করেন শক্তি হালদার।

২০শে অক্টোবর' ৭৪ 'শেষ কোথায়' নাটকটি (রচনা এবং পরিচালনা গোপাল দে) শিল্পীসংসদ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২২শে নভেম্বর' ৭৪।। অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত 'মারীচ সংবাদ' নাটকটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। এপর্যন্ত নাটকটি একাদশ রজনী অভিনীত হলো।।

।। ১৯৭৫ সাল ।।

জানুয়ারী মাস থেকে অফিস নাটক প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। তার আগে কয়েকটি নাটক সৌখিন নাট্যসম্প্রদায় মঞ্চস্থ করে।

৪ঠা জানুয়ারী' ৭৫। বৌদ্ধ নাটক 'বৈশাখী পূর্ণিমা' বৌদ্ধ উপজাতি বালিকাদের দ্বারা অভিনীত হয় হরিনা বুদ্ধবিহার প্রাঙ্গনে। উদ্যোক্তা ছিলেন বুদ্ধিষ্ট কালচারাল কমিটি।

৫ই জানুয়ারী' ৭৫ একাঙ্ক নাটক 'চেয়ার' রবীন্দ্রপরিষদের উদ্যোগে পরিষদ গৃহে জলধর মল্লিক কর্তৃক অভিনীত হয়।

ষষ্ঠ আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতা ১৯৭৫

১৩ই জানুয়ারী' ৭৫। 'আবর্ত্ত', কাহিনী সমরেশ বসু, নাট্যরূপ বরুণ দাশগুপ্ত, পরিচালনায় পার্থ রায় স্বাস্থ্যবিভাগ ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থার উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। সকল নাটকই রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই জানুয়ারী' ৭৫ নাটক 'সংক্রান্তি'। পরিচালক শক্তি হালদার। প্রযোজক—শিক্ষা অধিকার বিনোদন সংস্থা।

১৫ই জানুয়ারী' ৭৫—নাটক 'কিউবা', নাট্যকার ভোলা দত্ত, পরিচালক দীপেন্দ্র দাস, প্রযোজক সিভিল একাউন্টস স্পোর্টস কালচারাল ক্লাব।

১৬ই জানুয়ারী' ৭৫ নাটক 'আমি', নাট্যকার পার্থপ্রতিম চৌধুরী, পরিচালক শিশিরকান্তি দেব, প্রযোজক শিল্পবিভাগ ক্রীড়া ও বিনোদন সংস্থা।

১৭ই জানুয়ারী' ৭৫। নাটক 'চাকভাঙা মধু', নাট্যকার মনোজ মিত্র, পরিচালক শিল্পীগোষ্ঠী, প্রযোজক—পরিসংখ্যান বিভাগ।

১৮ই জানুয়ারী' ৭৫। নাটক 'ত্রিংশ শতাব্দী', পরিচালনায় অজিত মজুমদার, প্রযোজনা শুল্ক ও কেন্দ্রীয় আবগারী বিনোদনসংস্থা।

১৯শে জানুয়ারী' ৭৫। 'মেঘ', নাট্যকার উৎপল দত্ত, পরিচালক অশোক চক্রবর্তী, প্রযোজক কোর্ট এমপ্লয়িজ রিক্রিয়েশন ক্লাব।

২১শে জানুয়ারী নাটক 'রাজরক্ত', নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সুবোধ দে, প্রযোজক পূর্ত্তবিভাগ বিনোদনসংস্থা।

২২শে জানুয়ারী' ৭৫ নাটক 'মরণ খেলা', নাট্যকার রমেন লাহিড়ী, পরিচালক করুণাময় সেন, প্রযোজক খোয়াই শিক্ষা বিনোদনসংস্থা।

৫ই মার্চ '৭৫— নৃত্যনাট্য 'সামান্য ক্ষতি', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পিপলস আর্ট থিয়েটার কর্তৃক প্রযোজিত এবং পরিচালিত। মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে।

১৩ই ফেব্রুয়ারী' ৭৫ নাটক 'সেই বৃদ্ধ লোকটি', নাট্যকার-পরিচালক নিখিল ভট্টাচার্য, প্রযোজক ত্রিপুরা সেক্রেটরিয়েট ড্রামা ট্রুপ, স্থান রবীন্দ্রভবন (নাটকটি অল ইণ্ডিয়া সিভিল সেক্রেটরিয়েট ড্রামা কমপিটিশনে নতুন দিল্লীর মবলঙ্কর হলে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১৯৭৩-৭৪ সালে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন ত্রিপুরায় অনুষ্ঠিত শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে বিশ্বরূপা পুরস্কার পায়)।

সীতাহরণ নাটকে বিশ্বজিৎ সেন, যাদব সাহা, কমল মিত্র, বীরেন রায়, প্রমুখেরা

২৭শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী নাটক 'সীতাহরণ'। নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ, প্রযোজক রূপারোপ, পরিচালক শক্তি হালদার, অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে।

২৭শে এপ্রিল' ৭৫, রবীন্দ্রনাথের কালের যাত্রা রঙ্গম কর্তৃক পরিবেশিত হয় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে।

১০ ও ১১ই মে'৭৫ রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা', অর্কেষ্ট্রা কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই জুন' ৭৫। পূর্বায়ণ সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয় 'তোতা কাহিনী'। ১০ ও ১১ই জুন' ৭৫। বীর চাঁদ সদাগর নাটকটি ত্রিপুরা সংস্কৃতিপরিষদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৯শে জুন'৭৫ জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গেটম্যান' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। ৮ই জুলাই' ৭৫। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ নাট্যসংস্থা বাবুল দাশগুপ্তর 'ধ্রুবতারার আলো' এবং রতনকুমার ঘোষের 'ভূমিকম্পের আগে' অবলম্বনে গ্রন্থিত 'ট্রিড্রিম' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। ট্রিড্রিম অন্ধকার থেকে আলোয়

উত্তরণের নাটক বলে তারা ঘোষণা করে।

এই নতুন আঙ্গিকে যাঁরা অংশ নিয়েছেন : আশিস চক্রবর্তী, যাদব সাহা, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবতোষ চৌধুরী, বিভাস দেবনাথ, রঞ্জিত সাহা, স্বপন ঘোষ, তুলসী দত্ত, চিত্ত পাল, স্বাতী মৈত্র, ভারতী মৈত্র, চিত্রা মৈত্র, নমিতা হালদার, বিশ্ব সেন, শক্তি হালদার, গৌরী দাশগুপ্তা। আলো— হরিপদ দাস, সঙ্গীত— অমিয় দাস, কণ্ঠে - রীতা সিংহরায়। রূপসজ্জা—নরেশ পোদ্দার।

বেশীরভাগ তরুণ শিল্পীকে নাটকটিতে অংশগ্রহণ করিয়ে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে রূপারোপ।

২রা ও ৪ঠা জুলাই রবীন্দ্রনাথের শ্যামা নৃত্যনাট্যটি আর্কেস্ট্রা কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২০শে জুন' ৭৫ 'ক্যাপ্টেন হুররা' (নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়) পিপলস আর্ট থিয়েটার রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে জুলাই' ৭৫। ক্যাপ্টেন হুররা সুবোধ দের পরিচালনায় রূপম কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২১শে নভেম্বর' ৭৫। এম বি বি কলেজের ছাত্ররা 'ডাইনোসেরাস' এবং ছাত্রীরা 'রাক্ষস' নাটক দুটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে নভেম্বর' ৭৫। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক কাহিনী নিয়ে করবী দেববর্মা রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'মহারানী মহাদেবী' শিশুদিবস, ১৯৭৫ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা শিশু কল্যাণ পরিষদ থেকে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

শরৎচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে রূপম আয়োজিত শরৎ নাট্যমেলা ৮ই ডিসেম্বর হতে ১৩ই ডিসেম্বর' ৭৫ অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে।

৮ই ডিসেম্বর' ৭৫। 'ভবঘুরে শ্রীকান্ত', নাট্যরূপ-পরিচালক বামাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রযোজক রূপম। অভিনয়াংশে—বামাপদ মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দেবরায়, অজয় নন্দী, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, প্রমথেশ দেবরায়, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, গোপাল চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র সাহা, রাণা চক্রবর্তী, পার্থ সাহা, রাজা চক্রবর্তী, পার্থ দাস, ডঃ অজিতকুমার চক্রবর্তী, কৃষ্ণা পোদ্দার, বেলা মজুমদার, শেলী মুখার্জী, জয়শ্রী দেব। আলো— হরিপদ দাস, রূপসজ্জা—চিন্ময় রায়, আবহসঙ্গীত—রবীন্দ্র দাস।

শুভেনিরে তারিখ ছিল না, হয়তো ৯ই ডিসেম্বর' ৭৫ শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প অবলম্বনে 'মহেশ' নাটক ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদের প্রযোজনা এবং পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। অভিনাংশে—কোন নাম শুভেনিরে দেওয়া হয়নি।

১১ই ডিসেম্বর' ৭৫। শরৎচন্দ্রের 'বিজয়া' নাটকটি নিবেদন করে 'তিয়াস' নাট্য সংস্থা।

বিভিন্ন চরিত্রে—পরিতোষ দাশগুপ্ত, দিব্যেন্দ্র সেনগুপ্ত, তন্ময় দত্ত, শেখরেশ ভট্টাচার্য, শঙ্করসেবক দাস, সুধীরেশ ভট্টাচার্য, জনা ভট্টাচার্য, রেখা ভট্টাচার্য, ডঃ প্রেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরী, নিরোদবরণ মজুমদার ও অর্দ্ধেন্দুশেখর দাশ। আলো—দিলীপ দাশ।

১০ই ডিসেম্বর' ৭৫। সি. এ. সি. টি নিবেদন করে শ্রীকান্ত, অভাগীর স্বর্গ, পল্লীসমাজ, চরিত্রহীন এবং শেষপ্রশ্ন অবলম্বনে নাটক 'লোকযাত্রা'। গ্রন্থনা এবং নির্দেশনায় ছিলেন অশোক চক্রবর্তী; অভিনয়াংশে মালা দাম, দীপ্তি চৌধুরী, লিলি সেনগুপ্তা, কৃষ্ণা দেববর্মা, দেবরাজ হালদার, যুগল বৈদ্য, স্বপন কুমার চক্রবর্তী, স্বপন ঘোষ, কৃষ্ণপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ দেববর্মা, হংস হালদার। সঙ্গীত পরিচালনায় হীরেন দেববর্মা, আলো—হরিপদ দাশ।

১২ই ডিসেম্বর' ৭৫। লিটল ড্রামা গ্রুপ প্রযোজনা ও পরিচালনা করে ষোড়শী নাটকটি। অভিনয়ে—ফুলন ভট্টাচার্য, বনানী রায়, অহীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রদীপ বসু, দিলীপ ভট্টাচার্য, হরিপদ ভট্টাচার্য, সুহাস রায়, জ্ঞানদানন্দ রায়, কল্যাণ পাল, অমূল্য বণিক, অসিত চক্রবর্তী, মৃণাল দে সরকার, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সন্তোষ বর্ধন, বিমান সাহা, ও সুখলাল দে।

রঙ্গম ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় নাট্যমেলায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। বিষয় ছিল শরৎচন্দ্র, ব্যক্তি, সাহিত্য ও নাট্যবিচার। বক্তা ছিলেন শ্রীযুক্তা নবনীতা দেবসেন এবং প্রধান অতিথি শ্রীযুক্তা রাধারাণী দেবী।

।। ১৯৭৬ সাল।।

জানুয়ারী মাসেই ৭ম আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতা ১৯৭৬ শুরু হয়ে গেল।

৭ই জানুয়ারী' ৭৬। মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুষ্পক রথ' সলিল দেববর্মার পরিচালনায় কো-অপঃ রিক্রিয়েশেন ক্লাব মঞ্চস্থ করে। সমগ্র প্রতিযোগিতা রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই জানুয়ারী' ৭৬। অজিত গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'থানা থেকে আসছি' নাটকটি অশোক চক্রবর্তীর পরিচালনায় কোর্ট এমপ্লইজ রিক্রিয়েশন ক্লাব কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

৯ই জানুয়ারী' ৭৬। বাদল সরকার রচিত 'এবং ইন্দ্রজিৎ' সুবোধ দের পরিচালনায় পূর্তবিভাগ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১০ই জানুয়ারী' ৭৬। লোকনাথ ভট্টাচার্য রচিত 'বাঘের চোখ' দীপেন্দ্র দাস-এর পরিচালনায় সিভিল একাউন্টস রিক্রিয়েশন ক্লাব প্রযোজনা করে।

১১ই জানুয়ারী' ৭৬। নাট্যকার গোপাল দে রচিত 'মৃতের মিছিল' তাঁরই পরিচালনায় হেল্থ ডিপার্টমেন্ট থেকে মঞ্চস্থ হয়।

১২ই জানুয়ারী' ৭৬। বাদল সরকার রচিত 'বল্লভপুরের রূপকথা' মহাকরণ

বিনোদনসংস্থা মঞ্চস্থ করে। পরিচালক—নিখিল ভট্টাচার্য।

১৩ই জানুয়ারী' ৭৬। রাধারমন ঘোষ রচিত নাটক 'রণ-দুন্দুভি' প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিচালনায় খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ থেকে মঞ্চস্থ হয়।

১৪ই জানুয়ারী 'মুছেও যা মোছেনা', নাট্যকার জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশিরকান্তি দেব-এর পরিচালনায় শিল্পবিভাগ থেকে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই জানুয়ারী' ৭৬। 'সীতা হরণ', নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ, পরিচালক শক্তি হালদার, শিক্ষাবিভাগ থেকে মঞ্চস্থ হয়।

১৬ই জানুয়ারী' ৭৬। 'ফেরা', নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ, কমল মৈত্রের পরিচালনায় ও এন. জি. সি. কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই জানুয়ারী' ৭৬। তমাল দাস রচিত নাটক 'স্বপ্নসম্ভবা' খোয়াই এর শিক্ষাবিনোদন সংস্থা হতে মঞ্চস্থ হয়।

৩১শে জানুয়ারী'৭৬। 'বল্লভপুরের রূপকথা' নাট্যকার বাদল সরকার, নিখিল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় নেপথ্য সংস্থা মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রভবনে চাসনালাখনি দুর্গতদের সাহায্যার্থে। এটি তাদের তৃতীয় প্রযোজনা।

১৩ই মার্চ' ৭৬। 'এবং ইন্দ্রজিৎ', নাট্যকার বাদল সরকার, সুবোধ দে-র পরিচালনায় 'রূপম' সংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে সাহায্যার্থে।

১০ই এপ্রিল'৭৬। মনোজ মিত্রের 'টাপুরটুপুর' এবং সুকুমার রায় রচিত 'চলচিত্ত চঞ্চরী', পরিচালক অজিত মজুমদার, প্রযোজক ঘরোয়া নাট্যসংস্থা, স্বর্গত ত্রিপুরেশ মজুমদারের স্মৃতিচারণে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১০ এবং ১১ই মে' ৭৬। রবীন্দ্রনাথের 'অভিসার', গ্রন্থনা এবং পরিচালনা নবেন্দু চৌধুরী, প্রযোজক অর্কেষ্ট্রা, রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই জুন' ৭৬। নাটক 'ভূমিকম্পের পরে', নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ, রূপারোপের প্রযোজনায় এবং শক্তি হালদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৪ এবং ২৫শে সেপ্টেম্বর' ৭৬। নাটক 'নহবৎ', নাট্যকার সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনকুমার রায়ের পরিচালনায় আরাধনার প্রযোজনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৫ই অক্টোবর'৭৬। 'অথবা আমরা' রচনা এবং পরিচালনা অনিরুদ্ধ গুপ্ত, মৈনাক নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৩০শে ডিসেম্বর' ৭৬। 'সে', রচনা এবং পরিচালনা অনিরুদ্ধ গুপ্ত, মৈনাক নাট্যগোষ্ঠী দ্বারা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

এ পর্যন্ত নাট্য অনুষ্ঠানের মোটামুটি তথ্য দেওয়া হল। এই আলোচনা গ্রন্থের কাল

১৯৭৫ পর্যন্ত। ১৯৭৬ থেকে ৭৮ পর্যন্ত অতিরিক্ত তথ্য যুক্ত করা হোল, সেইসঙ্গে ১৯৮০ পর্যন্ত বিশিষ্ট সংস্থাগুলির নাট্যপ্রযোজনা এখানে উল্লেখ করা হল পাঠকের সুবিধার জন্য। ১৯৮০ সালে জুন মাসে ত্রিপুরায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার কারণে নাট্যাভিনয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তথ্য সংগ্রহ সম্ভব হয়নি পরিপূর্ণভাবে।

১৯৭৭ সালে রবীন্দ্রভবনে ৮ম আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতা ১০ই জানুয়ারী থেকে ২১শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হয়। অংশগ্রহণ করে ১১টি সংস্থা। উৎপল দত্ত রচিত 'টিনের তলোয়ার', পরিচালক অশোক চক্রবর্ত্তী, কোর্ট এমপ্লইজ উপস্থাপনা। নাটক 'পুনর্মিলন', রচনা বুদ্ধদেব বসু, পরিচালক যাদবেন্দ্র মুখার্জী, প্রযোজনা পঞ্চায়তরাজ। 'যদি আমি কিন্তু আমি' নাটকটির নাট্যকার রাধারমন ঘোষ, পরিচালক পার্থ রায়, উপস্থাপনায় হেলথ সার্ভিসেস। মানব মিত্র রচিত ও নিখিল ভট্টাচার্য পরিচালিত নাটক 'অরণ্যে দিশারী', প্রযোজনা মহাকরণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ক্ষুধিত পাষাণ', নাট্যরূপ সুধীরকুমার চক্রবর্তী, পরিচালনা অরুণেন্দুবিকাশ রায়, উপস্থাপনা এজি অফিস। প্রবোধবন্ধু অধিকারীর 'জনক-জননী' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় এবং শিক্ষাদপ্তরের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কমলাকান্ত ও তার জবানবন্দী', নাট্যরূপ জলধর মল্লিক, শিশিরকান্তি দেবের পরিচালনায় শিল্পদপ্তরের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকার রচিত 'পরে কোন দিন' নাটকটি প্রশান্ত গাঙ্গুলীর পরিচালনায় খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগ মঞ্চস্থ করে। শচীন ভট্টাচার্য রচিত 'গন্ধরাজের জন্ম' জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্তর পরিচালনায় ডি, এম অফিস উপস্থাপনা করে। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর 'আমি ক্রীতদাস' নাটকটি সলিল দেববর্মার পরিচালনায় কো-অপারেটিভ কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। 'অন্ধকারের নীচে সূর্য', নাট্যকার অগ্নিদূত, পরিচালনা নীরেন্দ্র ঘোষ, খোয়াই শিক্ষাবিভাগ থেকে পরিবেশিত হয়।

এছাড়া 'লক্ষণের শক্তিশেল' নাটকটি জলধর মল্লিক ও সুখময় ঘোষের পরিচালনায় শিশু রঙমহল কর্তৃক এম. বি. বি. কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়। রবীন্দ্রভবনে 'টিনের তলোয়ার' নাটকটি সি. এ. সি. টি. কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। তারাশঙ্করের 'কবি' নাটকটি শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। শ্রীমতী কমলা দত্ত-র পরিচালনায় 'ঝাঁসীর রানী' নাটকটি কাকড়াবন মহিলা সমিতির বিচিত্রা হলে কাকড়াবন মহাবিদ্যালয় কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। শিবপদ চক্রবর্তী রচিত ও পরিচালিত 'যুগের যন্ত্রনা' রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। অগ্নি আচার্য রচিত 'নীলাচলে শ্রীচৈতন্য' নাটকটিও রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকারের 'পাগলা ঘোড়া' তিয়াস কর্তৃক মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে। নাটকটি পরিচালনা করেন ডঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরী। এক নতুন স্বাদের নাটক 'অভিশাপ তরুণ বিপ্লব বিজয় ও অন্যান্য নাটক' অনিরুদ্ধ গুপ্তর পরিচালনায় মৈনাক কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

এবছর শহর দক্ষিণাঞ্চল নাট্যমেলা কমিটি আয়োজিত একাঙ্ক নাট্যমেলা ৩রা নভেম্বর হতে ১৪ই নভেম্বর' ৭৭ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

অংশগ্রহণ করে ১৭টি দল, অনুষ্ঠিত হয় বড়দোয়ালীর কৃষ্টিভবনে। দলগুলি হোল, ভারতমাতা ক্লাব, পঃ প্রতাপগড় আমাদের ক্লাব, পুলিশ ২য় ব্যাটেলিয়ান, অগ্নি— বড়দোয়ালী, নীলকমল ভট্টপুকুর, জনকল্যাণ সমিতি এম. বি. টিলা, সেবক সংঘ অরুন্ধতী নগর, মৌচাক—বড়দোয়ালী, নবারুণ নাট্যসংস্থা, ত্রিবেণী নাট্যম বেলতলি, নাট্যশ্রী বড়দোয়ালী, মিলনচক্র মধ্য বাধারঘাট, চৌরঙ্গি নাট্যসংস্থা মহিলা বিভাগ, অগ্নি, ত্রিবেণী নাট্যম, আমাদের ক্লাবের নাট্য গোষ্ঠী। নাটকগুলি হোল অশোক চক্রবর্তীর 'অন্ধকারের মিছিল', পাঁচকড়ি চট্টোপাধ্যায় -এর 'প্রহ্লাদ;' প্রসন্নকৃষ্ণ ভট্টাচার্য-এর, 'রক্তেবোনা ধান'; অগ্নিদূত রচিত 'ভাবীকাল' কিরণ মৈত্র—'বুদবুদ; রবীন্দ্র ভট্টাচার্য—'আমারে বাঁচতে দাও'; বসন্ত ভট্টাচার্য—'পরাজিত পৃথিবী; রাধারমন ঘোষ—'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে'; জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়—'বিসর্গ'; বিধায়ক ভট্টাচার্য—'অন্তরে নামটি রঞ্জনা'; নবকুমার ভট্টাচার্য—'অন্যনাটক'; মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়—'নায়কের সন্ধানে; শুভেন্দু কুণ্ড— 'উপরওয়ালা'; পার্থপ্রতিম চৌধুরী—'লাসকাটা ঘর'; রবীন্দ্র ভট্টাচার্য—'রক্তে রোয়া ধান'; শচীন ভট্টাচার্য—'এক্কা গাড়ীর ঘোড়া'; পরিচালক ছিলেন—অশোক চক্রবর্ত্তী, তপনমোহন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, তপন ভদ্র, রঞ্জিত চক্রবর্ত্তী, মৃণালশেখর দে, বাচ্চু দত্ত, পুষ্পল চক্রবর্ত্তী, ডঃ পরিমলকান্তি চক্রবর্ত্তী, জবা চক্রবর্ত্তী।

।। ১৯৭৮ সাল ।।

জানুয়ারী মাসে ৯ম অফিস নাটক প্রতিযোগিতা'৭৮ শুরু হয় মোট ৭টি সংস্থা নিয়ে।

২২শে জানুয়ারী ৭৮। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি', নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়, পরিচালনায় রঞ্জিত ভৌমিক, প্রচার বিভাগ। ২৩শে জানুয়ারী' ৭৮— 'সারা রাত্তির', নাটক বাদল সরকার, পরিচালক দীপেন দাস; পঞ্চায়েত রাজ— ২৪শে জানুয়ারী' ৭৮—যদি আর একবার, নাট্যকার বাদল সরকার, পরিচালক বামাপদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষা অধিকার। ২৫শে জানুয়ারী' ৭৮—'রামরাজত্বে', নাট্যকার এবং পরিচালক গোপাল দে, স্বাস্থ্য বিভাগ। ২৭শে জানুয়ারী—'পাগলা ঘোড়া', নাট্যকার বাদল সরকার, পরিচালক বিনোদনগোষ্ঠী, পরিসংখ্যান বিভাগ। ২৮শে জানুয়ারী' ৭৮—'নরক-গুলজার', নাট্যকার মনোজ মিত্র, পরিচালক ধীরেন্দ্র সিংহ, কমলরায় চৌধুরী, চন্দন সেনগুপ্ত, খোয়াই শিক্ষা বিনোদনসংস্থা।

১৯শে ফেব্রুয়ারী' ৭৮— গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রাবন্ন কবজে',

ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে বেসিক ট্রেনিং কলেজে মঞ্চস্থ হয়, প্রযোজক স্বাস্থ্যবিভাগ বিনোদন সংস্থা।

৫ই এবং ৬ই আগষ্ট 'মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ'। নাট্যকার গোপাল দে পরিচালনা বীরেন রায়, শিল্পী সংসদ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। এটি তাদের ২৩তম নাট্য প্রযোজনা।

২৬শে নভেম্বর' ৭৮। 'অমবস্যার মৃত্যু', নাট্যকার মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালক শক্তি হালদার, 'অন্বেষক' কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। অন্বেষকের এটি ৪র্থ প্রযোজনা।

১৯৭৮ সালে হয়তো আরো নাট্যসংগঠনের প্রযোজনা ছিল কিন্তু কোনো রকম লিখিত তথ্য না পাওয়ায় এখানে ছাপা গেল না।

।। ১৯৭৯ সাল ।।

এবছর রবীন্দ্রভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় ১০ই এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী 'বীরেশ্বর নরেন্দ্রনাথ', নাট্যকার গোপাল দে, পরিচালক বীরেন রায়, উদ্যোক্তা আগরতলা বিবেকানন্দ যুব 'মহামণ্ডল'-প্রযোজক 'শিল্পীসংসদ'। এটা তাদের ২৪তম নাট্যার্ঘ।

১৭ই এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী' ৭৯ ঃ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মা মাটি মানুষ', পরিচালনায় শক্তি হালদার। অন্বেষক নাট্য সংস্থার এটি ৫ম অবদান। ৫ই ফেব্রুয়ারী' ৭৯ ঃ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' নাটকটি অর্ধেন্দু ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ধর্মনগরের 'আঙ্গিক' নাট্যসংস্থা টাউন হলের মাঠে মঞ্চস্থ করে। ১৬ই এপ্রিল' ৭৯ ঃ ভক্ত রামপ্রসাদ, নাটক গোপাল দে, পরিচালনায় শিল্পীসংসদ, এটি তাদের ২৫তম অবদান। ৭ই এপ্রিল' ৭৯ ঃ 'ক্যাপ্টেন হুররা', নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়, পরিচালক সুবোধ দে, রূপম কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। ৩০শে এপ্রিল' ৭৯ ঃ শিশু নাটিকা 'সীতার বনবাস', সুনীলবিকাশ কাপালীর পরিচালনায় গণ্ডাছড়া লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে গণ্ডাছড়ার দুর্গাবাড়ী মঞ্চে অভিনীত হয়। ১৩ই জুন' ৭৯ ঃ 'সূর্য নেই স্বপ্ন আছে' এবং 'শেষ অঙ্কে নট' নাটক দুটি সুধীন দাশগুপ্তর পরিচালনায় থিয়েটার আর্ট কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। ১৮ই জুন' ৭৯ ঃ 'ময়না দ্বীপের রূপকথা' এবং 'ফুলগুলি সরিয়ে নাও' নাটক দুটি সুধীন দাশগুপ্তর পরিচালনায় থিয়েটার আর্ট কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। ২০শে এবং ২১শে জুন মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নৃত্যনাট্য অর্কেষ্ট্রা কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই নভেম্বর' ৭৯। 'অন্ধকারের আয়না' নাটকটি (রচনা অমর গঙ্গোপাধ্যায়, পরিচালনায় শাক্তি হালদার) অন্বেষক কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর' ৭৯। মহাকবি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' বিহাররঞ্জন সিংহ এবং শীলা সিংহর পরিচালনায় স্থানীয় শিল্পী সমাবেশে রূপারোপের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এবং ১১ই ডিসেম্বর' ৭৯। তরুণ রায়ের পরিচালনায় কলকাতার থিয়েটার সেন্টার রূপারোপের উদ্যোগে 'পরাজিত নায়ক' এবং 'অথচ সংযুক্তা' নাটক দুটি পরিবেশন করে।

অন্যান্য প্রযোজনার কথা প্রমাণ সহ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৮০ ত্রিপুরায় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা শুরু হয় জুন মাসে, তার আগে কয়েকমাস চলে চরম উত্তেজনা। নাট্য প্রযোজনা থমকে যায়। এরই মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক সাহসের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। যেমন- ১০ই ফেব্রুয়ারী' ৮০—রামকৃষ্ণ দেবনাথের আঞ্চলিক ভাষার নাটক 'হকুনর ছাও' রবীন্দ্রভবনে। ২৭শে অক্টোবর মাণিক চক্রবর্তীর পরিচালনায় রূপায়ণের প্রযোজনায় 'অজ্ঞাতবাস' রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। ১৬ই নভেম্বর শক্তি হালদারের পরিচালনায় অন্বেষকের প্রযোজনায় তুলসীদাস লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' রেন্টার্স সোসাইটি, কালীমন্দিরের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। ২রা ডিসেম্বর FANDO & LIS— 'ফালতু লতু' (নাট্যকার F.ARRABAL, রূপান্তর মাণিক চক্রবর্তী) রূপায়ণ কর্তৃক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। আরো নাটক হয়তো মঞ্চস্থ হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আলোচ্যকাল ১৯৭৮ পর্যন্ত, তাই পরবর্তী বছরগুলি সংক্ষিপ্ত করা হোল।

ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনে নাট্যকারের প্রভাব

ত্রিপুরার নাট্যচর্চার ধারাকে বোঝার জন্য মোটা-মুটি একটা ধারাবাহিক তালিকা গ্রন্থে সংযোজিত করা হল। নাট্যআন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় অর্থাৎ ত্রিপুর শিল্পায়তন এবং লোকশিল্পী সংসদের যুগে আমরা এই তালিকা থেকে দেখতে পাই যে ঐতিহাসিক নাটক বাদ দিলে সামাজিক নাটকে নাট্যকার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রাধ্যান্য অব্যাহত আছে। সেই সঙ্গে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনারায়ণ গুপ্ত, ব্রজেন দে, মন্মথ রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, ধনঞ্জয় বৈরাগী (তরুণ রায়), পার্থপ্রতিম চৌধুরী, নিশিকান্ত বসু রায়, কিরণ মৈত্র, মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন ভট্টাচার্য, তুলসীদাস লাহিড়ী, মহেন্দ্র গুপ্ত, দীনবন্ধু মিত্র, সুকুমার রায় প্রভৃতি কাহিনীকার ও নাট্যকারগণ ত্রিপুরার নাট্যচর্চায় প্রধান অংশ দখল করে রেখেছেন।

নাট্য আন্দোলনের তৃতীয় ধারায় রবীন্দ্রনাথতো আছেনই, সেই সঙ্গে আছেন স্থানীয় নাট্যকার গোপাল দে, অজিত মজুমদার, স্বপন সেনগুপ্ত, আনন্দময় রায়, মাণিক চক্রবর্তী, ধীরেন দেবনাথ, ননীদেব উল্লেখযোগ্য ভাবে। আর এসেছেন বাদল সরকার, সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায়, জগদীশ চক্রবর্ত্তী, নন্দগোপাল রায় চৌধুরী, গঙ্গাপদ বসু, মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়, রতনকুমার ঘোষ, বিমল রায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী, বীরু মুখোপাধ্যায়, অমিয় মিত্র, অরুণকুমার দে, শেখর চট্টোপাধ্যায়, বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, অজিতেশ বন্দোপাধ্যায়, ইন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, রাধারমন ঘোষ, বিজয় তণ্ডুলকার, তমাল দাস, রণজিত রায়, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র, গঙ্গাপদ বসু, সলিল চৌধুরী, জরাসন্ধ, প্রতিভা বসু, বুদ্ধদেব বসু, উৎপল দত্ত, এবং বার্টোলিট ব্রেস্ট।

এই সময় রতনকুমার ঘোষ, বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যসংগঠনের কাছে জনপ্রিয় নাট্যকার হয়ে ওঠেন।

নাট্য পরিচালক

নাট্য পরিচালক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন প্রথম এবং দ্বিতীয় ধারায় সুধাংশুমোহন দত্ত, ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বদেশরঞ্জন পাল, অনিল সেন, হৃষিকেশ দেববর্মা (ভিক্ষু ঠাকুর), রাণা ডাহালজঙ্গ (রত্ন হুজুর), গোপাল দে, শক্তি হালদার, কেশব ভট্টাচার্য, বিমল গুপ্ত।

তৃতীয় ধারায় নবনাট্য আন্দোলনে আমরা খ্যাতিমান পরিচালক হিসাবে পেলাম শক্তি হালদার, সুবোধ দে, অজিত মজুমদার, অশোককুমার দত্ত, সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, সলিল দেববর্মা, সুধীন আচার্য, গোপাল দে, দীপেন্দ্র কুমার দাস, নিখিল ভট্টাচার্য, রবীন্দ্র ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি চক্রবর্তী, বামাপদ মুখার্জী, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, সুখময় ঘোষ, আনন্দময় রায়, অমলেন্দু রক্ষিত, হারাধন দত্ত, শান্তিপদ ভট্টাচার্য, জলধর মল্লিক, হীরালাল সেন, শিশিরকান্তি দেব, জ্যোতি প্রসাদ সেনগুপ্ত, হরেন্দ্রকিশোর, দেববর্মা, সত্যেন রায় চৌধুরী, রমেন্দ্র ভট্টাচার্য, ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরী, গণেশ দেববর্মা, মাণিক চক্রবর্তী, কান্তি চক্রবর্তী, তপেশ রায়, জহর লস্কর, নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত, অশোক চক্রবর্তী, পার্থ রায়, যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, মাণিক দেব, ধূর্জটিপ্রসাদ দাশগুপ্ত, পরিতোষ দাস, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, নবেন্দু চৌধুরী, স্বপন কুমার রায়, ধীরেন্দ্র দেবনাথ, রূপেন চক্রবর্তী, শিবপদ চক্রবর্তী, প্রশান্ত গাঙ্গুলীকে ।

মহিলা পরিচালিকা—সবিতা মজুমদার, বিজিতা গাঙ্গুলী, করবী দেববর্মা, অমিতা ভট্টাচার্য, কমলা দত্ত, জবা চক্রবর্ত্তী, রানী কর, মীনাক্ষী ঘোষ।

সবিতা মজুমদার (সিংহ রায়) এর উল্লেখযোগ্য পরিচালনা 'নাট্যকারের সন্ধানে ছয়টি চরিত্র' নাটক। নাটকটি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তর, দ্বারা লিউজি পিরানদেল্লো-এর রূপান্তর। এটি ২৫শে অক্টোবর ১৯৭০ আন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়। করবী দেববর্মা ত্রিপুরার ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে স্বরচিত নাটক 'মহারানী মহাদেবী' যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেছেন।

নাট্য পরিচালনা এবং রচনার ক্ষেত্রে আর একটি স্মরণীয় নাম অমিতা ভট্টাচার্য। ত্রিপুরারাজ্যের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসকে সঙ্গীত ও নৃত্যে সমৃদ্ধ মনোমুগ্ধকর কাব্যনাট্যে পরিবেশন করেছেন তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ। বহুবার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ওই নাটক শুধু পরিবেশিত হয়নি, মানুষের মন জয় করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর অকাল মৃত্যুতে নাট্যজগতে চরম ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বিজিতা গাঙ্গুলী ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে ত্রিপুরার সংস্কৃতি জগৎ

তাঁর কাছ থেকে আরো অনেক কিছু পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে। লোকশিল্পী সংসদে তাঁর পরিচালিত নাটক শক্তিপদ রাজগুরু রচিত 'মেঘে ঢাকা তারা'; শুধু পরিচালনার ক্ষেত্রে নয়, তাঁর অপূর্ব অভিনয়-ও সেদিনের দর্শককে অভিভূত করেছে।

মীনাক্ষী ঘোষের বলিষ্ঠ পরিচালনা রাজদূত রচিত 'রক্তে রাঙা নকশাল' ১৯৭২-র একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।

১৯৭২-এ রানী করের পরিচালনায় একটি উল্লেখযোগ্য নাটক ধীরেন্দ্রলাল ধর রচিত 'রূপনগরের রাজকুমার'। বিভিন্ন নাটকে ও রানী করের অভিনয় পারদর্শিতা মনে রাখার মত।

মহিলা শিল্পী

লোকশিল্পী সংসদ ১৯৫৫ সালে ছেলেদের মেয়ে সেজে নাটক করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে এবং তাদের প্রথম নাটক রক্তকরবীতে লীলা দেব এবং যুথিকা গুপ্তাকে সর্বপ্রথম মঞ্চে নামায়। যুথিকা গুপ্তা বিয়ে হয়ে ত্রিপুরার বাইরে চলে যান এবং লীলা দেব সরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষিকা হওয়ায় দায়িত্ব বেড়ে যায়, ফলে নাট্যাভিনয় তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেই জায়গায় স্নিগ্ধা হালদার, মায়া দেব এবং অন্যান্য মেয়েরা এসে পড়েন। এই সময়েই ত্রিপুর শিল্পায়তনে সবিতা সিংহ রায় (মজুমদার), নমিতা সিংহ রায় (দাস), নৃত্যশিল্পী প্রতিমা চৌধুরী চুটিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। শিল্পায়তনেও কণিকা দেবনাথ চুটিয়ে অভিনয় করতে থাকেন, কিন্তু কয়েকটি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করার পর ত্রিপুরা ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে শিল্পায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শিল্পীসংসদ এই সময়েই নারী চরিত্রে মেয়েদের উৎসাহিত করে। ত্রিপুরায় সর্বপ্রথম লোকশিল্পী সংসদ, ত্রিপুর শিল্পায়তন, শিল্পায়ন এবং শিল্পীসংসদ এই আন্দোলনের কৃতিত্বের দাবীদার হতে পারে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। এরপর মেয়েদের নাটকে অভিনয় করার দ্বিধা দূর হয়ে যায় এবং ক্রমে মেয়েরা ব্যাপকভাবে নাটকে অংশগ্রহন করে ত্রিপুরার নাটকের গতি বেগবান করে তোলে।

ত্রিপুরায় সেদিন যে সব উদারচেতা সাহসী সংস্কৃতিপ্রেমী মেয়েরা নাটকে অংশগ্রহন করে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন, আজ তাঁদের আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

প্রথমে যাঁদের কথা মনে হয় তাঁরা হলেন 'লীলা দেব, যুথিকা গুপ্তা, মায়া দেব,' স্নিগ্ধা হালদার, বিজেতা গাঙ্গুলী, বিজয়া সাহা,' সতী দাশগুপ্তা, আভা পাল, স্নিগ্ধা মজুমদার, দেবলা মজুমদার, কণিকা দেবনাথ, সবিতা সিংহরায় (মজুমদার)। নমিতা সিংহরায়, প্রতিমা চৌধুরী, উমা দেব, মহুয়া ভট্টাচার্য (গাঙ্গুলী), অমলা চক্রবর্তী, বীণাপাণি ভট্টাচার্য, ইরা ব্যানার্জী, দীপালি দেবরায়, আভা দত্ত, বীণা রায়, ছায়া চক্রবর্তী, উমা

বর্মন, গৌরী বণিক, কল্পনা দাস, নীলিমা দাস, দোলন দেব, মণিকা মুখার্জী, রানু ব্যানার্জী, গীতা পাল, রেখা ভট্টাচার্য, লক্ষ্মী দাস, পারুল মজুমদার, মণিকা মুখার্জী, রেবা ব্যানার্জী, শিপ্রা ভট্টাচার্য, সুজাতা রায়, পুর্ণিমা চক্রবর্তী, শিবানী চৌধুরী, মিতা দেবগুপ্তা, রেখা সরকার, সুপ্তি ঘোষ, কল্পনা ভট্টাচার্য, মণিদীপা পালিত, চম্পা চন্দ, অমিতা গুপ্ত, ডলি মজুমদার, শেলী মুখোপাধ্যায়, বেলা মজুমদার, উমা চক্রবর্তী, লক্ষ্মী সিংহরায়, শুক্লা গোস্বামী, স্বাতী মৈত্র, চিত্রা মৈত্র, ভারতী মৈত্র, কাবেরী দেববর্মা, চন্দ্রা সেনগুপ্তা, সুনীতি চৌধুরী, রেণুকা দাস, মীনাক্ষী কর, হেনা ভট্টাচার্য, নিভা মজুমদার, রিক্তা সিংহরায়, রঞ্জিতা মজুমদার, নমিতা ভট্টাচার্য, উষা চক্রবর্তী, অনিমা গুপ্তা, ঝুনু মজুমদার, পারুল মজুমদার, শিপ্রা দত্ত, দেবিকা দাশগুপ্তা, সবিতা দাসচৌধুরী, মীনাক্ষী ঘোষ.....রানী কর, অঞ্জু নন্দী, মঞ্জু নন্দী, বর্ণালী বিশ্বাস, সাবিত্রী ভট্টাচার্য (বর্ধন), অনিতা হাজরা, রত্না সরকার, সবিতা দেববর্মা, শিখা রায়, অনিতা চক্রবর্ত্তী, গৌরী দাশগুপ্তা, নমিতা হালদার, রীতা সিংহরায়, নীলিমা দেববর্মা, নীলিমা সিংহরায়, শিবানী চৌধুরী, রীনা সেনগুপ্ত, রত্না সরকার, ফুলন ভট্টাচার্য, বর্ষা ধর, মিতা সরকার, মিতা দাস, বর্ষা দাশগুপ্তা, ঝর্ণা দেববর্মা, লক্ষ্মী চৌধুরী, পারমিতা বসু, বনানী সাহা, বনানী চক্রবর্ত্তী, মীনা রায়, মণিকা চক্রবর্ত্তী, রুমা দাশগুপ্তা, গৌরী মোদক, মুনমুন ভট্টাচার্য, আরতি পাল, শম্পা দাস, সুস্মিতা ভট্টাচার্য .....পূর্বিতা হালদার, চন্দ্রা সেনগুপ্তা, বর্ণালী সিন্‌হা, সুমা দেববর্মা, গোপা দাস, প্রণতি সিন্‌হা, নুপুর পাল, ইন্দ্রানী ঘোষ ....

নাট্য আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী প্রধান প্রধান নাট্য দল

ত্রিপুর শিল্পায়তন ● লোকশিল্পী সংসদ ● শিল্পায়ণ ● নাট্যশিল্পী সংসদ ● শিল্পী সংসদ ● ত্রিপুর শিল্পী সংহতি ● শিল্পী সংগঠনী ● পঞ্চপ্রদীপ ● মৌচাক ● কালচারাল ইউনিট ● মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ ● রসচক্র ● বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী ● শিল্পশ্রী ● নবোদয় সংঘ ● ত্রিপুরা পুলিশ ● সাহিত্য বাসর ● কৃষ্টি গোষ্ঠী ● সুরমন্দির ● ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ ● ত্রিবেনী সংঘ ● কলাকার গোষ্ঠী ● সংহতি শ্রী ● ভারত যুব সমাজ ● অগ্রগতি ● কলাকার গোষ্ঠী ●ইয়ুথ কয়ার ● দিশারী ● রূপম ● রূপারোপ ● উদিচী ● ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ ● লোকশ্রী ● আনন্দলোক ● ঘরোয়া ● রঙ্গম ● তিয়াস ● মনিপুরী ললিতকলা পরিষদ ● রূপায়ণ ● লিটল ড্রামাগ্রুপ ● অনামী ● মুখোশ ● নেপথ্য ● প্রচ্ছদ ● আরাধনা ● সি. এ. সি. টি. ● পূর্বায়ণ সাংস্কৃতিক সংস্থা ● রঙবেরঙ ● নির্মোক ● অর্কেষ্ট্রা ● পিপলস আর্ট থিয়েটার ● অগ্রগামী ● মৈনাক ● শিশু রঙমহল ● অন্বেষক ● মুক্তধারা ● শিল্পতীর্থ ● প্রচ্ছদ। গ্রন্থের এই পর্যায়ে শিশু সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ প্রাসঙ্গিক বোধে পুনমুদ্রিত করা হলো।

আগরতলার নাট্যমঞ্চে যাদের দেখেছি

শিশু সেনগুপ্ত

গতিময় এ জীবন। কোথাও থামবার মত এতটুকু সময় নেই। নেই কোনো অবসর। উঁচু পাহাড় থেকে নেমে আসা ঝর্ণাধারার মত জীবনের শুরু। তারপর শিশুকাল ও কৈশোরের কলতান, যৌবনের উচ্ছ্বল, দুর্দ্দম গতি, প্রৌঢ়ত্বে স্মৃতিচারণ ও পরে বার্ধক্যের স্থবিরতায় জীবনের পরিসমাপ্তি।

চঞ্চল যৌবনে যা সম্ভব হয়নি আজকে ঠিক এই মুহূর্তে প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে পেছনে-ফেলে-আসা আবছা দিনগুলোর দিকে চোখ মেলে তাকানোর মত সময় আমার হাতে এসেছে। মন বলছে 'আর কেন?' সঞ্চয়ের অনেক বোঝাইতো বয়ে বেড়িয়েছ—এবার নিজেকে শূন্য করে সবার সামনে সেগুলো ছড়িয়ে দাওনা। উন্মুক্ত করে দাও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার। সবাইকে সামনে নিয়ে এস, তাদেরকে—যারা একদিন নানা প্রতিকূলতার মাঝেও সবার মনোরঞ্জন করে গেছেন। সেদিনকার দিনে কোনো আত্মপ্রচার তাঁরা চাননি। কেবল মাত্র মানুষকে আনন্দের খোরাক জুগিয়ে নিঃশব্দে চলে গেছেন। আগরতলার নাট্যচর্চার যে ঝলমলে ইমারৎ আজকে গড়ে উঠেছে, বিগত দিনের সেই সব হারিয়ে যাওয়া অভিনেতারাই কিন্তু এর কাঠামো রচনা করতে গিয়ে অনেক ঘাম ঝরিয়েছেন।

১৯৪৫ ইং থেকে আজ পর্যন্ত আগরতলার নাট্য আন্দোলন ও নাট্যচর্চার আমি নীরব সাক্ষী। নাট্যচর্চার এই পরিবর্তন খুব কাছ থেকে দেখবার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখনকার দিনের নামী-অনামী অনেক অভিনেতার সঙ্গে অভিনয় করার মত সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে যাঁদের স্মৃতি আজকেও আমার মনকে নাড়া দেয়, যাঁদের স্নেহ ও ভালবাসায় তিল তিল করে আমার অভিনয় জীবন পরিপূর্ণতা পেয়েছে, যাঁদের সঠিক পথ নির্দেশ ও সহযোগিতা আমার নাট্য-জীবনে প্রেরণা জাগিয়েছে, তাঁদেরকে আমি ভুলতে পারি না। পারিনা বলেই যাঁরা আজকে আগরতলার নাট্যচর্চার সেই সব পথিকৃৎদের উপেক্ষা করে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন, সে ব্যাপারে সবাইকে সচেতন করতেই আমার এই প্রচেষ্টা। আমার এই প্রতিবেদন আত্মপ্রচার নয়,

কাউকে ছোট করার মত মানসিকতাও আমার নেই। শুধুমাত্র বিবেকের তাড়নায়, বিস্মৃতির আবরণ সরিয়ে সত্য ঘটনার সঠিক তথ্য জনমানসে পৌঁছে দেওয়াটা আমি নৈতিক কর্তব্য হিসাবেই মনে করি। তা না হলে আগরতলার প্রাচীন নাট্যশিল্পীদের শুধুমাত্র অসম্মান করা হবে না, নতুন জমানার অভিনেতাদের কাছে তারা চিরদিন অপরিচিত থেকে যাবেন। নাট্যমোদীদের কাছে দায়বদ্ধতা আমি অস্বীকার করতে পারিনা। ছোট বয়সের অনেকটা সময় আগরতলার কাছে আখাউড়াতে আমার জীবন কেটেছে। আমার বাবা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আখাউড়া রেলওয়ে ষ্টেশন মাষ্টার হিসেবে একটানা আঠার বছর কাজ করেছেন। আমার বাবা ও বড় ভাইরা সেদিন সৌখিন অভিনেতা হিসেবে আখাউড়া নাট্যামোদীদের মনোরঞ্জন করেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার। ভারতবর্ষে প্রথম ঘুর্ণায়মান মঞ্চ তৈরী করেন স্বর্গত সতু সেন। সম্পর্কে ইনি আমার জ্যাঠতুত দাদা।

আমাদের কোয়ার্টারের পশ্চিম দিকে ছিল দিগন্ত বিস্তৃত ধানের ক্ষেত। সেই ছোট বয়সে আমার সঙ্গী সাথীরা যখন অবসর সময়ে খেলাধূলা নিয়ে মেতে থাকত, আমি কিন্তু চলে যেতাম অনেক, অনেক দূরে, যেখানে খোলা আকাশ. দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ তার মাঝখানে। প্রকৃতিকে দর্শক রেখে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করতাম রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কবিতাগুচ্ছ। রেলওয়ে কলোনী স্কুলে পড়াশুনার সাথে সাথে স্কুলের সংস্কৃতি অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুল জয়ন্তী, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে আবৃত্তি ও একাংক নাটকে অভিনয় করেছি। ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় কবি হুমায়ুন কবির আখাউড়া এসেছিলেন। তাঁর সর্ম্বধনা সভায় তাঁরই কবিতা আবৃত্তি করে তাঁর হাত থেকে পুরস্কার নিয়েছি। সেই স্মৃতি আজও আমার মনকে নাড়া দেয়। যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী ঐ সময় স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে আমার সাথে অংশগ্রহণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে যেমন শ্রীপার্থ গুপ্ত (বর্ত্তমানে ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত) শ্রীমতী বেবী গুপ্তা, বেদাচার চক্রবর্তী (বর্ত্তমানে নাগীছড়া প্রাক্তন সৈনিক কলোনীতে স্থায়ী ভাবে বাস করছেন এখন আগরতলার স্থায়ী বাসিন্দা। বেদাচারের বাবা স্বর্গীয় গিরিজা চক্রবর্তী, যদিও এ ব্যাপারে তাঁর নাম উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক, আমাকে নাটক করতে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দিয়েছেন। গিরিজা বাবু পূর্ব বাংলার (বর্ত্তমান বাংলাদেশ) সুখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী—শান্তিনিকেতনে গানবাজনা শিখেছেন, কবিগুরুর আশীর্ব্বাদধন্য; দেশভাগের পরবর্তী সময়ে গিরিজাবাবু আগরতলা মহারাণী তুলসীবতী স্কুলে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে কাজ করেছেন।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে স্কুলে অভিনীত ছোট নাটক (স্ত্রী বর্জিত) যেমন কেদার রায়, কর্ণার্জুন, শিশুবীর, সৈনিক প্রভৃতি নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছি। আমাদের স্কুলে কোনো স্থায়ী মঞ্চ ছিল না। স্কুলের লাগোয়া আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট হলে সে সময় আখাউড়ার সমস্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হ'ত। বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও

কালীপূজা উপলক্ষ্যে আমার বাবা ও বড়ভাইরা স্থানীয় উৎসাহী সৌখীন অভিনেতাদের নিয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করে সাজাহান, বঙ্গেবর্গী, দেবলাদেবী, সিঁথিরসিঁদুর, সতী সাবিত্রী, মাটির ঘর, পি. ডাবলু ডি., মহারাজা হরিশচন্দ্র, বেজায়-রগড়, টিপু সুলতান, প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করতেন। বড়দের এই সব নাটকে শিশু শিল্পী হিসেবে অভিনয় করার মত সৌভাগ্য আমার হয়েছে, মঞ্চ ভীতি দূর হয়েছে বড়দের উৎসাহ অভিনয়ে সাবলীলতা যুগিয়েছে।

ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকে অভিনয় করার জন্য শিল্পীদের পোষাক পরিচ্ছদ আনা হত ঢাকার রমেশ মুখার্জী এণ্ড কোম্পানী থেকে।

এখন ভাবতে হাসি পায় যে এই সমস্ত চোখ ধাঁধানো ঝলমলে পোষাক, আঁকা সিন, উইংস, রংবেরংগের স্কাই এ মোড়া মঞ্চ আমার শিশু মনে এক অপূর্ব শিহরণ জাগিয়ে তুলত। পোষাক পরে মেক্‌আপ নিয়ে কখন মঞ্চে উঠে অভিনয় করব সেই অদম্য আগ্রহ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াত।

১৯৪৩ সন। মন্বন্তর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্ব্বনাশা কালোছায়া। অন্ধকারে ঢাকা মসীলিপ্ত সেই ভয়ংকর দিনগুলি। অবিভক্ত বাংলার সমস্তটা জুড়ে অভিনীত হচ্ছে এক মর্মন্তুদ নাটক, যার কুশীলব বাংলার প্রতিটি মেয়ে পুরুষ শিশু। "একটু ভাত দে মা, একটু ফ্যান দে মা।" প্রেতের মত চেহারার সেই মানুষগুলোর ক্ষুধার্ত ম্লান মুখগুলো স্মরণ করে আজকে আমি শিউরে উঠি।

আখাউড়ার কাছে সিংগার বিলে ইংরেজরা তৈরী করেছে বিমান ঘাঁটি। এর মাঝে জাপানীরা একদিন বোমা ফেলে গেছে। চারদিকে একটা অশান্ত থমথমে ভাব। সব মানুষ আতংকে দিন গুণছে। এই বাতাবরণে কোনো অনুষ্ঠান করা সম্ভব নয়। এই সময় আগরতলা ও কুমিল্লা থেকে দুটো নাট্যগোষ্ঠী আখাউড়া আসে। যত দূর মনে পড়ে আগরতলার দলটি (পরে জেনেছি ত্রিপুর শিল্পায়তন) অভিনয় করেছিল দুটো নাটক,— 'পতিব্রতা' ও 'তটিনীর বিচার'। কুমিল্লা দলটির অভিনীত নাটকের নাম "নার্সিং হোম"। সবগুলো নাটকই অভিনীত হয়েছিল রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে। নাটকে উভয় দলই যে মঞ্চসজ্জা রচনা করেন তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। টানা আঁকা দৃশ্যপটের পরিবর্তে ব্যবহার করেন কাঠের ফ্রেমে সাঁটা কাটা সিন। সেগুলো মঞ্চে সাজিয়ে তৈরী করা হয় ঘরবাড়ী, দালানের কোঠাবাগান, আসামীর কাঠগড়া, বিচারের মঞ্চ। অভিনয়ে আগরতলা দলটির অভিনয় প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। অভিনেতাদের অনেকেরই নাম মনে নেই। তবে ত্রিপুরেশ মজুমদার, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, ইন্দুবিকাশ চৌধুরীর নাম সবাইর মুখেমুখে ঘুরেছে।

১৯৪৫ সন। জীবনের প্রথম অধ্যায়ের উপর যবনিকাপাত। বাবা, রেলওয়ে চাকরী থেকে অবসর নিয়ে সপরিবারে আগরতলা চলে আসেন। আমাদের বাড়ী তৈরী হ'ল মোটর ষ্ট্যাণ্ডের কাছে বনমালীপুরে। উমাকান্ত একাডেমীতে ক্লাশ এইটে ভর্ত্তি হ'লাম।

প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী। তার অসুস্থতার কারণে সহকারী প্রধান শিক্ষক স্বর্গীয় সতীশ চক্রবর্তী মশাই প্রধান শিক্ষকের কাজ চালাতেন। বাংলার শিক্ষক ছিলেন স্বর্গীয় নিশিকান্ত বিশ্বাস।

বনমালীপুরে আমার বয়সী ছোট ছোট ছেলেদের সাথে পরিচয় হয়। সবার সাথে অন্তরঙ্গতা হয়ে যায়। এদেরকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুদে নাট্যগোষ্ঠী তৈরী হ'ল। পাড়ায় বিভিন্ন সময়ে বেশ কটি নাটক মঞ্চস্থ করা হোল। নাটকগুলি পরিচালনা করেছিলেন শ্রীগোপাল দাশগুপ্ত। পরে তিনি কলকাতা চলে যান। বইগুলোর নাম যতটা মনে পড়ে, 'বেতন নিবারক বিছানা', 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া', 'চলার পথে' ইত্যাদি। এই নাটকগুলি অভিনীত হয়েছিল বনমালীপুরে শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন মুখার্জী (মহারাণী তুলসীবতী স্কুলের শিক্ষক) মশাইর বাড়ীর সামনের খোলা জমিটির উপর কাঠের চৌকি দিয়ে মঞ্চ তৈরী করে। মঞ্চসজ্জা করা হয়েছিল ধুতি, শাড়ী দিয়ে এবং আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে। বনমালীপুরের প্রভাতী লাইব্রেরীর সভ্য, সভ্যাদের আগ্রহ ও উদ্যোগেই নাটকগুলি মঞ্চস্থ করা হয়। প্রভাতী লাইব্রেরীটি ছিল বর্ত্তমান আগরতলা পূর্ব থানার কাছে প্রফুল্ল ভট্টাচার্য্য মশাইর বাড়ীর সামনে ঘরটিতে। এছাড়া দু'একটা নাটক হয়েছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত তৈলচিত্রশিল্পী স্বর্গীয় শ্যামাচরণ চক্রবর্তী (শ্যামাচরণ পেইনটার) মশাইর বাড়ীর সামনে।

আমরা, 'সিরাজের স্বপ্ন', 'না টক না মিষ্টি', এই ধরনের কয়েকটি নাটক মঞ্চস্থ করি বনমালীপুরে দ্বিজেন দত্ত মশাইর যে খালি জমি ছিল সেইখানে। এখানেই পরবর্ত্তী সময়ে হরিগঙ্গা বসাক স্কুল গড়ে উঠেছে। নাটকে যে সমস্ত রাজকীয় পোষাক ব্যবহার করা হয়েছে তার বেশীর ভাগ যেমন আচকান পাগড়ি, তলোয়ার, যোধপুরী পায়জামা আমরা যোগাড় করেছি রাজ কর্মচারীদের বাড়ী থেকে। মহারাজের রাজসভায় রাজকর্মচারীদের ঐ সমস্ত পোষাক পরে যেতে হত। নাটকে অভিনয় করার সময় আমাদের সাজিয়ে দিতেন শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, স্নেহাংশু চৌধুরী (তখনকার দিনের সঙ্গীত শিক্ষক, বাড়ী বনমালীপুর থানা রোড) মধ্যপাড়ার ফটোগ্রাফার প্রফুল্ল সেনগুপ্ত (সেন এণ্ড সেনের মালিক, রবি সেনগুপ্তর বাবা)। আগরতলাতে যাঁরা নাটক অভিনয় করে সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের অনেকের বাড়ীই আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ বনমালীপুরে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, জ্যোতির্ময় মজুমদার (কালা) পীযূষ মজুমদার (ধলা) ধূর্জটি দাশগুপ্ত, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, সুখময় সেনগুপ্ত (ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) দিগেন্দ্র ব্যানার্জি, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অনিল দাশগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত, স্মরজিৎ চক্রবর্তী প্রমুখ। জ্যোতিপ্রসাদ ও বঙ্কুপ্রসাদ সম্পর্কে আমার বড়ভাই। অভিনেত্রীদের মধ্যে যুথিকা মজুমদার, কণিকা চক্রবর্তী।

উমাকান্ত একাডেমীতে প্রতিবছর বার্ষিক পরীক্ষার পর স্কুলের ছাত্ররা-নাটক করতেন।

মঞ্চ তৈরী হত স্কুলের হল-ঘরে যেখানে এখন লাইব্রেরী কাম রিডিং রুম করা হয়েছে। এই হল-ঘরে আগরতলার অনেক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অনেক নাটক ও বিচিত্রানুষ্ঠান করেছেন।

উমাকান্ত একাডেমীর শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে যে স্মরণিকা বের করা হয়েছে তাতে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রী অনিল ভট্টাচার্য মশাই তাঁর "একাডেমীর ছাত্র নাট্যচর্চার আদিপর্ব" প্রবন্ধের শেষ দিকে লিখেছেন "যে ইন্দুবিকাশ বাবুর অনুপস্থিতিতে এবং যুদ্ধকালীন অশান্ত সামাজিক পরিবেশে উমাকান্ত একাডেমীর নাট্যচর্চার প্রবাহে সাময়িক বিরতি ঘটে। তারপর যুদ্ধান্তে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ার পর একাডেমীর নাট্যচর্চায় নতুন যুগের সূচনা হ'ল।" তাঁর এই বক্তব্য আমি পুরোপুরি মেনে নিতে পারছিনা। কারণ ১৯৪৩ সালে যুদ্ধকালীন সময়ে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে উমাকান্তের ছাত্ররা শিক্ষক স্বর্গীয় নিশিকান্ত বিশ্বাস মশাই এর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ডাকঘর" নাটকটি অভিনয় করে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। দর্শকদের অনুরোধে তিনদিন ধরে এই নাটকটি অভিনীত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে এই নাটকটিই উমাকান্ত স্কুলে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। নাটকটির অমল চরিত্রে অভিনয় করেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা (ইনি ত্রিপুরা বন বিভাগে উচ্চপদে চাকুরী করে কিছুদিন আগে অবসর নিয়েছেন)। অন্যান্য চরিত্র-চিত্রনে ছিলেন রথীন দেব, পরিমল ভট্টাচার্য, পরেশ দে, বিমল চৌধুরী, দেবরাজ হালদার, মনোরঞ্জন ধর, নিত্যরঞ্জন দাস, ফটিক দত্ত ও আরও অনেকে। এটা খুবই সত্য কথা যে তখন আমি আগরতলায় আসিনি কিন্তু পরবর্তী সময়ে ১৯৪৫ সালে এই স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক স্বর্গীয় নিশিবাবুর কাছ থেকে এ তথ্য জানতে পেরেছি।

১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে তখনকার মহারাজার শিক্ষামন্ত্রী কর্ণেল ডি. এ. ডব্লু. ব্রাউন সাহেব উমাকান্ত একাডেমী স্কুলে "এডুকেশন উইক" নামকরণ করে এক প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত মহকুমা শহরের হাইস্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। প্রতিযোগিতার মূল অংশ ছিল খেলাধূলা ইত্যাদি। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হিসেবে ছিল নাটক অভিনয় ও আবৃত্তি। যতদূর মনে আছে, এই উৎসবে উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্ররা নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের "শতবর্ষ আগে" নাটকটি উপস্থাপনা করেন। নাটকটি পরিচালনা করেন কৃতি অভিনেতা ও খ্যাতনামা পরিচালক ত্রিপুরেশ মজুমদার। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক। এ নাটকে ছেলেরাই মেয়েদের অভিনয় করেছিলেন। উল্লেখযোগ্য ছিল "লুনা" চরিত্রে শ্রী ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের (আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রে কর্মরত ছিলেন) অভিনয়। হুসনীবাঈর চরিত্রে অভিনয় করেন সলিল ঘোষ (ইনি ত্রিপুরার তৎকালীন, চীফ মেডিক্যাল অফিসারের ছেলে। এম, বি, বি কলেজ থেকে আই এস, সি, পাশ করার পর ইলেকট্রিকাল ইনজিনীয়ার হন ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারে উচ্চপদে চাকুরী

নেন); সলিলের সুন্দর চেহারা ও অভিনয় অনেক অভিনেত্রীকেও হার মানায়। পুরুষ চরিত্রে ছিলেন জ্যোতির্ময় মজুমদার (কালা) পীযূষ মজুমদার (ধলা), বিমল চৌধুরী, রতিরঞ্জন দেবনাথ, বিমলেন্দু সেনগুপ্ত, প্রমথ পোদ্দার, মনোরঞ্জন ধর, দেবরাজ হালদার, পরেশ দে, অমলেন্দু রায়বর্ধন ও আরও অনেকে। দলগত অভিনয়ে নাটকটি উচ্চমানে পৌঁছেছিল ও দর্শকদের উচ্চপ্রশংসা পেয়েছিল। মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা অভিনয় করেছিলেন "সরমা" নাটকটি। যতদূর মনে আছে, নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা সুধাংশুমোহন দত্ত। অভিনয়াংশে ছিলেন—মণিকা গৌতম, বীণা চক্রবর্তী, মীরা বিশ্বাস, মায়া রায়, অলি গুপ্তা এবং আরও অনেকে। নেপথ্য সংগীতে অংশ নেন মহারাজকুমার বিপিনবিহারী দেববর্মা, প্রয়াত মহারাজকুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, ঠাকুর নীলু দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা। আলোকসম্পাতে ছিলেন পরেশনাথ চ্যাটার্জী। বোধজং স্কুলের ছাত্ররা অভিনয় করেন অয়স্কান্ত বীর ভোলামাষ্টার। উমাকান্ত স্কুলের বর্ত্তমান জিমনাসিয়াম হলের একটু পশ্চিমদিকে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল। তার সামনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে সেখানেই প্রতিযোগিতার নাটকগুলি অভিনীত হয়। এই নাটক প্রতিযোগিতায় আমি অবশ্য কোনো অংশ নেইনি।

ক্লাশ এইটের বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাদের বাংলার শিক্ষক নিশিবাবু স্কুলের ছাত্রদের দিয়ে মহেন্দ্র গুপ্তের "টিপু সুলতান" নাটকটি অভিনয় করান। আগরতলা স্কুল জীবনের নাটকে স্ত্রী চরিত্রে আমার প্রথম মঞ্চাভিনয়। টিপু সুলতান নাটকে রুনী বেগমের ভূমিকায় অভিনয় করে সুখ্যাতি কুড়াই। নাটকে নাম ভূমিকায় ছিলেন শ্রীবিমল চৌধুরী। ইনি বহুদিন হয় আগরতলা ছেড়েছেন। বিদেশ দূতাবাসে চাকরী করতেন। মনে হয় এতদিনে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। প্রমথ পোদ্দার অভিনয় করেছিলেন মঁশিয়ে লালী চরিত্রে। সুপুরুষ, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে। বাড়ীটা ছিল খোসবাগানের মাঠের দক্ষিণ দিকে, এখন যেটা বিশ্বকর্ম্মা গ্লাস এজেন্সির মালিকরা কিনে নিয়েছেন। অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেছিলেন তাঁরা ছিলেন অশোক দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, পরেশ দে, মনোরঞ্জন ধর, অমলেন্দু বর্ধন রায়, বাসুদেব ভট্টাচার্য। নাটকে জ্যোতিষীর ভূমিকায় অভিনয় করেন মৃসুদা (আমিনুল ইস্‌লাম, বর্ত্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক)। মৃসুদার উদাত্ত গলায় সুরেলা কণ্ঠের গাওয়া সেই গান— "হে, ভৈরব রুদ্র ডমরু তব কৈ," 'চঞ্চল, ওরে চল, মুসাফির থামিস নে আগে চল' গানগুলি আজও এতদিন পর আমাকে এক জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। আমাদের টিপু সুলতান নাট্যাভিনয় আগরতলা নাট্যমোদীদের মন কেড়ে নিয়েছিল। নাটকের সাফল্যের মূলে ছিল নিশিবাবুর হাড়ভাঙা পরিশ্রম ও কঠিন সাধনা। আজকে তিনি আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তাঁর উৎসাহ ও স্নেহশাসনে আমার পরবর্ত্তীকালের অভিনয় জীবন এক প্রচণ্ড গতিবেগ পেয়েছিল। নাট্যজীবনের স্মৃতি রোমন্থনে ওঁর বিদেহী আত্মার প্রতি

সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। পরবর্তীকালে স্কুল জীবনে আরও বেশ কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছি। অবশ্য সবগুলি নাটকেই আমার ভূমিকা ছিল স্ত্রী চরিত্রে। নাটকগুলি হচ্ছে শতবর্ষ আগে, মীরকাশেম, কালিন্দী, মহারাজা রঞ্জিৎ সিংহ ইত্যাদি।

১৯৪৭ ইংরেজী সনের শেষের দিকে তখনকার ত্রিপুরার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট মেজর হৃষিকেশ দেববর্মা মশাই পুলিশ কর্ম্মচারীদের দিয়ে অভিনয় করান শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সামাজিক নাটক "অনুপমার প্রেম"। এক্ষণে যেখানে আই, জি, পির, অফিস সেখানে ছিল পুরানো পুলিশ রিজার্ভ। এই পুরানো পুলিশ রিজার্ভ অফিস প্রাঙ্গনে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। অভিনয়াংশে ছিলেন প্রয়াত অমূল্যকেশব সেনশর্ম্মা, বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, মনীন্দ্র তরফদার, কমল দাশগুপ্ত (ছবি দাশগুপ্ত) অমৃত কর, ননী চক্রবর্তী প্রমুখ অনেকে। ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাবের এটাই হচ্ছে প্রথম পূর্ণাংগ নাটক অভিনয়।

১৯৪৮ সন। আমি তখন ক্লাশ নাইনের ছাত্র। প্রমথ পোদ্দারের কথা আগেই বলেছি। তিনি তখন কলেজের ছাত্র, নাট্যচর্চায় উৎসাহী এক ঝাঁক কলেজের ছাত্র ও কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণকে নিয়ে একটি নাট্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। সভ্যদের মধ্যে ছিল, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, প্রশান্ত দাসগুপ্ত, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, অনিল দে, রঞ্জিৎ দাস, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, পরেশ দে, আমিনুল ইস্‌লাম, সলিল ঘোষ, মাণিক সেন প্রমুখ অনেকে। প্রমথদার পরিচালনায় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলপ্রাঙ্গণে অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয় মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক 'টিপু সুলতান'। এ নাটকে আমি অভিনয় করিনি। স্মারক হিসেবে এই নাটকের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। নাটকটির সামগ্রিক উপস্থাপনা ছিল উন্নতমানের। প্রতিটি অভিনেতা দর্শকদের উচ্চ প্রশংসা পেয়েছিল। ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। তখন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা স্বাধীন ভারতে যোগ দেয়নি। ১৯৪৮ সন। রায় সাহেব সুরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ত্রিপুরা মহারাজের অন্যতম উপদেষ্টা। তাঁর ছেলেরা, জ্যোতিষ দত্ত, অমর দত্ত, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত আমার সাথে স্কুলে অনেক নাটকে অংশ নিয়েছেন। সিনেমা জগতে ত্রিপুরার প্রথম কাহিনী চিত্র "তথাপি"। প্রযোজনায় ছিল ছবি ও বাণী লিমিটেড্। অমরবাবু ছবি ও বাণী লিমিটেডের অন্যতম কর্ণধার। নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলটিও তখন ছিল ছন বাঁশ দিয়ে তৈরী কাঁচা ঘর। মাটির-ভিটি। পূর্বে পশ্চিমে লম্বা বিরাট ঘর। এই স্কুল ঘরটি আগুনে পুড়ে গেছে।

জ্যোতিষবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বৈকুণ্ঠের উইল" উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেন। তিনি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভ্যদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেন 'যে বৈকুণ্ঠের উইল' নাটকটি অভিনয় করিয়ে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল ঘরটি পাকা করতে সাহায্য করবেন। সে সময় ঐ স্কুলের

প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রয়াত সতীনাথ ভরদ্বাজ ও ছাত্রদের হোষ্টেল সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন প্রয়াত হীরেন্দ্রনাথ নন্দী। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি এ প্রস্তাবে আনন্দের সঙ্গে সাড়া দেন। "ত্রিপুর শিল্পায়তন" ছাড়া অন্য কোন স্থায়ী নাট্যগোষ্ঠির তখন পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করে জ্যোতিষবাবু একদল উদীয়মান নাট্যপ্রেমী তরুণকে একত্রিত করে নিজের বাড়ীতেই এই নাটকের মহড়া দেন। নাটক মঞ্চস্থ করতে যে খরচ হয় তার পুরোটাই তিনি নিজের পকেট থেকে দেন। তাঁর সুযোগ্য পরিচালনায় দু'দিন ধরে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয় ও দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা কুড়ায়। এ নাটকে আমার কোনো অংশ ছিল না। কর্ম্মকর্তাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে জেনেছিলাম যে প্রায় সাতশ টাকার মত দর্শনমূল্য সংগৃহীত হয়েছিল ও পুরো টাকাটাই স্কুল কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। সেদিনকার দিনে এই সাতশ টাকার মূল্য কম ছিল না। এ নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেছিলেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, সরোজ চন্দ (পরবর্ত্তী জীবনে রাজনৈতিক কর্মী) রনজিৎ দাস, অশোক দত্ত, সন্তোষ দত্ত, রতিরঞ্জন দেবনাথ, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, সলিল ঘোষ, রবীন দে, অনিল দে (ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের প্রাক্তন কর্মী) প্রমুখ আরও অনেকে। শিশু চরিত্রে ছিল চিদানন্দ গোস্বামী ও বেণুধর গোস্বামী।

পঞ্চাশ দশকের গোড়া থেকে ষাট দশকের মাঝামাঝি আগরতলায় নাট্যচর্চার প্রবাহ খুবই দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেছে। অনেক নতুন নতুন নাট্য গোষ্ঠীর জন্ম হয়েছে। নাটক অভিনয়ের ধারা পাল্‌টে গেছে। আঙ্গিকের উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটেছে, একঝাঁক তরুণ উদীয়মান অভিনেতার আত্মপ্রকাশ হয়েছে।

১৯৫০ সনে প্রমথ পোদ্দারের উদ্যোগে "সবুজ সংঘ" নামে একটি নতুন নাট্যগোষ্ঠী জন্ম নেয়। আমি এই নাট্য সংস্থার সদস্য হই। সুধাংশু মোহন দত্তের পরিচালনায় আমরা ঐতিহাসিক নাটক "দেবলাদেবী" অভিনয় করি। নাটকটি অভিনীত হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতন স্কুল ঘরে। এই নাটকে যারা অভিনেতার তালিকায় ছিলেন তাঁরা হলেন, প্রমথ পোদ্দার, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, নিত্যরঞ্জন দাশগুপ্ত, রঞ্জিত দেবনাথ, মানিক মিঞা (বর্ত্তমানে বাংলাদেশের নাগরিক), স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করেন সুবীর দাস, পরিমল দত্ত, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় বেণুধর গোস্বামী ও আরও অনেকে। আমি অভিনয় করি দেবদাসের ভূমিকায়।

প্রমথদা ছিলেন সবুজ সংঘ নাট্যসংস্থার প্রাণপুরুষ। নাটক অভিনয় করতে যে টাকা খরচ হ'ত তার সিংহভাগই আসত তাঁর কাছ থেকে। 'দেবলাদেবী' নাটক অভিনয়ের পর তিনি আগরতলা থেকে চলে যান। তাই ইচ্ছা বা আকাংখা থাকলেও 'সবুজ সংঘ'কে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। প্রধান কারণ ছিল অর্থাভাব।

একটা কথা উল্লেখ করতে ভুলে গেছি। করোনেশন গেটের পেছন দিকে ঘোড়ার খুরের মত অর্ধচন্দ্রাকৃতি যে দালানটি আছে তার নাম "প্যাণ্ডেল"। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর

মাণিক্য বাহাদুর ও পরে মহারাজা কিরিট বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের যুবরাজ হিসেবে এখানেই অভিষেক হয়। অনেক ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী এই প্যাণ্ডেল হল। ত্রিপুরা রাজ্যের ভারতভুক্তির চুক্তিও এইখানেই হয়েছিল। ১৯৪৮ সনের গোড়ার দিকে "ত্রিপুর শিল্পায়তন" এই প্যাণ্ডেলে ডি, এল, রায়ের ঐতিহাসিক নাটক "সাজাহান" অভিনয় করে। নাটকটি পরিচালনা ও এর নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার। দারা, সুজা, মুরাদ ও ঔরঙ্গজীবের চরিত্র চিত্রন করেন যথাক্রমে মেজর হৃষিকেশ দেববর্মা (ভিক্ষু ঠাকুর), অনিল সেন (ত্রিপুরার প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনীয়ার) রাণা ডাহলজং (মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী রাজা রাণা বোধজং এর বড় ছেলে) ও সুধাংশু মোহন দত্ত মশাই। অন্যান্য পুরুষ চরিত্রে ছিলেন ধূর্জটি দাশগুপ্ত, লক্ষবীর জং, অনিল দাশগুপ্ত, অজিত দাশগুপ্ত প্রমুখ। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু ব্যানার্জী, কিরণ দেববর্মা, অনিল দাস ও শিশু সিপারের ভূমিকায় ছিল মায়া রায়। এই নাটকে যে সব পোষাক ব্যবহার করা হয় সে সমস্ত আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। অভিনেতাদের সাবলীল অভিনয়ে নাটকটি মূর্ত হয়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে যারা পোষাক নিয়ে এসেছিল তারাও নাটকটির অভিনয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিল। তৈরী করা মঞ্চটি থেকে যায়। কিছুদিন পর আমরা এখানে যে দুটি নাটক মঞ্চস্থ করি সেগুলি হল "স্বর্গ হতে বড়" ও "রাজপথ"।

'স্বর্গ হতে বড়' নাটকে অমরেশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন শ্রীসরোজ চন্দ। অপূর্ব বাচনভঙ্গীতে উনি দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। শ্রীচন্দ পরবর্তী জীবনে আর নাটক করেন নি। রাজনীতিই এখন ওঁর পেশা। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, গোপাল গুপ্ত, পরেশ দে, রুনু বোস, সুনীল ঘোষ প্রভৃতি। আমার ভূমিকা কি ছিল এখন সেটা মনে করতে পারছিনা।

আগরতলার কৃষ্ণনগর ব্যানার্জী পাড়ায় ব্রজগোপাল ব্যানার্জী মশাইর বাড়ীতে প্রতি বছর পূজোর সময় ঘরোয়া পরিবেশে বেশ কিছু নাটক হয়েছে। যদুগোপাল ব্যানার্জীর মেয়ে রুবী ব্যানার্জী ছিল এর উদ্যোক্তা। সিনেমা ও মঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জী ব্যানার্জী বাড়ীর আত্মীয়া। তিনিও মাঝে মাঝে এই সব নাটকে অংশ নিয়েছেন। ব্যানার্জী বাড়ীর মেয়ে রেখা ব্যানার্জী ও ইরা ব্যানার্জী (গাংগুলী) সত্তর ও আশীর দশকে অভিনয় জগতে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। প্রবীণ শিল্পী কানু ব্যানার্জীও এই বাড়ীরই ছেলে।

ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের অন্যতম উপদেষ্টা ঠাকুর জীতেন্দ্র দেববর্মা। কৃষ্ণনগরের এ্যাড্‌ভাইজার চৌমুহনীর নামকরণ ওঁরই পদমর্য্যাদার স্বাক্ষর বহন করে। প্রয়াত দেববর্মা আগরতলা বেতার কেন্দ্রের অফিসার শ্রী মৃণাল দেববর্মার ঠাকুরদা। মৃণাল দেববর্মার পিসি সলিলা দেববর্মা সংগীত ও কৃষ্টি জগতের তখনকার দিনে একটি

পরিচিত নাম। জীতেন বাবুর বাড়ীতে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ও সলিলা দেবীর উৎসাহে নৃত্যনাট্য, নাটক ও সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে।

১৯৫১ সনে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে স্কুল থেকে বেরিয়ে এলাম। নাট্যজীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষ করে পা রাখলাম তৃতীয় অধ্যায়ে। পরিচয় হ'ল প্রয়াত ক্যাপ্টেন নগেন্দ্র দেববর্মার সাথে (পরলোকগতা অভিনেত্রী কল্পনা দেববর্ম্মার বাবা, বাড়ী কৃষ্ণনগরে)। আমার অভিনয় জীবনে আগরতলার অনেক নাম করা পরিচালক ও অভিনেতার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। কিন্তু আমার এই প্রতিবেদন সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না যদি প্রয়াত দেববর্মার সাথে আমার পরিচয় না হত। ওঁর সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছি। প্রথম জীবনে সৈনিক, পরবর্ত্তী কালে গবেষক, সাহিত্যকার, নাট্যকার, কবি ও সংগীত শিল্পী। প্রখর ব্যক্তিত্বময়, এক বিরল প্রতিভার অধিকারী। ওঁর সংগে পরিচয় না হলে আমি ত্রিপুরা মহারাজাদের নাটক সম্পর্কে উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতার কোন খোঁজ পেতাম না। ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে চল্লিশ দশকের শেষের দিকে (আমার আগরতলা আসার আগে পর্য্যন্ত) আগরতলার নাট্যচর্চার অনেক ইতিহাস আমি ওঁর কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছি।

ত্রিপুরার মহারাজ স্বর্গীয় বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের পার্সোনাল ষ্টাফে (দেহরক্ষী বাহিনীতে) উচ্চপদে চাকরী করতেন ক্যাপটেন দেববর্ম্মা ও সব সময় মহারাজার পাশে পাশে থাকতেন। ত্রিপুরার মহারাজ নাট্যকার অভিনেতা ও সংগীত শিল্পীদের শুধুমাত্র উৎসাহই দিতেন না, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যও করেছেন। মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এক নাটকগোষ্ঠি তৈরী করেন। নাটকের মহড়া ও অভিনয়ের সময় মহারাজা স্বয়ং উপস্থিত থাকতেন ও অভিনয়ের ভুলভ্রান্তি শুধরে দিতেন। গুণী শিল্পীদের তিনি কেমন ভালবাসতেন এ সম্পর্কে স্বর্গীয় দেববর্মা একটা সুন্দর গল্প বলেছিলেন। প্রবীণ অভিনেতা স্বর্গীয় অমূল্যকেশব সেনশর্মা ত্রিপুরেশ মজুমদারের সম্পর্কিত ভাই। কলকাতা কলেজে বি. এ. পড়ার সময় অমূল্যবাবু আগরতলা বেড়াতে আসেন। ত্রিপুরেশবাবু তখন যুবক।

নাটক পাগল অমূল্যবাবু নাটক করেন একথা ত্রিপুরেশবাবু জানতেন। ত্রিপুরেশবাবুর উৎসাহে ও পরিশ্রমে "মীরাবাঈ" নাটকটি অভিনীত হয়। অমূল্যবাবু এ নাটকে রাণা কুম্ভের অভিনয় করেন। তখনকার দিন দুর্গাবাড়ী মণ্ডপের হয় পূর্বদিকে নয়ত পশ্চিমদিকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে নাটক অভিনয় হ'ত। অন্যান্য দর্শকের সাথে একাসনে বসে মহারাজ নাটকটি দেখেন। নাটকটি খুবই উঁচু মানের হয়েছিল—বিশেষ করে অমূল্যবাবুর অভিনয় হয়েছিল অপূর্ব। মহারাজা ডেকে অমূল্যবাবুর খোঁজ খবর নেন ও আগরতলা থাকতে অনুরোধ করেন। কলেজ খোলার পর সেনশর্মাবাবু কলকাতা যাওয়ার উদ্যোগ নেন। কানাঘুষায় এ খবরটা মহারাজার কানে উঠে। তিনি

পুলিশের লোকদের বলে দেন অমূল্যবাবুর উপর নজর রাখতে যাতে তিনি (অমূল্যবাবু) আগরতলা ছেড়ে যেতে না পারেন। মহারাজার ভয়ে পরবর্তী জীবনে অমূল্যবাবু স্থায়ীভাবে আগরতলা থেকে যান ও রাজসরকারের চাকুরী নেন।

ত্রিপুরেশবাবু খুব বড় মাপের অভিনেতা ও সংগঠক। তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বলছি যে তিনি নিজে যে ধাঁচে অভিনয় করতেন, অভিনয়ের সেই ধারা জোর করে অন্যের উপর চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করতেন। অর্থাৎ অভিনেতার নিজস্ব বিশিষ্টতার কোন মূল্য তিনি দিতেন না। পরবর্ত্তীকালে দু একবার এ ব্যাপারে আমার সঙ্গেও তাঁর মত বিরোধ ঘটেছে। অমূল্যবাবু কলকাতা মঞ্চে অভিনয় দেখেছেন। তখন শিশির ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস ব্যানার্জির যুগ। অমূল্যবাবু তাঁদের অভিনয় বাচনভঙ্গীর অনুরাগী ছিলেন ও অভিনয়ে ত্রিপুরেশবাবুর মতামতের প্রাধান্য দেন নি। ফলে পারসোনালেটি ক্ল্যাস অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সংঘাত। পতিব্রতা নাটক অভিনয়ের পর সম্পর্কের ফাটল আরও দীর্ঘায়ত হ'ল। স্থানীয় অভিনেতা হিসাবে ত্রিপুরেশবাবু জয়ী হলেন। অমূল্যবাবুকে দল থেকে বের করে দেওয়া হল। অধিকাংশ অভিনেতা ত্রিপুরেশবাবুর দলে রইলেন। এই সময় নিঃসঙ্গ অমূল্যবাবুকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন প্রধান মন্ত্রী রাজা রাণা বোধজঙ্গ-এর বড় ছেলে রাণা ডাহলজং।

ত্রিপুরেশবাবু তার নাট্যগোষ্ঠীর নামকরণ করলেন "ত্রিপুর শিল্পায়তন"। রাণা ডাহলজং-এর পৃষ্ঠপোষকতায় অমূল্যবাবু সম্পূর্ণ আনকোরা শিল্পীদের নিয়ে গড়ে তুললেন "মাতৃমন্দির" নাট্যসংস্থা। মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থার প্রথম নাট্যাভিনয় মন্মথ রায়ের "কারাগার"। ব্রিটিশ ভারতে এই নাটকের অভিনয় তখন নিষিদ্ধ ছিল। নাটকের মূল চরিত্র কংসের ভূমিকায় ছিলেন অমূল্য বাবু নিজে। অন্যান্য ভূমিকায় ছিলেন মনি দেববর্মা (বীরচন্দ্র দেববর্মার ভাই) রমেশ দেববর্মা, কালু মিঞা, মাতাব মিঞা, বলাই সেনগুপ্ত (অমূল্যবাবুর ভাই) রূপেন চক্রবর্তী, নরেশ চক্রবর্তী, নারায়ণ রায় প্রমুখ অনেকে। শিশু অভিনেতা বিশ্বজিৎ সেনশর্মা কীর্ত্তিমানের প্রথম অভিনয় করেন এই নাটকে। মঞ্চস্থ হয়েছিল দুর্গাবাড়ী নাট্যমন্দিরের পূর্বদিকে অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে। কিছুদিন পর ত্রিপুরেশ বাবুর গোষ্ঠী অভিনয় করেন অপরেশচন্দ্রের 'কর্ণার্জুন'। শকুনি ও কর্ণের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে ত্রিপুরেশবাবু ও স্মরজিৎ চক্রবর্ত্তী (বনমালীপুরের বাসিন্দা ও পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মহকুমা শাসক হিসাবে কাজ করেন)। মাতৃমন্দিরের নাট্যসংস্থা পরবর্তী সময়ে দস্যু ও পোষ্যপুত্র—নামে আরও দু'টি নাটক অভিনয় করেন। সেগুলোও দুর্গাবাড়ীর অস্থায়ী মঞ্চে অভিনীত হয়। এই মঞ্চটি তৈরী হয়েছিল নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকে। সুধাংশুমোহন দত্ত পড়াশুনা শেষ করে আগরতলা আসেন ও মাতৃমন্দির নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দেন। সুধাংশুবাবুর উপস্থিতি মাতৃমন্দির নাট্যসংস্থাকে শক্তিশালী করে তোলে। অভিনীত নাটক দুটির অভিনয়

লিপিতে ছিলেন অমূল্যকেশব সেনশর্মা, সুধাংশুমোহন দত্ত, নারায়ণ রায়, কালু মিঞা, মাতাব মিঞা, রূপেন চক্রবর্তী ও আরও অনেকে। শিশু শিল্পী হিসেবে ছিলেন বিশ্বজিৎ সেনশর্মা। মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর "দস্যু" নাটকটিতে অভিনেতাদের অভিনয় চাতুর্য্য দেখে অভিভূত হন। পাশাপাশি ত্রিপুরেশবাবুর গোষ্ঠী অভিনয় করেন অনুরূপা দেবীর "মা"। অভিনয়াংশে ছিলেন ত্রিপুরেশবাবু, স্মরজিত চক্রবর্তী, মন্মথ পোদ্দার (প্রমথ পোদ্দারের বাবা) মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু বানার্জি, অতুল চক্রবর্তী, স্বর্গীয় শান্তি রায়। স্বর্গীয় নীলরতন গাংগুলি প্রমুখ আরও অনেকে।

"পোষ্যপুত্র" নাটক অভিনয়ের পর মাতৃমন্দির সম্ভবতঃ আরও দু'একটি নাটক করেছিল। সেগুলোর নাম ক্যাপটেন দেববর্মার মনে ছিল না। এরপর অমূল্যকেশব সেনশর্মা চাকরীর সুবাদে কৈলাসহর চলে যান ও নাট্যসংস্থাটি সাংস্কৃতিক জগৎ থেকে মুছে যায়। সুধাংশুবাবুও স্থায়ীভাবে ত্রিপুর শিল্পায়তনে যোগ দেন।

১৯৫২ সনে স্কুলের পড়া শেষ করে ত্রিপুরা সরকারে পূর্তবিভাগে চাকুরী নেওয়ার পর সাময়িকভাবে আমার নাট্যজীবনের পট পরিবর্ত্তন ঘটে, তবে বিচ্ছিন্নতা নয়। এই সময়টা আমার কেটেছে বিভিন্ন নাট্যসংস্থার নাট্য-অভিনয়ে স্মারক হিসেবে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই "ত্রিপুর শিল্পায়তনের" ডাকে তাদের নাটকে স্মারক হিসেবে আমার ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩ সনে আগরতলা পূর্ত বিনোদন সংস্থা মঞ্চস্থ করে কথা সাহিত্যিক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক "আরোগ্য নিকেতন"। পরিচালক শ্রীতপেশ বোস। নাটকটি অভিনীত হয়েছিল নেতাজী চৌমুহনীতে মন্ত্রীবাড়ীর সামনের খোলা জায়গায়। আজকে সেই মাঠেই গড়ে উঠেছে পূর্তবিভাগের বিভিন্ন অফিস। এ নাটকে আমিও অংশ নিই। অভিনয়াংশে অন্যান্যরা হলেন সর্বানন্দ ভট্টাচার্য্য, অজিত দাশগুপ্ত, সুধীন দে প্রভৃতি। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন মৃণাল ভৌমিক, বেণুধর গোস্বামী, সুবীর দাস। মন্ত্রীবাড়ীর এই অস্থায়ী মঞ্চে পরে আরও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয় যেমন পি, ডব্লিও, ডি, চিকিৎসা সংকট, কেরানীর জীবন, মানসী, পূজার বোনাস ইত্যাদি।

সমসাময়িক কালে ধলেশ্বরে শ্রীনিত্যরঞ্জন দাশগুপ্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাটক "দ্বীপান্তর"। এই নাটকে নিত্যবাবু অভিনয় করেন। তার সঙ্গে আর কে কে ছিলেন ঠিক মনে করতে পারছিনা।

ত্রিপুরা সরকারের উদ্যোগে ঐ বছর বর্ত্তমান শিশু-উদ্যানে শিল্প উন্নয়ন প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে এক নাটক প্রতিযোগিতা হয়। সরকার থেকেই অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করে দেওয়া হয়। আগরতলার কয়েকটি নাট্যসংস্থা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। আমাদের অভিনীত নাটক দুটির নাম পি, ডাব্লু, ডি ও উল্কা। ত্রিপুরা শিল্পায়তন উপস্থাপনা করে স্যানিভিলা। পি, ডাব্লু, ডি নাটকে আমার চরিত্র ছিল মিঃ সেনের। সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক অভিনয়ধারার এই চরিত্র চিত্রন করে দর্শকদের সাধুবাদ পাই। এই অভিনয় নিয়ে ত্রিপুর

শিল্পায়তনের পরিচালক ও অভিনেতা ত্রিপুরেশবাবুর সাথে মত বিরোধ হয়।

১৯৫৪ সনের মাঝামাঝি উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রদের সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-এর আয়োজন করা হয়। নাটক ও যাত্রাভিনয় ছিল এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ। অভিনীত হয় "সরমা" ও "বঙ্গেবর্গী" যাত্রাপালা ও "রীতিমত নাটক"। যাত্রাপালা ও নাটকে চরিত্র বন্টন নিয়ে ত্রিপুরেশবাবুর সাথে আমার পুরানো মতবিরোধ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। অন্যান্য অভিনেতারা আমাকে বঙ্গেবর্গীতে সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করার পক্ষে মত দেন কিন্তু ত্রিপুরেশবাবু এর তীব্র বিরোধিতা করেন। আমি নাটক অভিনয় থেকে সরে আসতে চাই। শেষ অব্দি শ্রী হৃষিকেশ দেববর্ম্মা, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল দাশগুপ্ত ও শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত মশাইর হস্তক্ষেপে এই মতবিরোধের নিষ্পত্তি হয়।

শেষ অব্দি বঙ্গেবর্গীতে আমিই সিরাজের ভূমিকায় অভিনয় করি। এটাই আমার জীবনে প্রথম যাত্রাভিনয়। এখানে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে ত্রিপুরেশবাবুর সাথে মতান্তরের জন্য উমাকান্তের প্রাক্তন ছাত্র বিশ্বজিৎ সেনশর্মাও এই অনুষ্ঠানে নাটক বা যাত্রা অভিনয়ে কোন অংশ নেন নি। যাত্রার প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছিল "শিরিশ কুসুম" গাছটির একটু পশ্চিম দিকে ও নাটক অভিনয় হয়েছিল এই প্যাণ্ডেলের আরও একটু পশ্চিম দিকে যেখানে উত্তর দক্ষিণে লম্বা একটি টিনের ঘর ছিল তার সামনে। যাত্রাপালায় যাঁরা আমার সাথে অভিনয় করেছিলেন তাঁরা হলেন শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত, স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয় সুধাংশু দত্ত, স্বর্গীয় নীলরতন গাঙ্গুলী, স্বর্গীয় পার্বতী ভট্টাচার্য্য, দিগেন্দ্র ব্যানার্জী, অমলেন্দু সেনগুপ্ত, সুবীর দাস, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, প্রমুখ। যাত্রাপালায় ব্যবহৃত পোষাক পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জাকর আনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। যাত্রাগান দেখতে প্রচুর দর্শকের সমাগম হয়।

থিয়েটার "রীতিমত নাটকে" বাড়ীওয়ালার ভূমিকায় অভিনয় করি। অন্য যাঁরা অংশ নেন তাঁরা হলেন স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয় সমরজিৎ চক্রবর্তী, স্বর্গীয় সুধীর দত্ত (উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক) ধূর্জটি দাশগুপ্ত, শান্তি সরকার, স্বর্গীয় গৌরাঙ্গ মুখার্জী এবং আরও অনেকে। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন মেঘেন্দ্র মুখার্জী, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর দাস প্রমুখ। কলকাতা মঞ্চ ও সিনেমা জগতের নাম করা হাস্যকৌতুক অভিনেতা স্বর্গীয় শ্যাম লাহা এই নাট্যানুষ্ঠানের অন্যতম দর্শক ছিলেন।

"ত্রিপুর শিল্পায়তন" এরপর আরও দু-একটি নাটক মঞ্চস্থ করেন 'চিত্রকথা' সিনেমা হলে (কোন স্থায়ী মঞ্চ না থাকায় নাটকের কর্মকর্ত্তারা মাঝে মাঝে সিনেমা হল ভাড়া করতেন)। যতদূর মনে হয় শিল্পায়তন যে যে নাটক অভিনয় করেন সেগুলো হচ্ছে, মাটির ঘর, কেদার রায়, উমাকান্ত একাডেমী হলে অভিনীত হয় "সীতা"। নাটকগুলি ত্রিপুরেশবাবু নিজেই পরিচালনা করেন। অভিনয়ে ছিলেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, স্বর্গীয়

অনিল সেন, হৃষিকেশ দেববর্মা, রাণা ডাহালজং, স্বর্গীয় সুধাংশু দত্ত, স্বর্গীয় অনিল দাশগুপ্ত, স্বর্গীয় হরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্মা, কানু বন্দোপাধ্যায়, অমলেন্দু সেনগুপ্ত প্রমুখ আরও অনেকে।

ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলটি ছিল বর্ত্তমান রূপসী সিনেমা হলের সামান্য একটু উত্তর দিকে। বোধহয় আর্থিক অনটনের জন্যই এই হলটি বন্ধ হয়ে যায়। এই হলে একটা অস্থায়ী মঞ্চ তৈরী করা হয়েছিল। এই মঞ্চে ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তনের শিল্পীরা অভিনয় করেন "চন্দ্রগুপ্ত ও বাংলার মেয়ে" নাটক। যাঁরা অভিনেতা গোষ্ঠিতে ছিলেন তাঁরা হলেন শিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত (উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক) শ্রী, কে, পি, দত্ত (তখনকার পাবলিসিটি অফিসার)। অনিলকুমার সেন, হৃষিকেশ দেববর্মা, ধূর্জটী দাশগুপ্ত, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, আশুতোষ রায়, রাণা ডাহলজং, সুবীর দাস, অমলেন্দু বর্দ্ধন রায়, রনজিৎ ভট্টাচার্য, বেণুধর গোস্বামী, গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়। এই নাটকে আমার কি ভূমিকা ছিল তা মনে নেই।

নাটক অভিনয়ের ক্ষেত্রে আগরতলার মেয়েরাও পিছিয়ে ছিল না। বনমালীপুরের হরিগঙ্গা বসাক স্কুলের সাহায্যার্থে পাড়ার মেয়েরা ত্রিপুরেশবাবুর পরিচালনায় অনুরূপা দেবীর "মা" নাটকটি অভিনয় করেন ত্রিপুর ছায়াবানী সিনেমা হলের অস্থায়ী মঞ্চে। নাটকটি প্রযোজনা করেন বনমালীপুর মহিলা সমিতি। অভিনয়াংশে ছিলেন মুকুল সেনগুপ্তা (সেনশর্মা) উমা দাশগুপ্তা (চৌধুরী), বাণী দাস, যুথিকা মজুমদার, দুলী দাশগুপ্তা, মিউ ব্যানার্জী প্রমুখ। প্রত্যেকটি শিল্পীর অভিনয় গুণে নাটকটি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, বিশেষ করে মুকুল সেনগুপ্তার মা চরিত্র চিত্রর্ন হয়েছিল অনবদ্য।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তীর (প্রাক্তন মন্ত্রী) উদ্যোগে কয়েকজন উৎসাহী মেয়ে একটি নাট্য সংগঠন গড়ে তোলে। এই গোষ্ঠী অভিনয় করে "শ্যামলী" নাটকটি। পরিচালক ত্রিপুরেশ মজুমদার। ত্রিপুর ছায়াবাণী হলের অস্থায়ী মঞ্চে নাটকটি অভিনীত হয়। এই নাটক দেখার জন্য দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী মূল্য নেওয়া হয়েছিল ও সংগৃহীত পুরো টাকাটাই বাণী বিদ্যাপীঠ স্কুল গৃহ নির্মাণের জন্য স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়। স্কুলটি তখন ছিল বেসরকারী। নাটকে যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন নাম ভূমিকায় শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী, শ্রীমতী মুকুল চক্রবর্তী, সতী দাসগুপ্তা, উমা দেব ও আরও অনেকে। স্বর্গীয় ত্রিপুরেশবাবু পরিচালনা ছাড়াও দাদুর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনিই ছিলেন একমাত্র পুরুষ অভিনেতা।

ত্রিপুর শিল্পায়তন পরবর্তী সময়ে আগরতলার বিভিন্ন অস্থায়ী মঞ্চে পর্যায়ক্রমে যে নাটকগুলি অভিনয় করেন সেগুলোর তালিকায় রয়েছে সাজাহান, সরমা, সীতা, প্রফুল্ল, মাটির ঘর, সংগ্রাম ও শান্তি, পরিচয় ইত্যাদি। অভিনেতা হিসাবে যাঁদের নাম আগে উল্লেখ করেছি তাঁরাই ছিলেন।

আগেই বলেছি যে পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের প্রথম নাটক 'অনুপমার প্রেম'। পরবর্তী সময় এই সংস্থা অভিনয় করেন 'কেদার রায়' উদয়ন সিনেমা হলে (বর্তমানে রূপছায়া সিনেমা হল)। পরিচালনায় ছিলেন পুলিশ সুপার জি. পি. ঘোষ। মাটির ঘর ও কারাগার এই ক্লাবের পরবর্তী প্রযোজনা। নাটক দুটির পরিচানায় ছিলেন পুলিশ সুপার শ্রীহৃষিকেশ দেববর্মা ও পি. এন চ্যাটার্জি (ইলেকট্রিক্যাল ইনজিনিয়ার)। এর কিছুদিন পরে জেলাশাসকের কর্মচারীরা শ্রী নরেশ সাহা ও প্রেমানন্দ নাথের পরিচালনায় যে নাটক অভিনয় করেন তার নাম "মহারাজ নন্দকুমার"। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদের বেংকোয়েট হলে। অভিনেতাদের নাম স্মরণে আসছে না।

১৯৫৫ সন। আগরতলার নাট্যচর্চার ইতিহাসে একটা নবযুগের সূচনা। প্রতিষ্ঠিত হ'ল "লোকশিল্পী সংসদ নাট্যসংস্থা"। নাটক নির্বাচন, অভিনয় ও আঙ্গিকের ঘটল বিস্ময়কর পরিবর্তন। নাট্য আন্দোলনে লোকশিল্পী সংসদ এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'ল। লোকশিল্পী সংসদের আত্মপ্রকাশের আগ পর্য্যন্ত আগরতলা সহরে, নাটকের স্ত্রী চরিত্র পুরুষ অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হ'ত। কিন্তু এই সংস্থা মেয়েদের দিয়েই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করান। সে সময় অবশ্য সমাজ জীবনে অভিনেত্রীর অভাব ছিল, তাই ত্রিপুর শিল্পায়তনে ও অন্যান্য সংস্থাগুলিতে বাধ্য হয়েই স্ত্রী ভূমিকা পুরুষ দিয়ে অভিনয় করানো হয়েছে। নাট্য আন্দোলনে এটা হল একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। লোকশিল্পী সংসদের প্রথম অভিনীত নাটক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' মঞ্চস্থ হল উমাকান্ত একাডেমী স্কুলের হলঘরে। লোকশিল্পী সংসদই প্রথম দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী মূল্য নিয়ে নাটক দেখার সুযোগ দেন। নাটকে অভিনয় করেছিলেন শক্তি হালদার, তপেশ রায়, দেবেন্দ্র ভৌমিক, লীলা দেব (বর্তমানে প্রধান শিক্ষয়িত্রী বোধজং গালর্স স্কুল) ইত্যাদি। এই নাটকের দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় ত্রিপুরা ছায়াবাণী সিনেমা হলে, যার কথা আগেই বলেছি। সেদিনকার দিনে অভিনেতাদের অভিনয় দেখতে দর্শকদের ভিড় উপচে পড়েছিল। দর্শকরা লোকশিল্পী সংসদের প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানিয়ে উচ্চ প্রশংসা করেছিল।

লোকশিল্পী সংসদের কর্মকর্ত্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের বাংলার অধ্যাপক) ও মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, সরকারী কবিরাজ।

লোকশিল্পী সংসদের অনুপ্রেরণায় ত্রিপুর শিল্পায়তনও এতদিন পরে সমস্ত বাধা দূরে ফেলে দিয়ে মেয়েদের অভিনয়ের পাদপ্রদীপে নিয়ে আসে। অভিনীত হয় তাদের করা পুরাণো দুটি নাটক, বাংলার মেয়ে ও চন্দ্রগুপ্ত। পুরুষদের চরিত্রে অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, হৃষিকেশ দেববর্মা, শীতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত, অনিল সেন, রমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত, অমলেন্দু বর্ধনরায়, সুবীর দাস, কালীদাস বাড়রী, মৃণাল চক্রবর্তী, রঞ্জিত

ভট্টাচার্য, শ্যামল চৌধুরী, স্বদেশ পাল, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত প্রমুখ। স্ত্রী চরিত্রে ছিলেন শ্রীমতী রাণী কর (সেন), ছন্দা দে, বেলা রায় ও আরও অনেকে। অভিনয়ে মেয়েরা পুরুষ অভিনেতাদের ছাড়িয়ে যান।

সমসাময়িককালে শিল্পায়ণ নাট্যসংস্থা জন্ম নিল। এই নাট্যসংস্থার প্রধান সংগঠক ও পরিচালক ছিলেন শ্রী শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। নবনাট্য আন্দোলনের ধারাকে বজায় রেখে তাঁরা একের পর এক নাটক অভিনয় করেছেন। তাঁদের উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনয়ের মধ্যে ছিল কেরানীর জীবন, দুঃখীর ইমান, শেষ কোথায়, মহেশ ও ছেঁড়া তার। পরিচালক ও বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয়ে ছিলেন শিববাবু নিজে। কেরানীর জীবনে ত্রিপুরেশ বাবু ও যূথিকা মজুমদার শিববাবুর সংগে একসাথে অভিনয় করেন। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন সান্টু দে, বেলা রায় ও শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ। অন্যান্য নাটকগুলিতে কে কে অভিনয় করেছিলেন মনে নেই। তবে শিবদাস বাবু ও কণিকা দেবনাথ মুখ্য চরিত্রে ছিলেন। শ্রীমতী কণিকা দেবনাথ অভিনয়ে এক নতুন মাত্রা যোগ করেন। তাঁর অভিনয় ছিল সাবলীল প্রাণবন্ত ও স্বাভাবিক। ১৯৬১ সনে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষ্যে শিল্পায়ন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটক অভিনয় করে। পরিচালক ছিলেন শিবদাসবাবু। অভিনয়ে কে কে ছিলেন মনে নেই। এই নাট্যসংস্থার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এর পর আস্তে আস্তে কমে যায়।

যে নাট্যসংস্থা এতদিন ধরে অভিনয় জগতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে এসেছে সেই "ত্রিপুর শিল্পায়তন" তখন পিছিয়ে পড়েছে। এর কারণ কি আমার জানা ছিল না। হয়ত বা শিল্পীরা বয়সের ভাবে ক্লান্ত অথবা অর্থিক অনটনই এর প্রধান কারণ ছিল। কিন্তু ত্রিপুরেশবাবু তাঁর মৃত্যুর আগে পর্য্যন্ত এই সংস্থাটিকে বাঁচিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন।

নাট্যচর্চায় লোকশিল্পী সংসদ জোর কদমে সামনের সারিতে এগিয়ে এল। এখন যেখানে মিটারসনের দোকান তার ডানপাশ দিয়ে একটা রাস্তা ভেতর দিকে চলে গেছে। কিছুটা এগুলে পরই সিংহরায় ভবন। এই দালানের দোতলায় ছিল লোকশিল্পী সংসদের ভাড়া করা ক্লাব ঘর। নাটকের মহড়াও হ'ত এই ঘরে। তখনকার দিনে একমাত্র লোকশিল্পী সংসদই ছিল একমাত্র সংস্থা যার নিজস্ব তৈরী গঠনতন্ত্র ছিল।

লোকশিল্পী সংসদের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশক্তি হালদার, পেশায় শিল্পী। সৌখিন অভিনেতা ও কুশলী সংগঠক। ইতিমধ্যে "রক্তকরবী"-তে তাঁর অভিনয় দেখেছি। শক্তিবাবুর সাথে যেচে আলাপ করলাম। আমি অভিনয় জগতে আছি শুনে উনি ওঁর নাট্যসংস্থায় যোগ দিতে অনুরোধ করেন। সানন্দে সাড়া দিয়ে এই সংস্থার সভ্য হলাম। তখন ওঁরা নাট্যকার ধনঞ্জয় বৈরাগীর ধৃতরাষ্ট্র নাটকের মহড়া দিচ্ছেন। যেহেতু নাটকে চরিত্র বিলি শেষ হয়ে গেছিল, আমি বাইরের থেকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছিলাম। এই নাটকে যাঁরা

অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, স্নিগ্ধা হালদার, বিজয়া সাহা, অঞ্জলি দাশগুপ্তা, মৃণাল ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী প্রমুখ। 'ধৃতরাষ্ট্র' নাটকের দ্বিতীয় অভিনয় রজনীতে আমাকে দেওয়া হ'ল স্বরূপের ভূমিকা কারণ এই চরিত্রের নিয়মিত অভিনেতা শ্রীভূপেন্দ্র চক্রবর্তী অসুস্থ ছিলেন। এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল আলোছায়া (বর্ত্তমান রূপছায়া সিনেমা হল) সিনেমা হলে সকাল ৯টায়। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। জীবনে এই প্রথম মেয়েদের সংগে নাটক অভিনয়। অভিনয়ে সফলতার নজীর রাখি, সংস্থার সভ্যসভ্যা ও দর্শকদের প্রশংসা আদায় করি।

এরপর লোকশিল্পী সংসদের দ্বিতীয় নাট্য উপহার হ'ল ধনঞ্জয় বৈরাগীর মঞ্চসফল নাটক 'রূপোলী চাঁদ'। নাটকটি অভিনীত হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে। পরিচালনায় ছিলেন সুধাংশুমোহন দত্ত। অভিনয়ে আমি ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন নীলরতন গাঙ্গুলী, খগেন্দ্র চক্রবর্তী (সম্পাদক রুদ্রবীণা পত্রিকা), ভূপেন্দ্র চক্রবর্তী, গোপাল চ্যাটার্জী, রণজিৎ ভৌমিক, সনৎ গোস্বামী, শক্তি হালদার, আশু রায়, মৃণাল ভৌমিক, সুধীন দে, সুশীল চৌধুরী প্রমুখ। স্ত্রী ভূমিকায় ছিলেন সতী দাশগুপ্তা, বিভা রায় ও বীণা রায়। অভিনয়ের তারিখ ১৬/১৭ অক্টোবর, ১৯৫৭ ইং।

১৯৫৮ সন। এই সময় ভারত সরকারের ফিল্ড পাবলিসিটির একটি শাখা আগরতলায় আসে ও আমাদের লোকশিল্পী সংসদকে ওদের অন্তর্ভূক্ত করে "আমাদের গ্রাম" ও "মংগু" নামে দুটো নাটক অভিনয় করতে অনুরোধ করে। আমরা, জিরানীয়া, তেলিয়ামুড়া, বিশালগড়, উদয়পুর, বিশ্রামগঞ্জ, সোনামুড়া, মেলাঘরে ও আগরতলায় এই নাটক দু'টো মঞ্চস্থ করি। আমি ছাড়া আর যাঁরা এই নাটকে অভিনয় করেন তারা হলেন, নরেশ সাহা, দেবেন্দ্র ভৌমিক, সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, ডাঃ নয়ন মজুমদার, সনৎ গোস্বামী, শ্রীমতী আভারানী পাল, শ্রীমতী লক্ষ্মী সাহা, শ্রীমতী মীনা সাহা, মৃণাল চৌধুরী।

ত্রিপুরা পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টের প্রযোজনায় আমরা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় অভিনয় করলাম 'জটাগঙ্গার বাঁধ' ও 'মানভঞ্জন' নামে দুটো নাটক। অভিনয়াংশে আমি ছাড়া অন্যান্যরা হলেন তপেশ রায়, সুশীল চৌধুরী, অজিত ভট্টাচার্য, শক্তি হালদার, গিরীন্দ্র ভৌমিক, মীনা চক্রবর্তী, ছবি দত্ত, ইরা দত্ত ও আরও অনেকে।

১৯৫৯ সনের ১৭ ও ১৮ জানুয়ারী আমাদের নাট্যসংস্থা নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে অভিনয় করলো কিরণ মৈত্রের নাটক 'বারো ঘন্টা'। শক্তি হালদার নাটকটির পরিচালক। তিনি অভিনয় করেন রাজেশ্বর চরিত্রে। আমি অভিনয় করি অমিয়র ভূমিকায়। আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, সুধীন দে, বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, শান্তি রায়, ভূপেন চক্রবর্তী, ডাঃ নয়ন মজুমদার,

রণজিৎ ভৌমিক, তন্দ্রা মজুমদার, শুভ্রা মজুমদার, যুথিকা গুপ্তা, বিজয়া সাহা, বীণা রায়, সনজিৎ সেনশর্ম্মা, রাজু, অজিত ভট্টাচার্য, হরেন্দ্র হালদার, সুশীল চৌধুরী ও গিরীন্দ্র ভৌমিক।

পরের নাটক লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার অভিনীত হয় ২৬শে ও ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৯ সনে। স্থান নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবন। নাটকটির পরিচালক শ্রীশক্তি হালদার। অভিনয়াংশে আমি ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন শক্তি হালদার, জিঞ্জির সেনশর্মা, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, অজিত ভট্টাচার্য, সুশীল চৌধুরী, গিরীন্দ্র ভৌমিক, রীনা দে, তন্দ্রা মজুমদার, স্বপ্না হালদার, মিতালী চক্রবর্তী, কল্পনা গুপ্তা, সুভ্রা মজুমদার, বিজয় রায়, রণজিৎ ভৌমিক, সাধন কর্মকার, সুবীর দাস, অভিজিৎ, যুথিকা গুপ্তা, মীনা চক্রবর্তী, রেনুকা সিংহ রায়, অলকা গুপ্তা ও পূর্ণিমা বর্মণ।

লোকশিল্পী সংসদের সহসভাপতি ও সাহিত্যিক শ্রীঅনিল ভট্টাচার্য বহু পরিশ্রম করে ও অনেক নথিপত্র ঘেঁটে রচনা করেন "রানী জয়াবতী" নাটকটি। শক্তি হালদার নাটকটির পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন। নাটকটি মঞ্চস্থ হয় নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সাংস্কৃতিক ভবনে। নাম ভূমিকায় ও রানী কমলাবতীর ভূমিকায় ছিলেন যথাক্রমে চিনু বর্ম্মন ও মানসী রায়। আমি ছাড়াও পুরুষ চরিত্রে ছিলেন শক্তি হালদার, তপেশ রায়, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, বিশ্বনাথ ব্রহ্মচারী, রূপেন মজুমদার, রণজিৎ ভৌমিক, ভূপেন চক্রবর্তী, সুশীল চৌধুরী, সর্ব্বানন্দ ভট্টাচার্য, সন্তোষ ব্যানার্জি, সুবীর দাস, নিখিল ভট্টাচার্য ও আরও অনেক। "রানী জয়াবতী" নাটকটি অভিনয়ের আগে কিছু সভ্য এই নাটকটি অভিনয়ের বিরোধিতা করেন। সাময়িকভাবে মিটমাট হলেও এক শ্রেণীর সভ্যদের মনে চাপা অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে।

১৯৬০ ইং সনে রবীন্দ্রনাথের শতবর্ষপূর্তি উৎসব প্রাক্কালে আমাদের সংস্থা উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করে, শক্তিবাবুর পরিচালনায়। আমার ভূমিকা ছিল সর্দারের। শক্তিবাবু অভিনয় করেন রাজার ভূমিকায়। অন্য যাঁরা অভিনয়াংশে ছিলেন তাঁরা হলেন তপেশ রায়, বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা, অজিত ভট্টাচার্য, সুশীল চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক ও অন্য আরও অনেকে। নন্দিনীর অভিনয় করেন স্নিগ্ধা হালদার ও কিশোরের ভূমিকায় প্রয়াত প্রণব ব্যানার্জি।

১৯৬০ সালের ১৩ই ও ১৪ই জুলাই আসন্ন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠান হিসাবে বীরচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের কর্মীবৃন্দ উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে 'বিসর্জন' নাটক অভিনয় করে। এই নাটকের অভিনয়ে যাঁরা সেদিন ছিলেন তাঁরা হলেন চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, ফনী চক্রবর্তী, দিলীপ সরকার, জ্যোতির্ময় খাসনবীশ, আশু রায়, তুলসী দত্ত, অঞ্জলি দাশগুপ্তা, সুমিত্রা দত্ত। রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রী বিমল গুপ্ত।

১৯৬১ সনে রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষে ৯ই ও ১০ই জুলাই উপরে লিখিত নাট্যসংস্থাটি বিসর্জন নাটকটি ২য় বার অভিনয় করেন প্রগতি বিদ্যাভবনের জ্ঞানমন্দির ক্যাম্পাস হলে। এই নাটকে সেদিনকার অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা ছিলেন বিমল গুপ্ত, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, মনিশংকর ভৌমিক, জোতির্ময় খাসনবীশ, ফনী চক্রবর্তী, দিলীপ সরকার, নীলরতন গাংগুলী, রমা সেন ও সতী দত্ত। পরিচালনায় ছিলেন সুধাংশুমোহন দত্ত।

১৯৬১ সনের ৩রা ও ৪ঠা জুন তারিখ বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টি ভবনে "রসচক্রের"-এর প্রযোজনায় বিসর্জন নাটক অভিনয় হয় বারীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায়। অভিনয়ে অংশ নেন মৃণাল চক্রবর্তী, উত্তমাচরণ চক্রবর্তী, ভানু রক্ষিত, সমীর দাস, নরেন্দ্র দারিং, প্যারী চক্রবর্তী, ভুবন চক্রবর্তী, রেখা চক্রবর্তী, অমলা চক্রবর্তী ও মীনাক্ষী মজুমদার ও আরও অনেকে।

অনেকদিন চুপ করে থাকার পর ত্রিপুর শিল্পায়তন ১৯৬১ সনের ৯ই জুন উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে বিসর্জন নাটকটি সফলভাবে অভিনয় করে। এতে বিভিন্ন চরিত্রে যাঁরা রূপ দেন তাঁরা হলেন শ্রী পি. এন চ্যাটার্জী, প্রশান্ত দাশগুপ্ত, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, মেঘেন্দ্র মুখার্জি, স্বদেশ পাল, সবিতা সিংহ রায়, প্রতিমা চৌধুরী, ইরা ব্যানার্জী। নাটকটির পরিচালনায় ও রঘুপতির ভূমিকায় অভিনয় করেন ত্রিপুরেশ মজুমদার।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১০ই ও ১১ই মে ত্রিপুরা শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে বিসর্জন নাটকের ইংরেজী রূপ "স্যাক্রিফাইস" অভিনীত হয় রবীন্দ্র হলে। অভিনয়াংশে ছিলেন লীলা রমন (ত্রিপুরার তৎকালীন মুখ্য সচিব শ্রী রমনের স্ত্রী), বামাপদ মুখোপাধ্যায়, নীরা চ্যাটার্জি, মৃণাল মজুমদার। এটাই ছিল আগরতলার নাট্যইতিহাসে প্রথম ইংরেজী ভাষায় নাট্যাভিনয়।

ঐ সনের ২৮শে ও ২৯শে অক্টোবর আমরা লোকশিল্পী সৎসদের সদস্যরা উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাস হলে অভিনয় করি 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি। শক্তিবাবু এর পরিচালক। অভিনয়ে আমি ছাড়া অন্যান্যরা হলেন শক্তি হালদার, ভূপেন চক্রবর্তী, মুকুল ভট্টাচার্য, মহুয়া ভট্টাচার্য, লীলা দেব, তপেশ রায়, অপর্ণা রায় চৌধুরী, রণজিৎ ভৌমিক, সন্তোষ ব্যানার্জি, ডাঃ নয়ন মজুমদার প্রমুখ অনেকে।

এরপরের ইতিহাস দুঃখজনক। আগেই বলেছি 'রানী জয়াবতী' নাটকটির অভিনয়ের আগে থেকেই বেশ কিছু সভ্য ক্ষুব্ধ ছিলেন। এই ক্ষোভ প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বেশ কিছু সভ্য আমাদের গোষ্ঠী ছেড়ে চলে যান ও অন্য সংস্থায় যোগ দেন। প্রকট হয়ে ওঠে আর্থিক সংকট। আমি, শক্তিবাবু ও সুশীল চৌধুরী, ডাঃ নয়ন মজুমদার বহু চেষ্টা করেও আমাদের প্রিয় নাট্যদলটিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলাম না। যে মহান ব্রত ও স্বপ্ন নিয়ে লোকশিল্পী সংসদ জন্ম নিয়েছিল, এগিয়ে চলেছিল নানা বিপত্তির মধ্যে, তার যাত্রা শেষ হ'ল এক অশুভ মুহূর্তে।

কিছুদিন বেশ অস্বস্তির মাঝে কাটাই। চীন ভারত আক্রমণ করেছে। রাষ্ট্রীয় আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। ঠিক এমনি সময় ত্রিপুরা পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্ট একটি ইউনিট গড়ে তোলে—আমিও ডাক পাই। এই ইউনিটটি অভিনয় করে দেশপ্রেমের উপর ভিত্তি করে "সৈনিক" নাটক। নাটকটির পরিচালক ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার শ্রী পি. এন. চ্যাটার্জী। আমার সাথে এ নাটকে আর যাঁরা অভিনয় করেন তাঁরা হলেন পি. এন. চ্যাটার্জী, তপেশ রায় রণজিত ভৌমিক, শক্তি হালদার, শ্রীমতী রাণী কর, শ্রীমতী মহুয়া ভট্টাচার্য, ছবি দেববর্মা ও আরও অনেকে।

পরের অভিনয় "ডাউন ট্রেন" নাটকে। আগরতলায় ক্যানসার হাসপাতাল তৈরী কররার জন্য ভীষণ চেষ্টা চলছে। এই নাটকটি অভিনয় করে যে দর্শনীমূল্য পাওয়া গেছিল তার পুরোটাই আমরা "ক্যানসার হসপিটাল তৈরী কমিটি"-এর সভাপতি ডাঃ গোবিন্দ চক্রবর্তীর হাতে তুলে দিই। নাটকে অভিনয়াংশে আমি ছাড়া আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন শ্রী পি. এন. চ্যাটার্জী, অজিত দাশগুপ্ত ও আরও অনেকে। নাটকটির পরিচালক ছিলেন শ্রী চ্যাটার্জী।

সৌনক নাটকের দৃশ্যে
রাণী কর ও শক্তি হালদার

লোকশিল্পী সংসদের উদ্যোগে ১৯৬৪ ইং সনের ৪ঠা ও ৫ই জুলাই নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের সংস্কৃতি ভবনে অভিনীত হ'ল শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক 'মেঘে ঢাকা তারা'। অভিনয়াংশে ছিলেন ডাঃ নয়ন মজুমদার, শক্তি হালদার, কমল চক্রবর্তী, দেবেন্দ্র ভৌমিক, সন্তোষ গাঙ্গুলী, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, মিন্টু দাস, রণজিৎ ভৌমিক, অমরেন্দ্র রক্ষিত, সুপ্রকাশ বড়ুয়া, বকুল বড়ুয়া, বিজিতা গাঙ্গুলী, অমিতা চক্রবর্তী, দেবলা মজুমদার। নাটকটি পরিচালনা করেন বিজিতা গাঙ্গুলী (বিজয়কুমার গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন)।

বোধহয় ১৯৬৫ সনের গোড়ার দিকে প্রয়াত হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মাকে (হরিকর্তা) সভাপতি ও দশজনকে কার্য্যকরী কমিটির সদস্য করে 'কৃষ্টি গোষ্ঠী' নামে একটি নাট্যসংস্থা গড়ে তুলি। এই নাট্যগোষ্ঠীর প্রথম নাটক "সর্পিল"। এই নাটকে আমার সাথে অভিনয় করে শ্রীতপেশ রায়, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, রণজিৎ ভৌমিক, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, রাণী কর প্রমুখ আরও অনেকে।

শ্রীনরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ত্রিপুরা বনবিভাগের দপ্তর প্রধান হিসেবে অনেক দিন কাজ করে গেছেন। দক্ষ প্রশাসক ও কড়া অফিসার হিসেবে তাঁর সুনাম ত্রিপুরায় আজও ছড়িয়ে আছে। ১৯৬৭ সনে তিনি ত্রিপুরা কৃষিবিভাগের অধিকর্ত্তা হিসাবেও অতিরিক্ত দায়িত্বভার নেন। শ্রী ভট্টাচার্য বনবিভাগ ও কৃষিবিভাগের কর্মচারীদের দিয়ে একটি

বিনোদন সংস্থা গড়ে তোলেন। এই নাট্যসংস্থা ১৯৬৭ ইং সনের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হলে মঞ্চস্থ করেন শক্তিপদ রাজগুরুর নাটক "শেষাগ্নি"। নাটকটি পরিচালনা করেন কৃষিবিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস। অভিনয়াংশে ছিলেন শ্রীসন্তোষ বিশ্বাস, মিসেস বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, দিলীপ চক্রবর্তী, বীরেন চক্রবর্তী, বিমল চক্রবর্তী, সতীশ শর্মা, পিনেন্দ্রনাথ রায়, বিজু চক্রবর্তী, মিসেস পাল চৌধুরী, অপরাজিতা দেববর্মা, নিরুপমা মজুমদার ও আরও অনেকে। তিনদিন ধরে নাটকটি অভিনীত হয়। দর্শকদের মধ্যে ছিলেন ত্রিপুরার তখনকার চীফকমিশনার শ্রীউমানাথ শর্মা। দলগত অভিনয়ে নাটকটি সফলতা লাভ করে। অভিনয়ে উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখেন বিশ্বজিৎ সেনশর্ম্মা ও মিসেস বিশ্বাস।

১৯৬৭ ইং সনের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন ত্রিপুরাতে আসেন। ত্রিপুরা রাজ্যসরকার তাঁকে সম্বর্ধনা দেন। সূচীতে ছিল নাটক অভিনয়। ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পৃষ্ঠপোষকতায় "কৃষ্টি গোষ্ঠী" অভিনয় করে মহেন্দ্র গুপ্তের ঐতিহাসিক নাটক "টিপু সুলতান"। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস হ'লে নাটকটি অভিনীত হয়। অভিনেতা ও অভিনেত্রী গোষ্ঠীতে আমি ছাড়া অন্যরা হলেন বঙ্কুপ্রসাদ সেনগুপ্ত, জ্যোতিপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, ডাঃ এইচ. এস. রায় চৌধুরী, ভূপেন চক্রবর্তী, সমরেশ চক্রবর্তী, (বর্ত্তমান তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের এ্যাসিস্টেন্ট ডাইরে'র), কল্পনা দেববর্মা, হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, পাঞ্চালী দেববর্মা, দেবারু দেববর্মা ও অন্যান্য আরও অনেকে।

আমার আলোচনাকাল ত্রিশদশক থেকে ১৯৬৭ ইং অব্দি। এরপর থেকে শুরু হয় রাজ্যভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতা। তার ইতিহাস সবারই জানা। অবশ্য ১৯৬৭ সন থেকে মাঝে মাঝে অনেক নাট্যগোষ্ঠী নাটক নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন, পৌরাণিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক বাদ দিয়ে অভিনীত হয়েছে রূপকধর্মী নাটক। কিন্তু ঐ সব নাটক প্রকৃত অর্থে সব শ্রেণীর দর্শকদের আনন্দ দিতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। নাটকে কোনো গল্প না থাকলে, খুশী মনে সে নাটক দর্শকরা গ্রহণ করতে পারে না। তাই আজকের দিনে আবার সেই গল্পপ্রধান নাটক ফিরে আসছে। সেই সব নাটক অভিনীত হচ্ছে থিয়েটার ও যাত্রাগানে।

ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের ধারায় বিশেষ করে পাঁচ ও ছয় দশকে বহু নাট্যসংস্থা গড়ে উঠেছিল। এ সব নাট্যসংস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল নাট্যশিল্পী সংসদ, শিল্পশ্রী, শিল্পী সংগঠনী, পঞ্চপ্রদীপ, শিল্পী সংসদ, আর্টিষ্ট এসোসিয়েশনে, শিল্পীসমাজ, কালচারেল ইউনিট, শিল্পসন্ধানী, কলাকার গোষ্ঠী, কল্লোল গোষ্ঠী, ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ, প্রচারবিভাগ, শিল্পবিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, আমরা সবাই, মুকুল সংঘ, রসচক্র, উত্তরায়ণ

শিল্পীসমাজ, বনমালীপুর ইয়ুথ এসোসিয়েশন, অগ্রগতি সংসদ, শিল্পীবাসর, রবীন্দ্র পরিষদ, রূপারোপ। এছাড়া ছিল স্কুল কলেজের ছাত্রদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা। এর মধ্যে অনেক সংস্থারই অস্তিত্ব নেই। তবে এই সংস্থাগুলি নতুন নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী উপহার দিয়েছে। আগরতলার নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র অভিনয়ই নাটকের সফলতা আনে না। নাটককে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করতে হ'লে দরকার অভিনেত্রীদের উপযুক্ত রূপসজ্জা ও আলোকসজ্জা, পোষাক পরিচ্ছদ, রূপসজ্জা, আবহসংগীত ও বিভিন্ন পরিস্থিতিতে যন্ত্র ও সঙ্গীতের সুষ্ঠু প্রয়োগ। যে কলাকুশলীরা এ সমস্তের দায়িত্বে থাকেন তাঁরা নেপথ্যেই থেকে যান। আমার এই প্রতিবেদনে শুধুমাত্র অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নাম উল্লেখ করে এসেছি। ঐ সব কলাকুশলীরা, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে নাট্যচর্চায় উপাচার যুগিয়ে গেছেন তাঁদের নাম উল্লেখ না করলে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। তাই উপস্থাপনা দীর্ঘায়ত হলেও তাদেরকে আমি জনসমক্ষে তুলে ধরতে চাই।

রূপসজ্জাকর—স্নেহাংশু চৌধুরী, প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, রবি ভট্টাচার্য, মিন্টু রায় (ঝরিয়া), পীযুষকান্তি মজুমদার, হরেন্দ্র হালদার, রূপেন চক্রবর্ত্তী, সত্য নন্দী, শক্তি হালদার, রণজিৎ ভৌমিক, শ্রী চিন্ময় রায়, ও শ্যামাচরণ চক্রবর্তী। এদের মধ্যে অনেকেই আজ আর ইহজগতে নেই।

সঙ্গীত ও যন্ত্রশিল্পী—কুমার বঙ্কিমবিহারী দেববর্মা, কুমার বিপিন বিহারী দেববর্মা, নবদ্বীপ দেববর্মা, নীলু দেববর্মা, রাণা ডহলজঙ্গ, ক্যাপটেন নগেন্দ্র দেববর্মা, হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মা, প্রবীর দেববর্মা, রবি নাগ, নিমাই দেববর্মা।

অলোকসজ্জা— ৺পরেশ চ্যাটার্জি, নীরোদ দাস, হরিপদ দাস, নরেশ পোদ্দার।

মঞ্চসজ্জা— ৺প্রফুল্ল সেনগুপ্ত, পরবর্ত্তী যুগে বিশু চক্রবর্তী, নরেশ পোদ্দার, শক্তি হালদার, রণজিৎ ভৌমিক, অমরেশ দত্ত, রূপেন চক্রবর্তী।

ত্রিশ দশক থেকে শুরু করে আজ অব্দি অনেক দিন চলে গেছে। দেশভাগ হয়েছে। ওপার বাংলা থেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অনেক পরিবার এসেছে। এখানকার প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থা ও লোকের মানসিকতা ও সাংস্কৃতিক জীবনে ঘটেছে পরিবর্তন। হাওড়া নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। আগরতলার কাঁচা রাস্তা রূপান্তরিত হয়েছে পাকা রাস্তায়। ছন বাঁশের তৈরী কুঁড়ে ঘরের জায়গায় মাথা উঁচু করে গজিয়ে উঠেছে সারি সারি ইমারৎ। আগরতলার বুকে তৈরী হয়েছে রবীন্দ্রভবন ও টাউন হলের মত আধুনিক প্রেক্ষাঘর। সব কটি স্কুল কলেজে রয়েছে সাংস্কৃতিক ভবন। আগরতলায় আমার নাট্যজীবনের দ্বিতীয় ও শেষ অধ্যায়ে সেই সমস্ত সাংস্কৃতিক ভবনের স্থায়ীমঞ্চে অভিনয়

করার সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু পিছনে ফেলে আসা প্রথমদিককার সেই দিনগুলির কথা চিন্তা করতে গিয়ে মনে হয় কি প্রতিকূলতার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা একদল নাটক পাগল ছেলে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে, সমস্ত বাধা বিপত্তিকে ঠেলে ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র নাট্যমোদীদের আনন্দ দিতে চেষ্টা করেছি। অভিনেতা ও কলাকুশলীদের প্রায় সবাই স্কুল কলেজের ছাত্র। নিজেদের কোন আর্থিক সংগতি ছিল না। কারুর কাছে চাঁদা চাইতে ভয় করত। দর্শনীমূল্য দিয়ে তখনকার দিনে কোনো দর্শক নাটক অভিনয় দেখা বিলাসিতা মনে করত। তাই কোনো নাটক অভিনয় করতে যে খরচ হত তার পুরো টাকাটার ব্যবস্থা করতে হয়েছে নিজেদের দেয়া চাঁদা দিয়ে।

কোনো কোনো সময় মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে বাঁশের মাচার ওপর, আবার কোন ক্ষেত্রে স্কুলগুলি থেকে চৌকি ও বেঞ্চ যোগাড় করে আমরা নিজেরাই নাটক করার জায়গায় নিয়ে গেছি। এগুলো দিয়েই মঞ্চ তৈরী হয়েছে। মঞ্চের ওপরটা ঢাকা হত সামিয়ানা বা ত্রিপল টানিয়ে দুপাশের বেড়া দেওয়া হ'ত ধারি দিয়ে। মঞ্চের সামনের দিকটার নীচের অংশ মুড়ে দেওয়া হ'ত ধারির ওপর একরংগা কাপড় জড়িয়ে। মঞ্চের একেবারে পেছন দিকে ঝুলানো থাক্‌ত একটা কালোপর্দা। তারপর সামনের দিকে কয়েক সারি আঁকা সিন যাতে থাকত বিভিন্ন দৃশ্যপট। এই সমস্ত সিনও স্থানীয় শিল্পীরা বিনা পারিশ্রমিকে এঁকে দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। মঞ্চের একেবারে সামনের দিকে দুটো পর্দা দুটো তারের সাথে শনের দড়ি দিয়ে টানানো থাকত। পর্দা দুটোকে নিয়ন্ত্রণ করা হ'ত পুলি দিয়ে। এছাড়া ছিল কয়েক জোড়া উইংস ও প্রত্যেক সিনের সামনের দিকে টানানো নানা রংএর কাপড়ের স্কাই। মঞ্চাধ্যক্ষের নির্দেশে নাটকের বিভিন্ন পরিবেশ দেখানোর জন্য উন্মোচন করা হ'ত ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট। এক দৃশ্য শেষ হওয়ার পর অন্য দৃশ্য শুরু করতে অনেক সময় লাগতো। কিন্তু এতে দর্শকরা বিরক্তি প্রকাশ করেন নি। কারণ সেই বিরতিতে চলত একটানা যন্ত্রসংগীত। নাটক মঞ্চস্থ করার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই মঞ্চ তৈরী করার কাজ আরম্ভ করতে হত। বেশ কিছু উৎসাহী কর্মী ও আমরা অভিনেতারাই অমানুষিক পরিশ্রম করে রাতদিন খেটে নাটক উপস্থাপনা ত্রুটিমুক্ত রাখতে চেষ্টা করেছি। বিজলী বাতির অভাব ছিল তাই আলোকসজ্জা করতে হয়েছে পেট্রোম্যা' জ্বালিয়ে।

পূর্বসূরীদের নাট্যচর্চার ধারা অব্যাহত রেখে আগরতলার নাট্যপ্রবাহকে থামতে দিইনি বরং এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছি। হয়ত আমাদের এই প্রচেষ্টা যুগান্তকারী নয় কিন্তু যুগোপযোগী ছিল বলেই আমি বিশ্বাস করি।

ঠিক এই মুহূর্তে আগরতলায় নাট্যচর্চায় কিছুটা ঘাটতি লক্ষ্য করেছি। ব্যক্তিগতভাবে এটা আমার কাম্য নয়। আমি আশা করব নাট্যপ্রেমী তরুণগোষ্ঠী নতুন ধরণের

যুগোপযোগী নাটক অভিনয় করে আগরতলাবাসী সবাইয়ের মনে নতুন চেতনা জাগিয়ে তুলবেন, সামাজিক জীবনে আনবেন দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্ত্তন।

নাট্যচর্চার জীবনে যাঁরা আমাকে ঘিরে ছিলেন তাঁদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অজ্ঞাতে অনেকের নামও হয়ত উল্লেখ করা হয়নি। তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও জীবিতদের প্রণাম জানিয়ে এই প্রতিবেদন এখানেই শেষ করলাম। উল্লেখিত সন তারিখের কোন গোলমাল থাকলে তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

[গোমতী, ১৩৯৮-এ প্রকাশিত:]

ত্রিপুর শিল্পায়তন মানেই ত্রিপুরেশ মজুমদার

যিনি ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনের পিতৃ-পুরুষ।

ত্রিপুরেশ মজুমদার এবং সুধাংশু দত্ত এঁরা ছিলেন সমসাময়িক। নাট্যজগতে এঁদের অবদান নাট্যকর্মীরা চিরদিন স্মরণ করবে। কিন্তু সুধাংশু দত্ত এবং ত্রিপুরেশ মজুমদারের মধ্যে পার্থক্য এইটুকুই যে ত্রিপুরেশ বাবু নাটক-পাগল শিল্পী, শুধু পরিচালনা করে তাঁর শান্তি নেই, অভিনয় চাই, সে অভিনয়ে থাকে নিষ্ঠা, দরদ, ভালবাসা। সংগঠন করার নেশা তাঁর, সংগঠন একান্ত প্রিয়, সংগঠন আপোষহীন। অন্য সংগঠনে সহায়তার হাত তাঁর প্রসারিত কিন্তু নিজেকে বিক্রী করে নয়, কিনতে হবে। কিনে নিতে হবে। কিনে নিতে হবে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব দিয়ে।

সুধাংশু দত্তর সংগঠন গড়ার দক্ষতা ছিল একথা কেউ বলবে না। অভিনেতা গড়তে পারতেন নিজে পরিচালনা করে। কোন বাধা নিষেধ নেই, দল থেকে দলে চলে যেতেন পরিচালনা করতে, ফলে কোনদলই তাঁকে একান্ত আপন করে পায়নি।

দক্ষ অভিনেতা এঁরা দুজন, দক্ষ পরিচালক এঁরা দুজন, কিন্তু বেহিসেবী ব্যক্তি দুজনেই। দুজনেই ব্যক্তি জীবনে কন্ট্রাশরি করে জীবিকা নির্বাহ করেছেন। সংসারের দায়দায়িত্ব ঠিকমত পালন করেন নি। প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করেছেন, দুহাতে তা খরচ করেছেন। ফলে ত্রিপুরেশবাবুর শেষ জীবন বড় দুঃখময় এবং সুধাংশু দত্ত সৌভাগ্যবান বলে শেষ জীবনে ঘরবাড়ী বিক্রি করে এবং মায়ের পেনশনের টাকা এবং প্রধানশিক্ষিকা গুণবতী স্ত্রীর রোজগারের উপর জীবন কাটিয়ে দিতে পেরেছেন। আজকের ছেলেদের মতো কঠোর জীবন সংগ্রাম করে নাট্যচর্চা সুধাংশু দত্তকে করতে হয়নি। আগের জীবনে এঁদের দুজনের উপর ছিল রাজ অনুগ্রহ, সরকারী সহায়তা যা পরবর্তী যুগের ছেলেরা

পায়নি। মাসের পর মাস মহড়া দিয়ে নাটক মঞ্চস্থের আগে ডোনেশন কার্ড বা টিকিট নিয়ে মানুষের দ্বারে দ্বারে বিক্রি করে নিজের হাতখরচ নয়, নাটক মঞ্চস্থ করার টাকা তুলতে হয়েছে, এইভাবে সংগ্রাম করেছে তারা, যা সুধাংশু দত্তকে করতে হয়নি। করতে হয়েছে শেষ পর্বে ত্রিপুরেশ মজুমদারকে ত্রিপুর শিল্পায়তন চালাতে গিয়ে।

আমাদের এই গ্রন্থের আলোচনাকাল ১৯৫০ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। তবুও ইতিহাসকে বোঝবার জন্য আগে পিছে কিছু বছর আলোচনার অঙ্গ হয়েছে কোথাও কোথাও। আমরা আমাদের গতিপথ ধরেই আলোচনা করছি।

১৯৫০/১৯৫১ এর কোন তথ্য পাওয়া যায় নি। ১৯৫২তে ত্রিপুর শিল্পায়তন ডি. এল. রায় রচিত 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

১৯৫৩র কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৯৫৪ তে 'রীতিমত নাটক' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমীর প্রথম বার্ষিক প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে প্রাক্তন ছাত্রগণের দ্বারা অভিনীত হয় উমাকান্ত একাডেমীতে। অভিনয়াংশে ছিলেন সুধাংশু দত্ত, ত্রিপুরেশ মজুমদার, ধূর্জটি দাশগুপ্ত, পরিতোষ মুখার্জী, শিশু সেন, কানু ব্যানার্জী, মেঘেন্দ্র মুখার্জী, পরিমল ভট্টাচার্য, আশু রায়, নিত্যানন্দ ব্যানার্জী, কালিদাস বাড়রী, নিত্যানন্দ ঘটক, অঞ্জু বর্ধন, রাণা লক্ষবীর, মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, ক্ষিতীন্দ্র বসু এবং সুখময় সেনগুপ্ত। সুখময়বাবুর দাড়ি নিয়ে রামচন্দ্র শহরে আলোড়ন তোলে।

১৯৫৫ তে অনুরূপা দেবীর 'মা' ত্রিপুরেশবাবুর পরিচালনায় বনমালীপুর মহিলা সমিতি ছায়াবাণী হলে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই নভেম্বর ১৯৫৮ ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন সাহিত্যবাসরের যুগজয়ন্তী উৎসবে 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং নির্বাচিত অংশ অভিনয় করেন।

১২ই এবং ১৩ই ফেব্রুয়ারী' ৫৮ বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'ক্ষুধা' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় শিল্পায়নের উদ্যোগে রূপছায়া সিনেমা হলে মঞ্চস্থ হয়।

২৩শে ও ২৪শে সেপ্টেম্বর'৫৮, 'প্লাবন', রচনা মনোজ বসু। ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন নেতাজীর সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৮ই এবং ১৯শে জুন'৫৮— 'উল্কা' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন নেতাজীর সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।

৬ই মার্চ'৫৮— 'মহেশ', কাহিনী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রিপুরেশ মজুমদারের

পরিচালনায় শিল্পায়তন নেতাজী সংস্কৃতিভবনের দ্বারউদ্‌ঘাটন উৎসবে মঞ্চস্থ করে।

২০শে এবং ২১শে জুলাই' ৫৯— তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।

৫ই এবং ৬ই ডিসেম্বর'৫৯— মন্মথ রায়ের 'লাঙ্গল' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন নেতাজী সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি পশ্চিমবঙ্গ বন্যার্তদের সাহায্যকল্পে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

১৫ই নভেম্বর'৫৯— মন্মথ রায়ের 'লাঙ্গল' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় তুলসীবতী স্কুলে ত্রিপুর শিল্পায়তন মঞ্চস্থ করে।

২৮শে জানুয়ারী'৬০— 'রীতিমত নাটক' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে, প্রচার বিভাগের সহায়তায়।

১৯৬০ সালে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সংক্রান্তি' নাটকটি ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৬শে ও ২৯শে মার্চ' ৬০— মনোজ বসুর গল্প (দেবনারায়ণ গুপ্তের নাট্যরূপ) 'ডাকবাংলো' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ইনস্‌টিটিউটের উদ্যোগে সংস্কৃতিভবনে অভিনীত হয়।

২৫শে নভেম্বর' ৬০—সলিল সেনের 'সন্ন্যাসী' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় প্রচার বিভাগের উদ্যোগে ত্রিপুর শিল্পায়তন শিশুউদ্যানে মঞ্চস্থ করে।

২৯শে মে' ৬১— রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় রবীন্দ্র শতবর্ষে উমাকান্ত একাডেমীর মুক্তাঙ্গনে ত্রিপুর শিল্পায়তন মঞ্চস্থ করে। উদ্যোক্তা ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদ। সঙ্গীতে ছিলেন অমিয় মুকুল দে। রূপকার প্রফুল্ল সেন এবং অন্যান্য। ৮ই জুন এবং ২৯শে জুন নাটকটি পুনরাভিনয় হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী' ৬২—ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন এম. বি. বি. কলেজের রবীন্দ্রহলে মঞ্চস্থ করে।

২২শে মার্চ ১৯৬৪ ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটক ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

এটাই ত্রিপুরেশচন্দ্রের শেষ নাটক, ত্রিপুর শিল্পায়তনের শেষ প্রযোজনা। অনেকে বলেন 'বিপ্রদাস' নাটকে তিনি শেষ অভিনয় করেন। ১৯৬৬ সনের ২১শে মার্চ নাটক পাগল আত্মভোলা মানুষটির জীবননাট্যের যবনিকাপাত হয়। নিজের সংস্থা ছাড়া বহু সংস্থায় তিনি নাটক পরিচালনায় সহায়তা করেছেন—এ তাঁর নাটকের প্রতি গভীর ভালবাসা।

লোকশিল্পী সংসদ প্রথম আঘাতহানে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাট্য আন্দোলনে

রবীন্দ্র নাটক অভিনয় করে

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র নাটক

ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাটক 'রক্তকরবী'র মঞ্চ সফলতা জেনেই লোকশিল্পী সংসদ পরপর রক্তকরবী অভিনয় করতে থাকে ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলনকে গতিশীল করার জন্য। সংসদের সৌভাগ্য, বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ অধ্যাপক নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়কে দীর্ঘকাল সভাপতি হিসেবে পেয়েছে। সেই সঙ্গে বহু জ্ঞানী গুণী মানুষ লোকশিল্পী সংসদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিজেকে যুক্ত করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক কবি পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কবি রণেন দেব সংসদের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ফলে লোকশিল্পী সংসদ তার কর্মধারাকে বহু বিস্তৃত করতে পেরেছিল। পর পর রক্তকরবী অভিনয়ে যাঁরা যোগ্যতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন তাঁরা হলেন রাজা—মনীন্দ্র ভট্টাচার্য এবং শক্তি হালদার। বিশুপাগল—শক্তি হালদার, তপেশ রায়, অজিত দত্ত। নন্দিনী— লীলাদেব, যূথিকা গুপ্তা, স্নিগ্ধা হালদার। সর্দার— মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, শিশু সেন। চন্দ্রা— মায়া দেব, লীলা দেব। এছাড়া অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন নরেশচন্দ্র পোদ্দার, দেবেন্দ্র ভৌমিক, বিমান ব্যানার্জী, সুনীল চৌধুরী, রসময় রাউত, নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত, জ্যোতি দাশগুপ্ত, দীপক ভৌমিক, পল্টু চৌধুরী, অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, হিরণ্ময় চক্রবর্তী, মাণিক চক্রবর্তী (খোয়াই), বিচিত্র সাহা, রঞ্জিত পাল, নীলু চক্রবর্তী, সমরেন্দ্র চৌধুরী, দুর্গানাথ চক্রবর্তী।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে ছিলেন ব্রজগোপাল সিংহ এবং নিভারানী সিংহ।

আবহসঙ্গীতে—কুমার প্রবীরকুমার দেববর্মা, কুমার প্রবোধকুমার দেববর্মা, ঠাকুর নবদ্বীপ দেববর্মা, শ্রী নিমাই দেববর্মা, ঠাকুর বীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা, শ্রী দেবল দেববর্মা।

রূপসজ্জায় ছিলেন রবি ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরায় রবীন্দ্র নাটকের জোয়ার

রাজ আমলের পরবর্তী সময়ে ত্রিপুরায় পূর্ণাঙ্গ রবীন্দ্রনাটক হয়েছিল কিনা তার কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে ১৯৫১ সালে নারী গ্রন্থাগার তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে 'বিসর্জন' নাটকের নির্দিষ্ট কিছু অংশবিশেষ অভিনয় করেছিল।

৩রা মার্চ ১৯৫৫ রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর নাটকটি কৈলাশহরের রাধাকিশোর ইনসটিটিউট তাদের স্কুল প্রাঙ্গনে মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২০শে অক্টোবর ১৯৫৭, নবকুমার সিংহর পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা' রাজকুমার সুরেন্দ্র সিং এর নৃত্য পরিচালনায় ভারতসেবক সমাজের উদ্যোগে নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই এবং ৮ই ডিসেম্বর' ৫৭ নৃত্যনাট্য 'শ্যামা' ত্রিপুর শিল্পী সংহতি উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ সংলগ্ন মাঠে স্টেজ করে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই নভেম্বর 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং বিসর্জনের নির্বাচিত অংশ সাহিত্য বাসরের যুগজয়ন্তী উৎসবে ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তনের উদ্যোগে দুর্গাবাড়ী মণ্ডপে অভিনীত হয়।

২৪শে জানুয়ারী'৫৮ 'মুকুট' কমল চৌধুরী ও মায়া দেবের পরিচালনায় সমাজশিক্ষা কেন্দ্র চম্পামুড়া, চম্পামুড়া স্কুল প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে।

১৫ই জুন' ৫৮ হাস্যকৌতুক 'অন্তেষ্টি সৎকার' উমাকান্ত একাডেমীর ১নং নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা উমাকান্ত একাডেমীতে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে সেপ্টেম্বর' ৫৯ 'মুকুট' মেলাঘর জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ছাত্ররা স্কুলপ্রাঙ্গনের মুক্ত মঞ্চে অভিনয় করে।

৮ই মে' ৫৯ পূজারিণী, মেলার মাঠের শিশুশিল্পী সংসদ মেলার মাঠে মুক্তমঞ্চে প্রযোজনা করে।

২৩শে মে' ৫৯ 'ডাকঘর' শিল্পায়ন বড়দোয়ালী স্কুলে মঞ্চস্থ করে।

৫ই এপ্রিল ১৯৬০। 'তাসের দেশ' অধ্যাপিকা ডাঃ নীরা চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় শিক্ষাবিভাগের উদ্যোগে সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৩ই ও ১৪ই জুলাই' ৬০ 'বিসর্জন' সুধাংশু দত্তের পরিচালনায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২৯শে এবং ৩০শে জুন' ৬০ 'তপতী' (রাজা ও রানী) শ্যামল চৌধুরীর পরিচালনায় কালচারাল ইউনিট উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১০ই মে' ৬০ 'পেটে পিঠে' চিলড্রেনস ক্লাব মঞ্চস্থ করে। এরা 'রোগের চিকিৎসা-ও' মঞ্চস্থ করে।

১৭ই জুন' ৬০ 'মুকুট' রানী করের পরিচালনায় মেলার মাঠের শিশুদের নিয়ে ওখানে মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

৯ই মে' ৬০ 'কর্ণ কুন্তী সংবাদ'। কুলাই হাইস্কুল, স্কুল প্রাঙ্গনের মুক্ত মঞ্চে অভিনীত হয়।

১৯৬০ সালেই 'শ্যামা' রাণাডাহাল জং ও মাধুরী রাণা-র যুগ্ম পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পী সংহতি তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬০ সালে 'জুতা আবিষ্কার' মৃণাল চক্রবর্তীর পরিচালনায় শিশু মহলের উদ্যোগে রবীন্দ্রপল্লীর মুক্তমঞ্চে অভিনীত হয়।

১৮ই নভেম্বর' ৬০ 'নটীরপূজা' তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ স্কুল ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১লা জুন' ৬১— 'ছুটি' সুধীন আচার্যর পরিচালনায় সবুজসাথীর উদ্যোগে উমাকান্ত একাডেমীর হলে মঞ্চস্থ হয়। নাট্যরূপ সুধীন আচার্য।

২৯শে মে' ৬১—'বির্সজন' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় রবীন্দ্র শতবর্ষ উৎসবে ত্রিপুর শিল্পায়তন উমাকান্ত একাডেমীর মুক্তাঙ্গনে অভিনীত করে।

২০শে মে, ৩রা ও ৪ঠা জুন এবং ৮ই জুলাই' ৬১, 'বিসর্জন' বারীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় রসচক্রের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে বড়দোয়ালীর কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই জুলাই, ১০ই জুলাই' ৬১ 'বিসর্জন' সুধাংশু দত্তর পরিচালনায় বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী জ্ঞানমন্দির প্রগতি বিদ্যাভবনে মঞ্চস্থ করে। সঙ্গীতাংশে নবদ্বীপ দেববর্মা।

৭ই এবং ১১ই মে' ৬১—'চিরকুমার সভা', কালচারাল ইউনিট সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসবে রবীন্দ্র নাটক

২২শে বৈশাখ ৫ই মে' ৬১ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এম বি বি কলেজের ছাত্রবৃন্দ কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে বৈশাখ ৬ই মে' ৬১—'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য এম. বি. বি. কলেজের ছাত্রীগণ কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

২৪শে বৈশাখ ৭ই মে' ৬১—'চিরকুমারসভা' কালচারাল ইউনিট সাহিত্যবাসরের উদ্যোগে সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৫শে বৈশাখ ৮ই মে' ৬১—'ডালিয়া', নাট্যরূপ বুদ্ধদেব বসু, নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্ররা সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।
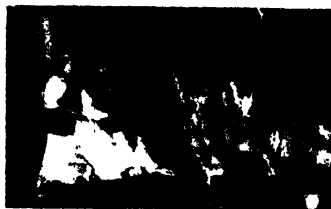
তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়
ছাত্রীবৃন্দের রবীন্দ্রনাটকের একটি দৃশ্য

২৯শে বৈশাখ ১২ই মে' ৬১—'রাজা রানী' তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩০শে বৈশাখ ১৩ই মে' ৬১—'মালিনী' মহাত্মাগান্ধী স্কুল, স্কুলমঞ্চে অভিনয় হয়।

৩১শে বৈশাখ ১৪ই মে' ৬১—'শারদোৎসব' উমাকান্ত একাডেমীর ছাত্ররা একাডেমীর মধ্যে অভিনয় করে।

২রা জৈষ্ঠ ১৬ই মে' ৬১ 'পেটে ও পিঠে' ১নং নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩রা জৈষ্ঠ ১৭ই মে' ৬১—'ডাকঘর' বিজয়কুমার উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩রা জৈষ্ঠ ১৭ই মে' ৬১ 'বীরপুরুষ' ৪নং বুনিয়াদী বিদ্যালয় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩রা জৈষ্ঠ ১৭ই মে' ৬১ 'মুকুট' বোধজঙ্গ বিদ্যালয় বিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৪ঠা জৈষ্ঠ ১৮ই মে' ৬১—'নকলগড়' প্রগতি বিদ্যাভবনের ছাত্ররা বিদ্যালয় মধ্যে অভিনয় করে।

৫ই জৈষ্ঠ ১৯শে মে' ৬১ 'মালিনী' বাণী বিদ্যাপীঠ উমাকান্ত একাডেমী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১০ই জৈষ্ঠ ২৪শে মে' ৬১ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য সঙ্গীতভারতী উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই জৈষ্ঠ ২৭শে মে' 'ডালিয়া' ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালক শক্তি হালদার।

১৫ই জৈষ্ঠ ২৯শে মে' ৬১ 'বিসর্জন' ত্রিপুরেশ মজুমদারের পরিচালনায় ত্রিপুর শিল্পায়তন কর্তৃক উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৫ই ও ৬ই আগষ্ট' ৬১ 'বিসর্জন' শিবদাস ব্যানার্জীর পরিচালনায় শিল্পায়নের উদ্যোগে সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

২৬শে মে' ৬১ 'জুতা আবিষ্কার'। নাট্যরূপ মৃণাল চক্রবর্ত্তী। পরিচালনায় ডাঃ প্রভাস দাশগুপ্ত। শিশুমহল ত্রিপুরা আঞ্চলিক পরিষদের উদ্যোগে উমাকান্ত একাডেমী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২০শে আগষ্ট ৬১ তে 'মুক্তধারা' আগরতলার ভারতীয় জীবনবীমা করপোরেশন সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।

বড় দোয়ালী স্কুল রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একগুচ্ছ অনুষ্ঠান করে এতদ্ব্যতীত, ১৯৭৭-পর্যন্ত অভিনয় হয়, তার একটি আংশিক তালিকা দেওয়ার চেষ্টা করা হলো ঃ

১৩ই মে' ৬১—'নটীর পূজা' ছাত্রীবৃন্দ দ্বারা স্কুল ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই মে' ৬১—'ডাকঘর' ছাত্রবৃন্দ দ্বারা অভিনীত হয়।

১৪ই মে' ৬১—'মুকুট' একাদশ শ্রেণীর ছাত্ররা অভিনয় করে।

১৭ই মে' ৬১—'হাস্যকৌতুক' ছাত্রবৃন্দ দ্বারা অভিনীত হয় কৃষ্টিভবনে।

২৬শে মে' ৬১—'সাক্ষী' প্রাক্তন ছাত্র ও শিক্ষকগণের দ্বারা অভিনীত হয় কৃষ্টিভবনে।

২৬শে মে' ৬১—বড় দোয়ালি স্কুলের পর এবার অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা। 'মুকুট' ভূপেন্দ্র চৌধুরীর পরিচালনায় মোহনপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ স্কুল প্রাঙ্গণের মুক্তমঞ্চে অভিনয় করে।

২৬শে মে' ৬১—'ছুটি' নাটকটি শিশুমহল উমাকান্ত একাডেমীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১১ই মে' ৬১—'চিত্রাঙ্গদা' কলকাতার সুরমন্দির সংস্থা এম. বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

২৫শে মে' ৬১—'চণ্ডালিকা' রসচক্র সংস্থা বড়দোয়ালী স্কুলের কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ করে।

৬ই মে' ৬১—'ঋতুরঙ্গ' সুবিমল রায় ও নির্মল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় কালচারাল ইউনিট সাবরুমে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬২ 'ডাকঘর' নাটকটি মোহনপুর উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ স্কুল প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

১০ই এবং ১১ই মে' ৬২—বির্সজনের ইংরেজী অনুবাদ SACRIFICE বারীন চ্যাটার্জীর পরিচালনায় শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই মে' ৬৩— 'প্রায়শ্চিত্ত' কুলাই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় মঞ্চে অভিনয় করে এবং
১১ই মে' ৬৩— 'ডাকঘর' কুলাই হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে।
১৩ই অক্টোবর' ৬৩—'রক্তকরবী' বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদ এম বি বি কলেজের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

১০ই জুলাই' ৬৩—'শাপমোচন', নৃত্যভানু রবীন্দ্রপরিষদের উদ্যোগে তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে জুলাই' ৬৩— 'বিসর্জন' আলোকময় দত্তর পরিচালনায় মোহনপুর সরকারী কর্মচারীবৃন্দ অফিস প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই মে' ৬৩ —'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্য সুনীল দের পরিচালনায় সোনামুড়া সমষ্টি

উন্নয়ণসংস্থা ব্লক অঞ্চলে মঞ্চস্থ করে।

৬ই মে'৬৪— 'রক্তকরবী' বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর পরিচালনায় ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৩শে মে'৬৫— 'রথের রশি' এল, আই সি রিক্রিয়েশন ক্লাব সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ করে।

১লা জানুয়ারী ১৯৬৬ 'গান্ধারীর আবেদন' বিজন চৌধুরী, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, দীনেশ দাস, বনশ্রী চৌধুরীর পরিচালনায় মহারাজ বীরবিক্রম কলেজের ছাত্রসংসদ রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

১লা মে'৬৬ 'কালমৃগয়া' নৃত্যনাট্য অমিয়মুকুল দের পরিচালনায় ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদ রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই অক্টোবর' ৬৬--- 'মুকুট' অশোককুমার দত্তর পরিচালনায় দ্বারিকাপুর নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ করে।

৪ঠা জুন'৬৭--- 'বিসর্জন' রামনগবের পঞ্চপ্রদীপ ১ম নিঃ ত্রিঃ নাট্য প্রতিযোগিতায় মিউজিক কলেজ মঞ্চে মঞ্চস্থ করে।

২রা অক্টোবর ১৯৬৭— 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্য রাজলক্ষী দেবীর পবিচালনায বিজয়কুমার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৭ সালেই 'বৈকুন্ঠের খাতা' মহারাজা বীরবিক্রম কলেজের ছাত্রসংসদ তাদের রবীন্দ্র হলে মঞ্চস্থ করে।

১২ই মে'৬৭— 'রাজা ও রানী' শ্যামল ভট্টাচার্যর পরিচালনায় শিশু শিল্পী গোষ্ঠী দ্বারা যোগেন্দ্রনগরের মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

১৪ই মার্চ'৬৭— 'চিত্রাঙ্গদা' বোধজঙ্গ স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ অভিনীত। মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে।

১২ই মার্চ'৬৭— 'শাপমোচন' তুলসীবতী বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই মার্চ '৬৭—'শ্যামা' নৃত্যনাট্য বিজয়কুমার বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৫ই মার্চ'৬৭—'দালিয়া' নাটক 'নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছাত্রীগণ তাদের সংস্কৃতিভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৮ সালে 'বৈকুন্ঠের খাতা' সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় কৈলাশহর আর কে ইনসটিটিউশনের ছাত্ররা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৮ সালেই 'দালিয়া' (নাট্যরূপ বুদ্ধদেব বসু), আগরতলা মহিলা কলেজের ছাত্রীবৃন্দ মহিলা কলেজ হলে মঞ্চস্থ করে।

১৭ই এবং ১৮ই আগষ্ট' ৬৮— 'অচলায়তন' ইউনিভার্সাল প্রাউটিষ্ট স্টুডেন্টস ফেডারেশন তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৩০শে মার্চ ৬৮ 'শেষরক্ষা' অধ্যাপক প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল এবং রণজিৎ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় বিলোনীয়া কলেজ হলে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই মার্চ' ৬৯—'শাস্তি' উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্রগণ একাডেমীর ৮০ বছর পূর্ত্তিউৎসবে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

১৯৬৯— 'শোধবোধ' নাটকটি মহিলা কলেজের ছাত্রীসংসদ মহিলা কলেজে মঞ্চস্থ করে।

৯ই মার্চ' ৭০— 'শাস্তি', নাট্যরূপ বীরু মুখোপাধ্যায়, অজিত মজুমদারের পরিচালনায় উমাকান্ত একাডেমীর আশীবর্ষপূর্তি কমিটির উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। পরে নাটকটি কৃষ্টিগোষ্ঠির উদ্যোগে বাঙ্গালোরে যায়।

১৯৭০-এ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' সুধীরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় কাঞ্চনবাড়ী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়। ১২ই জুলাই নাটকটি পুনরায় মঞ্চস্থ হয়। এই বছরেই 'মুক্তিরউপায়' নাটকটিও ওঁরা মঞ্চস্থ করেন।

১২ই এপ্রিল' ৭০ নাট্যশিল্পী সংসদ দুটি রবীন্দ্র নাটক মঞ্চস্থ করে সরকারী সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে, নিষ্কৃতি এবং পোষ্টমাষ্টার। অজিত মজুমদারের পরিচালনায়।

১২ই জুলাই'৭০— 'শাস্তি' অজিত মজুমদারের পরিচালনায় কৃষ্টিগোষ্ঠীর উদ্যোগে বিবেকানন্দ রেন্টার্স কলোনীর উন্নয়ণের জন্য অভিনীত হয়।

২০শে আগষ্ঠ'৭২— 'বিসর্জন' নাটক। ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পুতুলনাচ শাখা রবীন্দ্র শতবার্ষিকীভবনে মঞ্চস্থ করে ২৫তম স্বাধীনতা জয়ন্তী উৎসবে।

২৭শে সেপ্টেম্বর'৭২— 'রাজা' নাটকটি বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর পরিচালনায় রবীন্দ্র পরিষদ রঙ্গমের নাট্যমেলায় মঞ্চস্থ করে।

৮ই মে' ৭২ 'নটীরপূজা' প্রদিতি ভট্টাচার্য ও বড়দোয়ালীর মাণিক চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় কুলাই উচ্চতরমাধ্যমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ করে।

৯ই মে'৭২ 'বৈকুণ্ঠের খাতা' বড়দোয়ালীর মানিক চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় কুলাই উচ্চতরমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ হয়।

২২শে আগষ্ট' ৭২ 'চণ্ডালিকা' বিজয়কুমার উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকাগণ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করেন।

৫ই মার্চ' ৭২ 'বির্সজন' প্রচার বিভাগ বড়জলায় মঞ্চস্থ করে।

২৪শে নভেম্বর' ৭২ 'বিসর্জন'। ত্রিপুরা সেক্রেটারিয়েট ড্রামা ট্রুপ ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরীর পরিচালনায় ত্রিপুরার শিল্পীদের নিয়ে সম্মিলিত ভাবে আমেদাবাদের টেগর মেমোরিয়াল অডিটরিয়ামে এই নাটক অভিনয় করে প্রতিযোগিতার অঙ্গ হিসাবে।

আমেদাবাদে ত্রিপুরার শিল্পীরা

১০ই এবং ১১ই মে' ৭৫ 'বাল্মীকি প্রতিভা' (রবীন্দ্র গীতিনাট্য) অর্কেষ্ট্রা সংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২৭শে এপ্রিল'৭৫ 'কালের যাত্রা' রঙ্গম সংস্থা তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

৫ই মার্চ' ৭৫ 'সামান্য ক্ষতি' নৃত্যনাট্য হিল্লোলগোষ্ঠী রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

২রা ও ৪ঠা জুলাই' ৭৫ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য 'অর্কেষ্ট্রা' রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১০ই ও ১১ই মে' ৭৬ 'অভিসার', গ্রন্থনা নবেন্দু চৌধুরী, নবেন্দু চৌধুরীর পরিচালনায় অর্কেষ্ট্রা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৪ই জানুয়ারী' ৭৭। 'ক্ষুধিত পাষাণ', নাট্যরূপ সুধীরকুমার চক্রবর্তী, অরুণেন্দু বিকাশ রায়ের পরিচালনায় আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

আমেদাবাদে 'বিসর্জন'

আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতা ১৯৭২ সালে শেষ হোল। প্রতি বছর নাটক প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে কৃতীদের নিয়ে দল গড়ে সেক্রেটরিয়েট ড্রামা-গ্রুপ সারা ভারত সিভিল সার্ভিসেস ড্রামা কমপিটিশনে যোগ দেয়। এ বছর ঠিক হোল বিভিন্ন অফিসটিমের ভাল ভাল অভিনেতাদের নিয়ে সিভিল সেক্রেটরিয়েট ড্রামাট্রুপ গঠন করে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা হবে। সেই হিসাবে ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরীকে পরিচালক নির্বাচিত করা হয় এবং রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকটি করার সিদ্ধান্তগ্রহণ করা হয়। অভিনেতারা কে কোন চরিত্রে অভিনয় করবেন তা পরিচালক ঠিক করবেন। সেই মত গোবিন্দ মাণিক্য চরিত্রে নিখিল ভট্টাচার্য নির্বাচিত হলেন। রঘুপতি চরিত্রে শক্তি হালদার, গুণবতী হলেন সবিতা সিংহ রায়, জয়সিংহ—শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, অপর্ণা—ইরা গাঙ্গুলী, মন্ত্রী—ফনীভূষণ চক্রবর্তী, নক্ষত্র—মানস গাঙ্গুলী, নয়ন—তপেশ রায়, চাঁদপাল—অমরেন্দ্র রক্ষিত। অন্যান্য চরিত্রে গোপাল দে, পার্থ রায়, শিশির দেব, রণজিৎ ভৌমিক, চিন্ময় রায়, হীরা দে, রাখী রায়, রীনা দত্ত। প্রহরী—বেনুধর গোস্বামী, অজয় নন্দী, নীলিমা দাস।

সঙ্গীত—অমিয় দাস। রূপসজ্জা—হরেন্দ্র হালদার।

সহযোগী—কমলেশ ভট্টাচার্য। স্টেজ—নরেশ পোদ্দার এবং মনীন্দ্রনাথ দে।

স্মারক—রমাপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং সুবোধ দে।

বিসর্জন নাটকে রঘুপতির ভূমিকায় শক্তি হালদার [illegible] চক্রবর্তী
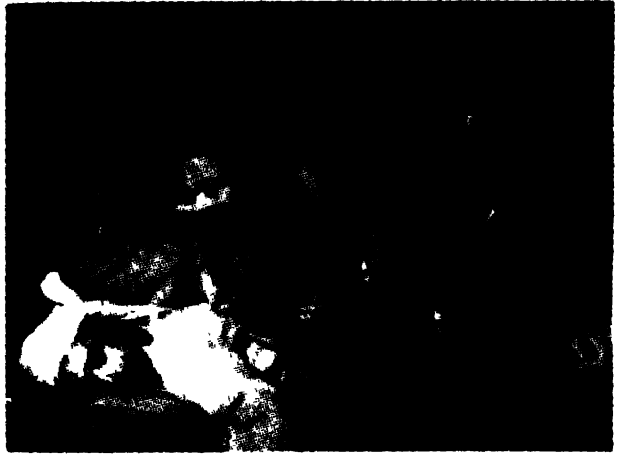
নাটকের মহলা থেকে পারস্পরিক দোষারোপ এবং শিল্পীরা বিভিন্ন সংস্থা থেকে আসায় দলাদলি চরম আকার ধারণ করে আগরতলা থেকেই। প্রতিযোগিতার স্থানে অভিনেতা শিল্পীদের মধ্যে সহমত না থাকায় যা হবার তাই হয়; একটি বিচ্ছিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়। পুরস্কার বিতরণের দিন দেখা যায় রঘুপতির ভূমিকায় শক্তি হালদার ছাড়া আর কেউ কোন পুরস্কার পেলেন না। এ এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন সেদিন সকল শিল্পীরা। রূপসজ্জায় হরেন্দ্র হালদার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ এই নাটকে করেছিলেন ; বহু পড়াশুনা করে বহু পরিশ্রম করে রাজারানীদের পোষাক নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন 'রাজমালা' দেখে। এখানে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখলে পাঠক বুঝবেন কি নিখুঁত কাজ তিনি করেছেন। নাটক শেষ হওয়ার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং আগরতলায় ফিরে এসে দু চার দিন পর তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। ত্রিপুরার নাট্যজগৎ এক দক্ষ রূপকারকে হারায়।

দক্ষ রূপকার হরেন্দ্র হালদার রূপসজ্জায় ব্যস্ত অভিনেতা শক্তি হালদারকে

বিসর্জন নাটকের দৃশ্যে বিভিন্ন চরিত্র

নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতা গোপাল দে
সংগঠনের নাম শিল্পীসংসদ

শিল্পীসংসদ আগে আর্টিস্ট এসোশিয়েসন নামে পরিচিত ছিল। আমরা এখানে এই দুটির প্রযোজনা তুলে ধরব। গোপাল দে-ই একমাত্র নাট্যকার পরিচালক এবং প্রযোজক যিনি দীর্ঘকাল ধরে নাট্যআন্দোলনে নিবেদিতপ্রাণ।

২৭শে অক্টোবর, ১৭ অক্টোবর ১৯৫৪। তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় রচিত 'কালিন্দী' নাটকটি চতুর্থবার অভিনয় করে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন 'নেতাজী সুভাষ' বিদ্যানিকেতনে মঞ্চ তৈরী করে। নাটকে নিত্যরঞ্জন দাস সঙ্গীত রচনা করেন এবং নিত্যরঞ্জন দাস ও রঞ্জিত ঘোষ সুরারোপ করেন। নাটকে পুরুষরা মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করেন।

২৬শে অক্টোবর বিধায়ক ভট্টাচার্য-র 'মাটির ঘর' নাটকটি নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে মঞ্চস্থ হয়। দুটি নাটক পরপর অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই মার্চ ৫৮ শিল্পীসংসদ নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে ভানু চট্টোপাধ্যায়ের 'আজকাল' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

১২,১৫ ও ১৯শে আগষ্ট ১৯৬৩। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর নাট্যরূপ উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

২৫, ২৬শে নভেম্বর '১৯৬৭। গৌরাঙ্গ ভদ্র রচিত 'কঙ্কাল' নাটকটি 'রাধামাধব মন্দির' প্রাঙ্গনে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই জুন '১৯৬৭। 'চারপ্রহর' নাটকটি ১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা নাট্যপ্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

২৭শে ডিসেম্বর ১৯৬৯। গোপাল দে রচিত এবং পরিচলিত নাটক 'ষড়বর্গ', ১ম বর্ষ আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

২৪শে অক্টোবর ১৯৭১। গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রক্তস্বাক্ষর' তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই জানুয়ারী ১৯৭২ গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'মহিমের সংসার' দ্বিতীয় আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে হেলথ সার্ভিসের পক্ষে।

১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২। গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রক্তস্বাক্ষর' আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

২১শে এপ্রিল ১৯৭৩। ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক "রামরাজত্ব" রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয় শিল্পীসংসদের উদ্যোগে।

২০শে অক্টোবর ১৯৭৪। গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'শেষ কোথায়' শিল্পীসংসদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৩ই জানুয়ারী ১৯৭৪। আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'অতীত ডাকে' অংশগ্রহণ করে।

১১ই জানুয়ারী ১৯৭৬। গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'মৃতের মিছিল' ৭ম আন্তঃঅফিস নাট্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

৬ই এবং ৮ই আগষ্ট ১৯৭৮। গোপাল দে রচিত নাটক 'মাতৃরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ' শিল্পীসংসদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। এটি তাঁদের ২৩-তম নাট্য প্রযোজনা।

১০ই এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ গোপাল দে রচিত নাটক 'বীরেশ্বর নরেন্দ্রনাথ' শিল্পী সংসদের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন—বিবেকানন্দ যুবমহামন্ডল, আগরতলা।

১৬ই এপ্রিল ১৯৭৯ গোপাল দে রচিত নাটক 'ভক্ত রামপ্রসাদ' শিল্পী সংসদের উদ্যোগে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। এটি সংসদের ২৫তম অর্ঘ।

ত্রিপুরেশ নাট্যমেলা, ১৯৭৩-তে শিল্পীসংসদ নিবেদন করে গোপাল দে রচিত নাটক 'রামরাজত্ব'। নাটকটির পরিচালক-ও তিনি নিজে। অভিনয়াংশে ছিলেন : নবকিশোর বণিক, প্রশান্ত দত্ত, বীরেন রায়, গোপাল দে, অনিতা চক্রবর্তী আলো ও শব্দ—হরিপদ দাস।

আবহ সঙ্গীত—বীরেন রায়, রূপকার—নরেশ পোদ্দার। নৃত্য পরিচালনা—হীরা দে। নাটকটির প্রযোজনা উচ্চ প্রশংশিত হয়।

* আন্তঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় সমস্ত নাটক হেলথ সার্ভিসেস এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

আর এক নাটক পাগল সুধীন আচার্য

সোজা সরল ভাল মানুষ নাটকের জন্য নাট্য প্রযোজনার জন্য অভিনয়ের জন্য কখনো কখনো ভাবান্তর দেখা গেলেও নিষ্ঠাবান নাটুকে সুধীন আচার্য। রূপারোপে এসেছিলেন জীবনের শেষপ্রান্তে, সদস্য হতে নয়, অভিনয়ে সহযোগিতা করতে। 'সীতা হরণে' চুটিয়ে অভিনয় করেছেন। সব দলের কিছু কিছু প্রযোজনা থাকে দারুন; সীতাহরণ এবং 'মহাকাব্য' রূপারোপের খুবই জনপ্রিয় প্রযোজনা। এখানে অভিনয় করে খুবই আনন্দ পেতেন সুধীন আচার্য। বড় মজার মানুষ তিনি। কিছুদিন দিল্লীতে ছিলেন। তারপর আগরতলায় আসেন। নাটকের পরিচালক হিসাবে প্রোগ্রামে লিখতেন সুধীন আচার্য (দিল্লী)। এ নিয়ে আমরা খুব মজা করতাম, রাগতেন না তিনি। হঠাৎই নাটক, জগৎ সংসার, সব কিছুর উর্ধে চলে গেলেন তিনি ১৯৭৭ সালে।

বিভিন্ন সংগঠনে তাঁর পরিচালিত নাট্য তালিকা

১-৬-৬১— রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি'। নাট্যরূপ সুধীন আচার্য। সংস্থা— সবুজ সাথী। 'গুরুদক্ষিণা' নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়।

২৯ এবং ৩০শে জুলাই 'শ্রেয়সী'। নাট্যকার দেবনারায়ণ গুপ্ত। সংস্থা—সঞ্চারী। মঞ্চস্থ হয় কৃষ্টিভবনে। ১৯৬২-তে 'যাত্রা হোল শুরু'। নাটক—অগ্নি আচার্য, সংস্থা-শিবাজী সংঘ।

১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬২ 'কিন্তু কেন'। সংস্থা সঞ্চারী। এবছর 'মুক্তিপথে' নবোদয় সংঘের উদ্যোগে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬৩ সালে শিল্পীচক্রের উদ্যোগে কৃষ্টিভবনে অনুষ্ঠিত হয় 'স্বীকৃতি' নাটকটি।

৭-৯-১৯৬৪তে 'মহাক্ষুধা' নাটকটি শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে সংস্কৃতি ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৫-৬-১৯৬৪তে 'শেষপ্রহর' নাটক শিল্পী সংগঠনীর প্রযোজনায় উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪। মানুষ নাটকটি শিল্পীসংগঠনীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

১১ই জুন ১৯৬৬ পার্থসারথি নাটক। ৩১শে অক্টোবর ১৯৬৪ এই নাটকটি শঙ্কর চৌমুহনীর পূজা কমিটির দ্বারা পুনরায় মঞ্চস্থ হয়।

১৮ই জুন ১৯৬৪ 'কুরুক্ষেত্রের পরে' নাটকটি কিশলয়ের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

৮ই অক্টোবর ১৯৬৫। ঐ নাটকটি শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে শঙ্কর চৌমুহনীর পূজাপ্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

৩রা জুন ১৯৬৫—'কেদার রায়' শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে রামনগর ৪নং রাস্তায় মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

'স্নেহের জয়' নাটকটি শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে ১০ এবং ১১ই জুন ১৯৬৫ উমাকান্ত ক্যাম্পাসে এবং ২২শে মে ১৯৬৬ মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়।

২২শে অক্টোবর ১৯৬৭ 'রাজা দেবি দাস' দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সহ-পরিচালক করে শঙ্কর চৌমুনীর পূজা-প্রাঙ্গণে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই আগষ্ট ১৯৬৮—'শোণিত তর্পন' সমষ্টি উন্নয়ণ প্রকল্পে শঙ্কর চৌমুহনীর পূজাপ্রাঙ্গণে মুক্তমঞ্চে মঞ্চস্থ হয়।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৭০—'কার দোষ' নাটকটি প্রজাতন্ত্র দিবসে কেন্দ্রীয় কারাগারে মঞ্চস্থ হয়।

৭ই জানুয়ারী ১৯৭২—'ফেরিওয়ালা' নাটক শিল্পম্‌এর প্রযোজনায় রবীন্দ্র -ভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৩ 'নিকটে ফাঁদ' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭৪তে 'ওদের রাখবো কোথায়' শিল্পম-এর প্রযোজনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

কৃষ্টি গোষ্ঠী

১১ই মার্চ ১৯৬২। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'মহরাজ নন্দকুমার', হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় বড় দোয়ালীর কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই এবং ১২ই মার্চ সলিল সেন রচিত 'ডাউন ট্রেন' নাটকটি পি.এন. চ্যাটার্জীর পরিচালনায় মুখ্যমন্ত্রীর ক্যান্সার তহবিলের সাহায্যার্থে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬৭। কিরণ মৈত্রর 'বারো ঘণ্টা' নাটকটি হরেন্দ্রকিশোর দেববর্মার পরিচালনায় আন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায় মিউজিক কলেজে মঞ্চস্থ হয়।

৯ই অক্টোবর ১৯৬৭। রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সকালের জন্য' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬৫ সনে কৃষ্টি গোষ্ঠীর প্রথম নাটক 'সর্পিল'।

ত্রিপুরা পুলিশ ক্লাবের উল্লেখযোগ্য নাটক

২রা ও ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৬ 'মেঘমুক্তি' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

১২ এবং ১৩ই নভেম্বর ১৯৫৮ মহেন্দ্র গুপ্তর 'কালপুরুষ' নাটক বড়দোয়ালী স্কুলে অনুষ্ঠিত হয়।

২৩শে নভেম্বর ১৯৫৯। বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'ক্ষুধা' সুধাংশুমোহন দত্ত-র পরিচালনায় বড়দোয়ালী স্কুলে মঞ্চস্থ হয়।

১৯শে নভেম্বর, ১৯৬০ ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'এক পেয়ালা কফি' নাটকটি কৃষ্টিভবন বড় দোয়ালী-তে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৬১ সালে 'মমতাময়ী হসপিটাল নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। এ সময় থেকে ত্রিপুরা পুলিশ ড্রামাটিক ক্লাব নামাকরণ' হয়।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৬২ বিধায়ক ভট্টাচার্যর 'মাটির ঘর' নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়।

৭ই এবং ৮ই নভেম্বর ১৯৬৪। শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র রচিত নাটক 'কাঞ্চনরঙ্গ' অভিনীত হয়।' শিল্পী স্বদেশ পাল, শ্যামল চৌধুরী, ইরা ব্যানার্জী নাটকে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৯ সালে ব্রজেন্দ্রকুমার দে রচিত নাটক 'বর্গী এলো দেশে' সংহতি নাট্যসংস্থার শিল্পীগণ ত্রিপুরা আরক্ষা বাহিনীর উদ্যোগে অরুন্ধতীনগর পুলিশ লাইনে দীপান্বিতা উৎসবে অভিনয় করেন। পরিচালক—সুধীন আচার্য।

ঘরোয়া

১০ই জুন ১৯৭২। কবি গুরুর ছোটগল্প অবলম্বনে নাটক 'শাস্তি', (নাট্যরূপ বীরু মুখ্যোপাধ্যায়)। অজিত মজুমদারের পরিচালনায় কৃষ্টিভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১১ই জুলাই ১৯৭২। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সওদাগরের নৌকা' অজিত মজুমদারের পরিচালনায় সরকারী মিউজিক কলেজে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭১-এর ২রা মে অজিত মজুমদার রচিত 'জয় বাংলা' তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। নাটকটি ২৪শে এপ্রিল প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

৮ই মার্চ ১৯৭৪ মোহিত চট্টপাধ্যায়ের 'বাঘবন্দী' নাটকটি অজিত মজুমদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

১০ই এপ্রিল ১৯৭৬ মনোজ মিত্রর 'টাপুর টুপুর' এবং সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরি' একাঙ্ক নাটক দুটি অজিত মজুমদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয় ত্রিপুরেশ মজুমদারের স্মৃতিচারণে।

লোকশ্রী

ত্রিপুরার প্রখ্যাত লোকসঙ্গীতশিল্পী অমিয় দাস। বিখ্যাত আধুনিকসঙ্গীতশিল্পী অরুন্ধতী হোমচৌধুরী জীবনে প্রথম নাড়া বাঁধেন এই অমিয় দাসের কাছে। এখানেই তাঁর গোড়াপত্তন।

রূপারোপের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অমিয় দাস। রূপারোপের সঙ্গে তাঁর ছিল গভীর সম্পর্ক। রূপারোপ, অন্বেষক, শিল্পতীর্থ, মুক্তধারা এবং অন্যান্য অনেক সংস্থা অমিয় দাসের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। শিল্পী বলতে যা বোঝায় অমিয় দাস তাই—সকলের প্রতি সহযোগিতার হাত তাঁর প্রসারিত। তাঁর নিজের সংস্থা 'লোকশ্রী'; মূলত সঙ্গীত প্রধান প্রযোজনা এই সংস্কার। ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ-এর বিখ্যাত নাটক যেমন 'মারীচ সংবাদ' তেমনি লোকশ্রীর বিখ্যাত নাটক পল্লীসঙ্গীতপ্রধান 'নক্সি কাঁথার মাঠ'। বহুবার অভিনীত হয়েছে এই নক্সি কাঁথার মাঠ। 'মহুয়া' নৃত্যনাট্য আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান।

২৬শে অক্টোবর '৭০ অন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায় লোকশ্রী ''নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র—'' (লিউইজি পিরানদেলো' রূপান্তর রুদ্রপসাদ সেনগুপ্ত) সবিতা মজুমদারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে।

অভিনয়ের অংশগ্রহণ করেন অজিত মজুমদার, সবিতা মজুমদার, রঞ্জিতা মজুমদার, যাদব মুখোপাধ্যায়, তিমিরবরণ ঘোষ, রিক্তা সিংহ রায়, অমল ভৌমিক, রাসবিহারী সাহা, আশীষ মোদক, নিভা মজুমদার, রিক্তা সিংহ রায়।

সহযোগিতায়— : ডঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ, বিষ্ণুপদ রায়, প্রদ্যোৎ সিংহ রায়, মাখন দেব, সুবীর দাস, সলিল দেববর্মা, শিশু সেন।

সঙ্গীত পরিচালনা—অমিয় দাস। রূপসজ্জা—সুবীর দাস, আলো ও শব্দ—পবিত্র ভট্টাচার্য।

ত্রিপুরার সাহিত্য সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যার নাম সর্বাগ্রে
ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ

২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটক 'রাজা' রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি 'নাট্যমেলা'তে উপহার দেয় ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদ।

মঞ্চ সাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মধ্যে 'বৈকুণ্ঠের খাতা', 'চিরকুমারসভা' ইত্যাদি হয়তো অনেক বেশী সফল, কিন্তু রবীন্দ্রনাট্য বলতে যে বিশেষ প্রয়োগরীতি বোঝায় তা ঐ নাটকগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 'রক্তকরবী', 'রাজা' প্রভৃতি প্রতীকধর্মীনাটক প্রয়োগরীতির দিক থেকে প্রকৃত অর্থে রাবীন্দ্রিক। এ ধরণের নাটকের প্রয়োগে বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জার প্রয়োজন পড়ে না, চেষ্টাটাই বরঞ্চ বেসুরো ঠেকে। "আমার ধর্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ ক্রমে রাজা নাটকের যে-আলোচনা করেছেন, তা হোল—

রবীন্দ্র পরিষদের এক অন্যতম কর্ণধার বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী

"রাজা নাটকে সুদর্শনা আপন স্বরূপ রাজাকে দেখাতে চাইলে। রূপের মোহে মুগ্ধ হয়ে ভুল রাজার গলায় মালা দিলে, তারপরে সেই ভুলের মধ্যে দিয়ে পাপের মধ্যে দিয়ে যে অগ্নিদাহ ঘটালে, যে বিষম যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে যে ঘোরে অশান্তি জাগিয়ে তুললে তাতেই তো তাকে সত্য মিলনে পৌছিয়ে দিলো। প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টির পথ। তাই উপনিষদে আছে তিনি তপের দ্বারা তপ্ত হয়ে এই সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন। আমাদের আত্মা যা কিছু সৃষ্টি করেছে তাতে পদে পদে ব্যথা। কিন্তু তাকে যদি ব্যথাই বলি তবে শেষ কথা বলা হোল যা, সেই ব্যথাতেই সৌন্দর্য, ততই আনন্দ।"

এই নাটকের অভিনয়ে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছেন—শেলী মুখার্জী, শর্মিলা দেববর্মা,

বামাপদ মুখোপাধ্যায়, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, অজিত চক্রবর্তী বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, নরেশ দাশ, দীনেশ দেবনাথ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, জলধর মল্লিক, আবদুস সালাম মল্লিক, প্রমথেশ দেবরায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, সুকুমার দাস, সরোজ চৌধুরী, সমরেন্দ্র রক্ষিত, অজয় নন্দী, অমিতাভ আইচ, নরেন দাস।

পরিচালক ঃ বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রপরিষদ অনেক নাটক মঞ্চস্থ করেছে। অবশ্য রবীন্দ্র নাটক। বার্ষিক সাহিত্য মেলায় ছোটদের নাটকের উৎসবের মত করেছে প্রতিবছর। ঘরোয়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রুতিনাটক করেছে অনেক অনেক।

তাঁদের প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল :

১৩ই অক্টোবর ১৯৬৩। রক্তকরবী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্র হল, এম.বি.বি. কলেজে অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য। ৬ই মে ১৯৬৪ পুনরাভিনয়।

১০ই জুলাই ১৯৬৩। রবীন্দ্রনাথের 'শাপমোচন'। পরিষদের শাখা নৃত্য ভানুর উদ্যোগে মহারাণী তুলসীবতী ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয়।

১লা মে ১৯৬৬ রবীন্দ্রনাথের 'কালমৃগয়া', পরিচালক অমিয়মুকুল দে। রবীন্দ্রহলে অনুষ্ঠিত হয়।

৫ই জানুয়ারী ১৯৭৫। 'চেয়ার' একাঙ্ক নাটক জলধর মল্লিকের পরিচালনায় পরিষদ গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এই একাঙ্ক নাটক নতুনত্বের দাবী করে।

ত্রিপুরা রবীন্দ্রপরিষদের নাটক

ডঃ সুখময় ঘোষ

১৯৬৩ : রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের 'রবীন্দ্র হল'। মঞ্চ পরিচালক বামাপদ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে বামাপদ, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য চিত্তরঞ্জন গোস্বামী, সবিতা মজুমদার, সরোজ চৌধুরী, অসিতাভ আইচ, সুখময় ঘোষ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, কৃষ্ণা পোদ্দার, ভারতকুমার রায়, সুকুমার দাস প্রমুখ।

১৯৭২ : রবীন্দ্রনাথের 'রাজা'। 'রঙ্গম' আয়োজিত নাট্যোৎসবে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে রবীন্দ্রপরিষদের নাটক। পরিচালনা বামাপদ মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে— বামাপদ, আবদুস সালাম মল্লিক, শেলী

মুখোপাধ্যায়, জলধর মল্লিক, সুখময় ঘোষ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, ভারতকুমার রায় প্রমুখ।

১৯৭৮ : সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল'। নাট্যরূপ—ড. জলধর মল্লিক ও ডঃ সুখময় ঘোষ। মহারাজা বীর বিক্রম কলেজের 'রবীন্দ্র হল' মঞ্চ। পরিচালনা ডঃ সুখময় ঘোষ, অভিনয়ে শিশুরঙ্গমহলের শিল্পীবৃন্দ, যথাক্রমে রুচিরা দুর্গাপ্রিয়, দেবায়ণ, আয়োদেশ, রাজশেখর, বোধিসত্ব, শুভ্র, মুন্নি, চম্পা, প্রমুখ।

১৯৭৯ : রবীন্দ্রনাথের নাটিকা 'বক্তৃতার বিপদ', উদীচীগৃহ। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা ডঃ সুখময় ঘোষ। অভিনয়ে—দেবায়ণ, দুর্গাপ্রিয়, শুভ্রজ্যোতি, ববি, সুমন, বোধিসত্ব, মধুজা, অলকানন্দা, মিঙ্কি, সোমদেব প্রমুখ।

১৯৮১ : রবীন্দ্রনাথের 'অচলায়তন'। রবীন্দ্রভবন মঞ্চ। পরিচালনায় ডঃ সুখময় ঘোষ। অভিনয়ে—সুদেষ্ণা, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, ভারতকুমার রায়, সুখময় ঘোষ, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, নীরেন্দ্র দাস প্রমুখ।

১৯৮২ (১) জলধর মল্লিকের একক নাটক বঙ্কিমচন্দ্রের 'মুচিরাম গুড়'।

(২) রবীন্দ্ররচনা অবলম্বনে শিশুরঙ্গমহলের নাটিকা 'গেছোবাবা', নাট্যরূপ ও পরিচালনা—ডঃ সুখময় ঘোষ, অভিনয়ে জিষ্ণু, দেবায়ন, বোধিসত্ত্ব, দুর্গাপ্রিয় প্রমুখ।

১৯৮৩ : সুকান্ত রচনা অবলম্বনে 'ষাঁড়-গাধা-ছাগল কথা'। নাট্যরূপ ও নির্দেশনা ডঃ সুখময় ঘোষ। অভিনয়ে—ববি, মধুজা, শঙ্খ, নীলেন্দু, সায়ন প্রমুখ। ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ ও ড: সুখময় ঘোষের ক্রিয়াশীলতা এবং পরেও বহমান, অন্ততঃ ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু আমরা এখানেই থামছি।

আরাধনা এবং সুধীন দাশগুপ্ত

আরাধনা ২-১০-১৯৭৩ সালে 'চিতাভস্ম' নাটক দিয়ে যাত্রা শুরু করে। এর পর তারা প্রযোজনা করে ভূমিকম্পের পরে, পাথরের চোখ, হারাধনের দশটি ছেলে, দেবদাস (৭ রজনী)। সুধীন দাশগুপ্ত ছিলেন নাটকগুলির পরিচালক। খুবই উল্লেখযোগ্য পরিচালনা তাঁর। সংগঠন শক্তিও দারুণ। নাটক নিয়ে পড়াশুনা শুধু নয়, যথেষ্ট দখল ছিল। ১৯৭৯ সালে ১৮ই জুন-এ অবস্থিত ময়না দ্বীপের রূপকথা ও ফুলগুলি সরিয়ে নাও উচ্চাঙ্গের প্রযোজনা। তবে সংস্থা বদল হয়েছে, এবারে উদ্যোক্তা থিয়েটার আর্ট।

নূতন পথের সন্ধানে ।। নাট্য সংস্থা 'রূপম্'

ত্রিপুরায় নাট্যআন্দোলনে রূপম একটি উল্লেখযোগ্য নাম। ১৯৬৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর রূপম নাট্যসংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম উদ্যোগ সুবোধ দে এবং শিশির দেব নিয়েছেন। তাঁদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে একে একে যোগ দেন মানস গাঙ্গুলী, বিশু সেন, শশাঙ্ক চক্রবর্তী, চিন্ময় রায়, ইরা ব্যানার্জী, আরো অনেকে। রূপমের পরিচালক সুবোধ দের নাট্যচর্চার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাবোধের কঠোরতার কারণে তাদের বেশীরভাগ নাটক দর্শকদের গভীর আস্থা অর্জন করতে পেরেছে। আসলে কলকাতার ছন্দক নাট্যগোষ্ঠীর সক্রিয় সদস্য ১৯৬৭ সালে চাকরী নিয়ে আগরতলায় আসার পর অভিনয়ের নেশা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। সেই প্রচণ্ড মানসিক যন্ত্রণা রূপম প্রতিষ্ঠার পিছনে কাজ করেছিল। ফলে ১৯৭৪ পর্যন্ত ত্রিপুরার নাট্যপ্রেমীরা পেল সতেরটি নাটক। আগরতলার নাট্যআন্দোলনে অংশ নিয়ে তাদের প্রথম নাটক 'এক বায়সঃ কথা' (রচনা ভবাণী ভট্টাচার্য, নির্দেশনা সুবোধ দে) ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। এরপর ১৬ই জুন ১৯৬৮ 'প্রতিনিধি' (নাট্যকার জগদীশ চক্রবর্ত্তী, পরিচালনা সুবোধ দে) তুলসীবতী হলে অনুষ্ঠিত হয়। ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৯ সালে নাট্যকার রবীন্দ্র ভট্টাচার্য রচিত 'কালো মাটির কান্না' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতী হলে। বিমল রায় রচিত 'অভিনয়' নাটকটি সুবোধ দের নির্দেশনায় তুলসীবতী হলে ঐ ৬ই জানুয়ারী ১৯৬৯-এ অনুষ্ঠিত হয়। নোরা ব্যাটক্লিফ রচিত উই গট্ রিদম্ নাটকটি (রূপান্তর অমিয় মিত্র) সুবোধ দে-র পরিচালনায় ২৪শে জানুয়ারী ১৯৭০ প্রথম অভিনীত হয়। এই দিনেই শেখর চট্টোপাধ্যায় রচিত 'প্রতিধ্বনি' নাটকটি সুবোধ দের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ তুলসীবতী হলে অনুষ্ঠিত হয় 'ঈশ্বর বাবু আসছেন', (Beckett-এর Waiting for Godot, রূপান্তর প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়)। এই দিনই 'বাগ্‌দী পাড়া দিয়ে' (কাহিনী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যরূপ মিহির চট্টোপাধ্যায়) সুবোধ দের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। এরপর ১১ই জুলাই তুলসীবতীর হলে মঞ্চস্থ হয় বিমল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'এরা কারা' নাটকটি, পরিচালনায় সুবোধ দে। লিউইজি পিরানদেলও রচিত নাটক Henry the IV, (রূপান্তর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্দেশনা সুবোধ দে), তুলসীবতী হলে ১৩ই আগষ্ট ১৯৭২ মঞ্চস্থ হয়। ইন্দ্র উপাধ্যায় রচিত 'টেরোড্যাকটিল নাটকটি সুবোধ দে-র পরিচালনায় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে ১লা অক্টোবর ১৯৭২ অভিনীত হয়।

১৯৭৩-এর ১৬ই এপ্রিল বসন্ত ভট্টাচার্য রচিত নাটক 'পরাজিত পৃথিবী' দীপেন্দ্রকুমার দাসের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে প্রথম মঞ্চস্থ হয়। এই দিনই আন্তন চেখভ রচিত নাটক "নানা রঙের দিন" সুবোধ দের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। মোহিত চট্টপা'ধ্যায় রচিত "রাজরক্ত" নাটকটি ১৫ই জুলাই ১৯৭৩ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনা

করেন সুবোধ দে।

বাদল সরকার রচিত নাটক 'সারারাত্তির' মানস গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ৮ই জুন ১৯৭৪ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। ১৯৭৪ সালের ২৭শে জুলাই মোহিত চট্টপাধ্যায় রচিত 'ক্যাপ্টেন হুররা' নাটকখানি সুবোধ দে-র পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। বাদল সরকার রচিত "এবং ইন্দ্রজিত" নাটকটি সুবোধ দের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

এই পর্যন্ত বিভিন্ন নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুবোধ দে, মানস গাঙ্গুলী, অরুণেন্দুবিকাশ রায়, চিন্ময় রায়, বিশু সেনগুপ্ত, যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশিস মোদক, শিশির দেব, অসীম দত্তরায়, শশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, দীপেন্দ্রকুমার দাশ, সুশীল ভৌমিক, অমল চ্যাটার্জী, অসীম চক্রবর্তী, প্রবোধলাল রায়, পার্থপ্রতিম দেব, চিত্ত দাস, অচিন্ত্য ঘোষ রায়, সুহাস চক্রবর্ত্তী, তরুণ চক্রবর্ত্তী, নারায়ণ বণিক, বিকচ চৌধুরী, গুড়াকেশ মুখার্জী, কানন গোস্বামী, অশোককুমার দে, দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, দীপক চ্যাটার্জী, স্বপন চৌধুরী, সুভাষ চ্যাটার্জী, নারায়ণ দত্ত, কৃষ্ণ দেবনাথ, দেবব্রত ব্যানার্জী।

নারী চরিত্রে অভিনয় করেছেন— নীলিমা দাস, রেখা ভট্টাচার্য, গৌরী বণিক, ইরা গাঙ্গুলী, গৌরী দেববর্মা, অনিতা চক্রবর্তী, পাপিয়া বসু।

রূপসজ্জায় ছিলেন চিন্ময় রায় এবং আলো ও শব্দ হরিপদ দাস। প্রথম দিকে মন্টু রায় রূপসজ্জায় ছিলেন, আলো ও শব্দ অমল ঘোষ। প্রথম দিকে প্রফুল্ল সেনগুপ্ত কোনো কোনো নাটকে রূপসজ্জায় অংশ নিয়েছেন।

যেহেতু আমাদের আলোচনা কাল ১৯৭৭ তাই ১৯৮০ সালের পর প্রযোজিত নাটকগুলি এখানে উল্লিখিত হোল না।

১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার কারণে নাট্য প্রযোজনা ব্যাহত হয়নি তা এই তালিকা থেকে বোঝা যায়। তবে কোনো কোনো সংস্থা প্রযোজনার ক্ষেত্রে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে এটাও ঘটনা। তবে সরকারী নীতি হিসাবে না দলীয় চক্রান্তে প্রযোজনা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে তা বলা বড় শক্ত। তবে নাট্য প্রযোজকদের কোনো ক্ষতি না হলেও দুজন প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক সরকারী কর্মী আগরতলা থেকে ত্রিপুরার পার্বত্য অঞ্চলে বদলী হয়ে গেলেন এটা সত্য। এঁরা হলেন পরিচালক চিত্রশিল্পী শক্তি হালদার, রূপারোপের স্তম্ভ এবং রূপমের জনপ্রিয় নাট্য পরিচালক সুবোধ দে। নাটক ক্ষতিগ্রস্ত হোল। 'রূপম' প্রসঙ্গে অভিনেতা পরিচালক মানস গাঙ্গুলী সম্পর্কে শ্রী শিশির দেবের একটি রচনার পূনর্মুদন এখানে বেমানান হবে না।

স্মৃতিপটে মানস গাঙ্গুলী ।। শিশির দেব

ষাটের দশকের মাঝামাঝি রূপম নাট্যগোষ্ঠী সবে জন্ম নিয়েছে আগরতলায়। একআধখানা নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে কি হয়নি। এমনি সময়ে কোনো একটি দিনে গোষ্ঠীর নির্দেশক সুবোধদা (দে) এসে বলল, "বোম্বে থেকে খুব ভাল একজন অভিনেতা আগরতলায় এসেছেন। আজ বিকেলে ওঁর সঙ্গে কথা হবে।" আমাদেরকেও থাকতে বললেন।

বিকেলে যথারীতি কথা হ'ল। কথা বলে অবাক লাগল। প্রথম পরিচয়, প্রথম আলাপ, কিন্তু বলতে দ্বিধা নেই যে খানিক্ষণ পরই মানস গাঙ্গুলী মানস দা' হয়ে গেলেন। সত্যি বলতে কি এত আন্তরিকতা ও সহজভাবে মানুষের সাথে মেশার ক্ষমতা খুব কম লোকের মধ্যেই দেখেছি। সেদিন থেকে মানসদা রূপমের সদস্য হয়ে গেলেন। আমৃত্যু তিনি রূপমের সদস্যই ছিলেন।

শ্যামলী বাজারে বসবাসের আগে মানসদা যতদিন নিজের বাড়ীতে ছিলেন, তার মধ্যে খুব কম দিন গেছে যেদিন আমরা মানসদার বাসায় অন্ততঃ রাত নটা অবধি কাটাইনি। আলোচ্য বিষয় অবশ্যই নাটক। তবে মাঝে মধ্যে সিনেমা কিংবা খেলাও থাকত। এটা সবারই জানা যে মানসদা খুব ভাল ক্রিকেট ও টেবিলটেনিস খেলতে পারতেন। আমার পরিচয় মানসদার সাথে যতটুকু তা নাটককে কেন্দ্র করে। মানসদার সাথে বহু বছর একটানা অভিনয় করেছি। আমার নির্দেশিত নাটকেও মানস গাঙ্গুলী অভিনয় করেছেন। সেই দিনগুলি আমার জীবনের চরম প্রাপ্তি।

মানসদা এত বড় মাপের অভিনেতা হওয়া সত্বেও তাঁর সাথে অভিনয় করতে গিয়ে কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়নি। এটা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র মানসদার এত বড় মাপের বিরাট শিল্পী মনের জন্যে।

অদ্ভুত একটা মুচকি হাসি মুখে লেগেই থাকত। এর পেছনে লাগছেন ওর পেছনে লাগছেন, বয়েসের কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু নাটকের রিহার্সাল করছেন কিংবা নাটকের আগে মেক্‌আপ নিচ্ছেন, তখুনি দেখা যাচ্ছে এ এক অন্য মানসদা। আমরাও তখন কথা বলতে ভয় পেতাম।

সেসময়ে রূপমের একটি নাটকের দৃশ্য

রূপমের রিহার্সাল রুমে বাইরের কারুর প্রবেশ

নিষিদ্ধ ছিল। নিদের্শক সুবোধদা সবাইকে গালিগালাজ করতেন রিহার্সালে। কাউকে মুখস্থ না করার জন্যে কিংবা কাউকে অভিনয় ঠিক না হওয়ার জন্যে। অভিনয় ঠিকমত হচ্ছে না বলে মানসদাকে সুবোধদা কোনদিন কিছু বলেছেন বলে জানা নেই। নাটকে চরিত্র বোঝার এবং তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার এক অসাধারণ ক্ষমতা ছিল মানসদা'র। তবে মানসদাকেও কথা শুনতে হত শুধুমাত্র পার্ট মুখস্থ না করার জন্যে। অদ্ভুত খেয়ালী লোক ছিলেন। দিনের পর দিন পার্ট মুখস্থ করতেন। সুবোধদা গালাগাল দিতেন পার্ট মুখস্থের জন্য। তারপর দেখা গেল দু-তিনদিন পরই পার্ট সব মুখস্থ কণ্ঠস্থ ঠোঁটস্থ। সুবোধদা মানসদার চাইতে বয়সে ছোট। কিন্তু গালিগালাজের সময় চুপ করে থাকতেন। কোনোদিন প্রতিবাদ করতে দেখিনি। শৃঙ্খলাবোধ এবং সম্মান প্রদর্শনের এক আশ্চর্য উদাহরণ মানসদা।

আগরতলায় যখন আমরা চুটিয়ে নাটক করতাম তখনকার মজার মজার ঘটনা আজও মনে পড়ে।

তুলসীবতী স্কুলে 'শের আফগান' নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। তখনও রবীন্দ্র ভবনে নাটক মঞ্চস্থ হতো না। মঞ্চে মানসদা, সুবোধদা, আমি, শশাঙ্ক এমনি আরো অনেকে এক সাথে হাজির কোনো একটা দৃশ্যে। হঠাৎ করে মানসদার উপরের পাটির একটা বাঁধানো দাঁত ছিট্‌কে মঞ্চে পড়ে গেল। মানসদা অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় এবং অভিব্যক্তিতে সে দাঁতটাকে মঞ্চ থেকে কুড়িয়ে তুলে মুখে লাগিয়ে নিলেন। ব্যাপারটা আমরাও বুঝতে পারিনি।

সত্যি বলতে কি মানসদা অভিনয় করতে যেমন আনন্দ পেতেন ঠিক তেমনি, কিন্তু অন্যান্য কাজে ঠিক ততটা উৎসাহবোধ করতেন না। অভিনয়টা তাঁর সহজাত গুণ। এটা কষ্ট করে অর্জন করা নয়। কত সহজে 'ক্যাপ্টেন হুররার 'গুগল্', চাক ভাঙা মধুর 'জটা' কিংবা 'রাজরক্তে'র সেই অসাধারণ চরিত্র চিত্রণ। 'ঈশ্বরবাবু আসছেন' নাটকের সেই অবিশ্বাস্য অভিনয়ের কথা কি কেউ ভুলতে পারে? যা হোক, যেটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা হ'লো, মানসদা চাইতেন কোনো দায় দায়িত্ব যেন তাঁর কাঁধে না পড়ে, তিনি শুধু চুটিয়ে অভিনয় করবেন। অথচ কি অদ্ভুত ক্ষমতা এবং দক্ষতা ছিল নাটকের সমস্ত বিভাগে। এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনা বলি।

খুব সম্ভবতঃ 'প্রতিনিধি' নাটক মঞ্চস্থ হবে তুলসীবতী স্কুলে। সেবারে মঞ্চের দায়িত্বে মানসদা। নাট্য নিদের্শক, মানসদা এবং আর যারা মঞ্চ তৈরীতে সহযোগিতায় আছেন সবারই সকাল নটায় তুলসীবতী স্কুলে হাজির হবার কথা। আমরা বলতাম, 'রূপম টাইম'—মানে আটটা বেজে উনষাট মিনিট ষাট সেকেণ্ডে সকাল ন'টা। আমি সেবারে মঞ্চের দায়িত্বে ছিলাম না। সকাল ১১টা নাগাদ স্কুলে গিয়ে দেখি সবাই বাইরে লনে বসে আছে। কী ব্যাপার? সুবোধদা বললেন, 'মানসদা আসেনি, আর কোন খবরও

পাঠায়নি'। সেদিনই সন্ধ্যা ছ'টায় 'শো', সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। সবাই চিন্তান্বিত। এমনটাতো হবার কথা নয়। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রশ্নে মানসদাও একনিষ্ঠ। তাহলে! সঙ্গে সঙ্গে সাইকেল নিয়ে সোজা মানসদার বাড়ী গেলাম। পৌঁছে দেখি বাড়ী নেই মানসদা। কোথায় গেছে কেউ জানে না। সাইকেল নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, কোথায় যাই, কী করি। স্কাই, উইংসের কাপড় যোগাড় হয়েছে কিনা কিছুই বুঝতে পারছি না। এগুলো মানসদার যোগাড় করার কথা ছিল। এমনি সময়ে হঠাৎ শুনলাম উমাকান্ত মাঠে দর্শকদের চিৎকার। খেলা হচ্ছে। কেন জানি না সোজা সেখানে গেলাম। গেলারীতে খুঁজছি যদি মানসদাকে পাই। হঠাৎ বন্ধুবর কমল সাহার সাথে দেখা। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, মানসদাকে দেখেছে কি না। সে বলল, কি ব্যাপার! ব্যাপার বললাম। তখন ও মাঠের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল ঐ দেখ্ মানসদা আম্পায়ার। তাকিয়ে দেখি তাই। ভাবতেই পারছি না ব্যাপারটা। তাকিয়ে আছি বোকার মত। হঠাৎ ওভার শেষ হবার পর মানসদা আমাকে দেখে দৌড়ে আমার কাছে এসে বলল—'শিশির, আজকের মঞ্চটা ম্যানেজ করে নাও।' আম্পায়ার না পেয়ে খেলাটা বানচাল হতে যাচ্ছিল। ওরা সকালে বাসায় গিয়ে এমনভাবে ধরল যে না করতে পারলাম না। আর স্কাই উইংসের কাপড় যার দেয়ার কথা, সে দেয়নি।' বলে মানসদা এক দৌড়ে মাঠে ঢুকে গেলেন আম্পায়ার হয়ে। সেবারে অনেক কষ্টে কাপড় যোগাড় করে তাড়াহুড়ো করে মঞ্চ তৈরী করে নাটক করতে হয়েছিল।

বিকালে নির্ধারিত সময়ে মানসদা এলেন একটু কাঁচুমাচু। সুবোধদার মুখোমুখি হচ্ছেন না। সুবোধদাও কথা বলছেন না। ঠিক সময়মত অভিনয় শুরু হল। চুটিয়ে অভিনয় করলেন।

পরের দিন গোষ্ঠীর আলোচনা সভা। শুরুতেই মানসদা ত্রুটি স্বীকার করে বক্তব্য রাখলেন এবং ভবিষ্যতে আর এধরণের ভুল হবে না অঙ্গীকার করলেন। সুবোধদার মত রাগী লোকও ঠাণ্ডা।

এই হচ্ছে মানসদা। কাউকে না করতে পারতেন না। একটু চেপে ধরলেই না হ্যাঁ-তে রূপ নিত।

শিশুর মত সরল এই এক বিরল নাট্য প্রতিভা ত্রিপুরার রঙ্গমঞ্চকে চিরকালের জন্যে (আমার বিশ্বাস) ফাঁকা করে দিয়ে গেল। আমি ধন্য তাঁর সান্নিধ্যে বহু বছর একটানা অভিনয় করতে পেরেছি বলে।

'মানসদা—এক বিরল নাট্য প্রতিভা'' (ত্রৈমাসিক 'পুষ্পাঞ্জলি'তে প্রকাশিত।)

আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন / শিল্পী সংসদ

১৯৫৪ সালে আর্টিষ্ট এসোসিয়েশন নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে স্টেজ বেঁধে অনুষ্ঠিত করেছিল তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' নাটক ২৭শে অক্টোবর। নাটকটি তাদের ৪র্থ অবদান। এই নাটকে সঙ্গীতশিল্পী নিত্যরঞ্জন দাশ সঙ্গীত রচনা করেন এবং সুর দিয়েছিলেন নিত্যরঞ্জন দাশ এবং রঞ্জিত ঘোষ। এরা এ বছর 'মাটির ঘর' (নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য) নেতাজী সুভাষ বিদ্যানিকেতনে মঞ্চস্থ করে।

আর্টিস্ট এসোসিয়েশান পরে শিল্পীসংসদ নামে ১২ই এবং ১৫ই আগষ্ট ১৯৬৩ বঙ্কিচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' নাটকটি উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ করে।

২৫শে এবং ২৬শে নভেম্বর ১৯৬৭ শিল্পী-সংসদ গৌরাঙ্গ ভদ্র রচিত 'কঙ্কাল' নাটকটি মঞ্চস্থ করে।

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭৩ স্থানীয় নাট্যকার গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'রামরাজত্ব' রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

শিল্পীসংসদের সদস্যদের সহযোগিতায় হেলথসার্ভিসেস রিক্রিয়েশন ক্লাব নাট্যকার গোপাল দের "অতীত ডাকে" নাটকটি তাঁরই পরিচালনায় ১৩ই জানুয়ারী ১৯৭৪, রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

সংসদ ২০শে অক্টোবর ১৯৭৪, গোপাল দে রচিত নাটক 'শেষ কোথায়' তাঁরই পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। এবছর আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'অতীত ডাকে' অংশগ্রহণ করে।

১১ই জানুয়ারী ১৯৭৬ গোপাল দে রচিত এবং পরিচালিত নাটক 'মৃতের মিছিল' আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। শিল্পীসংসদের সদস্যগণ এই প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত থাকে।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যসংস্থা রূপারোপ

একেবারে বেপরোয়া সংগঠন হয়ে গড়ে উঠল প্রথম থেকেই রূপারোপ। রূপারোপ গঠনের পিছনে ইতিহাস আছে যেমন সব সংগঠনে থাকে, কিন্তু রূপারোপ-এর ব্যাপারটা একটু আলাদা।

১৯৫৫তে রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটক অভিনয়ের মধ্যে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং দীর্ঘ দশ বছর ধরে একের পর এক নাটক মঞ্চস্থ করে ত্রিপুরার গ্রামে-গঞ্জে নাটক ছড়িয়ে ১৯৬৫তে মুখ থুবড়ে পড়ল লোকশিল্পী সংসদ। তখন হিন্দি-চীন ভাই-ভাই পর্ব শেষ হয়ে গেছে, চীন ভারত আক্রমণ করেছে---ভারত দেশগড়ার মুখে যুদ্ধে অযথা ব্যয়ে বিপর্যস্ত। সারা দেশে পক্ষে-বিপক্ষে নানা সমালোচনা, নানা রটনা। এই সুযোগ

সদ্ব্যবহার করলো যারা লোকশিল্পী সংসদের বিরুদ্ধে সব সময় সরব ছিলো। লোকশিল্পী সংসদের সংগঠন সম্পাদকের বিরুদ্ধে দেশবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে তাকে জেলে পোরা হোল। লোকশিল্পী সংসদের ভিতরে বাইরে দেখা দিল ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া। সদস্যদের মন ভেঙ্গে গেল, নাটক নিয়ে আন্দোলন করার মত মানসিকতা আর রইল না। ডাঃ নয়নরঞ্জন মজুমদার তখন সংসদের সভাপতি। তিনি শেষ চেষ্টা করলেন কিন্তু কিছু হোলনা। সংসদ দিশেহারা অবস্থায় ভেঙ্গে গেল। দিন যায় বছর যায়, বিচ্ছিন্ন সংসদের সদস্যরা আর জোট বাঁধে না। কিন্তু রক্তে যার নাটক সে আর কতদিন চুপচাপ বসে থাকতে পারে? এলো ১৯৭০ সাল। আঁচমকা ডাক দিলেন নাট্য পরিচালক চিত্রশিল্পী শক্তি হালদার তাঁর পুরণো বন্ধুদের। এসো চুপ করে আর বসে থাকা নয়, আবার দল গড়বো আমরা। এবার শুধু 'এ্যামেচার' নয়—নাটক করে এবার পকেটে পয়সা আনতে হবে।

শক্তি হালদারের প্যালেস কমপাউণ্ডে নবনির্মিত বাসভবনে সবাই জড়ো হলেন। এলেন সংসদের সদস্য নরেশ পোদ্দার, হরিপদ দাস, তুলসী দত্ত, অমিয় দাস, উদয়শঙ্কর রায়, বিশ্বজিৎ সেন, রাণা ডাহালজঙ্গ বাহাদুর. হরেন্দ্র হালদার, বীরেন রায়, সুধাংশুশেখর ভৌমিক, অধ্যাপিকা শিপ্রা দত্ত, বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন।

কার্য্যকরী সমিতি গঠিত হোল। বঙ্কিমবিহারী দেববর্মন সভাপতি। শিপ্রা দত্ত এবং। সুধাংশুশেখর ভৌমিক সহ-সভাপতি। শক্তি হালদার-সম্পাদক। বিশ্ব সেন এবং তুলসী দত্ত সহসম্পাদক। নরেশ পোদ্দার কোষাধ্যক্ষ। হরিপদ দাস, রাণা ডাহালজঙ্গ বাহাদুর (রত্ন হুজুর), হরেন্দ্র হালদার, অমিয় দাস সদস্য, বীরেন রায়, উদয়শঙ্কর রায় সদস্য। অজিত মজুমদার কমিটিতে থাকতে আপত্তি জানিয়ে সভা ত্যাগ করেন। কৃষ্ণপদ দত্ত এবং শ্রীমতী শোভা বসু হলেন পরামর্শদাতা।

সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, এ পর্যন্ত প্রকাশিত নাটকগুলির মধ্যে নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের নাটক খুবই যুগোপযোগী বলে সংস্থা মনে করে, তাই যথা সম্ভব নাট্যকার ঘোষের নাটকগুলি রূপারোপ নিষ্ঠার সঙ্গে মঞ্চস্থ করবে। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে "সিঁড়ি" নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে। নাটকের মহলা শুরু হয়ে গেল।

১৯৭০ সালের ৩০শে অক্টোবর রূপারোপ মঞ্চস্থ করে সিঁড়ি নাটকটি আন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায়। প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিল—শিক্ষা অধিকার, ত্রিপুরা সরকার। নাটকটি প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠ পরিচালক শক্তি হালদার, শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত পরিচালক অমিয় দাস, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা তুলসী দত্ত, শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা শক্তি হালদার, আলোক সম্পাতে শ্রেষ্ঠ হরিপদ দাস এই পাঁচটি বিভাগে দল শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

রূপারোপ বিপুল উৎসাহে পরবর্ত্তী নাট্য প্রযোজনায় মেতে ওঠে।

'সিঁড়ি' প্রকৃত পক্ষে উত্তরণের প্রতীক। নীচু থেকে উঁচুতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে। অহরহ মানুষ সেই উত্তরণের সাধনা করে চলেছে,—জেনে অথবা না জেনেই।

'সিঁড়ি' নাটকটি মোটামুটি একটি সকালে শুরু; পরবর্তী সকালে শেষ। নাটকে নায়ক দুজন। একজন বৃদ্ধ—যিনি নাটকের লোকটা। দ্বিতীয় নায়ক একজন যুবক, নাম রঞ্জন। নায়িকা সোনালী— যুবতী। লোকটা, রঞ্জন এবং সোনালী এদের বিগত জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন। ওরা যা বলছে তাতে বোঝা যাচ্ছে ওদের বুকের গভীরে নিদারুণ এক যন্ত্রণা প্রবহমান। কিন্তু কেন সেই যন্ত্রণার উদ্ভব, তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছেনা কিছুতেই। ওরা অনেক কথা বলতে গিয়েও থেমে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বক্তব্য শেষ হচ্ছেনা আদপেই। কেন-না ওরা ঘটনার ক্রীতদাস, অবস্থার ক্রীড়নক। তবু ওরা সম্পূর্ণ। ওদের জীবনের এই খণ্ড চিত্রের মধ্যেই ওরা এক অখণ্ড জীবনের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছে।

লোকটা, রঞ্জন এবং সোনালী—জীবনের পাশা খেলায় পরাজিত সত্যি; কিন্তু ওরা হার স্বীকার করে নিতে একেবারেই নারাজ। ওরা বিমর্ষ হলেও মর্বিড নয়। ক্লান্ত যদিও তবু বসে পড়তে অনিচ্ছুক। সমাজের দেওয়া একরাশ অসম্মানের বোঝা মাথায় নিয়েও ওরা যেন 'বেপরোয়ার' সপ্রতিভ এবং চলমান। ওরা তিনজনই এক অনির্দেশ নিয়তির ইঙ্গিতে একটি ঘরের মধ্যে আটকা পড়েছে। আর বাকী পৃথিবী উদ্যত হিংসা নিয়ে ঘিরে ধরেছে সেই ঘর। বেরিয়ে যাবার পথ নেই ওদের। শেষ রাতের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে তিনটি অপরিচিত মানুষ হঠাৎ আবিষ্কার করল—ওরা একে অন্যের পরিপূরক। যখন ওরা পরস্পর পরিচিত হোল তখন বন্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মতো একটি মাত্র পথে হিংসায় উন্মত্ত সমাজ বদ্ধমুষ্টিতে দণ্ডায়মান।

ওরা এবার আর সমাজের ক্রীতদাস হোল না। ঘরে তৈরী করা ছোট্ট দরজা বন্ধ রইল। নতুন পথে উত্তরণ ঘটলো রঞ্জন সোনালী আর লোকটার।

রূপারোপের এ নাটক 'সিঁড়ি' শক্তি হালদারের পরিচালনায়, অমিয় দাসের সঙ্গীত পরিচালনায়, নরেশ পোদ্দারের মঞ্চ গঠন এবং হরিপদ দাসের আলোক সম্পাতে এক অনবদ্য সর্বজনগ্রাহ্য প্রযোজনায় রূপান্তরিত হোল।

সিঁড়ি আগরতলার গণদর্শকের কাছে বহুবার তুলে ধরা হয়েছে, সেই সঙ্গে রতন ঘোষের 'মহাকাব্য' দর্শকের উচ্ছসিত প্রশংসা নিয়ে বারে বারে অভিনীত হয়েছে। মহাকাব্য নাটকের মহলা সিঁড়ি নাটকের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায়। রূপারোপ সিদ্ধান্ত নেয় ত্রিপুরার লোকসঙ্গীতের বিরল প্রতিভা অমিয় দাসের গুণের স্বীকৃতি দিতে

হবে। তাই তাঁরই পরিচালনায় একটি লোকসঙ্গীতালেখ্যর সঙ্গে রতনকুমার ঘোষের মহাকাব্য নাটকটি মঞ্চস্থ করা হবে।

১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট ১৯৭২ মহারাণী তুলসীবতী মিলনায়তনে 'মহাকাব্য' এবং লোকসঙ্গীত শিল্পী অমিয় দাসের সঙ্গীতানুষ্ঠান 'ও আমার সোনার মাটি' মঞ্চস্থ হোল। শিক্ষক কল্যাণ তহবিলের সাহায্যার্থে নাটকটি ৮ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। আজকের নাটক প্রসঙ্গে আগরতলার প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন—"আজকের দশকে উৎকৃষ্ট মৌলিক নাটক লেখা হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। আবার উৎকৃষ্ট নাটক যে সব সময় লেখা হচ্ছে বা অভিনীত হচ্ছে—এটাও ঠিক নয়। একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার যুগ চলছে। সবই এক্স্‌পেরিমেন্ট। কালের বিচারে ঠিক হবে এ যুগের কোন নাটক কালজয়ী বা যুগোত্তীর্ণ।

বর্ত্তমানে রাজনৈতিক মতবাদপুষ্ট বক্তব্যকে বড্ড বেশী করে নাটকে দেখানো হচ্ছে। দর্শকের সামনে তুলে-ধরা রাজনৈতিক মতাদর্শকে কেউ কেউ বাহবা জানিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে—কেউবা নাটকের পরিণতি দেখে হতাশ হচ্ছে। দুর্বোধ্য নাটককে অতিবুদ্ধিদীপ্ত বলে চালিয়ে কেউবা আবার নিজেকে বেশী নাট্য-বোদ্ধা বলে জাহির করে বাজার গরম করছেন। ভাবটা এরকম—দেখ হে আমি নাটক বুঝি; নাটক বুঝতে হলে আমারই শরণ নাও।

অধুনা বিদেশী নাটকের, বিশেষ করে পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদ ও অভিনয়ের হিড়িক পড়ে গেছে। ঠিক পুরোপুরি অনুবাদ নয়, কিছুটা রূপান্তর। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে পাশ্চাত্যের জীবন আর আমাদের জীবন সমজীবন নয়। নাটক কিন্তু জীবনের কথাই বলে। ও দেশের দেহবাদী সভ্যতা চূড়ান্তে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে; একটা মোড়ে এসে গতি তার স্তব্ধ। দৈহিক সুখ-ঐশ্বর্য্য, প্রাচুর্য্য, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এক অর্থে জীবন রহস্যের নির্মোক উন্মোচনের সহায়ক না হওয়ায় তাদের জীবনটাই আজ বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জীবনকে তারা বুঝতে পারছে না—উপভোগ করতে পারছে না; অথচ উপভোগ করার তীব্র বাসনা আছে। উপায় জানেনা। তাই জীবন আজ তাদের কাছে জটিল। তাদের দাম্পত্য-জীবন, ভোগ বিলাস, জীবনবোধ ও মূল্যায়ণ কয়েক দশকেই অতিরিক্ত পরিবর্ত্তিত। অর্থ পেয়ে তারা পরমার্থের পথ হারিয়েছে। সুখ পেয়ে সুখাতীতকে হত্যা করেছে। দেহ ভোগে দেহাতীতকে ভুলেছে। জীবন থেকে জীবন দেবতাকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। ইন্দ্রিয় পরায়ণ হয়ে প্রেমময়কে কবর দিয়েছে। নিজেরা রাজৈশ্বর্য্যে মেতে রাজার রাজাকে, প্রাণের রাজাকে বন্দী করে রেখেছে। তাই তাদের অন্তরের কামনা বাসনার সাথে বাস্তবের সংঘাত আর আমাদের সংঘাত এক নয়। তাদের যন্ত্রণা আর আমাদের যন্ত্রণা এক নয়।

আমাদেরও যন্ত্রণা আছে।

আমরা এমন একটা যুগে বাস করছি, যে যুগটাই যন্ত্রণার যুগ--ভাঙ্গনের যুগ। ভাঙ্গন আজ চারিদিকে। রাজনীতিতে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোয়। ব্যক্তি জীবনে। সংসারে, সমাজে। মানব মনে। সর্ব্বত্র।

একটা প্রচণ্ড যন্ত্রণা! সব দেখছি। সব বুঝছি। করতে পারছি না কিছুই। অসহায় হয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় অন্তিমের অপেক্ষায় দিন গুনছি।

আমরা যা হতে চাইছি, তা হতে পারছি না, যা হয়ে যাচ্ছি তা হতে চাইছি না। এই চাওয়া না চাওয়া, পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বে আমরা ভিতরে বাইরে অস্থির, অধীর, বিক্ষুব্ধ।

দীর্ঘদিনের শুচিতা আজ পরিত্যক্ত। পবিত্রতা বিনষ্ট। সত্য বিধ্বস্ত। মূল্যবোধ পরিবর্ত্তিত। প্রেমে আস্থা নেই, ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। অভাব মাতৃত্ব কেড়ে নিচ্ছে।

প্রেম নেই। বিশ্বাস নেই। আলো নেই। ভালবাসা নেই। অন্ধকার। যেদিকে চাই অন্ধকার, হিংসার অন্ধকার, ভাঙ্গন আর যন্ত্রণা।

আমরা বাঁচবো কি করে?

কিন্তু তবুও বলি এ যুগের মৌলিক নাটক এই বক্তব্য তুলে ধরে বাঁচার ইঙ্গিতে জীবনে জীবন পাবার দুর্বার আশায় সোচ্চার।

মানুষের অন্তরস্থিত কামনা-বাসনার সঙ্গে বহির্ঘটনার অনিবার্য সংঘাতই নাটক এবং এ যুগের মানব জীবনের কামনা বাসনা, আশা আকাঙ্খা, সুখ-দুঃখ ও ব্যথা-বেদনার তরঙ্গায়িত রূপরেখার দু'একটা বলিষ্ঠ আঁচড় আজকের মৌলিক নাটকেও দেখা যায়।

কোন কোন নাট্যবোদ্ধা প্রায়ই বলে থাকেন যে, বর্ত্তমানে বিদেশী নাটকের রূপান্তর প্রয়োজন। এটা কিন্তু দেওলিয়া মনোভাবের মানসিক দারিদ্রের সুস্পষ্ট লক্ষণ। অতীতকে অবলম্বন করেই বর্ত্তমান। ধারাবাহিকতাকে বাদ দিয়ে কিছু সৃষ্টি হয় না, হলে হবে অনাসৃষ্টি। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট নাটকের অভাব নেই। তাই বলে আমি বলছিনা যে পশ্চিমের জানালা বন্ধ করে রুদ্ধ গৃহে মৃতপ্রায় হয়ে থাকতে। আসল কথা, প্রাচ্য-প্রাচ্য, পাশ্চাত্য-পাশ্চাত্য। আমাদের জীবন আমাদের, ওদের জীবন ওদের।

এই প্রসঙ্গে বলি, ক্ষুধা ও তৃষ্ণা একই বোধের দুই প্রান্তিক অনুভূতি। ক্ষুধার সময় তৃষ্ণার বারি পান করলে যেমন ক্ষুধা মেটে না; তেমনি তৃষ্ণার সময় ক্ষুধার আহার্যে তৃষ্ণা নিবারণ হয়না। এটাই চিরন্তন সত্য; এই সত্যকে অস্বীকার করা মানসিক সুস্থতার লক্ষণ নয়।

প্রাচীন আচার্যগণ নাট্যচিন্তা-ধ্যানধারণার উপর সুচিন্তিত, যুক্তিগ্রাহ্য, তত্ত্ববহুল ও তথ্যসম্মত অভিমত দিয়ে গেছেন। সেই সব ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্য ভট্টশঙ্কুক,

ভট্টলোল্লট, অভিনবগুপ্ত, ভরত, বিশ্বনাথ প্রমুখদের মূল্যবান রচনাগুলো পড়লেই ভারতের নাট্য সম্পর্কিত চিন্তার আলোকে আমরা উদ্ভাসিত হতে পারি।

রূপারোপের সদস্যরা "অ্যাবসার্ড বা অ্যাবস্ট্রা" নাটকের ঘোরতর বিরোধী। তারা চায় বক্তব্যধর্মী নাটক, যে নাটকে সমাজের লক্ষ কোটি মানুষ উপকৃত হয়, উদ্দীপ্ত হয়। রবীন্দ্র নাটকের মধ্যে প্রতীকী নাটক আছে কিন্তু নাটকগুলি বক্তব্য ধর্মী। ঠাকুরদা বা বিশু পাগলা গান দিয়ে মনের ব্যথা, আনন্দ, ইতি কর্ত্তব্য সব কিছু বলে যায়। সুতরাং রূপারোপ মনে করে এই সময়ে নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের নাটকে বক্তব্য সহজ, বোধগম্য এবং বেগবান। তাই রতনকুমার ঘোষের নাটকই তারা মঞ্চস্থ করে যাবে পর পর। ফলে নাট্যকারের সঙ্গে রূপারোপের এক আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মহাকাব্য নাটক নিয়ে নাট্যকার লিখলেন---নাটকের একটি বিশেষ ফর্ম-এর বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করে আসছিলাম। নাটকের বিষয়বস্তু হবে রূপক, সংলাপ হবে কাব্যধর্মী ছন্দময় যাতে বক্তব্য সমকালীন সীমা পেরিয়ে চিরকালীন আবেদনে পৌঁছতে পারে।

আরো চিন্তা ছিল--সে নাটকে থাকবে বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বাউল রূপের প্রকাশ, নৃত্যের ভঙ্গীমা, ছন্দ-যতি লয়ের কাব্যিক সুষমা। অন্যদিকে থাকবে সংস্কৃত নাটকের মূকাভিনয়, গভীরতম ভাব প্রকাশের সংকেত। সর্বোপরি থাকবে একটি অন্তঃসলিলী সুর যা সর্বক্ষণ দর্শকদের মধ্যে সংগীতের আমেজ তৈরী করতে পারে।

দীর্ঘকাল চিন্তার পরিণতি এই 'মহাকাব্য' নাটক্।

আমাদের ভারতবর্ষে কয়েক হাজার বছর আগে একদা এক মহাকাব্যের সূচনা হয়। প্রেম ভালবাসা স্নেহ-মমতা-কর্ত্তব্যবোধ এবং জীবন ধর্মের সে এক মহামারী। ভাই ভাইকে ঈর্ষা করে। বন্ধু বন্ধুকে বিশ্বাস করেনা। ক্ষমতার সিংহাসন নিয়ে সেদিন হয়েছিল বিরোধ হানাহানি রক্তপাত। ধর্মবুদ্ধি পর্যন্ত আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল কুরুক্ষেত্রের আত্মঘাতী লড়াইয়ে। অসংখ্য জননী পুত্রহারা, অগণিত জায়া বিধবা, সংখ্যাহীন দুহিতা পিতৃহারা হয়েছিল সেদিন।

এই হানাহানি মহামারীতে সব চাইতে বেশী দগ্ধ হয়েছিল সেদিনকার অগণিত নাম-না-জানা জনতার দল। মহাকাব্যের ইতিহাসে যাদের স্থান নেই বললেই চলে।

সেই মহাকাব্য আজকের বিশ শতকের সাতের দশকে ভারতবর্ষে অভিনীত হয়ে চলেছে। সেই কান্না, সেই বেদনা, সেই হাহাকার! সেই বিরোধ বিবাদ সংঘর্ষ! সেই ক্ষমতার লড়াই!

একদা সেই মহাকাব্য আজকের সেই অলিখিত মহাকাব্যের পটভূমিকায় উপস্থাপনা করা হয়েছে। সেজন্য প্রকাশ ভঙ্গিমা নিতে হয়েছে রূপক ধর্মী। বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী,

সমাজ বা মতবাদ মহকাব্যের লক্ষ্য নয়। সর্বজনীন বেদনাই এর প্রধান উপজীব্য। মহাভারতই 'মহাকাব্য' নাটকের আসল প্রেরণা।

'মহাকাব্য' নাটকের অংশগ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ হলেন ঃ রাজ্যেশ্বর দাস, হংসকলি হালদার, শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভাস দেবনাথ, নালক বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি হালদার, চিত্তরঞ্জন পাল,, দীপক দে, বিভাস দেবনাথ, বিশ্ব সেন, অনিল মজুমদার, আশিস চক্রবর্তী, সুধীন আচার্য, বেণুধর গোস্বামী।

মহাকাবা নাটকেব একটি দৃশ্য

মহাকাব্য নাটকটির আগে অমিয় দাসের পরিচালনায় সঙ্গীতালেখ্য 'ও আমার সোনার মাটি' অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। সঙ্গীতাংশে ছিলেন—অমিয় দাস, প্রদ্যোৎ সিংহ রায় সুধীন ভট্টাচার্য, বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, নমিতা দাস, প্রতিমা গোস্বামী ও রীতা সিংহরায়। ছায়া রূপ এবং আলোতে ছিলেন হরিপদ দাস এবং নরেশ পোদ্দার।

মহাকাব্য নাটকের পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। মঞ্চে—নরেশ পোদ্দার, শব্দ এবং আলোকসম্পাত—হরিপদ দাস, রূপসজ্জা—হরেন্দ্র হালদার, সঙ্গীত পরিচালনা অমিয় দাস।

নাটকে আর Pushing-এ টিকিট বিক্রি নয়, এবার শুরু হোল Gate Sale গেটে লাইন দিয়ে টিকিট কাটা শুরু হয়ে গেল— নাটক ফিরে পেলো তার সম্মান। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় ক্যাম পামে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ভাবে পরিবেশিত হোল। দর্শক অভিভূত। অবশ্য দুষ্ট সমালোচক লিখল—'বাইশ রীলের হিন্দি ছবি।' কারণ হরিপদ দাস আলোকসম্পাতে এতখানি নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন যে নাটককে নাটক মনে হতে পারেনি দর্শকের কাছে, সিনেমা মনে হয়েছিল।

নাটক দেখে পশ্চিমবঙ্গের তদানিন্তন শিক্ষামন্ত্রী মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় মুগ্ধ হয়ে বলেন—'কলকাতার বাইরে এত উন্নত প্রযোজনা কল্পনার বাইরে।' বহুবার অভিনীত হয়েছিল এই নাটক। সমাজের উপরে যারা বসে আছে, বহুভাবে ব্যাভিচারে মত্ত, সমাজের নীচের দিকের মানুষকে শুধু পেট ভরে খাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেরা মাংস রুটি আর মদের প্রাচুর্যে ডুবে আছে, তাদের চরিত্রকে খুলে দিয়েছেন নাট্যকার রতনকুমার ঘোষ তাঁর এই মহাকাব্য নাটকে।

এর আগে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ ১৯৭২ সালের ১৩ই জুলাই রূপারোপ আর একটি সাড়া জাগানো নাটক রতনকুমার ঘোষ রচিত 'ভোরের মিছিল' মঞ্চস্থ করেছিল। নাটকের প্রারম্ভে তারা ঘোষণা করল—এই সময় যখন দেশ-কাল-সমাজ এক নতুন আবেগে প্রাণ চঞ্চল যখন আমরা আমাদের সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে গর্ববোধ করি,

যখন মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের নানা প্রকল্প রচনায় ব্রতী আমরা, ঠিক তখনই সেই ঘোষিত পুণ্যলগ্নে জীবনের মহামারী চলছে—আমাদের চোখের সামনেই।

এ এক বিস্ময়কর নৈরাজ্য! পুরনো সমাজ ভেঙ্গে গেছে অথচ নতুন সমাজে স্থিরতা আসেনি। কল্যাণ রাষ্ট্রের গল্প রচনা করে চলেছি কিন্তু ব্যক্তি জীবনের সামান্যতম স্বাচ্ছন্দ্য আমাদের কর্মপ্রবাহে অনুপস্থিত। ঈশ্বর বৃদ্ধ; সুতরাং পরিত্যক্ত। ধর্ম কুসংস্কারে ভারাক্রান্ত, তাই পরিত্যাজ্য। মানবিক মূল্যবোধ অর্থনৈতিক চাপে শ্বাসরুদ্ধ—অতএব নির্বাসিত।

ফলে আমরা বিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলেছি। ধনের সমবন্টন নেই। ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলছে। শ্রমের মর্য্যাদা নেই। অসম ব্যবস্থায় প্রতিপালিত হয়ে আমরা একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা ভালবাসা এবং সহানুভূতি হারিয়ে ফেলেছি।

এমনি করে গড়ে তুলেছি এক লাঞ্ছিত ও অপমানিত সমাজ—যে সমাজে রাজকুমার জুয়া খেলে, পঙ্কজ ওয়াগণ ভাঙ্গে, গবা রকেট ছোঁড়ে, পদ্ম হাঁসের মত পাঁকভর্তি জলে সাঁতার কাটে।

সূর্য পরিক্রমার মত ঘুরতে ঘুরতে একদিন আমরা সকলে বিষুবরেখায় মিলবো। তখন দেখা যাবে মানবিক বিস্ফোরণ আসন্ন। বিরাট বিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে অবৈধ সন্তান বুকে নিয়ে সমাজের চিরন্তন শক্তি অপমানিত অবহেলিত অত্যাচারিত নারী। সেই মিছিল রাতের অন্ধকারে যাত্রা সুরু করেছে ভোরের সূর্যের প্রতীক্ষায়; রাত পোহাতে কত দেরী তা আমাদের জানা নেই, তবে মানুষ হিসাবে আমরা আশা রাখি—সূর্য ওঠার সময় হয়ে এলো।

'ভোরের মিছিল'এর পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। আলো ও শব্দে হরিপদ দাস, সঙ্গীত পরিচালনায় অমিয় দাস। নেপথ্য কণ্ঠে ছিলেন রীতা সিংহরায় ও প্রদ্যুৎ সিংহ রায়, সঙ্গতে রজত গাঙ্গুলী। নেপথ্য কণ্ঠে শিশু শিল্পী মিত্রারুণ হালদার। রূপকার নরেশ পোদ্দার। ভোরের মিছিলে অগ্রবর্ত্তী জনগণ হলেন—শক্তি হালদার, দীপক দে, আশিস চক্রবর্তী, চিরঞ্জিব চক্রবর্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, বিভাস দেবনাথ, তুলসী দত্ত, যাদব সাহা, বিশ্বজিৎ সেন, অজয় সেনগুপ্ত, বেণুধর গোস্বামী, তপন ভট্টাচার্য এবং গৌরী দাশগুপ্তা।

এই নাটকে চলচিত্র এবং স্টেজের অভিনেতা এক হয়ে অভিনয় করে নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং দর্শকগণের দ্বারা অভিনন্দিত হয়। আলোক সম্পাতে হরিপদ দাসের পরীক্ষা নিরীক্ষার সার্থক প্রকাশ এই নাটককে সার্থকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায় অভিনয়ের সহযোগী হয়ে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সালে রূপারোপের আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা নবনাট্য আন্দোলনের সমস্যাকেন্দ্রিক বাস্তবানুগ নাটক তুলসীদাস লাহিড়ীর

'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। নাটকটি প্রথম অভিনয় হয় বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে রঙ্গম অয়োজিত নাট্যমেলায়।

রূপরোপের বক্তব্য ছিল—'রূপারোপের উপর ভার পড়েছে নবনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্য্যায়ের নাটক মঞ্চস্থ করার। এই পর্যায়ে রূপারোপ সিদ্ধান্ত নিয়েছে নবনাট্য আন্দোলনের পুরোধা নাট্যকার তুলসীদাস লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' মঞ্চস্থ করার।অবশ্য এই পর্য্যায়ে দুঃখীর ইমান—; 'ছেঁড়া তার', 'দলিল' বা 'পথিক', এগুলি ছিল সর্বোত্তম। কিন্তু আমাদের সীমিত সামর্থ্য ও নানাবিধ অসুবিধার কথা চিন্তা করে বর্ত্তমান নাটকটিই আমরা বেছে নিয়েছি এই পর্য্যায়ে।

থিয়েটার এসেছে বিদেশ থেকে। গিরিশবাবুর প্রতিভা সেই থিয়েটারকে দেশজ যাত্রার ঢঙের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে দেশীয় লোকের প্রিয় করে তোলে! গিরিশচন্দ্র-শিশিরকুমারের পরবর্তী যুগে বাংলা মঞ্চে ইংরেজী প্রভাব দেখা দেয় মারাত্মক ভাবে। বাংলা নাটকে চলে ইংরেজী নাটকের চতুর্থ শ্রেণীর অনুকরণ। কারণ দর্শকরা বোকা এবং তাদের খুশী করতে হলে মোটা দাগের জিনিষ হওয়া চাই, এই বিশ্বাস তখন মঞ্চ মালিকদের বদ্ধমূল। তাই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের আওতা থেকে নাট্যলক্ষ্মীকে বাঁচানোর জন্য আরম্ভ হয় নবনাট্য আন্দোলন। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে গণজীবনের আবেদনকে উপজীব্য করে নাট্য-রচনা। দর্শক মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে তথাকথিত ভাঁড়ামীর হাত থেকে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে গড়ে ওঠে নাট্য-সংস্কৃতির সখ্যতা। এই আন্দোলনের মাধ্যমেই অপেশাদার ও সৌখিন দলগুলি বিকাশ লাভ করে। পরবর্তী সময়ের নাট্যাভিনয়ে যে সমাজ সচেতনতা ও উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তার সূত্রপাত হয় এই আন্দোলনের মাধ্যমে।

নাট্যকারের কথায়—স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে অর্থনৈতিক চাপে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে নেমে এসে মজদুর শ্রেণীতে পরিণত হচ্ছে। অথচ সংসার চালানর দায়িত্ববোধ, সুরুচি ও সুনীতিবোধ তাদের সাধারণ মজদুরের মত শুধু নিজের চিন্তায় জীবন-যাপন করবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাই যে পরিবারের কর্মসংস্থান আছে তার ঘরে পোষ্য বেকার সংখ্যাও যথেষ্ট। গৃহকর্ত্রী, গৃহিণী সবাইকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পদে পদে নিজেকে বঞ্চনা করেছে। এবং গৃহকর্ত্তা অর্থ এনে তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে বঞ্চিত হয়ে ক্ষোভে দুঃখে সংসারের উপর বীতরাগ হচ্ছে। এই সাংঘাতিক জীবনযুদ্ধের ফলে পরস্পরের প্রীতির সম্বন্ধ অটুট রাখা সম্ভব হচ্ছে না। পরস্পর পরস্পরের উপর দোষারোপ করছে এবং নিজে বাঁচার চেষ্টায় আত্মজনের উপর মমতাহীন হচ্ছে। এই দুঃখ এবং বঞ্চনার মূল কোথায় তা খুঁজে না পেয়ে ক্রমশঃ তারা সব কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। এ ব্যাধির মুক্তির সন্ধান দেবার মত

লোকের একান্ত অভাব তবু এরই ভেতরে সংখ্যায় নগণ্য হলেও কিছু লোক মানুষ হয়ে বাঁচবার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এইসব নৈরাশ্যের কবলে হতাশায় দিগভ্রান্ত অগণিত জনগণ কখনো কখনো দুরন্ত দুর্যোগের রাত্রিতে চপলার ক্ষণিক চমকের মত এইসব জীর্ণ ভাঙ্গা বুকেও মনুষ্যত্বের প্রকাশ দেখতে পাচ্ছে।

এদের নিয়েই নাটক লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার। শুধু নৈরাশ্যের কথা নয়। আজকের এই দুর্দিনও কেটে যাবে—তারও ইঙ্গিতে এতে আছে।

বাণী, হরিসাধন এ যুগের তপস্বী, তাদের তপস্যা সার্থক হবে এ বিশ্বাস রাখি। (উধৃতি— তুলসীদাস লাহিড়ী)

এই নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন— শক্তি হালদার, সুকুমার সরকার, আশিস চক্রবর্তী, সমরেশ সান্যাল, রঞ্জিত ভট্টাচার্য, কল্লোল দত্ত, বিশ্ব সেন, দীপক দে, বেণুধর গোস্বামী, চিত্ত পাল, শেখর বন্দোপাধ্যায়, বিভাস দেবনাথ, নালক বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা দাস, হংসকলি হালদার, লক্ষ্মী সিংহরায়, দীপা দাশগুপ্তা, গৌরী দাশগুপ্তা, দীপ্তি বিশ্বাস, স্বপ্না সান্যাল, সুভাশিস হালদার, দেবাশিস হালদার, নবারুণ হালদার, মিত্রারুণ হালদার, প্রতিভাংশু দাস, দীপঙ্কর পোদ্দার, পূর্বিতা হালদার, পম্পা গোস্বামী।

এই সময়ে রূপারোপের সংগঠনে ছিলেন---উপদেষ্টা শোভা বসু, কৃষ্ণপদ দত্ত, মৃণাল কান্তি চক্রবর্ত্তী।

সঙ্গীত পরিচালক---অমিয় দাস। এবং কণ্ঠে রীতা সিংহ রায়।

আলো ও শব্দ---হরিপদ দাস

যন্ত্র সংঙ্গীতে---বঙ্কিমবিহারী দেববর্মণ, বিপিনবিহারী দেববর্মণ এবং রবীন্দ্র দাস।

মঞ্চ পরিকল্পনা—নরেশ পোদ্দার

রূপকার---হরেন্দ্র হালদার।

এছাড়াও সংগঠনে ছিলেন বীরেন রায়, নিখিল ভট্টাচার্য, সুধাংশুশেখর ভৌমিক। নাটকটির মুখ্য পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার।

প্রসঙ্গতঃ ১৯শে জুন ১৯৯৭, রবীন্দ্রভবনে 'শিল্পতীর্থ' তুলসীদাস লাহিড়ী রচিত 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার' নাটকটি মঞ্চস্থ করে। নির্দেশনায় ভগবান দাস। আলোক সম্পাতে—দেবল চ্যাটার্জী, আবহ সঙ্গীত---লিটন সাহা, সহযোগিতায় ছিলেন—স্বপন চক্রবর্তী, শ্যামল চৌধুরী, নমিতা হালদার, শক্তি হালদার। অভিনয়াংশে—বর্ণালী সিনহা, সুমা দেববর্মা, গোপা দাস, দীপঙ্কর দেববর্মা, পুরঞ্জন দেব, সমীর আচার্য, বিপ্লব সাহা, পিন্টুলাল সাহা, মৃন্ময় দেববর্মা মনোজ সাহা, সৌম্য চৌধুরী, উত্তমকুমার সিংহা, গৌতম সূত্রধর, পীযূষ মজুমদার, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, স্বাধীন সিংহ, প্রসেনজিৎ সিংহ, রাণা সিংহ। এরা বয়সে একেবারে তরুণ, ১৫/১৬ বছর হবে। যোগ্যতার সঙ্গে চুটিয়ে

এই হৃদয় বিদারক নাটকটি তারা অভিনয় করে। দর্শকগণের উচ্চ প্রশংসা তাদেরকে আপ্লুত করে।

১৮ই মার্চ ১৯৭৩ 'রূপারোপ' শক্তি হালদারের পরিচালনায় মঞ্চস্থ করে নাট্যকার রতনকুমার ঘোষের 'যবনিকা পতনের আগে' রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। এই নাটকে রূপারোপ বক্তব্য রাখে—'আর পাঁচটা দলের মত রূপারোপ একটা দল নয়। শুধুমাত্র নাটক অভিনয় করে হৈ হল্লা সৃষ্টি করে বাজার গরম করা আমাদের কাজ নয়। আমরা কেউ রূপারোপের সদস্য নই, আবার সবাই আমরা সদস্য—এই ভেবে যদি ভবিষ্যৎ নাগরিকেদের জন্য কিছু করতে পারি। উদ্দেশ্য একটাই মানুষের ভিতর তার 'মানুষ' চেতনাকে জাগ্রত করা। কঠিন একাজ, তবু এই আমাদের ব্রত। তাই কোনো অনুষ্ঠান নির্বাচন ক্ষেত্রে রাজনীতিকে আমরা এড়িয়ে চলি।

আমাদের মহান ব্রতে দেশের যুবসমাজকে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি। যার যতটুকু আছে তাই নিয়ে আমাদের সাহায্য করুন।

আজকের নাটক সেই সমাজ সমস্যাই। শুধু সমস্যা নয়—নাট্যকার তার কারণ সোজাসুজি বলেছেন- -ইদানিং অন্য নাটকে যা দেখা যায়, যা দর্শককে দুর্বোধ্য আধুনিক শিল্পকলার মতো ধোঁকার মধ্যে ফেলে, সেই প্রতীক ধর্মী দুর্বোধ্যতার আশ্রয় না-নিয়ে।

নাটকটির বক্তব্য নাট্যকারের বক্তব্যে

যবনিকা পড়ে তখন—যখন ঘটনা শেষ। কী মঞ্চে, কী ব্যক্তি জীবনে, কী জাতীয় জীবনে। শেষ পরিণতির চরম লগ্নের শেষ সংলাপ উচ্চারণের পরই যবনিকা পতন অনিবার্য।এটা কিন্তু নিয়মের বিধান।

অথচ মাঝে মাঝে এই নিয়মের বিধান খণ্ডিত হয়। কী মঞ্চে, কী ব্যক্তি জীবনে, কী জাতীয় জীবনে—এমন সময় যবনিকা নেমে আসে যখন ঘটনার পরিণতি চরম লগ্নে পৌঁছায়নি; বহু সংলাপই তখনো অনুক্ত থেকে যায়; বহু স্পন্দন জীবনে বাকী থাকে; বহু সুর ও ছন্দ-যতি-লয় তখন-ও অবিকশিত। কেন এমন হয়?

এর কারণ আকস্মিক দুর্যোগ; কী ব্যক্তি জীবনে, কী সমাজ জীবনে, কী জাতীয় জীবনে মাঝে মাঝে এমনসব দুর্যোগ আঘাত করে যার পরিণতি হোল সময়ের আগেই যবনিকা পতন। এই যবনিকা পতন বাঞ্ছিত নয়। অথচ সমাজের স্তরে স্তরে অন্যায় অবিচার অসন্তুষ্টি যবনিকা পতনকে ত্বরান্বিত করে। চরম পরিণতির আগেই যদি পর্দা নামে তাহলে নাটকের ব্যর্থতা। তেমনি সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিতে যদি অকস্মাৎ দুর্যোগ এসে আঘাত হানে এবং যবনিকা পতনকে ত্বরান্বিত করে তাহলে সমাজ সভ্যতার ব্যর্থতাও প্রকট হয়ে ওঠে।

এমনি ব্যর্থতার মুখোমুখি আজ আমরা সকলেই। ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, রাষ্ট্র জীবনে নানা অসংগতি এবং বিশৃংখলা এমন নাড়া দিয়েছে যার জন্য সকলেই আমরা যবনিকা পতনের ভয়ে বিহ্বল।

কিন্তু মানুষ হিসেবে আমার বিশ্বাস যবনিকা পতন অনিবার্য নয়। এই ভয় এই আশঙ্কা এই বিহ্বলতা সম্পূর্ণ সাময়িক। আজকের মতো আরো বহুবার আচম্বিত যবনিকা পতনের ভীতি আমাদের মানব-সভ্যতাকে আচ্ছন্ন করেছে। অনেকবারই গভীর অন্ধকারে আমরা বিমূঢ় হয়েছি। কিন্তু আমরা মানুষ এবং যেহেতু মানুষ সেজন্য সেই ভয় ভীতি উপেক্ষা করে পথ চলেছি। যবনিকাও তাই পড়েনি।

আজও যত অন্ধকার নেমে আসুক, যত দুর্যোগ ঘনীভূত হোক, যত ভীতি আমাদের আচ্ছন্ন করুক—যবনিকা পতন ঘটবে না। কারণ, মানুষ অপরাজেয়।

নাট্য রূপায়ণে ছিলেন কমলরঞ্জন মৈত্র, বিশ্ব সেন, অরুণ রায়ঘটক, উত্তম চক্রবর্তী, বেণুধর গোস্বামী, চিরঞ্জীবমাধব চক্রবর্তী, আশিস চক্রবর্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, কল্লোল দত্ত, নালক ব্যানার্জী, বিভাস দেবনাথ। কত্থক নৃত্যে—গৌরী দাশগুপ্তা।

স্থানীয় স্ফুলিঙ্গ ক্লাব এবং রূপায়ণের সদস্যগণ এবং পরিচালক মাণিক চক্রবর্তী রূপারোপের কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

নাটকটির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন অমিয় দাস, আলো—হরিপদ দাস, রূপকার নরেশ পোদ্দার। নাটকটির ১৮ই সেপ্টেম্বর পুনরাভিনয় হয়।

২৩শে এপ্রিল ১৯৭৩ ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় রূপারোপ প্রযোজনা করে রতনকুমার ঘোষ রচিত 'ভূমিকম্পের আগে' নাটকটি। নাটকটি পরিচালনা করেন—শক্তি হালদার। মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে।

নাটকের শুরুতে সংস্থা একটি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠান করেন। তাঁরা বলেন—'ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের পথিকৃত, ত্রিপুরার কৃতি সন্তান, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় পরম প্রিয় নট স্বর্গীয় ত্রিপুরেশ মজুমদারের স্মৃতির প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর বিদেহী পুণ্যাত্মা জ্যোতিষ্কের মত আমাদের যাত্রা পথ আলোকিত করুক। সেই সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সেইসব স্বর্গত শিল্পীদের যাঁরা ত্রিপুরার নাট্যান্দোলনকে সার্থক ভাবে এগিয়ে এনেছেন।'

নাটকটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন অমিয় দাস এবং নেপথ্য কণ্ঠে ছিলেন রীতা সিংহ রায়, অমিয় দাস, অরুন্ধতী হোম-চৌধুরী ও নমিতা দাস। আলোক সম্পাতে—হরিপদ দাস, রূপকার—নরেশ পোদ্দার। নৃত্য পরিকল্পনা—গৌরী দাশগুপ্তা। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন :

শক্তি হালদার, নন্দলাল ভট্টাচার্য, আশিস চক্রবর্তী, কল্লোল দত্ত, স্বপন নন্দী, মাণিক

চক্রবর্তী, উত্তম চক্রবর্তী, যাদব সাহা, বিভাস দেবনাথ, দেবপ্রসাদ দাস, চিরঞ্জীব চক্রবর্তী, নির্মল চন্দ, নালক ব্যানার্জী, বেণুধর গোস্বামী, সুকুমার সরকার, চিত্ত পাল, দীপক দে, শেখর ব্যানার্জী এবং বিশ্ব সেন।

এই নাটকের অভিনয়ে নাট্যকার রতন ঘোষ শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন—'ত্রিপুরায় যে ভাবে আপনারা নাট্য আন্দোলনের স্রোত বেগবান রেখেছেন, সেজন্য আগামী দিনে নিশ্চয়ই এর যোগ্য স্বীকৃতি মিলবে। এগিয়ে চলুন। দর্শক তৈরী করুন।

রূপারোপের প্রচেষ্টা সার্থক হোক এই কামনা করি। রতনকুমার ঘোষ,

১২ই জুন ১৯৭৪। রূপারোপ এবার প্রযোজনা করলো বিশ্বনাথ দে রচিত 'প্রকাশকের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র' এবং বাবুল দাশগুপ্ত রচিত 'ধ্রুবতারার আলোয়' একাঙ্ক নাটক দুটি। নাটক দুটি মঞ্চস্থ হয় রবীন্দ্রভবনে। নির্দেশনায় ছিলেন শক্তি হালদার। আলো—হরিপদ দাস। রূপসজ্জা নরেশ পোদ্দার।

'প্রকাশকের সন্ধানে ছ'টি চরিত্রে' বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন ঃ দেবপ্রসাদ দাস, শক্তিময় চক্রবর্তী, বাণীব্রত সরকার, পার্থ গাঙ্গুলী, দেবাংশু দাস, বিজয় দেব, যাদব সাহা, শিশির সিংহ রায়।

'ধ্রুবতারার আলোয়' বিভিন্ন চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন : আশিস চক্রবর্ত্তী, নন্দলাল ভট্টাচার্য, মেঘনাদ সাহা, চিরঞ্জীবমাধব চক্রবর্তী, রূপক সাহা, সুশান্ত চক্রবর্তী, যাদব সাহা, সুধাংশুশেখর ভৌমিক, সুধীন আচার্য, সঙ্গীতা চৌধুরি, নমিতা হালদার, গৌরী দাশগুপ্তা এবং শিশু শিল্পী সৌরভ সেন।

৫ই আগষ্ট '৭৪ এবং ১৫ই অক্টোবর 'দুইরাত্রি' নাটক (নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত) শক্তি হালদারের পরিচালনায় রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয় এবং নাটকটি উচ্চ প্রশংসিত হয়। এই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ২১শে জুলাই। ১৫ই অশেবর শিক্ষক-কল্যাণ তহবিলের সাহায্যর্থে অভিনয় হয়েছিল।

স্থানীয় পদাতিক পত্রিকা নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন তাঁর ১৫ই আগষ্ট ১৯৭৪ সংখ্যায় : 'রূপারোপ' গোষ্ঠীর প্রযোজিত নাটকগুলো একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। তার পরিচয় পাওয়া গেল তাঁদের 'দুইরাত্রি' নাটকে।

একটা স্টেশন হ'ল দৃশ্যপট। একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি চরিত্র এই স্টেশনে এসেছে। নাটকটির বিষাদময় সুর ধ্বনিত হয় শেষ পর্য্যায়ে যখন স্মৃতিভ্রষ্টের অভিনয় করে এক অভিনেত্রী চপলা কিছুক্ষণের জন্য হিমাংশুকে স্বামী রূপে পেয়ে অতৃপ্ত নারী হৃদয়ের বিলাপ শুনিয়েছে। দর্শকগণ অভিভূত হন যখন চপলা মীরা হয়ে বলে—কি ক্ষতি হতো ভগবানের, যদি হতভাগিনী চপলাকে একটু গৃহকোণ, একটি স্বামী-শ্বশুর শাশুড়ী দিতেন।

হিমাংশুর ভূমিকায় তুলসী দত্ত চপলাকে নিয়ে দ্বিধাচিত্তের অভিনয়ে অপূর্ব। মীরার ভূমিকায় ভারতী মৈত্র দারুণ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন শেষ দৃশ্যে। টাইপ চরিত্রে তারাময়ীর ভূমিকায় নমিতা হালদার প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন, কুঁদুলে ও ভালবাসা ভরা মন দুটোই দারুণ ফুটিয়ে তুলেছেন। নীতিশের ভূমিকায় শক্তি হালদার উদাত্ত কণ্ঠে চরিত্রের মর্যাদা রেখেছেন—সেই সংগে নিজের অভিনয়ের সুনাম। যাত্রী হয়ে বেড়ানোর জন্য স্টেশনে স্বল্পসময়ের জন্য এসে বিশ্ব সেন ও সংগিনী কথা না বলে যে অভিনয় করা যায় তা সেদিন দেখিয়ে দিয়েছেন। আঙ্গিকের খেলা দেখিয়েছেন হরিপদ দাস। আলো ছায়ার ট্রেণ চলার দৃশ্যে দর্শক দারুনভাবে অভিনন্দিত করে। ট্রেনের কামরা থেকে প্লাটফর্মে ছিটকে আসা আলো নিঃসরণ চমৎকার। দর্শকগণের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়েছে রূপারোপের দুইরাত্রি দেখে।

১১ই আগষ্ট ১৯৭৪, 'জনযুগ' পত্রিকা লেখে ঃ এই নাটকের মঞ্চসজ্জার ব্যাপারে নরেশ পোদ্দার সত্যিই প্রশংসনীয়। অভিনয়াংশে সর্বপ্রথম বলতে হয় তুলসী দত্তের কথা, বলিষ্ঠ এবং সাবলীল অভিনয় দ্বারা তিনি হিমাংশু চরিত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন এবং প্রমান করলেন যে তিনি সত্যিই একজন দক্ষ শিল্পী। স্টেশন মাষ্টারের স্ত্রী চরিত্রে নমিতা হালদার প্রশংসনীয়—। বেশ সহজ অভিনয় করে অভিনয় দক্ষতা দেখিয়ে গেছেন তিনি। নীতিশ চরিত্রে শক্তি হালদার সর্বাঙ্গীন সুন্দর অভিনয় করে গেছেন; ওঁর emotional কণ্ঠ বোধ হয় এর সহায়ক। সব মিলিয়ে এই চরিত্রটি একটি উপভোগ্য চরিত্র হয়েছে। আমার কেবলই যেন মনে হচ্ছে নাট্যকার নীতিশ চরিত্রের প্রতি সুবিচার করেননি। উনি যদি নীতিশকে দিয়ে আরও সংলাপ বলাতেন তাহলে সেদিন শক্তি হালদারের অভিনয় আরও একটু বেশী দেখতে পেতাম।

এ নাটকে শেষদৃশ্যে আবহসঙ্গীত মনে রাখার মত। শব্দ প্রক্ষেপণ ও আলোকসম্পাতে হরিপদ দাস উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। উনি যে অবিসংবাদী শ্রেষ্ঠ তা দর্শক সাধারণ আরও একবার বুঝে নিলেন। হরিপদ দাসকে এ নাটকের কৃতিত্বের অনেকাংশের দাবীদার মনে করা যেতে পারে।

'দুইরাত্রি' নাটককে হাতে রেখে রূপারোপ ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প অবলম্বনে 'দালিয়া' (নাট্যরূপ প্রতিভা বসু এবং বুদ্ধদেব বসু) রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। নাটকটির প্রযোজনা উচ্চ প্রশংশিত হয়।

নাটকে বিভিন্ন চরিত্রে অংশগ্রহণ করেন : গৌরী দাশগুপ্তা, স্বাতী মৈত্র, বিশ্ব সেন, তুলসী দত্ত, কমল মৈত্র, বেণুধর গোস্বামী, যাদব সাহা, নন্দলাল ভট্টাচার্য। আলো ও শব্দ পরিচালনায় হরিপদ দাস, রূপকার নরেশ পোদ্দার। নৃত্য পরিকল্পনা : গৌরী দাশগুপ্তা, সঙ্গীত পরিচালনায় অমিয় দাস। নেপথ্য কণ্ঠ রীতা সিংহরায়, প্রদ্যুত সিংহরায়, অমিয় দাস।

এলো ১৯৭৫। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। তার আগে দেশে নানা অশান্তিতে মানুষ বিভ্রান্ত। এরই মধ্যে ত্রিপুরার যাত্রা পাগল, সংগঠক অভিনেতা ননী দাসের আহ্বানে শক্তি হালদার যাত্রাকে আন্দোলনমুখী করার প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। সঙ্গে সহযোগী হলেন—বিশ্ব সেন, নরেশ পোদ্দার, হরিপদ দাস, বেণুধর গোস্বামী এবং রূপারোপের সকল সদস্যগণ। ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৫ সনে জন্ম নিল যাত্রা সম্মেলনের ফুলের কুঁড়ি। সেই কুঁড়ি পরিপূর্ণ ফুলের রূপ নিল ৩১শে আগষ্ট ১৯৭৫ যাত্রা সেমিনারে। ফলে রূপারোপের নিজস্ব নাট্যপ্রযোজনা ক্ষতিগ্রস্ত হোল। তবুও এত ব্যস্ততার মধ্যে শক্তি হালদারের পরিচালনায় রূপারোপ ২৭শে এবং ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৫ প্রযোজনা করল রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সীতাহরণ' নাটক রবীন্দ্রভবনে।

নেপথ্যে তখন রূপারোপের বিশাল কর্মযোগীর দল। উপদেষ্টা শ্রীকৃষ্ণপদ দত্ত, শ্রীমৃণালকান্তি চক্রবর্তী, শ্রীমতী শোভা বসু। ব্যবস্থাপনায় অধ্যাপিকা শিপ্রা দত্ত, অজিত ভৌমিক, তুলসী দত্ত, শিশির রায়, কার্ত্তিক গুপ্ত। সঙ্গীত পরিচালনায় অমিয় দাস। তবলায়—বীরেন রায়। বেহালায়—পার্শ্বনাথ বণিক। বাঁশীতে—কুমুদ সরকার। অন্যান্য যন্ত্রে—নানূ মিঞা ও সম্প্রদায়। নেপথ্য কণ্ঠে—রীতা সিংহ রায় ও অমিয় দাস। আলো—হরিপদ দাস, সহযোগী সুনীল দেববর্মা। মঞ্চ—চিত্ত পাল ও যাদব সাহা। রূপকার—নরেশ পোদ্দার। নৃত্য পরিকল্পনা—গৌরী দাশগুপ্তা।

পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে নাটকটি বহুবার প্রদর্শিত হয়।

অন্ধকার থেকে আলোয় উত্তরণ

রূপারোপের একটি পরীক্ষামূলক নাটকের দৃশ্য

রূপারোপ ৮ই জুলাই বেশীর ভাগ তরুণ শিল্পীদের নিয়ে প্রযোজনা করল 'ট্রিড্রিম' নাটক। দুটি নাটকের মূল বিষয় নিয়ে একটি পরীক্ষা মূলক নাটক সৃষ্টি করা হোল। নাটক দুটি হোল—বাবুল দাশগুপ্তর 'ধ্রুবতারার আলো' এবং রতনকুমার ঘোষের 'ভূমিকম্পের আগে'। নাটকটি দর্শকবৃন্দের দ্বারা দারুণভাবে অভিনন্দিত হয়।

নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পীগণ হলেন—আশিস চক্রবর্তী, সুশান্ত চক্রবর্তী, যাদব সাহা, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবতোষ চৌধুরী, বিভাস দেবনাথ, রণজিত সাহা, স্বপন ঘোষ, তুলসী

দত্ত, চিত্ত পাল, স্বাতী মৈত্র, ভারতী মৈত্র, চিত্রা মৈত্র, নমিতা হালদার, বিশ্ব সেন, শক্তি হালদার এবং গৌরী দাশগুপ্তা।

তখন সংস্থার পিছনে পরামর্শ দিচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণপদ দত্ত শ্রী মৃণাল চক্রবর্তী এবং শোভা বসু। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন—সুধাংশু ভৌমিক, কমল মৈত্র, সুভাষ চক্রবর্ত্তী, হরিপদ রায় ও ফণী চক্রবর্তী।

আলোক সম্পাতে—হরিপদ দাস, সহযোগী সুনীল দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দে।

সঙ্গীতে—অমিয় দাস। কণ্ঠে—রীতা সিংহরায়। যন্ত্রে—ধীরেন্দ্র ভৌমিক।

রূপসজ্জা—নরেশ পোদ্দার।

মঞ্চ—চিত্ত পাল, যাদব সাহা ও নরেশ পোদ্দার।

রূপারোপ নাট্যসংস্থার সকল সদস্য যাত্রা সম্মেলন ৭৫কে পূর্ণরূপ দেওয়ার জন্য সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সম্মেলন প্রস্তুতির কাজ পুরো দমে এগিয়ে চললো।

যাত্রা সম্মেলন শুরু হোল ৬ই নভেম্বর ১৯৭৫ এবং শেষ হোল ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৫। সর্বমোট ৩৩ দিন। সম্মেলন চালিয়ে রাখতে যাত্রা সম্মেলন কমিটির সমস্ত সিদ্ধান্ত কার্যকরী রূপ দিতে কঠোর পরিশ্রম করতে হোল রূপারোপের সকল সদস্যদের। সম্মেলন সার্থক হোল কিন্তু রূপারোপের নাট্যআন্দোলন ব্যাহত হোল।

প্রচণ্ড আলোড়ন তোলা 'সীতাহরণ' নাটক নিয়ে আলোচনার ঝড় বয়ে যায়। দর্শকগণ অভিনন্দিত করে প্রতিটি 'শো'তে। 'সীমান্ত প্রকাশ' পত্রিকায় সমালোচিত হল—

'সীতাহরণ' সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে একটি মনোহরণ রূপায়ণ।

রতন ঘোষের নূতন পালা সীতাহরণ। এমন একটি নাটক যার বক্তব্য খুবই স্পষ্ট। মহাজনদের চিরাচরিত শোষণ এবং যারা মাটির কাছাকাছি রয়েছে তাদের মানসিক জড়তা— এই দুয়ের বিরুদ্ধেই মানবতাকে অবতারণ করা হয়েছে এই নাটকে। নাটকের এই বক্তব্য কোনো রাজনৈতিক দল বিশেষের নয়, কেননা এর আবেদন সর্বজনীন। মানবতাই এই নাটকের ঘোষণা।

প্রথমেই বলতে হয় 'সীতাহরণ' রূপায়ণে সংঘ-চেতনা কাজ করেছে সর্বাধিক। এরজন্য শ্রীশক্তি হালদারের মুখ্য নির্দেশনাকেই সাধুবাদ জানাতে হয়। তাছাড়া ভূমিকার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অভিনেতা নির্বাচনে শক্তিবাবু যে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তাতেই নাটক অনেকখানি সাবলীলতা লাভ করেছে। 'সীতাহরণ' যাত্রা এবং থিয়েটারের মিশ্ররূপ। টেকনিক, মঞ্চসজ্জা এবং পোষাক পরিচ্ছদের এই মিশ্র রূপটি নাটকটিকে ফুটিয়ে তুলেছে।

দলগত অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'সীতাহরণ' এমন একটি 'পীচ'-এ পৌছতে পেরেছে যা উপভোগ্যতার দিক থেকে অনেক কাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে দর্শকদের কাছে।

ব্যক্তিগত অভিনয়ও অনেকেরই উল্লেখযোগ্য। বিদুরের ভূমিকায় বিশ্ব সেন রীতিমত সমৃদ্ধ। কমল মৈত্রের উচ্চারণ ও অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের। কাকীমার ভূমিকায় শুক্লা দাশগুপ্তার অভিনয় অনিন্দ্যসুন্দর, মাতৃ ভূমিকায় অসাধারণ। রাধা ও সীতার ভূমিকায় শ্রীমতী চিত্রা মৈত্র সাবলীল অভিনয় করেছেন।—বিনয় রায়।

সাহিত্যিক এবং সমালোচক কানাই লাল চক্রবর্ত্তী 'সীমান্ত প্রকাশ' ১২ই মার্চ ১৯৭৫ সংখ্যায় লিখলেন :—

অভিনয়, কলাকৌশল ও সংঘ-চেতনার ত্রিবেণী সঙ্গম

.......রতনকুমার ঘোষের 'সীতাহরণ' নাটকে শুধুমাত্র হিসাবের খাতায় গোলমাল দেখিয়ে মহাজন প্রত্যেক চাষীকে একই কায়দায় বছরের পর বছর ফাঁকি দিচ্ছে। আর ভাগ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে প্রত্যেক চাষী বছরের পর বছর তা সহ্য করছে। নাটকের শেষ বক্তব্য—মহাজন চাষী সাধারণের কব্জায়। নাটকের বক্তব্য উপস্থাপনায় নাট্যকার সুন্দর ভাবে রামায়ণের সাহায্যে অগ্রসর হয়েছেন। রাবণ রাজা সীতাহরণ করেছেন, কিন্তু সীতাকে চিরদিন নিজের আয়ত্বে রাখতে পারেন নি। উপরন্তু সীতাহরণের কারণে নিজের মৃত্যু ডেকে এনেছেন। সীতাকে ভূমি-লক্ষ্মীরূপে কল্পনা করা হয়েছে। রাবণ মহাজন, মহাজনের ভূমিগ্রাস—রাবণের সীতাহরণের মত অপরাধ বা পাপ। এই পাপে মহাজনের মৃত্যু অনিবার্য। এবং রামের সঙ্গে সীতার প্রত্যাবর্তন বা মহাজনের কলুষিত কবল হতে ভূমিলক্ষ্মীর মুক্তি ও চাষীর হাতে প্রত্যাবর্তন।

এই নাটকে বহু চরিত্র। আর সবচেয়ে বড় কথা, সবগুলি চরিত্রই সুন্দর ফুটেছে আন্তরিক অভিনয়ের গুণে। 'সংঘচেতনা' বা টীম-ওয়ার্কের একটি আদর্শ স্থানীয় দৃষ্টান্ত রূপারোপ এই নাটকের মাধ্যমে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। নাট্যপরিচালক শক্তিবাবু প্রশংসনীয় কাজ দেখিয়েছেন। বস্তুত শক্তিবাবু পরিচালিত নাটক সমূহের মধ্যে এই নাটকটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বললে একটুকু বাড়িয়ে বলা হবে না।

গ্রাম্য দরিদ্র বাল-বিধবা রাধা কিংবা পালায় সীতারূপে চিত্রা মৈত্র অপূর্ব অভিনয় করেছেন। এই শিল্পীর চোখমুখের অভিব্যক্তি তুলনারহিত। ভরতের স্ত্রীর ভূমিকায় শুক্লা দাশগুপ্তার একই সঙ্গে অভিনয় ও সঙ্গীত পরিবেশন অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। যাত্রা পালায় নৃত্য পরিবেশন করে গৌরী দাশগুপ্তা অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন।

নাটকের মূল চরিত্র গ্রাম্যযুবক কন্বের। কন্ব পালাতে রামের ভূমিকায় অভিনয় করেছে সুশান্ত। সুশান্ত শুধু অভিনয়ে নয়, তার গানের গলা খুবই সুন্দর। শুধুমাত্র অভিনয় দক্ষতার গুণে অপ্রধান চরিত্র বিদুরের ভূমিকায় অভিনয় করে বিশ্ব সেন দর্শক মনের শ্রেষ্ঠ আসনটি দখল করে নিয়েছেন। কমল মৈত্র মহাজন চরিত্রে নিজেকে এত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছিলেন যে, একবারও মনে হয়নি অভিনয় দেখছি। অন্যভাবে বলা যায়,

অভিনয়ের মাধ্যমে কমলবাবু মহাজন চরিত্রে শুধু জীবন্ত করেননি—মহাজন চরিত্রে নিজেকে বিলীন করেছেন। ফণী চক্রবর্তীর গ্রাম্যযুবক হারাণই হোক কিংবা যাত্রা পালাতে রাবণই হোক, অত্যন্ত আকর্ষনীয় হয়েছে। ফণীবাবুর মূল কৃতিত্ব তিনি যতক্ষণ মঞ্চে ছিলেন, দর্শকের সবটুকু দৃষ্টি তাঁর প্রতি আবদ্ধ রাখতে দর্শকগণকে বাধ্য করেছিলেন। সুধীন আচার্য-র যাত্রা পালায় 'বিভীষণ' দারুণ। বৃদ্ধ 'পৃতমে'র ভূমিকায় যাদব সাহা টাইপ চরিত্র হিসাবে ভাল অভিনয় করেছেন। পরিচালক শক্তি হালদার অভিনীত বৃদ্ধ ভরত প্রাচীন ভরতই বটে। বেণুধর গোস্বামী টাইপ চরিত্রে অদ্বিতীয়। নাটকের শেষ দৃশ্য অপূর্ব। ফ্রীজ ছিল বিষয় ভিত্তিক মনোগ্রাহী। ফ্রীজের দৃশ্য দুটি ভাগে বিভক্ত। একদিকে দেখান হয়, মহাজনকে গ্রামবাসী সম্পূর্ণ কব্জা করেছে, মহাজন সম্পূর্ণ পরাজিত। অপর ভাগে দেখান হয় সীতা খোলা তলোয়ার হাতে রাবণকে আঘাত করতে উদ্যত, রাবণ পরাজিতের ভঙ্গিমায় ফ্রীজ হয়ে গেছে।'

নানুমিঞা ও তার সম্প্রদায় সৃষ্ট আবহসঙ্গীত এই নাটকের একটি মূল্যবান সম্পদ।

'গণরাজ' পত্রিকা ২৪শে এপ্রিল ১৯৭৫ লিখেছে ঃ' নাটকের অভিনবত্বে এবং যুগোপযোগী বলিষ্ঠ চিন্তা ধারায় যে সব অপেশাদারী নাট্যসংস্থা আগরতলায় নাট্যআন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাদের মধ্যে রূপারোপ একটি অনস্বীকার্য নাম। সফল প্রযোজনায় ওদের প্রায় প্রত্যেকটি নাটকই দর্শকদের অভিনন্দন লাভে ধন্য হয়েছে। নাটকের প্রতিটি শিল্পীর প্রাণঢালা অভিনয়ে 'সীতাহরণ' সার্থকতার পর্যায়ে উন্নিত হয়েছে।

সফল পরিচালনাধন্য পরিচালক শক্তি হালদার এবং সুষম ছন্দে বাঁধা সুন্দর টিমওয়ার্কে মনোরম নাটকটি উপহার দেওয়ার জন্য রূপারোপের শিল্পী নেপথ্য শিল্পীসহ সকলেই ধন্যবাদার্হ।'

'সীতাহরণ' ১৯৭৬-র ১৫ই জানুয়ারী আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় শক্তি হালদারের পরিচালনায় শিক্ষা অধিকারের উদ্যোগে উল্লেখযোগ্যভাবে অভিনীত হোল। এখানে মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন শ্রীমতী দীপ্তি চৌধুরী।

১৯৭৬-র ১৫ই জুন রূপারোপ মঞ্চস্থ করল রবীন্দ্রভবনে রতনকুমার ঘোষের 'ভূমিকম্পের পরে' নাটকটি। পরিচালনা করেলেন শক্তি হালদার।

১৯৭৭ সালের ১৬ই জানুয়ারী আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতায় প্রবোধবন্ধু অধিকারী রচিত নাটক 'জনক-জননী' শিক্ষা অধিকারের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়। দীপ্তি চৌধুরী বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত হন।

এরপর রূপারোপ-এর অধিকাংশ সদস্য শক্তি হালদারের থেকে আরো উন্নত প্রযোজনার দাবীতে শক্তি হালদারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন এবং বিশ্ব সেনকে

সম্পাদক করে দীর্ঘদিনের মহলাকেন্দ্র শক্তি হালদারের বাসভবন থেকে সরিয়ে নিয়ে যান পোষ্ট অফিস চৌমুহনীতে একটা ভাড়াটে ঘরে। শক্তি হালদার সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

সরকারী কোপে পড়ে ইতিমধ্যে শক্তি হালদার বদলী হয়ে গেছেন ত্রিপুরার গভীর পার্বত্য অঞ্চল পানিসাগর এবং বিলথৈ—প্রথমে একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে এবং পরে পানিসাগর বেসিক ট্রেনিং কলেজে।

নতুন কর্মসমিতি গঠন করে রূপারোপ এগিয়ে চলে নবযাত্রা পথে। অনুষ্ঠিত হোল ১৩ই এপ্রিল ১৯৭৮, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে—নরেশ পোদ্দার এবং বিশ্বজিৎ সেনের পরিচালনায়, রতনকুমার ঘোষ রচিত 'জম্বুদ্বীপের ইতিকথা'। নাটকটি অন্ধ ত্রাণ-তহবিলের সাহায্যার্থে অভিনীত হয়। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন : কমল মৈত্র, প্রবীর মুখার্জী, যাদব সাহা, সুধীন আচার্য, সুধাংশুশেখর ভৌমিক, সুব্রত চক্রবর্তী, বিশ্ব সেন। এছাড়া চিত্ত পাল, হরিপদ দাস, বিভাস দেবনাথ, সুকৃতি দেবনাথ, সিতাংশুবিকাশ আচার্য, রবিরঞ্জন দে ও গীতশ্রী মৈত্র।

ব্যবস্থাপনায় ছিল—অন্ধ ত্রাণ তহবিল কমিটি। মঞ্চ—চিত্ত পাল, রূপসজ্জা—যাদব সাহা, আলো—হরিপদ দাস, সঙ্গীত পরিচালনা—রঞ্জিত ঘোষ, যন্ত্রে— বীরেন রায়, গোপাল রায়।

নাট্যকারের কথায় : "যেদিন শিশু ছিলাম, সেদিন মার কোলে শুয়ে রূপকথায় জম্বুদ্বীপের কথা শুনেছি, কৈশোরে শুনেছি পাঠশালায় গুরুমশায়ের কাছে, যৌবনে বন্ধু জনের মুখে। শুনেছি গানে কবিতায় গল্পে প্রবন্ধে। শুনেছি পথে ঘাটে-মাঠে প্রান্তরে। জম্বুদীপ! জম্বুদীপ?

জম্বুদ্বীপ কোথায়? কেউ যদি এমন প্রশ্ন করেন তাহলে আমার জবাব—জম্বুদ্বীপ আমাদের মনে। সেই আশ্চর্য মনোহর জম্বুদ্বীপের অভিনব রূপকথা এ নাটকের আসল বিষয়বস্তু। হ্যাঁ—রূপকথা। মানব সভ্যতার সবচাইতে বিস্ময়কর রূপকথা। সেই রূপকথা শুনতে শুনতে হঠাৎ যদি আপনার কানে অথবা চোখে 'কেউ বা কিছু' নিতান্ত চেনা জানা আত্মপ্রকাশ করে বসে—তাহলে চমকে উঠবেন না। মনে করবেন সেই মিল নিতান্ত কাকতালীয় ব্যাপার। ঠাকুরমার রূপকথায় যেমন অনেক কিছুই প্রায়ই আমাদের চোখে পড়ে—এও ঠিক তেমনি মামুলী অঘটন।"

নাটক প্রযোজনা করা খুবই কষ্টকর হয়ে দাঁড়াল রূপারোপের। দীর্ঘদিনের সাধনা হরিপদ দাসের পুতুলনাচের প্রযোজনা করল তারা। ৩রা ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ সনে মঞ্চস্থ হোল—রূপারোপ প্রযোজিত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'একটি মোরগের কাহিনী' অবলম্বনে 'পুতুলনাচ'। স্থান রবীন্দ্রভবন।

নাট্যরূপ ও সঙ্গীত রচনা : অজিতকুমার মজুমদার। সুর সংযোজন ও কণ্ঠে শিবপ্রসাদ ধর। শব্দ ও আলো হরিপদ দাস, সহযোগী সুনীল দেববর্মা এবং মনোরঞ্জন দে। মঞ্চ—নরেশ পোদ্দার। পুতুল তৈরীতে ননী ব্যানার্জী। সহায়তায়—রাজকুমার সূত্রধর, বাসনা অধিকারী। পুতুল সজ্জায়—ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, গৌরাঙ্গ দাস, শেলী দাসগুপ্তা, গৌরী দাশগুপ্তা। মঞ্চসজ্জা হারাধন চক্রবর্তী, রমেশ শীল, সুকুমার সূত্রধর, রাজমোহন সূত্রধর, স্বদেশবালা দে এবং বিহারী দেববর্মা।

আবহ সঙ্গীত ঃ গোপাল রায়, বীরেন রায়, কালীকিংকর দেববর্মা, অশোক দাশ, ব্রজগোপাল চক্রবর্তী, অরকেষ্ট্রা দি কনসার্ট, হরবোলা : দিলীপ পাল।

আবৃত্তি : স্বপন নন্দী।

ভাষ্য ও সংলাপ : মঞ্জুশ্রী রায় চৌধুরী, সংঘমিত্রা নন্দী, সুতপা ভট্টাচার্য, সুমিতা ভট্টাচার্য, অরবিন্দ চক্রবর্তী।

রূপশিল্পী : ফণীভূষণ চক্রবর্তী, যাদব সাহা, গৌরী দাশগুপ্তা, চিত্ত পাল, প্রদীপ দাস, রবিরঞ্জন দে, প্রণব কর, মনোরঞ্জন দে, পল্লব বর্মন, নরেশ পোদ্দার।

স্থির চিত্র : স্বপন নন্দী এবং স্টুডিও সেন এ' সেন।

১৯৭৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর রবীন্দ্রভবনে রূপারোপ প্রযোজনা করে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য 'কুমারসম্ভব' অবলম্বনে নৃত্যনাট্য। গ্রন্থনা নরেশ পোদ্দার।

নৃত্য পরিচালনা : বিহাররঞ্জন সিংহ ও শীলা সিংহ।

সঙ্গীত পরিচালনা : রঞ্জিতকুমার ঘোষ। আলো ও শব্দ—হরিপদ দাস। কণ্ঠ সঙ্গীতে—রতন সেনগুপ্ত, সুলেখা চক্রবর্তী, মল্লিকা সাহা, বিভা সিংহ, আলো মজুমদার, সুস্মিতা দত্ত মজুমদার, পাঞ্চালী দেববর্মা ও রঞ্জিতকুমার ঘোষ।

যন্ত্রসঙ্গীতে : গোপাল রায় ও অশোক দাস। তবলা : বীরেন রায়।

মঞ্চসজ্জা : চিত্ত পাল, হরিপদ দাস ও জগদীশ দাস।

সূত্রপাঠ : স্বপন নন্দীও পাঞ্চালী দেববর্মা। নির্দেশনায়— নরেশ পোদ্দার।

এরপর রূপারোপ আর কোনো অনুষ্ঠান করতে পারেনি, ফলে ধীরে ধীরে সংস্থা কাগজে কলমে থাকলেও মূলতঃ তার কর্মধারা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

এদিকে সরকারের পুনর্বিবেচনার ফলে শক্তি হালদার আগরতলার সরকারী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। রূপারোপের এই বেদনাদায়ক অবস্থা তাঁকে পীড়িত করে, কিন্তু অন্যকোনো উপায় না থাকাতে ১৯৭৮ সালের ১০ই জুলাই তাঁর বি. কে. রোডের বাসভবনে আবার জন্ম নেয় নতুন সংগঠন 'অন্বেষক' নাট্যসংস্থা। নামাকরণ করেন তুলসী দত্ত।

সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এক কর্মসমিতি গঠন করা হোল—

সভাপতি : শ্রী মণিময় ভদ্র। সহ: সভাপতি : শিশু সেন এবং অনিল দে।

সাধারণ সম্পাদক : শক্তি হালদার। সহঃসম্পাদক : হারাণচন্দ্র সূত্রধর এবং শ্রীমতী নীলিমা দেববর্মা।

সংগঠন সম্পাদক : শ্যামল চৌধুরী। প্রচার সম্পাদক : দীপক বণিক। কোষাধ্যক্ষ : কৃষ্ণপদ ব্যানার্জী।

সদস্যঃ হীরালাল সাহা, নারায়ণ সাহা, পার্থসারথি পাল, স্বপন দাস, নীরেন দেববর্মা, নমিতা হালদার, বিভাস দেবনাথ, নীলিমা সিংহরায়, ডাঃ সুকুমার রায়, দেবল চ্যাটার্জী, অনুপম রায়চৌধুরী, দেবব্রত মুখার্জী, তুলসী দত্ত, মতীশ দাস, দিলীপ দাস। সদস্য চাঁদা মাসিক পঞ্চাশ পয়সা।

অন্বেষকের প্রথম নাটক 'সম্রাট কণিষ্ক' ২৭শে আগষ্ট ১৯৭৮ তারিখে রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালক—শক্তি হালদার।

অন্বেষক প্রযোজিত নাটকের একটি দৃশ্যে হারান সূত্রধর, কার্তিক বণিক, নমিতা হালদার প্রমুখরা

৫ই অক্টোবর' ৭৮ 'দুই মহল' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়। পরিচালনায় ছিলেন শক্তি হালদার। আলো—দেবল চ্যাটার্জী'। নাট্যকার জোছন দস্তিদার রচিত দুইমহল নাটকের অভিনয়ে ছিলেন শিশু সেন, অনুপম রায়চৌধুরী, গোপা সেনগুপ্তা, কার্ত্তিক বণিক, কৃষ্ণপদ ব্যানার্জী, সজল চক্রবর্তী, অসীম দত্ত, পার্থসারথি পাল, হারাণ সূত্রধর, শ্যামল চৌধুরী, নিধু সেনগুপ্ত, অজয় আচার্য, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য (রামু), অরুণ সূত্রধর, দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, হীরালাল সাহা, শ্যামসুন্দর দেববর্মা, মণিময় দেববর্মা, নমিতা হালদার, পূর্বিতা হালদার।

রূপসজ্জায়—রূপেন চক্রবর্তী। আবহসঙ্গীতে—অমরনাথ বণিক এবং মতীশ দাস।

নাটকটি ২৮শে জুন ১৯৮১ রবীন্দ্রভবনে পুনরাভিনীত হয়।

২৬শে নভেম্বর ১৯৭৮ অন্বেষক 'অমাবস্যার মৃত্যু' নাটকটি মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্রভবনের

মঞ্চে। নাট্যকার মন্টু গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন বেশীরভাগ নতুন এবং তরুণ শিল্পী: আশিস চক্রবর্ত্তী, অমল চক্রবর্ত্তী, তমাল চক্রবর্ত্তী, অনুপম রায়চৌধুরী, দেবব্রত মুখার্জী, স্বপন ঘোষ, নন্দলাল ভট্টাচার্য, গোপাল দত্ত, অঞ্জন রায়চৌধুরী, নারায়ণ সাহা, সজল চক্রবর্ত্তী, বিভাস দেবনাথ, অনুপ চৌধুরী, শেখরকুমার গোপ, নমিতা হালদার, নীলিমা দেববর্মা। আবহসঙ্গীত: বেহালা—চিত্ত আঢ্য, গীটার—হীরেন দেব।

'অমাবস্যার মৃত্যু' বহুবার মঞ্চস্থ হয়।

১৭ এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৯ রবীন্দ্রভবনে অন্বেষক মঞ্চস্থ করে ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মা মাটি মানুষ' নাটকটি। নাটকটি ৮ই মে ১৯৭৯ রবীন্দ্রভবনে পুনরাভিনীত হয়। পরিচালক : শক্তি হালদার।

অন্বেষক নাটকের একটি দৃশ্য

১৫ই মে ১৯৭৯ সুকান্ত-নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির আহ্বানে রবীন্দ্রভবনে রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' নাটকের নির্বাচিত অংশ অভিনয় করে অন্বেষক।

রঘুপতি।। শক্তি হালদার, জয়সিংহ।। উত্তম চক্রবর্ত্তী। অপর্ণা। নীলিমা সিংহ রায় অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন।

২৮শে অক্টোবর ১৯৭৯ অমর গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অন্ধকারের আয়না' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

অন্ধকারের আয়নায় অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা ছিলেন : শিশু সেন, দেবব্রত মুখার্জী, কার্ত্তিক বণিক, স্বপন ঘোষ, অনুপম রায়চৌধুরী, কৃষ্ণপদ ব্যানার্জী, হারান সূত্রধর, সৌমেন চক্রবর্ত্তী, তমাল চক্রবর্ত্তী, দেবাশিস অধিকারী, নীলিমা সিংহরায়, সুদীপ্তা পাল।

আবহসঙ্গীত : হীরালাল সাহা। তবলায় : দেবাশিস অধিকারী।

আলো : দেবল চ্যাটার্জী, রূপসজ্জা : রূপেন চক্রবর্ত্তী।

ব্যবস্থাপনায় : তুলসী দত্ত, রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, অঞ্জন রায় চৌধুরী, বিভাস দেবনাথ।

পরিচালক : শক্তি হালদার।

নাটকটি ১৮ই নভেম্বর শিশু কল্যাণ তহবিলের জন্য পুনরাভিনীত হয়।

১লা অক্টোবর ১৯৮০ 'অন্বেষক' রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে তুলসীদাস লাহিড়ীর 'লক্ষ্মীপ্রিয়ার সংসার'। নাটকটি রেন্টার্স সোসাইটির কালীমন্দিরের সাহায্যার্থে ১৬ই নভেম্বর পুনরাভিনীত হয়। পরিচালক—শক্তি হালদার।

২৭শে এপ্রিল ১৯৮১ রবীন্দ্রভবনে ধনঞ্জয় বৈরাগীর নাটক 'রুপোলী চাঁদ' মঞ্চস্থ করে অন্বেষক। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার।

১৩ই ডিসেম্বর' ১৯৮১ জোছন দস্তিদারের 'কর্নিক' নাটকটি অন্বেষক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। পরিচালক ছিলেন শক্তি হালদার। নাটকটি ২৫শে জুলাই ১৯৮২-তে পুনরাভিনীত হয়। 'কর্নিক' নাটকে অংশগ্রহণকারী শিল্পী ছিলেন শিশু সেন, দিলীপ দাশ, স্বপন দাস, কৃষ্ণপদ ব্যানার্জী, শ্যামল চৌধুরী, দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত, কার্তিক বণিক, হারাণ সূত্রধর, অজয় আচার্য, অনুপম রায়চৌধুরী, দীপক বণিক, হীরালাল সাহা, মণিময় দেববর্মা, নমিতা হালদার, গোপা সেনগুপ্তা।

৩০শে মে ১৯৮২ 'চুপ' নাটকটি অন্বেষক রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি ৬ই জুন পুনরাভিনীত হয়।

আলো—দেবল চ্যাটার্জী। পরিচালক—শক্তি হালদার।

অন্বেষকের সব চেয়ে উৎসাহী সদস্য তুলসী দত্ত। রূপারোপের একনিষ্ঠ সদস্য, ত্রিপুরা সরকারের শারীর শিক্ষক তুলসী দত্ত, ২২ বছর সরকারী দপ্তরে কাজ করেও চিকিৎসার জন্য সরকারের কাছ থেকে একটি পয়সা না পেয়ে নিজের সম্পত্তি বিক্রি করে এবং বন্ধু বান্ধবদের সাহায্য নির্ভর করে মাদ্রাজে যান হৃদরোগ চিকিৎসার জন্য। সেখানে অপারেশনের পর তিনি মারা যান। তারিখটা ছিল ১০ই জুলাই ১৯৮১। তুলসী দত্তের মৃত্যুতে সারা আগরতলার সঙ্গে অন্বেষকে শোকের ছায়া নেমে আসে। এক শোক সভায় মিলিত হয়ে তারা পরলোকগত নাট্যশিল্পী এবং ক্রীড়াবিদ বন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানায়।

তুলসী দত্ত

মাদ্রাজে যাওয়ায় আগের দিন আমরা তাঁকে বিদায় জানাতে গেলে হাসতে হাসতে অভিনয়ের ভঙ্গিতে তুলসী দত্ত পাশে তাঁর স্ত্রী সেবা দত্তকে নিয়ে বলে—'কিচ্ছু ভাববেন না, ওপন হার্ট সার্জারির পর ফিরে এসে এমন অভিনয় করব যে আমার গলা

হলের শেষ মাথায় গিয়ে আবার আমার কাছে ফিরে আসবে।'

তুলসী দত্ত-র অকাল মৃত্যুতে অন্বেষকের সদস্যরা এত বেশী ভেঙ্গে পড়ে যে নাটক করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না, স্মৃতি সতত তাদের কুরে খেতে লাগলো; অবশেষে নাটক আর পরিচালনা করতে পারলেন না শক্তি হালদার। অন্বেষক ডুবে গেল নাট্যজগৎ থেকে।

নাট্য পরিচালক শিল্পী শক্তি হালদার হতাশায় ডুবে গেলেন, স্থির করলেন আর অভিনয় করবেন না, নাট্য প্রযোজনাও না। কিন্তু নাটক যার রক্তে সে কতদিন চুপ করে থাকবে। শোক সবাই একদিন ভুলে যায়, দু এক বছর পর আবার নাট্য পরিচালনায় হাত লাগালেন—'মুক্তধারা' এবং পরে 'শিল্পতীর্থ' সংগঠনে।

সরকারী স্কুল তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষক শক্তি হালদার। স্কুলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতে হয়। শক্তি হালদারের গৃহিনা, গুণী রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী মধুছন্দা সঙ্গীত পরিচালিকা, নৃত্য শিল্পী পূরবী চন্দ থাকতেন নৃত্য পরিচালনায়। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান হতো অপূর্ব। ছাত্রীদের নিষ্ঠা ছিল, ছিল শিল্পের প্রতি ভালবাসা। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতী বাসনা দেববর্মার ছিল আন্তরিক সহানুভূতির স্পর্শ। ফলে সব প্রাণময় হয়ে উঠতো।

শক্তি হালদারের তৃপ্তি নেই শুধু ছোটদের নিয়ে। প্রস্তাব দিলেন শিল্পী মধুছন্দা সুরকে—আসুন আমরা একটা দেশাত্মবোধক গানের দল গড়ে তুলি। এক কথায় রাজি মধুছন্দা। তখন যুব সমিতিকে সঙ্গে নিয়ে নতুন সরকার গড়েছে কংগ্রেস। জনসংযোগ ও পর্যটন অধিকর্ত্তা গুরুপদ সাহু। একদিন ডাক পড়লো শক্তি হালদারের। মন্ত্রী বাহাদুরের ইচ্ছা শক্তিবাবু আবার যাত্রার হাল ধরেন। শক্তি হালদারের জবাব—বামফ্রন্টের সময় যাত্রা উন্নয়নের কর্মকর্ত্তারা তাঁকে বাতিল করে দিয়েছে—এই দীর্ঘ কবছর যাত্রা কোন অবস্থায় আছে কিছুই জানা নেই। তখন তিনি উপ-অধিকর্তা শিল্পী গৌতম দেববর্মাকে সঙ্গে দিয়ে একটি সরকারী গাড়ীতে ত্রিপুরার সমস্ত যাত্রা সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করে দিলেন। উত্তর ত্রিপুরায় সমীক্ষা শেষ করে দক্ষিণ ত্রিপুরার যাওয়ার যখন তোড়জোড় চলছে, ঠিক সেই সময় মি: সাহুকে হারধন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে এক বিরাট

মুক্তধারার কান্না নাটকের একটি দৃশ্য

দল ঘেরাও করে বসলো। বক্তব্য একটাই : শক্তি হালদার CPM এর দালাল, তাকে কেন যাত্রার উন্নয়নের কাজে লাগানো হোল? কংগ্রেসের কালচারাল সেলের লোক তারা—তারা এ অবিচার সহ্য করতে রাজী নয়।

শক্তি হালদার বাতিল হয়ে গেলেন CPM এর লোক এই অভিযোগের ভিত্তিতে। অধির্কতা সাহেবও বিপদগ্রস্ত হলেন।

সৃষ্টি হলো 'মুক্তধারা'। ত্রিপুরায় সম্প্রীতি নষ্ট হতে চলেছে। দেশাত্মবোধক গানের মাধ্যমে দেশের প্রতি, দশের প্রতি মুক্তধারা তার কর্ত্তব্য পালন করবে। কিছুদিন চললো বেশ ভালই, তারপর শিল্পীরা সবাই অনুভব করলেন— পণ্ডশ্রম, বৃথা এ জাগরণের গান। যারা জেগে ঘুমোয় তাদের ঘুম ভাঙাবে কার সাধ্যি। তাই আবার ফিরে এলো এরা। নাটক হবে, মুক্তধারার ব্যানারে আবার নাটক হবে। যেমন কথা তেমন কাজ, প্রথম প্রযোজনা আবার 'রক্তকরবী', আবার রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথই বিপদের বন্ধু। রক্ত করবীতে পরিচালক এবং রাজা—শক্তি হালদার, নন্দিনী—পূর্বিতা হালদার, বিশু পাগল—তপন ভদ্র, সর্দার—শিশু সেনগুপ্ত, গোঁসাই—দীপক বণিক, মেজ সর্দার—কার্তিক বণিক, অধ্যাপক—বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, চন্দ্রা—চন্দ্রা সেনগুপ্তা, ছোট সর্দার—রাজীব ব্যানার্জী এবং অন্যান্যরা। তিল ধারণের জায়গা ছিলনা টাউন হলে। হাউস ফুল হলেও কিছু দর্শক দাঁড়িয়ে নাটক দেখে গেছে। প্রথম প্রযোজনায় সার্থকতা এনে দিল মুক্তধারার। রক্তকরবী প্রথম মঞ্চস্থ হয় টাউন হলে ২৩শে মার্চ ১৯৯২। দ্বিতীয়বার অভিনয় হয় রবীন্দ্রভবনে ৯ই এপ্রিল ১৯৯২-তে।

পূর্বিতা হালদার

এরপর দ্বিতীয় প্রযোজনা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', পরিচালনায় বিশ্বজিৎ সেনশর্মা। প্রধান চরিত্রে, কপিলা-পূর্বিতা হালদার-এর অভিনয় সেদিনের দর্শক বহুকাল মনে রাখবে। নাটকটি ৫ই মার্চ ১৯৯৩ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয়।

তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর আয়োজিত ভারত ছাড় আন্দোলনের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে জেলা ভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতায় ৯২-এ 'মুক্তধারা' নিবেদন করে 'জাগ্রত গণদেবতা' ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯২। নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন শক্তি হালদার। আলো—দেবল চ্যাটার্জী, রূপসজ্জা—মিত্রারুণ হালদার, সঙ্গীত পরিচালনা—পূর্বিতা হালদার, আবহসঙ্গীত—প্রভাত পাল ও শ্যামল দেবনাথ। অভিনয়াংশে—দীপক বণিক, পার্থগোবিন্দ চক্রবর্তী, আশিস চক্রবর্তী, মনোজ ঘোষ,

কিরীট দেবনাথ, রাজীব ব্যানার্জী, আশিস তারণ, লিটন সাহা, হীরালাল সাহা, অঞ্জন দেবরায়, শিশু সেনগুপ্ত, পূবির্তা হালদার, নিরঞ্জন সাহা, শক্তি হালদার, চন্দ্রা সেনগুপ্তা। নাটকটি প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

ইতিমধ্যে বেণুধর গোস্বামী বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সংস্থার সঙ্গীত শাখা নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায়। ফলে গঠন করেন দ্বিতীয় 'মুক্তধারা'। নামের শুধু কিছু পরিবর্তন করে 'মুক্তধারা সাংস্কৃতিক সংস্থা' এই নামে রেজিস্ট্রেশন করে নিজেকে সম্পাদক বলে ঘোষণা করেন। ব্যাঙ্ক টাকার লেনদেন বন্ধ করে দেয়। দুই মুক্তধারা হওয়ায় মানুষ বিভ্রান্ত হতে থাকে। মুক্তধারার সদস্যরা নিরুপায় হয়ে মুক্তধারার পরিবর্তে 'শিল্পতীর্থ'র ব্যানারে নাট্যপ্রযোজনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত বুদ্ধদেব বসুর পুনর্মিলনের একটি দৃশ্যে শিশু সেনগুপ্ত, আশিস তারণ, পূর্বিতা হালদার, নমিতা হালদার ও রাজীব ব্যানার্জি

'শিল্পতীর্থ'-র প্রথম নাট্য প্রযোজনা নেশার বিরুদ্ধে বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আয়না'। অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভবনে ২রা এবং ২১শে আগষ্ট ১৯৯৩ সালে। এই নাটকে এরা ঘোষণা করে—'আমরা মুক্তধারার সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' নাটক দুটি সফলভাবে মঞ্চস্থ করেছি। 'মুক্তধারা' দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় সদস্যগণ শিল্পতীর্থ সংস্থার নামে নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শিল্পতীর্থ শিল্পকলা, সঙ্গীত এবং নাটক শিক্ষণ এবং প্রয়োগের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

মধু দেববর্মা পরিচালিত 'দিবা কথমা' নাটকের একটি দৃশ্য

'আয়না' নাটকটি পরিচালনা করেন—শক্তি হালদার, সহ পরিচালক—শিশু সেনগুপ্ত। আলো—দেবল চ্যাটার্জী, রূপসজ্জা—মিত্রারুণ হালদার, সঙ্গীত ও আবহ সঙ্গীত—পূর্বিতা হালদার, শব্দ—মনোজ সাহা।

অভিনয়ে ছিলেন—কার্তিক বণিক, দীপক বণিক, রাজীব ব্যানার্জী, বিশ্বজিৎ সেনশর্মা, জয়ন্ত পুরকায়স্থ, শিশু সেনগুপ্ত, আশিস তারণ, মিত্রারুণ হালদার, লিটন সাহা, সিদ্ধার্থ চক্রবর্তী, চন্দ্রা সেনগুপ্ত, পূর্বিতা হালদার।

এরপর লক্ষ্ণৌতে বেঙ্গলী ক্লাব আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার উদ্দেশ্যে শিল্পতীর্থ বুদ্ধদেব বসুর অবিস্মরণীয় নাটক 'পুনর্মিলন' আগরতলা টাউন হলে ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৯৫ মঞ্চস্থ করে এবং ১২ই জানুয়ারী ১৯৯৫ লক্ষ্ণৌ-এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

প্রতিযোগিতায় পরের বছর অংশগ্রহণের জন্য শক্তি হালদার রচিত এবং মধু দেববর্মা পরিচালিত নাটক নুতন আঙ্গিকে এবং ককবরক ও বাংলা মিশ্রিত ভাষায়—'দিবা কথমা' প্রথম রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ হয় এবং পরে লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত প্রকাশচন্দ্র ঘোষ স্মৃতি পূর্ণাঙ্গ নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। আরো একবার আগরতলা টাউন হলে এই নাটকটি মঞ্চস্থ হয়—পূর্বিতা হালদার ও রাজীব ব্যানার্জীর অভিনয় চাতুর্য সকলের প্রশংসা পায়।

এরপর, পরপর কার্তিক বণিকের পরিচালনায় নাটক মঞ্চস্থ হতে থাকে—'এখনও দুঃসময়' টাউন হলে, 'হিন্দুস্থান ও বিপন্ন স্বদেশ' রবীন্দ্রভবনে, (নাটকটি স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করে) 'ঝড়ের পাখি'—টাউন হলে, 'সদর দরজা' রবীন্দ্রভবনে, 'কৃষ্ণ গোবর্ধন' রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

পারিবারিক কারণে শক্তি হালদার ত্রিপুরা ত্যাগ করায় সদস্য কার্তিক বণিক ও শ্যামল চৌধুরীর অভিভাবকত্বে মুক্তধারার গতিবেগ অব্যাহত আছে একেবারে নবাগতদের নিয়ে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শক্তি হালদার রচিত এবং পরিচালিত ও উত্তম কুমার সিংহ নির্দেশিত নাটক 'কান্না' (ত্রিপুরার কান্না) ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৭ টাউন হলে মঞ্চস্থ হয়।

নাটকটি ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। এই নাটকের উদ্যোক্তাদের বক্তব্য : বর্তমানে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী সমস্যায় শুধু মানুষের জীবন ধন-সম্পত্তি নয়, ত্রিপুরার ইতিহাস, ত্রিপুরার ঐতিহ্য, ত্রিপুরার সংস্কৃতি আজ বিপন্ন। তাই আজ নতুন প্রজন্মের কাছে ত্রিপুরার প্রাচীন গৌরব গাথা আমরা নাটকের আকারে তুলে ধরলাম। ত্রিপুরার সচেতন মানুষকে এবার প্রশ্নের সামনে দাঁড় করাতে চাইছি। নাটকটির প্রয়োগ নৈপুণ্য

সম্পূর্ণ নতুন ধরনের, তাই অনেক জায়গায় সাধারণ দর্শকের বুঝতে একটু অসুবিধা হয়, তবুও সার্বিক ভাবধারায় সাধারণ এবং অসাধারণ দর্শককে অভিভূত করতে পারবে এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ঊনকোটিশ্বর দেবমূর্ত্তিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার রাজমহারাজদের ধর্মীয় সহাবস্থানের ভিতর দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষকে এক ঐক্যের সূত্রে গাঁথার মহৎ চিন্তা ছিল, যদিও আজকের মত সেদিনকার রাজ্যলোভী উদয় মাণিক্যের কলঙ্কিত অধ্যায়-ও তবুও রতনমণির মত বিদ্রোহী সন্ন্যাসী ঐতিহাসিক; আজো এই ভয়াবহ দিনে আমাদের আশার আলো হয়ে জ্বলছেন।

আমরা আশাবাদী, আপনাদের মত আমরা সবাই উজ্জ্বল দিনের আবির্ভাবে বিশ্বাসী; সেই বিশ্বাস নিয়ে আমাদের নাটক আজকের 'কান্না'।

কান্নায় যারা অংশ নিয়েছিল—

উত্তমকুমার সিংহ, লিটন সাহা, পিন্টুলাল সাহা, মনোজ সাহা, সৌম্য চৌধুরী, পুরঞ্জন দেব, সমীর আচার্য, প্রণব সিংহ, প্রিতম সিংহ, বর্ণালী সিংহ, প্রণতি সিংহ, নুপুর পাল, ইন্দ্রানী ঘোষ, রাকেশ দত্ত, দীপঙ্কর দেবশর্মা বিপ্লব সাহা, বিকাশ ভট্টাচার্য।

আলো—দেবল চ্যাটার্জী, সঙ্গীত পরিচালনা—অমিয় দাস, নেপথ্য সঙ্গীত প্রদ্যুৎ সিংহরায়, নমিতা দাস, পাপ্পু দাস, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, অমিয় দাস। ঢোলক—যীশু মুখার্জী।

শক্তি হালদারের তত্ত্বাবধানে শিল্পতীর্থ শিশুদের জন্য একটি নাট্যশাখা গড়ে তোলেন। শাখা ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য স্মৃতি ছোটদের নাটক প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটির নাট্যরূপ পরিকল্পনা করেন শক্তি হালদার এবং পরিচালনা করেন রাজীব ব্যানার্জী। একটি নতুন ধরণের উপস্থাপনা দর্শককে মুগ্ধ করে।

অংশগ্রহণকারী শিশু শিল্পীরা :

মৈত্র মহাশয়—গৌরবসুন্দর দত্ত। অন্নদা—জয়ীতা ঘোষ। মোক্ষদা—কুসুমিতা দত্ত। রাখাল—শ্রেয়া ব্যানর্জী। মাঝি—পীযূষ মজুমদার।

ঘোষক এবং অন্যান্য চরিত্রে—অর্কদৃপ্ত চক্রবর্তী, মাল্যবান চক্রবর্তী, মৃন্ময় দেববর্মা, সুজিত ভৌমিক, গৌতম সূত্রধর, অরিত্র ঘোষ, বাপি বণিক, সিদ্ধার্থ ঘোষ. শুভ্রনীল লস্কর।

আলোক সম্পাতে—দেবল চ্যাটার্জী।

অনুষ্ঠানটি ৬ই জুন ১৯৯৫ রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত হয়।

শক্তি হালদারের অনুপস্থিতির কারণে শাখাটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায়।

গঠনমূলক কাজ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'রঙ্গম' নাট্য সংস্থা

রঙ্গমের সম্পাদক প্রশান্ত গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন ঃ ১৯৭১ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী রঙ্গমের নাট্যগোষ্ঠীর পত্তন হয়। শুধুমাত্র নাটক মঞ্চস্থ করাই এর উদ্দেশ্য ছিল না; নাটকের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিশ্বের নাট্যআন্দোলনের সর্বাধুনিক ধারার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করার প্রয়াসই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা নীতিতে বিশ্বাস নয়, সমাজের সর্বাত্মিক অবক্ষয় রোধে বলিষ্ঠ জীবনবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে সাহায্য করাই এই গোষ্ঠীর মূল লক্ষ্য।

রঙ্গমের বিভিন্ন লক্ষ্য—বিভিন্ন ধরণের নাটকাভিনয়, নাট্যমেলার আয়োজন, থিয়েটার ওয়ার্কশপ পরিচালন, বিশিষ্ট অতিথি নাট্যকারের পরীক্ষামূলক নাট্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, আলোচনা সভা প্রভৃতি।

রঙ্গমের প্রথম নাটক মঞ্চস্থ হয় ১৯৭২ এর ১৪ই মে সরকারী মিউজিক কলেজ মিলনায়তনে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'পুস্পক রথ' অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্যর পরিচালনায়। এই বছরের ২৫শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর পর্যন্ত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি-উপলক্ষ্যে নাট্যমেলার আয়োজন হয়। রঙ্গম সহ আরো পাঁচটি সংস্থা এই মেলায় যোগ দান করে। রঙ্গম মঞ্চস্থ করে পুরানো সামাজিক নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী'। ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় ১৯৭৩-র এপ্রিল মাসে 'রঙ্গম' কমলাকান্ত ও তার জবানবন্দী অভিনয় করে। নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় ছিলেন জলধর মল্লিক। রঙ্গমের চতুর্থ প্রযোজনা সমরেশ বসুর 'ছুটির ফাঁদে'। নাট্যরূপ ও নির্দেশনায় অধ্যাপক বামাপদ মুখোপ্াধ্যায়। ১৯৭৪-র ফেব্রুয়ারী মাসে প্রখ্যাত নাট্যকার ও নির্দেশক শ্রী বাদল সরকারের পরিচালনায় সপ্তাহব্যাপী থিয়েটার ওয়ার্কশপের আয়োজন করে রঙ্গম। ৬ই ফেব্রুয়ারী নতুন আঙ্গিকে 'প্রস্তাব' অভিনয় করে দেখান বাদল সরকার। ৭ই ফেব্রুয়ারী বাদল সরকারের নাট্যচিন্তা প্রদর্শনী সহ আলোচনা করা হয়। বিশ্লেষক স্বয়ং শ্রী সরকার। এই বছরেই আরো দুটি নাটক মঞ্চস্থ হয়—মুক্তাঙ্গন আঙ্গিকে রবীন্দ্রনাথের 'কালের যাত্রা', নির্দেশনায় অধ্যাপক জলধর মল্লিক এবং অসিত দাসের 'বৃষ্টি বৃষ্টি'—পরিচালনায় শ্রী সলিল দেববর্মণ। স্থানীয় মিউজিয়ামে একটি সিমপোসিয়ামের আয়োজন করে এরা। ৮ই ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে শরৎচন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ নাট্যমেলার আয়োজন করে রঙ্গম। নাট্যমেলায় রঙ্গমকে নিয়ে মোট পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করে। অন্য দলগুলি হোল—'তিয়াস', 'ত্রিপুরা সংস্কৃতিপরিষদ' 'লিটল ড্রামা গ্রুপ' এবং 'ত্রিপুরা কলাসংস্কৃতি কেন্দ্র'।

ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনে রঙ্গম এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠার ভিত সুদৃঢ় করেছে নিঃসন্দেহে।

নাট্যকার পরিচালক অধ্যাপক জলধর মল্লিক তাঁর নির্দেশিত নাটক গুলিতে যে স্বকীয়তার পরিচয় রেখেছেন তা দর্শককে অভিভূত করেছে। আঙ্গিক এবং গুণগত দিকও সহজ সরল অথচ বৌধিক প্রকাশ নাট্য আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছে।

বিভিন্ন নাটকে রঙ্গমের সহযোগী শিল্পীবৃন্দ

বামাপদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথেশ দেবরায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সুখময় ঘোষ, শ্যামল চন্দ, অজয় নন্দী, অমরেন্দ্র রক্ষিত, অমিতাভ দেবরায় কৃষ্ণধন নাথ, গোপাল চৌধুরী, নগেন সাহা, বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, বেণুধর চক্রবর্তী, রঞ্জিত ভৌমিক, সলিল দেববর্মণ, সুকুমার দাস, মীরা ঘোষ, শেলী মুখোপাধ্যায়, সবিতা দেববর্মণ।

মোহিত চট্টপাধ্যায়ের 'পুস্পক রথ' নাটকটি ১৯৭২ সালের ১৪ই মে প্রথম প্রযোজনা হিসাবে আগরতলার সরকারী মিউজিক কলেজে মঞ্চস্থ হয়।

নাট্য-সূত্র : ঘড়ির কাঁটারও একটা স্বাধীন সত্বা আছে, সে খুশিমত স্লো—ফার্ষ্ট হয়। কিন্তু জীবনের দুর্ভাগ্য আর ক্লান্তিতে আমরা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। এ জীবন থেকে তাই মুক্তি হয়ে ওঠে একান্ত অভিলাষ। হয়তো আমরা অনেকেই এসে তখন ভিড় করি একটা কাল্পনিক স্টেশনে।

পাড়ি জমানোর স্বপ্ন দেখি এমন এক রাজ্যে যেখানে মুক্ত জীবনে আসে পরিপূর্ণতার আনন্দ। স্বপ্ন হয়ে ওঠে সত্য। পৃথিবীর নির্দয় ব্যবহার হয়ে যায় অতীতের দুঃস্বপ্ন মাত্র।

কিন্তু আরেকটা পৃথিবী কি সত্যিই আছে? অন্ততঃ শিবেন তাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, কেননা, তা না হলে যে এই দুঃস্বপ্নের পৃথিবীতে সে বাঁচবে না। বিশ্বাস করে অবসরপ্রাপ্ত কেরাণী সুখরঞ্জন ও তার স্ত্রী বিন্দু, যাদের অনেক সাধ এই পৃথিবী মেটায়নি। বিশ্বাস করে অফিসের টেবিলে একভাবে বসে কাজ করে ক্লান্ত শুভা, কিংবা বেকার নিষ্কর্মা যুবক পাম্পু। কেননা এদের কাছে এই বিশ্বাসটুকুই যে শেষ আশ্রয়স্থল।

পুষ্পক রথের অপেক্ষা করে সবাই। আর তখনই আবির্ভাব 'লোকটির', যার পরিচয় আমরা জানিনা কিন্তু সে রথের সারথিদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই পৃথিবীর হয়েই সালিসী করতে থাকে। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই, অত্যন্ত নাটকীয় ভাবে সে প্রমাণও করতে সমর্থ হয় যে—পৃথিবীর অভিশাপ এড়াতে যে রথে ওরা পাড়ি জমাবে, সেই রথে ওরা ছাড়াও আরো দুটো জিনিষ থাকবে। যার একটি রক্ত গোলাপী যাকে বলা যায় চাঁদ মামার রাঙা কৌটো। আর অপরটির রং কালো—যার মধ্যে গোপনে চালান যাচ্ছে পৃথিবীর জমাট অভিশাপ নূতনতর পরীক্ষার পরিকল্পনায়।

যাওয়া আর হলো না। মৃত্যুময় পৃথিবীতেই থেকে গেল ওরা। কিংবা তার জন্যেই কি বেঁচে গেলো?

নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সলিল দেববর্মণ, মীরা ঘোষ, সুখময় ঘোষ, সবিতা দেববর্মণ, কৃষ্ণধন নাথ, অমরেন্দ্র রক্ষিত, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, রঞ্জিত ভৌমিক, প্রমথেশ দেবরায়, প্রশান্ত গাঙ্গুলী। নাট্য পরিচালনায় ছিলেন—বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য।

১৯৭৫ সালে ৮ই ডিসেম্বর 'শরৎ নাট্যমেলায়, নাট্যমেলার আয়োজক 'রঙ্গম'এর আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক 'ভবঘুরে শ্রীকান্ত' দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন শ্রীবামাপদ মুখ্যোপাধ্যায়। 'শ্রীকান্ত' চারখণ্ডে বিস্তৃত একটি এপিক উপন্যাস, ভবঘুরে শ্রীকান্ত তার চলার পথে ভগবানের বিচিত্র সৃষ্টির যে রূপ প্রত্যক্ষ করেছে, তাই এ উপন্যাসের মূল উপজীব্য। কার্যকারণের জালবিস্তারে সুসংবদ্ধ আখ্যান বস্তুর স্বাদ হয়তো এ উপন্যাসে পাওয়া যায় না; তবুও বিরাট এক দৃশ্যপটের এখানে ওখানে ছড়িয়ে থাকা কয়েকটি রসঘন মুহূর্ত নাটকীয়তায় অনবদ্য। সেগুলিকে রসিকজনের পরিবেশন করার দায়বদ্ধতা ত্রিপুরার নাট্যরসিকরা চিরকাল স্মরণ করবে।

বিভিন্ন চরিত্রে যোগ্যতার সঙ্গে অভিনয় করেছেন অমিতাভ দেবরায়, বামাপদ মুখোপাধ্যায়, অজয় নন্দী, প্রশান্ত গাঙ্গুলী, প্রমথেশ দেবরায়, বাণীকণ্ঠ ভট্টাচার্য, গোপাল চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র সাহা, শ্রীমান রাণা চক্রবর্ত্তী, পার্থ সাহা, রাজা চক্রবর্তী, পার্থ দাস, ডঃ অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণা পোদ্দার, বেলা মজুমদার, শেলী মুখার্জী, জয়শ্রী দেবরায়। আলোকসম্পাতে ছিলেন হরিপদ দাস এবং রূপসজ্জায় চিন্ময় রায়।

একটি পরিচ্ছন্ন নাট্য সংস্থার নাম
'তিয়াস'

১৯৭৫ সালের ১১ই মে 'তিয়াস' নাট্যসংস্থার কার্যকরী কমিটি গঠিত হোল। সভাপতি ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, সম্পাদক দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত, প্রচার প্রধান অরুণেন্দু বিকাশ রায়, প্রযোজনা প্রধান অর্দ্ধেন্দু দাশ, কোষাধ্যক্ষ কল্যাণী দাশগুপ্তা।

কোনো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নাটক তিয়াস মঞ্চস্থ করেনা। নাট্যাভিনয়ে তাঁদের নিষ্ঠা এবং মার্জিত ও ভদ্র আচরণ সবার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

তিয়াসের উল্লেখযোগ্য দুটি নাটক : প্রথমটি ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৭২ সনে রঙ্গম আয়োজিত বঙ্গরঙ্গমঞ্চের শতবর্ষ পূর্তি নাট্যমেলায় অভিনীত হয়—পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'মলাটের রং মুহূর্ত'। নাটকটি একটি আধুনিক সমস্যামূলক নাটক।

নাটকের কথায় : আমাদের করুণ হৃতসর্বস্বতার মুহূর্ত্তগুলি চুপিসারে কখন যে জীবনের

মলাটের রং হয়ে দাঁড়ায় তা বোধ করি আমরা কেউ জানিনা। বাইরের স্তরে যে একজোড়া দম্পতি আপনাদের চোখের সামনে একটা রাত্তিরের জন্য থাকতেন, তাঁদের ভেতরের কণ্ঠস্বরগুলি সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা যা উচ্চারণ করিনা, সেই অনুচ্চারিত সংলাপের নাটক, আজকের নাটক, শিল্প অঞ্চলের অসহায় একই বৃত্তে পাক খেয়ে ফেরা নিশিজীবন শুধুই নিশিযাপন নয়, বুঝি তা একটি সমগ্র প্রভাতের জন্য হাহাকারের বিশেষ আর্তি, আর সেই আর্তির কথাই এ নাটকের বক্তব্য।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন ডাঃ এইচ, এস রায়চৌধুরী। মঞ্চ—নীরোদ মজুমদার ও দিলীপকুমার দাস। শব্দ—দিলীপ কুমার দাস। আলো—নারায়ণ সরকার, শিশুতোষ রায়, মাণিক পাল। রূপসজ্জা—চিন্ময় রায়।

বিভিন্ন চরিত্রে ছিলেন : শ্রীমতী দীপ্তি রায়চৌধুরী, ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, শ্রীমতী রেখা ভট্টাচার্য, দিব্যেন্দু সেনগুপ্ত, শংকরসেবক দাশ, শেখরেশ ভট্টাচার্য।

তিয়াসের আর একটি নাটক ১৫ই এপ্রিল ১৯৭৩-তে ত্রিপুরেশ নাট্য মেলায় মঞ্চস্থ হয়। নাটক-মোহিত চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মৃত্যু সংবাদ'। চরিত্র চিত্রণে ছিলেন—অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্দ্ধেন্দু দাস, শেখর ভট্টাচার্য, তন্ময় দত্ত, ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী, অলক বন্দোপাধ্যায়, শঙ্করসেবক দাস, বিপ্লব দেবগুপ্ত, প্রণব ভট্টাচার্য ও অন্যান্য।

মঞ্চ—দিলীপ দাস, নীরোদ মজুমদার। আলো—শিশুতোষ রায়, মাণিক পাল। পরিচালক ছিলেন ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরী।

১৫ই জুন ১৯৭৪ রবীন্দ্রভবনে 'তিয়াস' মঞ্চস্থ করে 'অরুণোদয়ের পথে'। নাটক সলিল চৌধুরী রচিত. Lady Gregory-র অনুবাদ হয়। পরিচালক ছিলেন ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায় চৌধুরী।

১৯৭৭ সালে বাদল সরকার রচিত 'পাগলা ঘোড়া' নাটকটি ডাঃ হেমেন্দুশঙ্কর রায়চৌধুরীর পরিচালনায় তিয়াস নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

উত্তাল তরঙ্গ তুলে ত্রিপুরার নবনাট্য আন্দোলনে গতিবেগ এনেছিল আগরতলার নাট্য শিল্পী সংসদ

১৯৬২ সালে কতিপয় উৎসাহী তরুণের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নাট্য শিল্পী সংসদ। এর মধ্যমণি হলেন হারাধন দত্ত।

নাট্যশিল্পের চর্চা, সংগঠনপ্রীতি, আন্তরিকতাই ছিল ওদের মূলধন। ১৯৫২ সালে 'স্বীকৃতি' নাটক উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই এদের আত্মপ্রকাশ; সংস্থার প্রথম সম্পাদক ছিলেন সত্যেন লস্কর।

ত্রিপুরার নবনাট্য আন্দোলনে এই সংস্থা একটি দায়িত্ব-সচেতন ভূমিকা পালন করে।

এখানে অনুশীলন করে বহু নাট্যশিল্পী যাত্রা ও নাটকে নিজেদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

১৯৬৭ সালে ১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এই সংস্থা 'শ্রেষ্ঠদল' হিসাবে সম্মানিত হয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭০ সালে ২য় শ্রেষ্ঠদল, ত্রিপুরা যাত্রা প্রতিযোগিতায় ১৯৮৫ সালে শ্রেষ্ঠদল হিসাবে পুরস্কৃত হয়। ১৯৮৬ সালে ২য় শ্রেষ্ঠদলের সম্মান লাভ, এ-ছাড়া বহু প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী, শ্রেষ্ঠ পরিচালকের মর্য্যাদা পেয়েছে।

১৯৮৭ সালে সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে বাংলা দেশের আজাদী নাট্যশিল্পী সংস্থার আমন্ত্রণে ত্রিপুরা থেকে এই প্রথম নাট্যশিল্পী সংসদ বাংলা দেশ সফরে যায়। সেখানে 'নটী বিনোদিনী' নাটক মঞ্চস্থ করে দর্শকদের দ্বারা অভিনন্দিত হয়।

শুধুমাত্র নাটক ও যাত্রা অভিনয়ের মধ্যেই সংসদের কাজকর্ম সীমিত থাকে নি, সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনেও সংসদ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছে। দুঃস্থ ছাত্রীদের সাহায্য, অসুস্থ যাত্রা শিল্পীদের চিকিৎসাকার্যে সহায়তা দান, দেশের প্রয়োজনে ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য করা ইত্যাদি কাজে এরা ছিল সমান উৎসাহী।

মরীচ সংবাদ নাটকের একটি দৃশ্য

যাত্রা এবং নাটক অভিনয় একই সঙ্গে করে এই দুই আঙ্গিকের ফারাক দূর করতে সচেষ্ট ছিল সংসদ; এটা তাদের উল্লেখযোগ্য দিক। যাত্রার প্রতি অবজ্ঞার যে ভাব একদল উঠতি নাট্যশিল্পীদের মধ্যে সব সময় কাজ করছিল, সংসদ একই সঙ্গে দুই আঙ্গিকে সমান পারদর্শিতা দেখিয়ে প্রমাণ করেছে তাদের অভিনয় দক্ষতা।

নাট্যশিল্পী সংসদের অভিনীত নাটক এবং যাত্রার তালিকা অনেক দীর্ঘ। প্রথমে 'স্বীকৃতি', তিনবার অভিনীত হয়েছে। তারপর 'নিষ্কৃতি', তিন বার; 'যার কেহ নাই' একবার; কেদার রায়' একবার; 'ভাড়াটে চাই' একবার; 'কার দোষ' কুড়িবার অভিনীত হয়। এইভাবে 'কুশধ্বজ' দুইবার, 'রাণার' দুইবার, 'শতাব্দীর স্বপ্ন' পাঁচবার, 'ঝড়' নাটকটি দশবার অভিনীত হয়। '১৯৬৫' চারবার, 'বিশ-পঞ্চাশ' তিনবার, 'ঝংকার' পাঁচবার, 'উত্তাল তরঙ্গ' আঠার বার। 'স্নেহের জয়' দুবার, 'পোষ্ট মাষ্টার' দুবার, 'গ্রামের নাম পদ্মবিল' একবার, 'মহাপথের যাত্রী' দুবার। এছাড়া যাত্রা পালার অভিনয় হয়েছে 'নটী বিনোদিনী' আটবার, 'মা মাটি মানুষ' চারবার, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' আটবার, 'বৈকুন্ঠের খাতা' একবার, 'ধর্ম সিংহাসন' একবার, 'রাজ সিংহাসন' একবার, 'বাংলার বধূ' দুবার। 'শতাব্দীর স্বপ্ন', 'পাগল ঠাকুর, 'তাসের ঘর, 'ধূলার স্বর্গ', টিপু-সুলতান বহুবার অভিনীত হয়।

নাট্যশিল্পী সংসদ ছিল এক বিরাট সংসার। এই সংসারে সদস্য সত্যেন রায়চৌধুরী, অল্পকালের জন্য অজিত মজুমদার, নারায়ণ দাশ, রূপেন চক্রবর্তী, বাসুদেব গাঙ্গুলী, নিতাই বেলোয়াড়, নিমাই মজুমদার, রবীন্দ্র লস্কর, ধনরাজ নাগী, পারুল মজুমদার, লীলা দেবনাথ, খেলা দেবনাথ, ডলি ধর, উষা চক্রবর্তী, বকুল দে, দুলি দে, রঞ্জিতা দে, লক্ষ্মী সিংহরায়, কল্পনা দেববর্মা, সাবিত্রী মিশ্র, মনোরমা ভৌমিক, অতসী বণিক, অপর্ণা দাস, তুলসী দে, তনুশ্রী দে, রিংকী ভৌমিক এবং কাবেরী দেববর্মা। কাবেরী দেববর্মা ঠাকুর পরিবারের মেয়ে। যেমন তার অভিনয় চাতুর্য, তেমনি সংসদের অভিনয়ের মান উন্নত করতে সে সহায়তা করেছে। অত্যন্ত শক্তিশালী অভিনেতা হারাধন দত্ত এবং বিধায়ক লস্কর। এঁদের সংযত এবং হৃদয়গ্রাহী অভিনয় ত্রিপুরার নাট্যমোদিরা চিরকাল মনে রাখবে।

হারাধন দত্ত, অনিল দেবনাথ, গণেশ দেব, কাবেরী দেববর্মা, কঙ্কণা সাহা, প্রদ্যোৎ নারায়ণ ঘোষ এবং রূপেন চক্রবর্তী—এরা ছিল সংসদের স্তম্ভস্বরূপ। নবনাট্য আন্দোলনে এদের অবদান ত্রিপুরার সংস্কৃতি জগৎ কোন দিন ভুলবে না।

ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ

'সম্ভাবনাময় মারীচ সংবাদ'— লিখেছেন নাট্যকার পরিচালক মাণিক চক্রবর্ত্তী সীমান্তপ্রকাশ পত্রিকায় ঃ

ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ, নাটক যাঁদের কাছে সময় কাটানো, Art for art's sake, আত্মার তাগিদ, প্রতিষ্ঠা, অর্থ এসব নিয়েই নয়, বরঞ্চ নাটক যাঁদের কাছে 'অস্ত্র' (অপসংস্কৃতি রোধক ও শ্রেণী সংগ্রামের) এবং কখনো to protest and enlightenment — তাঁরা গত ২২শে নভেম্বর রবীন্দ্রভবনে অরুণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'মারীচ সংবাদ' মঞ্চস্থ করলেন, ১১শ রজনীর অভিনয়।

Protest and enlightenment এর প্রবক্তা ব্রেখট সাহেবের এপিক থিয়েটার-এর মূল তত্ত্ব অনুকরণে নাটকটির গঠন এবং প্রয়োগেও এপিক থিয়েটারের বিশেষ ফর্মগুলির ব্যবহার দেখে স্থিরনিশ্চিত ধারণা জন্মে যে, ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক পরিষদ এ নাটকটি মঞ্চস্থ করেছেন বিশেষভাবে Protest and enlightenment কে মনে রেখেই।

নাটকের শুরুতেই বাজীকর দুই সাকরেদ সহ অন্যান্য খেলোয়াড়দের নিয়ে প্রেক্ষাগৃহ থেকে মঞ্চে উঠলেন। উদ্দেশ্য যাতে প্রথম থেকেই দর্শক রিয়ালিটির মায়া কাটাতে পারেন। এক কথায়, দর্শক ও অভিনেতার মধ্যেকার ইলিউশনকে উপেক্ষা করা। কিন্তু সেইসময় অন্ধকার থেকে বাজীকরের কণ্ঠ ও ডুগডুগির শব্দ কিছুটা 'ম্যাজিকেল'। এরপরেই স্পট লাইটে ড্রিম আলোয় বাজিকরের ম্যাজিক দৃশ্য কিছুটা ড্রামাটিক, এতে ব্রেখটের ন্যারেটিভ কর্ম ব্যাহত এবং আহত হয়েছে। একই দোষে দুষ্ট নাটকের আরো বিভিন্ন দৃশ্যে যেমন অন্ধকারে চরিত্রের প্রবেশ, আলো-ছায়ার যাদুর দৃশ্য, বিশেষ চরিত্রে

বিশেষ আলো ইত্যাদি। মঞ্চে আলো থাকবে প্রচুর, আলোর খেলা দর্শকদের বিভ্রান্ত করবে না, তাদের চিন্তা শক্তিকে আঘাত করবে না, যা কিছু ঘটবে তা নগ্নভাবে দেখানোই হবে আলোর কাজ—ব্রেখট সাহেবের এই নির্দেশ নাটকে পরিচালক শুধুমাত্র উপরিলিখিত দৃশ্যগুলি ছাড়া মানতে পেরেছেন।

মারীচ সংবাদ নাটকে 'জাদুকর' চরিত্রটি নাটকের সঙ্গে দর্শকদেব চিন্তার প্রথম, প্রধান এবং প্রয়োজনীয় সেতু। জাদুকর বলতেই যেহেতু ম্যাজিক মায়া বিভ্রান্তি হিপ্নোটিজম প্রভৃতি শব্দ মনে আসে, তবুও নাটকে জাদুকরের অস্তিত্ব মঞ্চে ম্যাজিক সৃষ্টি বা হিপ্নোটাইজের জন্য নয়, বরঞ্চ বক্তব্যের খাতিরে নাটকের গঠনশৈলীতে যে ম্যাজিক ও ইলিউশনগুলিকে প্রশ্রয় দেয়া হয়েছিল সেগুলিকে ভেঙ্গে ফেলা। উনি ন্যারেটর, চরিত্রাভিনেতা নন। তাঁর প্রধান কাজ দর্শকের সঙ্গে নাটকের পূর্বপরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া এবং প্রথম থেকেই দর্শকদের বিচার করার পক্ষে উপযুক্ত চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে দেয়া ও মায়া থেকে মুক্ত রাখা। এই গুরুতর দায়িত্বটি সুষ্ঠুভাবে পালনে জাদুকর ভূমিকাভিনেতা সফল হন নি তাঁর উচ্চারণে ও প্রক্ষেপণ অস্পষ্টতার দরুন।

Epic theatre এর সঙ্গীত শিল্পী (অভিনেতা) অবশ্যই 'art's sake কথাটি Sacrifice করবেন। তিনি নিজস্বতা বাদ দিয়ে 'গান' এর মত একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষনীয় মাধ্যম ব্যবহারে দর্শকদের আরো বেশী text এর দিকে ঝুঁকিয়ে দেবেন। দর্শক নাটক দেখতে দেখতে কখনই সঙ্গীতে ডুবে তালে তালে পা নাচাবেন না (নাটকে যা হয়েছিল ঐ দিন)। কোন গায়ক অভিনেতা কখনোই তাঁর অভিনয় জৌলুষে তাঁদের মুগ্ধ করবেন না (মেরী বাবা চরিত্রাভিনেতা যা করেছেন)। ফলত মারীচ সংবাদ নাটকের সবচাইতে অসফল শিল্পী মেরীবাবা ভূমিকা অভিনেতা গায়ক শিল্পী। তিনি যখনই মঞ্চে এসেছেন তখনই দর্শকদের 'চিন্তা' থেকে দূরে সরিয়ে তাঁর অভিনয় ব্যক্তিত্বের আবেশে ভরিয়ে ফেলেছেন। এতে নাটকে তাঁর উপস্থিতি ও তার মাধ্যমে নাট্যকার যে সব প্রয়োজনীয় শিক্ষা (social education) দর্শকদের দিতে চান, তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। নাটকের ঐ দৃশ্যগুলি বক্তব্যের বিশ্লেষণ না হয়ে তাই চমকদার Dramatic theatre এ পর্যবসিত হয়েছে।

যাদুকর গায়ক এবং তাদের সহযোগীদের বাদ দিয়ে 'মারীচ সংবাদ' নাটকের মূল তিনটি Plot এর মধ্যে একমাত্র ঈশ্বর লাঠিয়াল অংশটুকু দর্শকগণ মোটামুটি অনুধাবন করতে পেরেছেন; অন্য দুটি অংশ, মারীচ ও গ্রেগরী, অনেকাংশেই অস্পষ্ট (enlightenment এর প্রশ্নে)। এই অস্পষ্টতার জন্য বিভিন্ন ন্যারেট্যারদের বাদ দিয়ে দায়ী করা যায় ঐ অংশগুলির অভিনেতাদের, কারণ তাঁরা অভিনয়ে alienation effect আনতে পারেননি যা ছিল বক্তব্যের খাতিরে অপরিহার্য্য।

বিভিন্ন অভিনেতা যদিও মাঝে মাঝে epic acting এর সূত্র মেনে চলেছেন কিন্তু এত অল্প সময়ের জন্য যে মনে হয়েছে তাঁরা epic acting সম্পর্কে একেবারে কোন চিন্তা করেননি, করলেও ফলপ্রসুভাবে নয়; এবং তাই ব্রেখট অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে যে Discussion এর কথা বলেছিলেন (The attitude which he adopts is a

socially critical one. In this exposition of the incident and his characterization of the Person he tries to bring out those features which come within society's space. In this way his performance becomes a discussion (about the social condition) with the audience he is addressing) তার সম্পুর্ণ প্রয়োগ অভিনেতা ও দর্শক কেহই গ্রহণ করতে পারেন নি।

অভিনয়ে চরিত্রের মধ্যে ডুবে যাওয়ার চেষ্টা, সংলাপ এর উপর জোর না দিয়ে চরিত্রের feelings-এর উপর জোর দেওয়া epic acting বিরোধী। চরিত্রাভিনেতা ঐ চরিত্রটি অভিনয় করে দেখাবেন, এবং তিনি ঐ চরিত্রের সাথে কখনোই নিজেকে মিলিয়ে ফেলবেন না, the actor does not allow himself to become completely transformed or the stage in to the character he is portraying. He is not Lear, Harpage .... তিনি মারীচ, গ্রেগরি, রাবণ, কিছুই না তিনি মারীচের চরিত্র অভিনয় করে দেখাবেন যাতে দর্শক ঐ চরিত্র দেখে social condition সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

ঐদিন নাটকে অহীন্দ্র চক্রবর্ত্তী যেভাবে রাবণের চরিত্র অভিনয় করিয়ে দেখিয়েছিলেন তা apic acting এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এইভাবেই রাবণ ভূমিকা অভিনেতার অভিনয় করা উচিত ছিল রাবণের চরিত্রে এবং এমনিভাবেই মারীচ, গ্রেগরি প্রত্যেকেরই।

ঐ দিনকার নাটকে epic acting এর সূত্র সম্পূর্ণভাবে মেনে চলার চেষ্টা করেছেন জমিদার, নায়েব ও ঈশ্বর। উল্লেখযোগ্যভাবে বাল্মীকী (মুখে সিগারেট ও ইংরেজী ভাষা অনেকটা সাহায্য করেছে যদিও)। রাবণ, মারীচ কিছু কিছু মুহূর্ত্ত অনুযায়ী। অন্যান্যরা empathy operation করেছেন সব সময় এবং তাও অনুপযুক্তভাবে, তাই তাঁরা কেউই নাটক অথবা নিজেদের দিকে দর্শকদের আকর্যণ করতে পারেন নি।

যাঁরা epic acting এর চেষ্টা করেছেন তাঁরা আরো সাফল্যজনক হতে পারবেন যদি অভিনয় করা কালীন মঞ্চের সামনেকার অদৃশ্য দেয়ালের কথা যা দর্শক আর মঞ্চকে ভাগ করে রেখেছে, ভুলতে পারেন। অভিনয় করাকালীন আমরা কখনোই দর্শকদের উপস্থিতির কথা ভুলব না।

দর্শক একটি ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রত্যক্ষ করছেন, এবং ঘটনাকে কেন্দ্র করে দর্শক social condition সম্পর্কে বিচার করছেন। অভিনেতাগণ ঐ ঘটে যাওয়া ঘটনা দর্শকদের সামনে বর্ণনা করছেন নিজেকে ঘটনা থেকে দূরে সরিয়ে শিল্প সম্মতভাবে। মোটামুটি এতটুকু ঐদিন নাটকে মেনে চললে 'মারীচ সংবাদ' থেকে দর্শকগণ আরো বেশী enlightened হতে পারতেন বলে বিশ্বাস করি।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক অভিনেতাই বিভিন্ন মুহূর্তে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। অনেকেই অনেক সংলাপ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছেন। অনেকের gesture-ই মাঝে মাঝে উপযুক্ত হয়েছে। বিভিন্ন কোরাস শিল্পী তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করেছেন স্বল্প

ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যভাবে, সবাই কিছু কিছু মুহূর্তের জন্য প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য, যদিও এবং পেতেনও, যদি নাটকটির গঠন ও প্রয়োগ Brecht এর অনুকরণে epic theatre না হয়ে dramatic theatre হতো। Brecht এর কাছে থিয়েটার Collective Art, সবার চেষ্টায় সম্মিলিত চেষ্টায় নাটক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করবে, ব্যক্তি দলের উদ্দেশ্যকে সফলতার দিকে নিয়ে যাবে, তাই ব্যক্তিগত প্রশংসা তুষ্টি আলোচনার স্থান পেলনা। নাটক নির্বাচনের ব্যাপারে নাটগোষ্ঠীর যে উদ্দেশ্য, তার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হোল? না হলে কেন হয়নি? এ নিয়ে আলোচনা সীমিত থাকল।

ব্রেখট এর নির্দেশিত পদ্ধতির উপযুক্ত প্রয়োগে ব্যর্থ হলেও এবং নাটক নির্বাচনের উদ্দেশ্য to protest and enlightenment এর উপযুক্তভাবে মঞ্চস্থ না হলেও ত্রিপুরা সংস্কৃতিপরিষদ প্রযোজিত মারীচ সংবাদ ত্রিপুরায় রেকর্ড দিন মঞ্চস্থ হয়েছে, এগিয়েছে, সাড়া জাগিয়েছে। তাই ত্রিপুরা সংস্কৃতিপরিষদকে ধন্যবাদ। শুধু প্রশ্ন, এ ধন্যবাদ তো অন্য নাট্যদলও পেতে পারত, নাট্য আন্দোলনে দোলা দেবার অভূতপূর্ব নজির অন্য নাট্যদলও সৃষ্টি করতে পারত।

সংস্কৃতি পরিষদের সাথে অন্যান্য সৌখিন নাট্য দলগুলির যারা নাট্য আন্দোলন ছাড়া অন্য আন্দোলনে বিশ্বাসী নয়, পার্থক্য বের করব? (প্রশ্নগুলি ত্রিঃ সঃ পঃ এর চিন্তা ও উদ্দেশ্যের মৌলিকতার জন্যই এসে পড়ে)।

মরীচ সংবাদ নাটকের একটি দৃশ্যে ওস্তাদের ভূমিকায় হীরালাল সেন

আমাদের প্রশ্নের মীমাংসা হয় যদি ত্রিঃ সা পঃ থিয়েটারের আদি স্থান সম্পর্কে নির্দেশটি মানতে পারেন— The right scientific sceptical Spirit is to be found among the industrial workers, and so the theatre must go straight out into the suburbs where it can stand, as it were, wide open, at the disposal of those who live hard and produce much, so that they can be fruitfully entertained there with their great problems. They may find it hard to pay for our Art and immediatly to grasp the new method of entertainment and we shall have to learn in many respects what they need and how they need it.

আশাকরি ত্রিপুরা সাংস্কৃতিক পরিষদ শীঘ্রই এই নির্দেশটি অন্যান্য নির্দেশপত্রের মতো মানতে পারবেন।

আলোচনাটি ২২-১১-১৯৭৪ ইং তারিখের প্রযোজনায় করা হয়েছিল।

আলোচনাটা এখানে তুলে ধরার অর্থ নাট্যসমালোচনা করতে গেলে সমালোচকের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হওয়া দরকার। তার দৃষ্টান্ত এই সমালোচনা।

ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ ত্রিপুরার একটি প্রথম শ্রেণীর নাট্যসংস্থা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিল অতি অল্প সময়ে। সংগঠনের প্রাণপুরুষ হীরালাল সেন এবং শিবদাস ব্যানার্জী। শিবদাস ব্যানার্জী সংগঠনে দক্ষ এবং ত্রিপুর শিল্পায়তন থেকে তাঁর যাত্রা শুরু। ত্রিপুর শিল্পায়তনে শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' বহু অভিনীত এবং সার্থক নাটক।

সংস্কৃতি পরিষদ প্রথম নাট্য প্রযোজনা করে ২২ এবং ২৩শে নভেম্বর ১৯৬৯-এ। উৎপল দত্ত রচিত নাটক 'রাতের অতিথি' মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে।

হীরালাল সেনের পরিচালনায় সুনীতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'পঞ্চ মিত্র' নাটকটি শিল্পী সংগঠনীর উদ্যোগে তুলসীবতীর ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয় ১৭ই এপ্রিল ১৯৬৮ সালে।

১৪ই এবং ১৫ই মে ১৯৬৪। দেবনারায়ণ গুপ্ত রচিত এবং হীরালাল সেন পরিচালিত 'তাপসী' নাটকটি শিল্পী সমাজের উদ্যোগে উমাকান্ত ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়। ঘোষিত পরিচালক হিসাবে শ্রী সেন এই নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

২৪, ২৫ এবং ২৬শে মার্চ ১৯৬৬ শিক্ষাঅধিকারের বিনোদন সংস্থার প্রযোজনায় গঙ্গাপদ বসু রচিত নাটক 'জীবনায়ণ' শক্তি হালদারের পরিচালনায় সরকারী সঙ্গীত বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকে হীরালাল সেন উল্লেখযোগ্য মঞ্চাভিনয় করেন।

ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ ২২শে এপ্রিল ১৯৭৩ ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় 'বিশে জুন' নাটকটি পরিবেশন করে।

১৯শে এবং ২০শে আগষ্ট ১৯৭৪ অরুণ মুখোপাধ্যায় রচিত মারীচ সংবাদ নাটকটি ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে। নাটকটি ২২শে নভেম্বর পুনরভিনীত হয়।

৯ই ডিসেম্বর' ১৯৭৫ রঙ্গম আয়োজিত শরৎ নাট্যমেলায় ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদ শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প 'মহেশ' নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করে রবীন্দ্র ভবনে। নাটকটি পরিচালক মণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হয়।

১০ই এবং ১১ই জুন' ১৯৭৫ ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ 'বীর চাঁদসদাগর' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

১৯৭৪-তে ত্রিপুরা সংস্কৃতি পরিষদ স্থানীয় নাট্যকার ধীরেন দেবনাথ রচিত 'কবর' নাটকটি রবীন্দ্রভবনে মঞ্চস্থ করে।

মারীচ সংবাদ ১৯৭৪ পর্যন্ত ১১শ রজনী অভিনীত হয়।

ত্রিপুরা নাট্য আন্দোলনে এল ডি জি (লিটল্ ড্রামা গ্রুপ) এর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা

এল ডি জি-র আত্মপ্রকাশ ১৯৬৭ সালে দৈনিক সংবাদ পত্রিকাভবনে। প্রতিষ্ঠাতাগণের অন্যতম হলেন অশোক চক্রবর্তী, প্রশান্ত দেব, কালীপদ চক্রবর্তী, মৃণাল দে সরকার, মানস দেববর্মা, প্রদীপ দাশগুপ্ত। দৈনিক সংবাদ পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন দত্ত ভৌমিক ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। মূলতঃ এই সময় থেকেই ত্রিপুরার নাট্য আন্দোলন এক নতুন খাতে বইতে শুরু করে। নাটকের টিকিট বই হাতে নিয়ে দল বেঁধে অফিসে অফিসে, স্কুলে স্কুলে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে ঘুরতে হতো নাটকের কুশীলবদের। ছিল না সরকারী সাহায্য, দিতে হতো প্রমোদ কর। সে এক ভীষণ প্রতিকূল অবস্থা। তাছাড়া কর্মীদের প্রায় সবাই ছিলেন শিক্ষকতায় যুক্ত। সব কাজ সেরে অতিরিক্ত সময়টাতে তাঁরা ভাল নাটক প্রযোজনা নিয়ে মেতে থাকতেন। সকলেরই গাঁটের পয়সা খরচ করে নাটক মঞ্চস্থ করতে হতো। ছিল হলের সমস্যা; একমাত্র রবীন্দ্রভবন ছিল ভরসা, তাও আবার প্রয়োজনে ব্যবহার করা যেত না। তবু একদল তরুণ এক অদম্য সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন নাট্যআন্দোলনে।

১৯৬৭ সালে উৎপল দত্তের 'কিউবা' নাটকটি মঞ্চস্থ হয় তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে। এটিই এল-ডি-জির প্রথম নাটক, সঙ্গে ছিল একটি একাঙ্ক, ভোলা দত্তর লেখা 'চর্পট'। অশোক চক্রবর্তীর নির্দেশনায় এই নাটক দুটিতে অভিনয় করেন—অশোক চক্রবর্তী, অমূল্য বণিক, প্রশান্ত দেব, কমল মজুমদার, মৃণাল দে সরকার, বদ্রীলাল দেববর্মা, অসিত পাল, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, প্রশান্ত ধর, অমিত রায়, লিলি সেনগুপ্তা প্রমুখ।

৭০-এর দশকের গোড়াতে এল ডি জির সঙ্গে যুক্ত হন অহীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রদীপ বসু, বিমল সেনগুপ্ত প্রমুখ। তারও কিছু পরে আসেন বামাপদ মুখোপাধ্যায়, ঋতেন চক্রবর্তী, অসিত চক্রবর্তী, জ্ঞানানন্দ রায়, কমল বাবু, পরেশনাথ ভট্টাচার্য, সুধাংশু রায়, নিরঞ্জন দাস, জীবন দেববর্মা, শিবানী চৌধুরী, হরিপদ ভট্টাচার্য, রীণা সেনগুপ্তা, দিলীপ ভট্টাচার্য, পীযূষ ধর, বিনয় ধর, অনিতা হাজরা, বর্ষা দাসগুপ্তা, সুশীল দাস, অঞ্জন দাসচৌধুরী প্রমুখ।

।। মঞ্চস্থ নাটক।।

১৯৬৮। ম্যাক্সিম গোর্কীর গল্প অবলম্বনে 'রাজাধিরাজ দর্শন'। নাট্যরূপ কালীপদ চক্রবর্তী।

১৯৬৮। ব্রেখটের 'সমাধান' (পাঁচটি শো)

১৯৬৯। উৎপল দত্ত রচিত 'মোঘ' (তিনটি শো)

১৯৭০। উৎপল দত্ত রচিত 'সভ্যনামিক' (২টি শো)

১৯৭১। 'বিহান বেলা' এবং 'হারাধনের দশটি ছেলে'। পরের নাটকের নাট্যকার রাধারমণ ভট্টাচার্য। (২টি শো)

১৯৭৩। উৎপল দত্তর 'ঠিকানা' (৩টি শো)

১৯৭৩। উৎপল দত্তর 'ঘুম নেই' (৩টি শো)

১৯৭৩। রাজশেখর বসুর 'চিকিৎসা সংকট' ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

১৯৭৪। ব্রেখটের 'নিয়ম ও ব্যতিক্রম', ভাবানুবাদ মৃণাল দে সরকার।

১৯৭৪। উৎপল দত্তর 'ফেরারী ফৌজ'। (১৯৭৫ সালে জরুরী অবস্থার সময় চতুর্থ শো শুরু হওয়ার প্রাক মুহূর্তে সরকারী আদেশ বলে প্রদর্শনী বন্ধ করে দেওয়া হয়।

১৯৭৫। বাদল সরকারের 'বল্লভপুরের রূপকথা'। (৪টি শো)

১৯৭৫। অগ্নিমিত্রের 'নিকটে ফাঁদ'। (২টি শো)

১৯৭৫। শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'। (১টি শো)

১৯৭৬। নারায়ণ সান্যালের উপন্যাস অবলম্বনে বিভূতি চৌধুরীর নাট্যরূপ 'পাষণ্ড পণ্ডিত'। (১টি শো)

১৯৭৮। উৎপল দত্তের 'কাকদ্বীপের এক মা'। '(১টি শো)

১৯৭৮। 'মরুঝঞ্ঝা'। (১টি শো)

১৯৭৮। উৎপল দত্তর 'লৌহমানব' (৭টি শো) (শিলচর ও খোয়াইতে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।)

১৯৭৮। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'ছোট বকুলপুরের যাত্রী'। (তিনটি শো)

১৯৭৮। তাপস সেনের 'আজব আয়না'। (৭টি শো)

১৯৮০। রবীন্দ্র ভট্টাচার্যের 'বলির বায়েন'। (৪টি শো)

১৯৮১। উৎপল দত্তের 'দ্বীপ'। (৩টি শো)

১৯৮২। দেবাশিস সেনগুপ্তর 'একটি রাজনৈতিক সমীকরণ'। (১টি শো)

১৯৮২। শুভঙ্কর চক্রবর্ত্তীর 'বিদ্রোহী চার্বাক'। (৮টি শো) এই নাটকটি বিলোনীয়াতেও অভিনীত হয় এবং খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এরপর আর কোন বড় নাটক অভিনীত হয়নি তবে ১৯৮৬ সালে বেশ কিছু একাঙ্ক নাটকের অভিনয় হয়।

এল ডি জির নাটকের সাংগঠনিক কাজে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন সব্যসাচী ভট্টাচার্য, সন্তোষ বর্ধন, জীবন দেববর্মা, সমীর সাহা, বিমান বিহারী সাহা রায়, সুভাষ গোস্বামী, দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, সুহাস রায়, সুপ্রসন্ন চক্রবর্তী।

বিভিন্ন নারী চরিত্রে ১৯৬৭ থেকে ১৯৮২' পর্যন্ত যাঁরা অভিনয় করেছেন — শিবানী চৌধুরী, রীণা সেনগুপ্তা (১৯৬৯)। সাবিত্রী বর্ধন (১৯৭১) রত্না সরকার (১৯৭১)। ফুলন ভট্টাচার্য, বর্ষা ধর, মিতা সরকার, মিত্রা দাস, লক্ষ্মী সিংহরায়, বর্ষা দাশগুপ্তা (১৯৭৩)। ঝর্ণা দেববর্মা, লক্ষী চৌধুরী, অনিতা হাজরা, পারমিতা বসু (১৯৭৪)। বনানী সাহা, বনানী চক্রবর্তী, মীনা রায়, মণিকা চক্রবর্তী (১৯৭৫)। রুমা দাশগুপ্তা (১৯৭৬)। গৌরী মোদক, মুনমুন ভট্টাচার্য (১৯৭৮)। আরতি পাল (১৯৮০), শম্পা দাস, সুস্মিতা ভট্টাচার্য (৮২)।

LDG র উল্লেখযোগ্য দুটি একাঙ্ক দীপক গোস্বামীর 'বিহান বেলা' এবং রাধারমন ঘোষের 'হারাধনের দশটি ছেলে'। নাটক দুটির পরিচালক অশোক চক্রবর্তী।

'বিহান বেলা' নাটকে অভিনয়ে ছিলেন ঃ অহীন্দ্র চক্রবর্তী, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সন্তোষ বর্ধন, প্রদীপ বসু, হরিপদ ভট্টাচার্য, সাবিত্রী বর্ধন (ভট্টাচার্য), প্রশান্ত দেব, অশোক চক্রবর্তী। 'হারাধনের দশটি ছেলে' নাটকে অভিনয় করেছেন অহীন্দ্র চক্রবর্তী, যুগল বৈদ্য, শ্যামল চক্রবর্তী, প্রশান্ত দেব, অশোক চক্রবর্তী, রত্না সরকার।

আবহসঙ্গীতে বিমল সেনগুপ্ত, আলো—শিশুতোষ রায়, বিষ্ণু দে। মঞ্চ ও রূপসজ্জা— সমীর সাহা, কল্যাণ রায়। ব্যবস্থাপনায়—দিব্যেন্দু ভট্টাচার্য, কালীপদ চক্রবর্তী, অমল ঘোষ, ভীষ্মদেব ভট্টাচার্য, বিভূতি চৌধুরী, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, জীবন দেববর্মা, অরুণ ঘোষ, নিরঞ্জন দাস। পৃষ্ঠপোষক - অনিল ভট্টাচার্য (সাংবাদিক)।

রঙ্গম আয়োজিত শরৎ নাট্যমেলায় লিটল ড্রামা গ্রুপ ১২ ডিসেম্বর, ১৯৭৫ প্রযোজনা ও পরিচালনা করে শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী' নাটক। অভিনয়ে ছিলেন ফুলন ভট্টাচার্য, বনানী রায়, অহীন্দ্র ভট্টাচার্য, সুহাস রায়, জ্ঞানদানন্দ রায়, কল্যাণ পাল, অমূল্য বণিক, অসিত চক্রবর্তী, মৃণাল দে সরকার, প্রদীপ দাশগুপ্ত, সন্তোষ বর্ধন, বিমান সাহা, সুখলাল দেব।

LDG জানিয়েছে শত সীমাবদ্ধতা সত্বেও এল, ডি জি, শরৎ জন্ম শতবর্ষে শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের তাঁরই দেওয়া নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করছে এই ভরসায় যে-উপলক্ষে এই নাট্যমেলার আয়োজন সেখানে অমর কথাশিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই বড় কথা।

এই মেলায় পরিচালক অশোক চক্রবর্তী পরিচালনা করেন সি, এ, সি, টি প্রযোজিত 'লোকযাত্রা' নাটকটি ১০ই ডিসেম্বর' ১৯৭৫। নাটকটি শ্রীকান্ত, অভাগীর স্বর্গ, পল্লীসমাজ চরিত্রহীন, এবং শেষ প্রশ্ন অবলম্বনে রচিত।

নাটকে অংশ গ্রহণকারী শিল্পীবৃন্দ ঃ

মালা দাস, দীপ্তি চৌধুরী (অতিথি শিল্পী, নেপথ্য), লিলি সেনগুপ্তা, কৃষ্ণা দেববর্মা, দেবরাজ হালদার, যুগল বৈদ্য, স্বপনকুমার চক্রবর্তী, স্বপন ঘোষ, কৃষ্ণপ্রসাদ মুখার্জী, বিদ্যুৎ দেববর্মণ ও হংস হালদার। আবহসঙ্গীত—হীরেন দেববর্মন। এছাড়া ছিলেন বিভিন্ন কর্মধারায় হরিপদ দাস, নরেশ পোদ্দার, লছমী দেববর্মা, গোপী সেনগুপ্তা ও শ্রীমান অরিন্দম দেববর্মণ। তথ্যসূত্র—শ্রী প্রশান্ত দেব।

নাট্য পরিচালক বিমল গুপ্ত-র 'মুখোশ'

মুখোশের অভিনীত নাটকগুলি :

খাঁচা, আমি ক্রীতদাস, এবং ইন্দ্রজিৎ, ত্রিংশ শতাব্দী, রাজরক্ত, ক্যাপ্টেন হুররা। বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর ছত্রচ্ছায়ায় রবীন্দ্রনাথের 'বির্সজন'। মূলতঃ পরিচালক বিমল গুপ্ত।

প্রথম দিকে এঁরা সুধাংশু দত্ত (বড়দা)কে নিয়ে কয়েকটি নাটক প্রযোজনা করেন, এর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য নাটক বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী রচিত "আমি ক্রীতদাস"। নাটকটি প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ২৩শে অক্টোবর ১৯৭০, আন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতায়।

'আমি ক্রীতদাস-এ এঁরা বলেছেন :

বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় বিজ্ঞান, আণবিক অস্ত্র, মহাকাশ অভিযান এবং যন্ত্র সভ্যতার উচ্ছৃঙ্খল সাফল্য। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়ের বস্তু বিংশ শতাব্দীর নিঃসঙ্গ মানুষ আর তার মন। এই আত্মরতির শতাব্দীতে আশা, প্রেম, স্বপ্ন, ভালবাসা অর্থহীন। কুসংস্কার, বৈক্লব্য, ক্লীবত্ব এবং সময়ের যাদুঘরে কতকগুলো সাজানো মূল্যবোধের শুকনো ফুলে ঢাকা একটা গলিত শবদেহ বহন করে ক্রীতদাসের মতো জীবনযাপন করছে আজকের মানুষ। Le Mythe de sisyphe-র মননশীল বিদ্রোহী কাম্যুর মতই সে-মানুষ আর তার, সভ্যতা।

এই মননশীল মানুষের প্রতিনিধি লেখক আদিনাথ মিত্র। বিচিত্র অভিজ্ঞতা, বিচিত্র জীবন জিজ্ঞাসা এবং মুক্ত জীবনবোধ নিয়ে জীবনকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন তিনি। নীতির অনুশাসনকে তুচ্ছ করে মানুষকে তার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার দুরূহ সাধনায় তিনি বিব্রত, ক্ষত-বিক্ষত এবং অপ্রকৃতিস্থ।........

....নাট্যকার আদিনাথ মিত্র নায়ক (নেপথ্য নায়ক) আদিনাথ মিত্রের কাছ থেকে যে সত্য লাভ করেছে সে হচ্ছে অমোঘ নিয়মের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ ক্রীতদাসের মুমূর্ষু আর্তনাদের সত্য : "সকাল থেকে রাত্রি—ঋতু থেকে ঋতু—জন্ম থেকে মৃত্যু একই নিয়মে সব চলছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী সূর্যের চারপাশে ঘুরে ঘুরে হয়রান হচ্ছে পৃথিবী। কাল থেকে কালান্তরে মানুষ দুঃখে কাঁদছে সুখে হাসছে। মানুষ জন্মাচ্ছে

নিয়মে—মানুষ মরছে নিয়মে। অ্যামিবা থেকে আমি—সবাই এক নিয়মে বাঁধা। নিয়মের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত আমরা, কারণের প্রহারে জর্জরিত আমরা।"

শিল্পী আদিনাথ মিত্রের শৃঙ্খলিত জর্জরিত আত্মার আর্তনাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। নিয়মের ক্রীতদাস বিদ্রোহ ঘোষণা করে মানুষ হয়ে উঠতে চায়।

বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর নামে নাটকটি প্রযোজিত হয়েছিল। পরিচালক সুধাংশু দত্ত। আলো—দীপক দত্ত ও তপন ধর।

চরিত্র রূপায়ণে ছিলেন : বিমল গুপ্ত, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, পার্থ রায়, জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল, শিশির মজুমদার, কান্তিরঞ্জন রায় ভৌমিক, তপন রায়, অমল দত্ত, অনিমা গুপ্তা, ঝুনু মজুমদার, পারুল মজুমদার।

১৯৭৩ সালে ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় 'মুখোশ' সংস্থা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সদস্য সংখ্যা ক্রমে বাড়তে থাকে। নাট্যমেলায় একটি 'বি' টিম তৈরী করা হয়।

৯ই এপ্রিল ১৯৭৩ মুখোশ নিবেদন করে 'রাজরক্ত'—নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়। পরিচালক— বিমল গুপ্ত। আলো—দীপক দত্ত।

অভিনয়াংশে : বিমল গুপ্ত, কৃষ্ণকুমার দেববর্মা, নন্দকুমার ঘোষ, বর্ণালী বিশ্বাস।

১৯শে এপ্রিল ১৯৭৩ নাট্যমেলায় মুখোশ (বি) টিম নিবেদন করে মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্যাপ্টেন হুররা'। পরিচালক ছিলেন—যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলো—দীপক দত্ত। সঙ্গীত পরিচালনা—কৃষ্ণকুমার দেববর্মা। ব্যবস্থাপনায়—রবীন সেনগুপ্ত, তপন ধর, তপন রায়। মঞ্চ—আশিস মোদক।

অভিনয়াংশে : যাদবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আশিস মোদক, পল্লব বর্মণ, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, নরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত মোদক, নন্দকুমার ঘোষ, শিখা রায়।

বিমল গুপ্ত নাট্য আন্দোলনের দ্বিতীয় ধারায় 'পঞ্চপ্রদীপ' নাট্যসংস্থায় তাঁর কর্ম ধারাকে বিস্তৃত করেছিলেন। পঞ্চপ্রদীপ পর পর অনেক সফল নাটক মঞ্চস্থ করেছে, তার উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হোল—১৯৫৯ সালে নীহার রঞ্জন গুপ্ত রচিত এবং বিমল গুপ্ত পরিচালিত 'রাত্রি শেষ' নাটক।

১৭, ১৮ই নভেম্বর ১৯৫৯—নিশিকান্ত বসু রায় রচিত 'ললিতাদিত্য' নাটকটি বিমল গুপ্তর পরিচালনায় রামনগর ৫নং রোডে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৬০। মন্মথ রায় রচিত 'অমৃত অতীত' সুধাংশু দত্তর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়।

৯, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৬৭ ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায় রচিত 'খুনী' নাটকটি বিমল গুপ্তর পরিচালনায় তুলসীবতী ক্যাম্পাসে মঞ্চস্থ হয়।

১৯৭২ সাল থেকে 'পঞ্চপ্রদীপ'-এর কর্মধারা 'মুখোশ' নাট্যসংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়।

নব-নাট্য আন্দোলনে 'রূপায়ণ' একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

রূপায়ণের সদস্য দীপকজ্যোতি বড়ুয়া কিছু অনু-নাটক লিখেছিলেন। দীপক জ্যোতি একজন ইঞ্জিনিয়ার এবং খুবই প্রতিভাবান ছেলে। এই নাটক দর্শকদের কাছে তুলে ধরার দায়িত্ব ছিল পরিচালক এবং নাট্যকার মাণিক চক্রবর্ত্তীর। নাটকগুলি যুব এবং বিদগ্ধ মহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। ত্রিপুরায় নাট্যআন্দোলনের তৃতীয় পর্যায়ে নাটকের গতিবেগ সঞ্চারিত করার জন্য রূপারোপ, রূপম, রঙ্গম যেমন বিভিন্ন ধারার নাটক পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে অভিনয় করে নিজস্ব দর্শক সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে—মাণিক চক্রবর্ত্তী ঠিক সেই সময় বা একটু পরে একেবারে তরুণ পরিচালক-নাট্যকার হিসাবে তরুণদের নিয়েই ত্রিপুরার নিজস্ব ধারা প্রবর্তন করে জয়োল্লাসে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ করেছেন। রূপায়ণের সৃষ্ট থিয়েটার মহূর্ত নাটক হিসাবে দর্শককে উত্তেজিত করেছে, আহত করেছে, সমব্যাথী করেছে। দর্শক একই সঙ্গে অভিনেতা, এমন বিমূর্ত রূপ আর কে দেখাতে পেরেছে কে জানে। দর্শককে অভিনেতা করে দর্শক থেকে নাটক সৃষ্ট হয়ে দর্শককে অভিভূত করেছে এমনটি আর ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনে কে করতে পেরেছে? সত্তরের দশকে রূপম সর্বপ্রথম নিয়মিত ভাবে কিছু ইংরেজী অনুবাদ নাটক ব্রেখ্‌টকে গুরু মেনে মঞ্চস্থ করে। কলেজটিলার অধ্যাপক মহল এবং কুঞ্জবনের কিছু উচ্চ পদস্থ আমলাদের স্তুতিতে ধন্য হয়েছে সে নাটক। কলকাতায় নবনাট্য ধারাকে অবলম্বন করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁদের নান্দীকার যে এই ধরণের নাটক করেছেন, সেইসব পরীক্ষার টিকে যাওয়া নাটক হুবহু মঞ্চস্থ করা হয়েছে আগরতলার মঞ্চে। কলকাতার নাটক আগরতলায় দেখতে পাওয়া ছাড়া আর কিইবা সার্থকতা আছে ত্রিপুরার নব নাট্য আন্দোলনে এই সব প্রতীকী নাটকে? একটা limited দর্শক—সাধারণ দর্শক টানা সম্ভব হয়নি এদের পক্ষে। রূপায়ণ সেখানে ব্যতিক্রম।

মাণিক চক্রবর্তী

রূপায়ণের একটি নাটক 'চোর'। রচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দোপাধ্যায়— গ্রন্থনা এবং নির্দেশনায় মাণিক চক্রবর্ত্তী। অনুষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভবনে ২৭শে জুলাই ১৯৭০। দেবল চ্যাটার্জী ছিল আলোতে এবং রূপসজ্জায় স্বপন নন্দী ও আশিস রায়, মঞ্চ স্বপন নন্দী। রূপায়ণ তাদের প্রোগ্রামে প্রথমেই ঘোষণা করেছেন "ত্রিপুরার নাটক প্রয়োজনীয় করে তুলুন" অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় নাটকের প্রয়োজন নিয়ে নতুন করে ওঁরা চিন্তা-ভাবনা করতে বলেছেন। তারপরই এঁরা ঘোষণা করেন

"নাটক থেকে মরচে ও নকল চাকচিক্য একেবারে মুছে যাক।" এসব কথাগুলি বলার সাহস দরকার। সাহস শুধু নয়, দুঃসাহস দেখিয়ে সকলের কাছে বরণীয় হয়েছেন তাঁরা সে সময়। যদিও আজকের বহু নাট্য আলোচক সন্তর্পণে এদের গুণগান করতে কলমের মুখ বন্ধ করে ফেলেন। বামাপদ মুখার্জী নয়, অজিত মজুমদার নয় বা সুখময় ঘোষ নয়, মেঘনাদ সাহার কলমে সমালোচিত রূপায়ণের 'চোর' নাটক। তিনি লিখেছেন— "নিজস্বতা ও নতুনত্বের দাবীদার রূপায়ণ নাট্যসংস্থার 'চোর' নাটকখানি। রচনা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। নাটক খানিতে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। শুরুতে দেখা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের বিড়াল।

এটা বঙ্কিমচন্দ্রের ফ্যানটাসি জাতীয় রচনা। অর্থনৈতিক বৈষম্যহেতুই যে সমাজে চৌর্যবৃত্তি বা চোরের সৃষ্টি—বক্তব্য এইটুকুই।

বিড়ালের বক্তব্যের অনুসরণে বা বিড়ালের বক্তব্যের climax সৃষ্টিতে 'চোর' মানিক বন্দোপাধ্যায়ের চোরে, চোরের জীবনবোধ ও চোরের সচেতন মনে প্রেমের ব্যাপারে মানসিক বিশ্লেষণ বা Mental analysis আমরা দেখতে পাই। চোরও যে আমাদের মত একটি মানব সত্তা, তার মধ্যেও যে আমাদের মত প্রেমের অনুভূতি বর্তমান, সচেতন মনে তারও যে স্ত্রীর প্রতি এক ধরণের ভালবাসা বর্ত্তমান—এ সমস্তই মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোরে বলা হয়েছে।"

এইযে বিড়াল আর চোরকে নিয়ে আফিমখোর কমলাকান্তকে সামনে রেখে বুর্জোয়া সমাজের চরিত্র বিশ্লেষণ, নাট্যকার এবং পরিচালক মাণিক চক্রবর্ত্তীর মুন্সিয়ানা প্রমান করে। সঙ্গে স্বপন নন্দীর মূকাভিনয় সংযোজন আধুনিক নাট্যপ্রবাহের গতি প্রকৃতি আরো বেশী সময়গ্রাহ্য করে তুলেছে। অন্যান্য নাট্যসংস্থার মত মাণিক চক্রবর্ত্তীর এ প্রযোজনা মঞ্চ সফল নাটকের পুনরভিনয় নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং সার্থক।

২৪শে অক্টোবর ১৯৭৩ রবীন্দ্রভবনে রূপায়ণের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য নাটক "অজ্ঞাতবাস"। বিজ্ঞাপনে তাঁরা লিখেছেন "ত্রিপুরার মঞ্চে অভিনব এবং দুঃসাহসিক রস উপভোগ করতে হলে নিঃসন্দেহে এলার্জিমুক্ত মন থাকা দরকার।" এ নাটকে বিভিন্নজন, বিভিন্ন মত পোষণ করেছেন—কেউ বলেছে 'দুঃসাহসিক'। কেউ বলেছেন—A Right Kick to the Tradition! কেউ বলেছেন 'অশ্লীল' আবার কারো কথায় মোটেই অশ্লীল নয়। এরকম মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। নাট্য সমালোচকগণ বলেছেন—"আগরতলায় প্রথম 'এ' মার্কা একটি নাটক উপহার দিল রূপায়ণ। তরুণ শিল্পীগোষ্ঠী, তরুণ পরিচালক অর্থাৎ সব মিলিয়ে একটা তরুণ উষ্ণ রক্তের ছড়াছড়ি দেখা যায়। যার জন্য স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের মন এডভেঞ্চারিজমের দিকে ছুটে যায়। সম্প্রতি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে অনুষ্ঠিত 'অজ্ঞাতবাস' নাটকটিও তারই ফসল। অজ্ঞাতবাসের আগে স্কেচ ১ এবং স্কেচ ২ নাটক দুটি অনুষ্ঠিত হয়।

সাধন সাহা লিখিত অজ্ঞাতবাস নাটকটির নাট্যরূপ দেওয়ার সময় মাণিকবাবু ভাল করে বুঝেছিলেন যে সম্পাদনার উপরই এর উৎকর্ষ নির্ভর করছে। তাই তিনি এই সুযোগের সদব্যবহার করেছেন।

লেখক সাধন সাহা স্থানীয় শিক্ষিত মহলে বা আঁতেল মহলে অপরিচিত নন। হাংরি জেনারেশন নামীয় সংস্থার মুখপত্র 'স্বকাল' এর তিনি নিয়মিত লেখক।

রূপায়ণ সবচেয়ে কম গড়বয়সের শিল্পী নিয়ে গঠিত। মানিক চক্রবর্তীও বয়সে তরুণ তবু তার নির্দেশনা পাকা হাতের কাজ যা মনকে খুবই আনন্দ দেয়।

অজ্ঞাতবাস সম্পর্কে বিরুদ্ধ মত

আগরতলায় এরকম ধরণের নাটক মঞ্চস্থ হয় তা আমি চাইনা। কারণ আগরতলায় এ নাটকের কোন প্রয়োজন নেই। এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে আপনারা সজাগ হয়ে উঠুন। নাটককে ওরা সিনেমা ভেবে ওরা সর্বজনের কাছে হাস্যাস্পদ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছেন। আগরতলাবাসীরা এর প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন বলে আমার মনে হয়। ....কলকাতার অনুকরণে এখানে অপসংস্কৃতি বা তথাকথিত ইয়াংকি কালচার আমদানী করার পথ আমরা বন্ধ করবই। (বিবেক পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠি থেকে)।

'অর্জুন ২রা নভেম্বর ১৯৭৩, ১৩শ সংখ্যায় প্রকাশিত সমালোচনা।

রূপায়ণের 'যবনিকা কম্পমান' ও 'অজ্ঞাতবাস'

অজ্ঞাতবাস নাটকের একটি দৃশ্য

২৭শে সেপ্টেম্বর রূপায়ণ সংস্থা দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক মঞ্চস্থ করলেন শ্রী সত্যেন ভদ্রের 'যবনিকা কম্পমান' ও শ্রী সাধন সাহার 'অজ্ঞাতবাস'। দ্বিতীয়টির নাট্যরূপকার এবং নির্দেশক শ্রী মাণিক চক্রবর্ত্তী। আগরতলায় যে সমস্ত সংস্থা নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন তাঁদের মধ্যে 'রূপায়ণে'র সদস্যবৃন্দ গড় বয়সে ন্যূনতম। ....রূপায়ণ সেই অতি অল্পসংখ্যক সংস্থার অন্যতম, যাঁরা প্রথম প্রযোজনায় স্বেচ্ছায় সমালোচক আমন্ত্রণ করেন। নাটক সম্পর্কে এই মনোভাব প্রশংসনীয়।

'যবনিকা কম্পমান' এর বিষয়বস্তু মূলতঃ সমাজের বিভিন্নস্তরে উপস্থিত শোষণ পীড়ন বঞ্চনা ও অসঙ্গতির চিত্রায়ণ। নাটকের 'সামাজিক কর্ত্তব্য' হিসাবে এর উপস্থাপনার হয়তো প্রযোজন এবং সার্থকতা রয়েছে।...........

'অজ্ঞাতবাস'-এর নাট্যগুণ অনস্বীকার্য। নাট্যরূপটির জন্য প্রশংসা শ্রী মাণিক চক্রবর্তীর অবশই প্রাপ্য। ....অভিনয়ে নির্দেশক শ্রীচক্রবর্তী স্বচ্ছন্দ। শ্রীউত্তম চক্রবর্তী ও শ্রীমতী

সঙ্গীতা চৌধুরীর অভিনয় নাটকের প্রতি বিশ্বস্ত। অল্পকালের উপস্থিতিতে দর্শকের চোখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন শ্রী দীপক বড়ুয়া।

'সীমান্ত-প্রকাশ' পত্রিকা ৭ই নভেম্বর ১৯৭৩ লিখেছে : রূপায়ণ নাট্যসংস্থা একই সঙ্গে নতুনত্ব এবং চমক দেখানোর দুর্লভ সুযোগের সদ্‌ব্যবহার করলেন ২৪শে অক্টোবর নাটক 'অজ্ঞাতবাস'-এ।

....অজ্ঞাতবাস নাটকের আগে রূপায়ণ আরো নাটক মঞ্চস্থ করেছে, কিন্তু জীবনের এমন কিছু কিছু দিক—যা নিতান্ত অজ্ঞাত—মঞ্চে অগণিত দর্শকদের সামনে 'অজ্ঞাতবাস' সর্বপ্রথম নিয়ে এলো। বোধহয় আগরতলার নাটকের ইতিহাসে এসব বলিষ্ঠ দৃশ্য রচনায় রূপায়ণের প্রচেষ্টা অদ্বিতীয়। নাটক দেখে বোঝা গেছে, নাট্যসংস্থার উদ্যোগীরা নাট্যশিল্পে জীবনের কোন দিককেই অস্পষ্ট করে রাখতে রাজী না। যা সত্য, পরিচ্ছন্ন এবং দিবালোকের মতন স্পষ্ট—তাকে ভাঁড়ামির আড়ালে বন্দী করে রাখার মধ্যে কোন সচেতন জীবনবোধের পরিচয় নেই। উদ্দাম উচ্ছ্বল জীবনপ্রবাহেই গ্লানিহীন পরিশুদ্ধতা। শুচিনির্মল জীবনবোধের বে-আব্রু তাগিদেই বোধ হয় রূপায়ণের প্রাণবন্ত ছেলেরা সবার সামনে মঞ্চে 'উদোম' হয়ে যেতে দ্বিধাবোধ করেনি।'

রূপায়ণের এ নাটক ছিল বিজ্ঞাপিত প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। নাটকটি সু-অভিনয় তো হয়েইছিল সেইসঙ্গে পরিচালক মাণিক চক্রবর্তী এবং তাদের সংগঠন ত্রিপুরায় যে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিল তা ছিল অনবদ্য।

সত্যেন ভদ্র রচিত নাটক 'যবনিকা কম্পমান' রূপায়ণ-এর আর এক সার্থক প্রযোজনা। এখানে ওদের তরুণ শিল্পীগণ—দুলাল চক্রবর্তী, প্রদীপ সাহা, মাণিক চক্রবর্তী, উত্তম চক্রবর্তী এবং সংগীতা চৌধুরী—সবার সুঅভিনয় নাটকটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

আজকের নাটক প্রসঙ্গে 'সীমান্ত প্রকাশ' পত্রিকায় ৬ই নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক শ্রীআদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন :

মাণিক চক্রবর্ত্তীর থিয়েট্রণ ও প্রসেস বহু সন্ধানী পরীক্ষা-নিরীক্ষায় দ্যুতিমান।

গত ১২ই অক্টোবর ১৯৭৪ রবীন্দ্রভবনে রূপায়ণের 'প্রসেস' ও থিয়েট্রনে' প্রদর্শিত অনুনাটকগুলি সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়েছে এ পর্যন্ত। মাণিক চক্রবর্ত্তী পরিচালিত 'প্রসেস' যেখানে রূপায়নের শিল্পীগোষ্ঠী অভিনয় করেছে যেমন—উত্তম চক্রবর্তী, দুলাল চক্রবর্তী, অজয়শঙ্কর ভট্টাচার্য, দেবাশীস রায়, স্নেহেন্দু চক্রবর্তী, প্রদীপ দেব, অঞ্জন চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ চন্দ, প্রদীপ সাহা, নীলাঞ্জন চৌধুরী, রতিরঞ্জন রায়, আশীষ দাস, সুদীপ ঘোষ, সোমনাথ দত্ত, সমীরণ সাহা, সজল বণিক, দীপক বড়ুয়া, পার্থ ঘোষ, শ্যামল পাল, স্বপন নন্দী, সীমা চক্রবর্তী, সরমা দেববর্মা, কৃষ্ণ রায়বর্মন, সবিতা

চৌধুরী। যে সমস্ত অনুনাটক দেখান হয়েছে এখানে—স্ট্যান্ট, আর্ট, নাড়ীতে মোর রক্তধারায় লেগেছে তার টান (নষ্টালজিয়া), ফ্যামিলি অ্যাফেয়ার্স, এ্যাকাডেমী, হত্যে দিয়েছি সত্যের দুয়ারে (কমিটমেন্ট), জীবন, কালো ভ্যান, অভিনয়, আর্ট—২, ফুটবল।

ত্রিপুরায় নাট্যচর্চার ক্ষেত্রে যখন সন্ধানের উৎকণ্ঠার ব্যাকুলতা, যখন কোলকাতার পেশাদারী ও অপেশাদারী রঙ্গমঞ্চের রীতি ও প্রয়োগ কুশলতার দিকে আলো-হাতড়ানোর ব্যর্থ প্রয়াস এবং নিজস্ব পথ সন্ধানে নিস্পৃহতা, তখন কখনো কখনো হঠাৎ এক আধ ঝলক আলোর সন্ধান পাওয়া যায়—অসিত অন্ধকারে নিজের পথ চিনে নিতে সাহায্য করে। সেই রকমই এক ঝলক আলো নিয়ে রূপায়ণের মাণিক চক্রবর্ত্তীর আবির্ভাব আগরতলার রঙ্গমঞ্চে—ত্রিপুরায় নিজস্ব ধারায় নাটক করার প্রসেস নিয়ে যে নাটকে কেবল মাত্র ত্রিপুরাই থাকবে তারপর ভৌগলিক সীমাকে অতিক্রম করে বিশ্বমানবের সাথে আত্মলীন হয়ে যাবে।

কেবলমাত্র নিয়ন চমকান রঙ্গমঞ্চের মধ্যে নাট্য পরিবেশনা রূপায়ণ সীমাবদ্ধ করে রাখেনি, মুক্ত আকাশের নীচে সাধারণ মানুষের মাঝে কখনো রাস্তায় কখনো মাঠে কখনো পথে পথে এঁরা এঁদের নিজস্ব ধারার নাটক দেখিয়ে চলেছেন—যে নাটকের চরিত্রগুলি ত্রিপুরার—যে নাটকে নাট্য সমালোচকদের একহাত নেওয়া হয়েছে, দর্শকদের মূল্য দেওয়া হয়েছে।

মাণিক চক্রবর্ত্তী পরিচালিত 'প্রসেস' এর অনুনাটকগুলির মধ্যে জীবন সম্পর্কিত বাস্তব বিশ্লেষণ, সমসাময়িক জীবন যন্ত্রণা, নৈরাশ্য, ব্যর্থতা—বিক্ষোভবোধের অবসন্নতা, অসহায় যন্ত্রণাভূতির তীক্ষ্নতা, শৃঙ্খলাহীন ছাত্র, নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী কুৎসিত মানুষগুলির উদ্দাম জাগরণ ও মস্তিষ্ক চর্বন, জীবনের ভারসাম্যহীন আর্থিক দুর্গতি, আশাহীন আত্মিক যন্ত্রণা, নিরন্ধ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্বাস নিরোধী শ্মশান ভূমিতেই যৌবনের বিনষ্টি, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর হতাশা, আর্থিক ও মানসিক রিক্ততার অবসাদে ক্ষয়িষ্ণু জীবন, ঈর্ষা, দারিদ্র্য, ক্রূরতা প্রতিহিংসা, স্বার্থবুদ্ধি প্রীতি, সহৃদয়তা, ভালোবাসা, ভাবাদর্শ, স্বৈরাচারী শক্তির যথেচ্ছাচার, স্ফীত দম্ভ, সর্বহারা মানুষের অসহায়তা, বিপন্ন মানবিকতা ইত্যাদি সবই আছে।

বস্তুময় জীবনভূমি থেকেই মাণিক চক্রবর্ত্তী উপকরণ ও উপাদান সঞ্চয় করেছেন। "ত্রিপুরার নাট্যভূমিতে মাটি থেকে রস নিঙড়ে মাটিকে সচেতন করার মানসিকতা মাণিক চক্রবর্তীর মধ্যে উদ্দীপিত।" ত্রিপুরায় মণিমাণিক্যের অমূল্য সম্পদ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক চিন্তাবিদ শিক্ষক এবং দুর্মুখ সমালোচক শ্রীকানাই চক্রবর্ত্তী থিয়েট্রন সম্পর্কে বলেছেন এক প্রবন্ধে—'রূপায়ণ-এর থিয়েট্রন শৈল্পিক নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ সার্থক। তিনি আরো বলেছেন—"নতুন নাট্যগোষ্ঠী রূপায়ণ" তাহাদের অভিনব প্রযোজনা

'থিয়েট্রেণ' অভিনয় করিলেন ১৬ই জুন সন্ধ্যায় কম্যুনিটি হলে। বর্তমান যুগের হাওয়ায় আমরা সর্বত্র তথাকথিত প্রগতিশীলদের সাক্ষাৎ পাই, যথা—প্রগতিশীল লেখক ,প্রগতিশীল সাংবাদিক, প্রগতিশীল নাটক, প্রগতিশীল সাহিত্য ইত্যাদি। সমাজের প্রগতি হউক আর নাই হউক তথাকথিত প্রগতিশীলরা দিনের পর দিন এক এক আসর আলো করিয়া বসিতেছেন। বস্তুত এই ডামাডোলে 'প্রগতি শীল' শব্দটির অর্থ সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছে। সত্যিকারের প্রগতিশীল কোনো সৃষ্টির মুখোমুখি হইলে সর্বত্র দেখা গিয়াছে ঐ নূতন সৃষ্টিকে গ্রহণ করিতে দর্শকের বা পাঠকের মধ্যে কোন ভ্রান্তি আসে না। বাধা বা অপবাদ যাহা আসে তাহা প্রায়শই আসে ঐ তথাকথিত 'প্রগতিশীল'দের পক্ষ হইতেই।

নাটক অভিনয় হওয়া বলিতে আমরা শুধু নাটকের নটনটী কর্তৃক সংলাপ বলা বুঝি না, তাহার সাথে যুক্ত থাকে, মঞ্চ, দৃশ্য রচনা, আলোক সম্পাত, শব্দ সংযোজন ইত্যাদি। এইগুলি আজকের নাটকে প্রয়োজনীয়, অবশ্যগ্রাহ্য। কিন্তু নাটকে প্রয়োজনীয় নূতন রীতির সঞ্চার করিয়া ' রূপায়ণ' নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে নবতর গতির সন্ধান দিয়েছে। মঞ্চ, দৃশ্য রচনা, আলোকসম্পাত ইত্যাদি শুধু বাদ দেওয়াই হয় নাই এই সমস্ত অঙ্গ নাটক প্রযোজনায় কত অপ্রয়োজনীয় তাহা সার্থকভাবে দর্শকদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে সমর্থ হইয়াছেন।

থিয়েট্রেন সাধারণ নাটক নয়। সমাজ জীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার প্রতিফলন। এখানে আছে ভিক্ষা, কল্পিত শহর, দুধ, ম্যাজিক স্তম্ভ, অহেতুক ভয়, বেবীফুড, ধর্মঘট, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা, সমাজচেতনা, যুবসমাজের অধঃপতন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কখনো সচেতন করা, কখনো চাবুক মেরে সচেতন করার প্রয়াস। এ প্রয়াস কখনো ব্যঙ্গের রূপ নেয়, কখনো দুঃখের।

রূপায়ণের এই সফল নবনাট্য প্রয়াসকে আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই তাঁহাদের অভিনব ও একান্ত নিজস্ব চিন্তা 'থিয়েট্রনে'র জন্য।"

৬ই মার্চ ১৯৭৪ দৈনিক গণরাজ পত্রিকা লিখছে—"আগরতলা ৪ঠা মার্চ। মঞ্চ নেই, আলোকসম্পাত নেই, নেই দৃশ্য সজ্জা বা অভিনেতার কোন স্বতন্ত্র পরিচয়। দর্শকদের ভীড়ে দর্শক-অভিনেতা একাকার হয়—টুকরো টুকরো সংলাপ আর হাত চোখ শরীরের স্বাভাবিক ভঙ্গিমায় চলতি ঘটনা, আজকের সমস্যার বিভিন্ন দৃশ্য একের পর এক ফুটে উঠেছে। সমস্যায় জর্জরিত দর্শকও নিজের অজ্ঞাতে কখন সে অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে ফেলেছে, আগে বুঝে উঠতে পারেনি। এ হোল মুহূর্ত নাটক, রূপায়ণ যার নাম দিয়েছে থিয়েট্রেন, চলতি ঘটনার স্কেচ। এদের প্রতিটি অভিনয় প্রাণপূর্ণ এবং দর্শককে অভিভূত এবং উত্তেজিত করেছে। দর্শকই বলে দিচ্ছে তাঁদের সার্থকতা।"

পত্রিকায় রূপায়ণ-এর বিজ্ঞাপন

'আমি রূপায়ণ বলছি!'

আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় চিত্রকথার সামনে নাটক থিয়েট্রোন করব। আপনারা দেখতে আসুন।'

ব্যাস এতেই দর্শক সমাগম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।

রূপায়ণ বিভিন্ন স্মারকে বলেছে, "নাটকে চেতন হাতের সংখ্যা বাড়ুক", 'গতানুগতিক ভাষার মৃতদেহ মাড়িয়ে থিয়েটারের নিজস্ব ভাষা সৃষ্টি হোক।' ভাষার রুক্ষতা ও রূঢ়তা যত না স্পষ্ট, প্রযোজনায় তেমনি উদ্দাম দাম্ভিকতা।

তবু বলা যেতে পারে ত্রিপুরার নিজস্ব ধারায় নাট্যরীতি প্রবর্তনের নিরলস প্রয়াস করে চলেছেন মাণিক চক্রবর্ত্তী ও রূপায়ণ।

মানুষের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, প্রাপ্তি বঞ্চনার গতানুগতিকতার পথে অগ্রসর না হয়ে এঁরা রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অতল স্পর্শ সুগভীর জীবন জিজ্ঞাসার সামনে এনে দর্শককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন—যে জিজ্ঞাসা অর্থহীন নয়।

জীবন জিজ্ঞাসার জটিলতার বিশ্লেষণে দুঃসাহসী প্রয়াস, বাস্তব দৃষ্টির প্রক্ষেপে বিষয় নির্বাচন এবং নতুন জীবন চিন্তার পটভূমিকায় নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনা ও রূপকল্প কেবলমাত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ-ই নয়, ত্রিপুরার নাট্যধারার নতুন পথের সন্ধানও বটে।

দিগন্তব্যাপী ভাঙ্গনের দিক চক্রবালে নতুন জীবন আবিষ্কারের মধ্যবিত্ত চেতনায় ত্রিপুরায় রূপায়ণের একদল নবীন শিল্পী সারা ত্রিপুরায় নিরাশা-শঙ্কা-অন্ধবিশ্বাসধর্ষিত সাধারণ মানুষের সান্নিধ্যে এসে মানুষের রহস্যবহুল চিরন্তন ইতিহাসকে, চিরন্তন মানুষকে আবিষ্কারের মধ্যেই অবক্ষয়পীড়িত হতাশ মানুষের হৃদয়ের অন্তরতলে অভিনব উন্মাদনার ঢেউ জাগাতে চেষ্টা করল। এই নবীন শিল্পীদলের জীবন রচনার প্রয়াস তেমনি অপ্রত্যাশিত যেমনি বর্তমান সামাজিক পরিবেশে নতুন জীবন-প্রচ্ছদে বিচিত্র।

বিচিত্র আঙ্গিকে অভিনব বাচ্যে এঁদের নাটক বিষামৃতের পসরা। বিদ্রোহে, প্রতিবাদে, যৌবনের অভিব্যক্তি। বিচিত্র স্বাদের এক অন্তহীন অভিসার— রৌদ্রাভিসার। কোনো কোনো অনুনাটকে চরিত্র ও পরিবেশ বিন্যাসের মুন্সীয়ানায় ও রসিকতাপূর্ণ বাগ-বিদগ্ধতায় ও ভঙ্গিতে সার্থক হাস্যরসের সম্ভাবনা ঘন নিবিষ্ট। সিচুয়েশন ও চরিত্রের পরিমিত সঙ্গতি মাঝে মাঝে wit-র পর্যায়ে এসেছে। নাটকগুলির পরিচালনায়, প্রযোজনায়, পরিবেশ সৃষ্টিতে ও চরিত্রে বিন্যাসে মনোভঙ্গীর দিকে মাণিক চক্রবর্ত্তী

অবজেকটিভ হলেও ব্যক্তিগত মনোভঙ্গীটি সার্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হয়েছে। রূপায়ণের বহু সন্ধানী এ'পেরিমেন্ট এবং একটি নাটকের এক দেহে অনেক আঙ্গিকের সংযোজনা বাস্তববোধ সঞ্জাত উপলব্ধির প্রকাশ, প্রয়োগকৌশল ও শৈলীর পরিচায়ক। রূপায়ণের যাত্রা অন্ধকার গলির পথে আপন তন্দ্রাহীন মননশীলতার তীক্ষ্ণ রশ্মিপ্রক্ষেপে গণনাট্য দরবারের সন্ধানে। রূপায়ণ প্রসঙ্গে এক কথায় বলা যায়, এ দশকের তমসাচ্ছন্ন ত্রিপুরার নাট্যাকাশে উড্ডীয়মান অক্লান্ত নাট্য বিহঙ্গম।

রূপায়ণ প্রযোজিত এবং মাণিক চক্রবর্ত্তী পরিচালিত নাটক গুচ্ছ

- রতনকুমার ঘোষের 'সমুদ্র সন্ধানে', 'তৃতীয়কণ্ঠ', 'শেষবিচার।'
- প্রকাশ নন্দী রচিত 'ঝিঁ ঝিঁ পোকার কান্না।' 'অজানা কাহিনী।'
- পার্থ বন্দোপাধ্যায় রচিত 'শেষ অঙ্কে নট।'
- মাণিক চক্রবর্ত্তী রচিত 'মস্ত টান।'
- নাটক 'অজ্ঞাতবাস' মূল গল্প সাধন সাহা, নাট্যরূপ মাণিক চক্রবর্ত্তী।
- নাটক 'ডা: ওয়াং এর গোপন সংকেত' মূল নাটক বাসুদেব দাশগুপ্ত।
- বঙ্কিম চন্দ্রের বিড়াল এবং মাণিক বন্দোপাধ্যায়ের 'চোর' নিয়ে চোরনাটক, নাট্যরূপ মাণিক চক্রবর্ত্তী।

'থিয়েট্রোন এবং প্রসেস', নাটক মাণিক চক্রবর্ত্তী, অনুষ্ঠিত হয় আগরতলা, জিরানিয়া, ধর্মনগর এবং কাছাড়ে। ৫৬টি শো হয়।

স্কেচ ১, ২, মূল রচনা দীপক বড়ুয়া, নাট্যরূপ মাণিক চক্রবর্ত্তী।

FANDO & LISS (ফালতু লতু), মূল রচনা ফরাসী নাট্যকার F. ARABAL, অনুবাদ মাণিক চক্রবর্ত্তী।

'লীলায়তে নিল্যতা ও স্বপ্ন ভত্ব', রচনা ববিওল হুসাইন, গ্রন্থনা মাণিক চক্রবর্ত্তী।

ত্রিপুরার প্রতিভাময়ী মেয়ে
প্রতিমা চৌধুরীর নিজের কথায়

বোম্বের মাউন্ট ইউনিকের এক বিশাল বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের ২২তলায় জানালা খুলে যখন দেখি রাতের বোম্বের দৃশ্য, সারা আকাশ জুড়ে আকাশছোঁয়া অট্টালিকাগুলো তারার ফুলকির মত জ্বলছে, জ্বলছে হীরা না মুক্তোর মালার মত, জ্বলছে না দুলছে—সে জ্বলার সে দোলার সৌন্দর্য্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, সেই সঙ্গে চোখ দুটো বন্ধ হয়ে আসে অনায়াসে। আর ঠিক তার পাশাপাশি দুচোখ এক করলেই ভেসে ওঠে, মনে পড়ে আমার জন্মভূমি, আমার জন্মস্থান—শিবনগরের পুকুরের পাড়ে নবাদার ধোপিখানার বড় বড় মাটির গামলার পাশ দিয়ে সরু রাস্তার পাশে মায়া ঘেরা বাঁশের দেয়াল বেয়ে ফুর-ফুরে দখিনা বাতাস জুঁই চামেলীর গন্ধে মাতাল করে। পুকুর পাড়ে পল্লী কবি মতিন মিঞা নয় মতিন কাকু কবিতা লেখেন, একটু দূরে বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্যি সেতারের মূর্চ্ছনায় ঘুম পাড়ান—সারা পাড়া ঘুমায়, ঘুমিয়ে পড়ে।

ত্রিপুর শিল্পায়তনে সাজাহান নাটকে প্রতিমা চৌধুরী ও ত্রিপুরেশ মজুমদার

বোম্বের এই বিলাসবহুল ঘরে নরম বিছানায় শুয়ে এ স্মৃতি ম্লান হয় না, মুছেও যায়না, স্পষ্ট হয়, আরো স্পষ্ট হয়ে দুচোখের সামনে এসে দাঁড়ায়—মা, আমার মা, দীর্ঘাঙ্গিনী মা, সোনার বরণ রঙ—সদা হাসিমাখা মুখ, যে মুখে ক্লান্তি নেই, কথায় গল্পে আপন সবাই। বাবা ভাই দিদিরা—না আরো আছে, আরো।

বাড়ীর উঠানে সন্ধ্যা, জ্যোৎস্না মাখা আলোছায়া—দোলন চাঁপার ফাঁকে ফাঁকে খেলা করে। মাটিতে পাটি পাতা—দিদি দীপু, দীপ্তি চৌধুরী এখন ভট্টাচার্য, হারমোনিয়ামে সুর তোলে, হরিকর্ত্তা পাশে বসে তবলায় বোল তোলেন, মার্গ সঙ্গীতের অনুরাগী গান গান নীহার দাস, তবলা টেনে নেন ওস্তাদ কৃষ্ণ দাশ। এরি মাঝে এসে পড়েন ওস্তাদ রবি নাগ, আরো আরো অনেকে। রাত বাড়ে। চাঁদের আলো সামনে সুপারি গাছের আড়ালে

মুখ লুকায়, তখন আমার বাড়ীতে গানের জলসার মধ্য—আমেজ।

এখানেই আসেন গানের টানে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শচীন্দ্রলাল সিংহ—শচীনদা হয়ে, আসেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত সুখময়দা হয়ে, আসেন ত্রিপুরেশ মজুমদার, শক্তি হালদার, আরো অনেকে; এঁরা তখন আমাদের ঘরের মানুষ, আমাদের আপনজন।

এমনি পরিবেশে আমি বড় হয়ে উঠলাম। তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী আমি, শহরের সেরা স্কুলে পড়ি, গর্বে আমার বুক ভরে যায়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নাচের প্রোগ্রাম করেছি, বারোমাসে তের পার্বন—স্কুলে অনুষ্ঠানের অভাব নেই—সবাই প্রশংসা করে, ভালবাসে, ভাল লাগে আমার, খুব ভাল লাগে।

নাটক পাগল ত্রিপুরেশ মজুমদার। ধরে বসলেন এক সময়—শুধু নাচলে হবেনা, ভাল নাটক করতে হবে—নাটক মানে অভিনয়। আঁৎকে উঠলাম আমি, অভিনয়! না বাবা তা হবে না, ও আমি পারবো না! পারবো না বললে শুনবে কেন—

সুখময়দাকে ধরলেন ত্রিপুরেশবাবু, ধরলেন মাকেও। বাড়ীর মধ্যে মা আমার উদারপন্থী, মা না বলবে কেন, অনুমতি মিলে গেল। সুতরাং মঞ্চে নাটকে শুধু নাচা নয় অভিনয়—প্রাণ মাতানো অভিনয় চাই। দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই ত্রিপুরেশ কাকু এসে হাজির। কইরে, কবে যাবি রিহার্সালে! আজ যাব কাল যাব এই করে সময় কাটিয়ে দিই—কিন্তু তাঁর হাত থেকে কি নিস্তার পাওয়ার উপায় আছে, স্টেজে নামিয়ে তবে শান্তি। তার পরে নাটক নাটক নাটক নাটক—নাটক আমায় পেয়ে বসলো। করলাম উল্কা, রাজারাণী, কালিন্দী, উমাকান্ততে অনুষ্ঠিত বিসর্জনে অপর্ণা, সাজাহান নাটকে জাহানারা। সঙ্গে আছেন আমার সবিতা সিংহরায়, নমিতা সিংহরায়।

ত্রিপুরেশ কাকু পাগলী ডাকতো আমায়। বিসর্জনে অপর্ণা চরিত্রে অভিনয় করতে কেউ দিতে চায়নি, আমি খুবই চঞ্চল ছিলাম বলে। ত্রিপুরেশ কাকুর ইচ্ছায় সব হোল। কিন্তু রিহার্সালে আমি প্রায়ই যেতাম না—সবাইকে পীড়া দিয়েছে এ বিষয়টা। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেও আমি সিরিয়াস ছিলাম না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে আমি তাক্ লাগিয়ে দিতাম। জাহানারা চরিত্রে ঠিক তাই হয়েছিল—শেষ পর্যন্ত সবাইকে আমি খুশী করতে পারতাম। এখন আর মনে নেই কত চরিত্রে আমি অভিনয় করেছি তবে ২০/২৫ টাতো হবেই। তবে একটা দুঃখের কথা কি জানেন, ত্রিপুরেশ কাকুর শরীর খুব একটা ভাল যাচ্ছিলনা—আর আমি নাটকে আসার পর নমিতাদি সবিতাদি একে একে চলে গেল। আমার বড় কষ্ট লেগেছিল—হয়তো এ কষ্টের কোনো কারণ নাও থাকতে পারে।

তারপর অনেক কথা—সে কথা থাক। নাচ! নাচ আমার প্রাণ মন সব। নাচের জন্য বিয়ের ছাদনা তলায় আমার আর বসা হলো না। আজ কলকাতা কাল দিল্লী। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে ভারত নাট্যমের সর্বজন পরিচিত শিল্পী আমি। প্রোগ্রাম করে

চলেছি দিনের পর দিন। এই মুম্বাই শহরে একটা নাচের ক্লাশ চালাচ্ছি আমি নিষ্ঠা সহকারে। তারি মাঝে যখন একলা হয়ে পড়ি, যখন সময়টা আমার একান্ত আপনার, তখন মনে পড়ে—আগরতলা একটা ছোট্ট মিষ্টি শহর, সংস্কৃতি সাহিত্য সঙ্গীতে নাটকে এক জমজমাট শহর। নাচে গানে নাটকে যাত্রায় ভরে থাকতো এ শহর। মনে পড়ে আগরতলার মাটিতে শিল্প সংস্কৃতির মিষ্টি মেটো গন্ধ, ত্রিপুরী বাঁশীর মন মাতানো সুর, পাহাড়ে ভেসে আসা—ওজনিজং জনিজাং.....না এই আকাশছোঁয়া অট্টালিকায় বসে আর ভাবতে পারছি না আমার ফেলে আসা মিষ্টি আগরতলার স্মৃতিকে।

ত্রিপুর ভূমিতে নাট্যভূমি ত্রিপুরার গৌরববৃদ্ধি করেছে

এই গ্রন্থ যদিও ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম পর্ব, ১৯৭৮ পর্যন্ত সীমারেখা টেনে সমাপ্ত ঘোষণা করছে, অপেক্ষা করছে পরবর্তী বছর গুলোকে নিয়ে এবং নতুন নুতন নাট্যসংস্থাকে নিয়ে আলোচনা করতে দ্বিতীয় পর্বে। তবুও ১৯৯৩-তে প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা 'নাট্যভূমি' যার কথা এই পর্বেই উল্লেখ করতে হচ্ছে এই ভেবে যে, বহুবছর পর ত্রিপুরার নাট্যজগতে ত্রিপুরার মুখ উজ্জ্বল করেছে যে সংস্থা তাকে হয়তো এই গ্রন্থে পঞ্জীভূত হবার সুযোগ নাও দিতে পারে মহাকাল।

সংস্থা 'নাট্যভূমি' তাই এ গ্রন্থের শেষ আলোচ্য নাট্য সংস্থা।

পরিচালক সঞ্জয় কর লিখেছিলেন,—"খুব বড় কিছু ভাবনা নিয়ে নয়, ভাল নাটক ভাল ভাবে করবো, সততার সঙ্গে নিষ্ঠা নিয়ে করবো—এমন একটা তাগিদেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নাট্যভূমি' ১৯৯৩ সালে। যাঁরা এর প্রতিষ্ঠার শরিক—প্রত্যেকেই কোনো না কোনো কাজে জীবিকার জন্যে জড়িত ছিলেন। বর্তমান কঠিন সময়ে জীবননির্বাহের প্রাণপাত সংগ্রামের মধ্যেও এঁরা জনাকয়েক শুধু নাটকের জন্য দল গড়লেন। কারণ একমাত্র নাটকেই তাঁদের আত্মা মুক্তি পায়, নাটক তাঁদের প্রত্যেকেরই প্রথম ভালবাসা। নাট্যভূমি গড়ার পিছনে অন্য অনেকের মধ্যে যিনি ছিলেন প্রেরণার, সাহসের মূল উদগাতা, তিনি নাট্যকার চন্দন সেনগুপ্ত।"

তিরানব্বইয়ের ২৬শে আগষ্ট—আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে নাট্যভূমির প্রথম প্রয়োজনা চন্দন সেনগুপ্তর 'আরোহণ'। সঞ্জয় করের নির্দেশনায় এ নাটকে অনুপম, সুপ্রীতি, দুলাল, নীলমণিরা স্থাপন করল এদের চলার প্রথম ফলক। শুধু আগরতলা নয়, মফস্বলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, আদানপ্রদানের মাধ্যমে নিজেদের শিক্ষিত করে তুলতে প্রথম থেকেই নাট্যভূমির কুশীলবেরা ছিলেন প্রস্তুত। শিলচরসহ রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা শহরগুলোতে 'আরোহণ'-এর দশেরও বেশী শো হয়েছিল। এ নাটকে বিশেষ প্রাপ্তি ছিল ত্রিপুরায় প্রখ্যাত আলোকশিল্পী প্রয়াত হরিপদ দাসের আলোক পরিকল্পনা। পরে 'আরোহণ' 'সিঁড়ি' নিয়ে স্থানীয় দূরদর্শনেও প্রযোজিত হয়েছিল।

শুধু নাটক করেই ক্ষান্ত হোলনা তারা, অদম্য জানার আকাঙ্খায়, শেখার আকাঙ্খায় নাট্য

উৎসবের প্রয়োজন দেখা দিল। ১৯৯৪ সালে প্রথম 'উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় নাট্যোৎসব'এর আয়োজন শুরু হোল। ১৯৯৪-এর প্রথম নাট্য উৎসবে অন্যান্য দলের সঙ্গে মণিপুরের 'কলাক্ষেত্র' প্রযোজিত 'পেবেত' 'আফ্রিকা' ও 'তানমালাই' আগরতলার নাট্য দর্শকদের স্তম্ভিত করেছিল। কানহাইলালের দুরন্ত নির্দেশনা, সাবিত্রী দেবীর অভিনয় আজ এক মধুর ইতিহাস। কানহাইলালের এই নাটকগুলো ত্রিপুরার নাট্যচর্চাকে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড প্রভাবিত করেছে। বিশেষতঃ '৯৫-এর পর থেকে ত্রিপুরার ককবরক নাটকে যে এক আমূল পরিবর্তন দেখা যায়—তার পেছনে প্রথম নাট্যোৎসবের কানহাইলালের প্রযোজনা গুলির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

"প্রথম নাট্যোৎসবের সফলতার মধ্য দিয়েই ঘোষিত হলো—ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য প্রতি একবছর অন্তর আয়োজন করা হবে নাট্যোৎসবের। চারিদিকে যখন বিভেদের উগ্র আস্ফালন তখন ভারতের উত্তর-পূর্বের প্রত্যন্ত এই রাজ্যে, যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা সত্ত্বেও, ভিন্ন ভাষাভাষী নাট্যদলগুলোকে একমঞ্চে এনে নাট্যোৎসব আয়োজনের প্রথম পথ দেখাল 'নাট্যভূমি'। বাংলার পাশাপাশি ককবরক, মনিপুরী, অসমিয়া ভাষার নাটক প্রদর্শনের মাধ্যমে এক অখণ্ড সংলাপের উচ্চারণ শুরু হলো এই বেসরকারী পর্যায়ের উৎসব মঞ্চ থেকে।"

"নাট্যভূমিতে নতুন মুখের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এদের নিয়েই শুরু হলো পরবর্তী প্রযোজনা। ১৯৯৫-র শেষ দিকে শুরু হলো চন্দন সেনগুপ্তের আরেক অভিনব সৃষ্টির নাট্যায়ণ 'সোনার হরিণ'। বক্তব্যে, প্রয়োগের নতুনত্বে এ নাটক দর্শক মন আলোড়িত করল। বাংলাদেশের ঢাকা, জামালপুরসহ ত্রিপুরা ও কাছাড়ের বিভিন্ন শহরে বহুবার অভিনীত হলো 'সোনার হরিণ'। প্রচারিত হলো আকাশ বাণী এবং দূরদর্শন থেকেও। সুপ্রীতি ও অনুপম ছাড়া সম্পূর্ণ কুশীলবদের নিয়ে প্রযোজিত হলো এ নাটক।"

নাট্যভূমি আয়োজিত চতুর্থ বর্ষ চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অভিনেতা রামেন্দ্র মজুমদার পাশে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার এবং আগরতলার পুরপিতা আশিস সাহা (১৯৯৬)

"১৯৯৬-র মার্চ মাসে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের সহায়তায় নাট্যভূমির দ্বিতীয়

নাট্য উৎসব যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই সময় ১৪ই মার্চ হঠাৎ সবাইকে শুরুর পথ দেখিয়ে চলে গেলেন নাট্যভূমির প্রাণপুরুষ চন্দন সেনগুপ্ত। যাঁর দ্বিতীয় নাট্যোৎসব উদ্বোধন করার কথা ছিল তাঁরই স্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত হলো এই আয়োজন। এই উৎসব নামাঙ্কিত হলো তাঁর নামে। সে বছর শিলচরে 'দশরূপক'; আগরতলার 'তিয়ারী' ও আয়োজক সংস্থার পাশাপাশি কলকাতার 'চুপ কথা' প্রযোজনা 'তখন বিকেল' এবং গুয়াহাটির 'নাট্যম' প্রযোজনা 'সবিতা' ও 'ভাই' অভিনয়ে, প্রযোগে, উপস্থাপনে বিশেষভাবে দর্শকমন ছুঁয়েছিল। নাট্যভূমির নিজস্ব প্রযোজনা ভাণ্ডারে পরবর্ত্তী সময়ে যুক্ত হলো চন্দন সেনগুপ্তের 'জলছবি', 'প্রসঙ্গ হরধনু' এবং সঞ্জয় করের 'অবলম্বন'।"

১৯৯৮এর তৃতীয় চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি নাটোৎসবের সহায়তায় ছিলেন আগরতলা পুর পরিষদ। উত্তর পূর্বাঞ্চল—পূর্বাঞ্চল পর্যায় হয়ে এই নাট্যোৎসবে এ বছর থেকে যুক্ত হলো আর একটি পালক—বাংলাদেশের নাটক। সে বছর ২২শে এপ্রিল তুমুল বর্ষণ ঝরা সন্ধ্যায় ঢাকা-বাংলাদেশের 'থিয়েটার সেন্টার' প্রযোজনা করলো ডঃ নীলিমা ইব্রাহিমের 'আমি বীরঙ্গনা বলছি'র নাট্যরূপে 'শামুকবাস'। যাঁরা এ নাটক দেখেছেন তাঁদের প্রত্যেকের স্মৃতিতে বহুকাল এ নাটক বেঁচে থাকবে! বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বীরাঙ্গনাদের এ এক অকথিত জীবন সংলাপ। মঞ্চস্থ হয়েছিল স্থানীয় দল 'তিয়ারী' 'শিল্পার' সঙ্গে কলকাতার' 'গান্ধার' প্রযোজনা বিজয়লক্ষ্মী সেনের একক অভিনয়ে 'যাঁরা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'। জয় গোস্বামীর কাব্যের বৃষ্টি বিজয় লক্ষ্মীর অভিনয়ে সুবার মন ভিজিয়েছিল। গুয়াহাটির 'সীগাল' প্রযোজনা পরাগ শর্মার নির্দেশনায় অসমীয়া নাটক 'পরশুরাম' এবং থিয়েটার গিল্ড প্রযোজনা নরেন পাটগিরি নির্দেশিত 'কর্ণকথা' সেবারের অন্যতম আকর্ষণ ছিল।

নাট্যোৎসব আয়োজনের পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মতভাবে নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রশিক্ষণের জন্য বিশ্ববন্দিত নাট্যকার, নির্দেশক বেরটল্ট ব্রেখশ্ট এর জন্ম শতবর্ষ উপলক্ষে ১৯৯৮-এর আগষ্ট মাসে আগরতলার সুকান্ত একাডেমিতে আয়াজিত হলো সপ্তাহব্যাপী নাট্যপ্রশিক্ষণ শিবির, প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো ব্রেখশ্ট বিষয়ে আলোচনা সভা। বাংলা দেশের বিশিষ্ট নাট্য সমালোচক অধ্যাপক শফি আহমেদ সহ রাজ্যের সরোজ চৌধুরী, বামাপদ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ নাট্য বিশেষজ্ঞরা এতে বক্তব্য রাখেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাত দেওয়া হয় ত্রিপুরার ইতিহাস কেন্দ্রিক একটি বড় ধরনের কাজে। রাজন্য ত্রিপুরায় ১৯৪২-৪৩ সালে রিয়াং জনগোষ্ঠীর এক গৌরবোজ্জ্বল বিদ্রোহের বিষয় উঠে এল 'দেবোনা তিতুন'-খ্যাত নাট্যকার কমল রায়চৌধুরীর কলমে। ১৯৯৮-এর ২৩শে অক্টোবর আগরতলা টাউন হলে প্রযোজিত হলে এই নাটক 'ধর্মগোলা'। ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরে গত একবছরে বেশ কিছু অভিনয় হয়েছে এ নাটকের। ইতিহাসে স্মরণীয় বিক্ষোভে আবর্তিত সে সময়ের গৌরব-গাথা দর্শক আনুকূল্য পেয়েছিল। ১৯৯৯-এর মাঝামাঝি থেকেই শুরু এবারের নাট্যোৎসব অর্থাৎ ৪র্থ চন্দন

সেনগুপ্ত স্মৃতি নাট্যোৎসব ২০০০-এর প্রস্তুতি। আগামী ১১-ই জানুয়ারী থেকে স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে শুরু হচ্ছে পাঁচ দিনের নাট্যোৎসব। শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে আয়োজিত এই নাট্যোৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে নাট্যভূমির সুহৃদ ও সহযোদ্ধাদের নিয়ে চলেছে এক নিরলস কর্মযজ্ঞ। নাট্যভূমির মুকুটে আরেকটি গৌরবের পালক যুক্ত হলো কলকাতার 'নান্দীকার' আয়োজিত জাতীয় নাট্যোৎসবে নাট্যভূমির আমন্ত্রণ। নাট্যভূমি এই উৎসবে 'সোনার হরিণ' উপস্থাপনা করবে।

"এ ছাড়াও নাট্যভূমির কিছু পরিকল্পনা আছে। নাট্যশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এতে ছোঁয়া লাগাতে হবে পেশাদারীত্বের। তৈরী করতে হবে পটু নাট্যকর্মী। এ বিষয়গুলি দীর্ঘদিন ধরেই এ রাজ্যে উপেক্ষিত। পেশাদারীত্বের কথা বললেই আবার অনেকের মাথা গরম হয়ে যায়। নাটক হবে পেশা, তা হলেতো নাটকের দায়বদ্ধতা বলে আর কিছুই থাকবে না। নাটক হয়ে উঠবে মুনাফার কারখানা।

আমাদের ধারণা, নাটককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই পেশাদারিত্বের প্রযোজন। এ জন্যেই প্রয়োজন নাট্য বিষয়ক শিক্ষণের। এ রাজ্যে সে ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়েও এ জাতীয় পরিকল্পনা আছে বলে জানিনা। নাট্যভূমি নাট্যকর্মীদের আধুনিক নাট্য শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চায়—শিক্ষিত করতে চায় ত্রিপুরার নাটকের উন্নতির জন্যেই। একটা একাডেমিক পরিবেশ, যাকে শুদ্ধ বাংলায় বলা যেতে পারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ, গড়তে চায় নাট্যক্ষেত্রে। সেটা ছাত্র পড়িয়ে টাকা রোজগারের জন্য নয়, একটি শিক্ষিত নাট্যদল গড়ে তোলার জন্য। জানিনা—কবে এই পরিকল্পনা সার্থক হবে। আমরা আমাদের সীমিত ক্ষমতায় এই লক্ষ্যে পৌছতে চেষ্টা করছি।

সাতবছর সময় হিসাবে খুব বেশী নয়। কিন্তু এরই মধ্যে নাট্যভূমি নাটকের স্বার্থে, সর্বোপরী সুস্থ মননের জন্য নিষ্ঠা নিয়ে সততার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। চলার পথে নানা বাধা আসে—নানা রূপে নানা মুখোশে। নাট্যভূমির চলার ছন্দেই সে সব চূর্ণ হবে—কারণ নাট্যপ্রেমী মানুষের ভালবাসা আর আশীর্বাদই নাট্যভূমির প্রেরণা শক্তি"

নাট্যভূমি আয়োজিত চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতি নাট্যাৎসব ২০০০ স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত সঞ্জয় কর এর আলোচনা থেকে গৃহীত হলো। [এই প্রসঙ্গে উক্ত নাট্যোৎসব-এর সহ সভাপতির একটি পত্র উদ্ধৃত হলো ঃ]

.....ত্রিপুরার নাট্যআন্দোলন এখন চলছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। সাতের দশক এবং আটের দশকে যে জোয়ার এসেছিল নয়ের দশকের শেষপ্রান্তে সে জোয়ার স্তিমিত তবে ক্ষীণধারায় হলেও তা এখনো বহমান। .....

কমল রায়চৌধুরী

(ত্রিপুরার বিশিষ্ট নাট্যকার অভিনেতা

'চন্দন সেনগুপ্ত স্মৃতিনাট্যোৎসব ২০০০'-এর সহ-সভাপতি)

"যাত্রায় লোকশিক্ষা হয় রে"

যাত্রার আসর থেকে সাহিত্য

শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি ।। —৺পতঞ্জলি ভট্টাচার্য্য

অশোকের কটা ছিল নাতি,
আকবরের কটা ছিল হাতি,
এসব তত্ত্ব করিয়া বাহির,
বড় বিদ্যে করেছি জাহির

হয়তো উদ্ধৃতি ঠিকভাবে করিতে পারি নাই। বাসর-সদস্যরা মাপ করিবেন। চিরকালই স্মৃতিশক্তি আমার দুর্বল তাহার উপর বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির বার্ধক্যে স্মৃতিভ্রংশ হয়। কবিতাটি কাছে থাকিলে ভুল শুধরাইয়া লইতে পারিতাম। খুঁজিয়া বাহির করিবার পরিশ্রম করিতেও ইচ্ছা হইতেছে না।

উদ্ধৃতি নির্ভুল হউক বা না হউক, আসলে কোনো ভুল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আসল যদি ঠিকই রহিল, তবে উদ্ধৃতি ঠিক হইল কিনা তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি?

কবিতাটি আপনাদের স্মরণপথে আনিবার কারণ আছে। নিতান্ত অক্ষম হইলেও আমাকে অনুরূপ বিদ্যা-জাহির কার্যে আপাতত লিপ্ত হইতে হইতেছে।

কেন,—তাহা আপনাদের না বলিয়া পারিব না। আগরতলায় কিছুদিন পূর্ব্বে তরণী সেন বধের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ে শ্রীরামকে দীর্ঘশ্মশ্রুসমন্বিত দেখা গেল। অনেকেরই মনে প্রশ্ন উদিত হইল—শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি ছিল কি না?

এই প্রশ্নের সমাধানের জন্য আমার কনিষ্ঠা শ্যালিকা আমাকে এক পত্রাঘাত করিয়াছেন।

তিনি শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি থাকার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিও দিয়াছেন। তাঁহার মতে, শ্রীরামচন্দ্র এক-আধদিন বনবাস করেন নাই—দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষকাল বনবাস করিয়াছিলেন। বনে ক্ষৌরকার না পাওয়ারই সম্ভাবনা। অতএব দিনে দিনে তাহার শ্মশ্রু পরিবর্ধমান হইবারই কথা। কিন্তু শ্যালিকা দেবী একটি খটকাও তুলিয়াছেন। ঐ অভিনয়ে শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি থাকিলেও তদনুজ লক্ষ্মণের নাকি দাড়ি ছিল না। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

প্রকৃতপক্ষে শ্রী রামচন্দ্রের দাড়ি থাকুক বা না থাকুক, শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি দেখিয়া

আজকালকার জনসাধারণের বিস্মিত হওয়া বিচিত্র নহে। শিশুকাল হইতে আমরা যে সব ছবি, যাত্রা, অভিনয় প্রভৃতি দেখিয়াছি, তাহার ফলে কতকগুলি চরিত্রের সহিত দাড়ির নিত্যসম্বন্ধ বলিয়াই আমাদের মনে হয়। কথায় বলে,—'গাঁজা, গেরুয়া, গোঁফ-দাড়ি এই তিনে সাধু ভারি।' মুনি-ঋষির যদি দাড়ি গোঁফ না থাকে তাহা হইলে যেন বড়ই বেমানান ঠেকে। রোষকষায়িত চক্ষু লইয়া আপনাদের সম্মুখে বিশ্বামিত্র ঋষি দণ্ডায়মান কিন্তু শ্মশ্রুর অভাবে যদি 'শ্মশ্রুমাবর্ত্য-পাণিনা' ('শ্মশ্রুম্' বোধ হয় আর্যপ্রয়োগ) তিনি তাঁহার ক্রোধ প্রকাশ করিতে না পারেন, তাহা হইতে যেন মনে হয় তাঁহার চিত্র যথোপযুক্তই হয় নাই। ধ্যানস্থ বাল্মিকী মুনি, অথচ তঁহার প্রশস্ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু শোভাবিরহিত—এ কেমন লাগে? বীণাহস্তে গান করিতে করিতে নারদ মুনি অবতীর্ণ হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখ একেবারে দাড়িবিহীন—এমন নারদের যেন মুনিত্বই নাই বলিয়া বোধহয় না কি? শুধু আমাদের দেশের মুনি-ঋষিদের কথা কেন, পাশ্চাত্য জগতের মুনিঋষিদের কথা ভাবিয়া দেখুন না কেন? ঐতিহ্য বলে—খ্রীষ্টানদের আদিপুরুষ এ্যাডাম (Adam) দাড়িসহিতই সৃষ্ট হইয়াছিলেন। ছবিতে দাড়িবিহীন এ্যাব্রাহাম বা রাজা আর্থারের দেখা পাইবেন না।

যেমন দাড়ি না থাকিলে কতকক্ষেত্রে বিসদৃশ ঠেকে, তেমনি থাকিলেও কতকক্ষেত্রে বড়ই অদ্ভুত মনে হয়। ধরুন, শ্রীকৃষ্ণের কথা। মাথায় চুড়া, হাতে মোহনমুরলী, পরঁনে পীতধরা, নব ঘনশ্যাম নওলকিশোরের বদনমণ্ডলে দীর্ঘ শ্মশ্রুরাজির শোভা! শ্রীকৃষ্ণের এ রূপ কল্পনা করিতে পারেন কি? কোনো ছবি বা অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের এ রূপ দেখিয়াছেন কি? এমন রূপ লইয়া শ্রীকৃষ্ণ যদি গোপিনীদের মনোহরণ করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার শ্মশ্রুরাজির কি দশা হইত তাহা আপনারাই বলুন। আর রাধিকার মূর্ছাই বা কে নিবারণ করিতে পারিত? কৃষ্ণসখা অর্জুনের কথাও ভাবিয়া দেখুন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে রথে দণ্ডায়মান অর্জুন জ্যাকর্ষণ করিতেছেন—দীঘ শ্মশ্রুশোভিত তাঁহার মুখচন্দ্র? ভাবিতে পারেন কি? তেমনি শ্মশ্রুশোভিত শ্রীরামচন্দ্র কোনো ছবিতে বা অভিনয়ে পূর্বে দেখিয়াছেন কি? শুনিতে পাই —আমাদের নবদিল্লীর বিড়লামন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিমূর্তি আছে। সেই প্রতিমূর্তিতে কি দাড়ি দেওয়া হইয়াছে? ইহার উত্তর আপনারা অনুগ্রহ করিয়া শচীনবাবু বা সুখময় বাবুর নিকট হইতে জানিয়া লইবেন। আমি ত শুনিয়াছি শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রতিমূর্তিতে দাড়ির লেশমাত্র নাই, তবে এই প্রতিমূর্তি বনবাসকালীন রামের কিনা জানি না।

শ্রীরামচন্দ্র ক্ষত্রিয় ছিলেন। ক্ষত্রিয়রা যোদ্ধা। পূর্বকালে পাশ্চাত্য দেশে যোদ্ধাদের মধ্যে দাড়ি রাখার রেওয়াজ ছিল বলিয়াই মনে হয়। শ্যার্লমেনের নাকি দাড়ি ছিল। গল্প আছে বীর আলেকজাণ্ডার এক সময় তাঁহার সেনাপতি ও সৈন্যদের দাড়ি কর্তন করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, কেন না দাড়ি থাকার জন্য যুদ্ধে অসুবিধা হইতেছিল। আমাদের দেশেও

অনুরূপ কোনো প্রথা প্রচলিত ছিল কি না, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। তবে ভরত যখন রামকে বনবাস হইতে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন এবং পথে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বিশ্রাম করেন, তখন ঐ মুনি অতিথিদের সেবার্থ নানা প্রকার আয়োজন করেন। তিনি নাকি কূর্চও সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কূর্চ দ্বারা নাকি শ্মশ্রু মার্জন করা যায়। ইহা হইতে এই মাত্র সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত শ্মশ্রুমান ছিলেন এবং শ্মশ্রুমার্জন প্রথা তৎকালে বর্তমান ছিল। রামের যে দাড়ি ছিল তাহা নিশ্চয়ই এতদ্ দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—যুগভেদে দাড়ি রাখার প্রথারও ইতরবিশেষ ঘটিয়াছে। কখনো কখনো দাড়ি ভদ্রতা ও ভব্যতার পরিচায়ক বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইত, আবার কোনো কোনো সময় শ্মশ্রুশোভা মোটেই সমাদর লাভ করিত না। শ্রীরামচন্দ্রের যুগে দাড়ির কিরূপ কদর ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। ক্ষত্রিয়দের যে দাড়ি রাখিতেই হইবে এরূপ কোনো অনুশাসন মনুসংহিতা বা অন্য কোনো সংহিতায় এ যাবত আমার চোখে পড়ে নাই, যদিও শ্মশ্রুর শুভাশুভ লক্ষ্মণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় :—

নিম্নং বক্রমপুত্রাণাং কৃপণানাঞ্চ হ্রস্বকম।

সংমপূর্ণং ভোগিনাং কান্তং শ্মশ্রু স্নিগ্ধং শুভং মৃদু।।

সংহতং চাস্ফুটিতাগ্রং রক্তশ্মশ্রুশ্চ চৌরকঃ।

রক্তাল্পপরুষ শ্মশ্রুকনাঃ স্যু পাপমত্যবঃ।।

অস্যার্থঃ—অপুত্রদের দাড়ি নিম্নমুখী, কৃপণদের দাড়ি হ্রস্ব, ভোগীদের দাড়ি সম্পুর্ণ, কান্ত, স্নিগ্ধ, শুভ ও মৃদু, চোরদের দাড়ি সংহত, অগ্রভাগ অস্ফুটিত ও রক্তবর্ণ, পাপীদের দাড়ি অল্প লাল ও কর্কশ।

এক বয়সে শ্মশ্রু হইয়া উঠে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার প্রতীক। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গ অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ করুন। শ্রীরামচন্দ্র বনবাসান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতেছেন। তাঁহার পুষ্পক্ বিমান গগনমার্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়াছে। তিনি ধরাতলে পদার্পণ করিলেন—এবং শ্মশ্রুপ্রবৃদ্ধিজনিতানন বিক্রিয়াংশ্চ, প্লক্ষান্ প্ররোহজটিলানিব মন্ত্রিবৃদ্ধান......অন্বগ্রহীৎ। বৃদ্ধকালে আননবিকৃতি ঘটে। দাড়ি থাকিলে শুধু যে আননবিকৃতিই ঢাকা পড়ে তাহা নহে—সাধারণের নিকট সহজেই জ্ঞানী ও অভিজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়া যায়। তদুপরি দাড়ি যদি একটু শুভ্রকান্তি হয়, তাহা হইলে ত কথাই নাই।

কিন্তু বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্রের বয়স তো বেশী ছিল না। সীতাকে হরণ করিয়া রাবণ

যখন পলায়ণ করেন, সে সময়ে সীতা শ্রীরামচন্দ্রের যে বর্ণনা দেন তাহাতে দেখা যায় যে শ্রীরামচন্দ্র তখনও যৌবন অতিক্রম করেন নাই। সেই বয়সে অবশ্য শ্রীরাম বা লক্ষণের দাড়ি গজানোই স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁহাদের মতো সুশ্রী যুবকদের পক্ষে দাড়ির প্রতি বিশেষ আসক্তি থাকা কি স্বাভাবিক?

আসক্তি না হয় না রহিল, কিন্তু সে যুগের লোকের পক্ষে দাড়ি কামানো কি সম্ভব ছিল?

অসম্ভব যে তাহাও ত বলিতে পারি না। ক্ষুরের ন্যায় কোনো যন্ত্র যে প্রাচীনকালে ভারতে বর্তমান ছিল তাহার প্রমাণ খুঁজিতে বেশি কষ্ট করিতে হইবে না। উপনিষদের সেই প্রসিদ্ধ 'ক্ষুরস্য ধারা'র কথা স্মরণ করুন। ক্ষৌরক্রম নির্দেশ করিতে গিয়া গোভিল বলিয়াছেন—'শ্মশ্রুকর্মকারয়িত্বা নখচ্ছেদনমনন্তরম্।' এই ক্ষুর কি প্রকারের ছিল? ক্ষুর অর্থে তীরের অগ্রভাগে যে তীক্ষ্ণ ফলক থাকে তাহাও বুঝায়। কে জানে এই তীক্ষ্ণ ফলক দ্বারা শ্মশ্রুকর্ম সম্পন্ন হইত কিনা? শ্রীরামচন্দ্র রাজপুত্র, রাজপুত্রদের পক্ষে ক্ষৌরকার দ্বারাই ক্ষৌরকর্ম সম্পন্ন করানো সাধারণতঃ সম্ভব! বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র ক্ষৌরকার পাইবেন কোথায়? শ্রীরামচন্দ্র নিজেই যে নিজের শ্মশ্রুকর্ম সম্পন্ন করিতে পারিতেন না তাহা কি করিয়া বলা যায়? আর যদি অন্য কাহারও সাহায্য একান্তই প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে অনুজ লক্ষ্মণ কি এটুকু সহায়তা করিতে পরাঙমুখ হইতেন? নিজেই নিজের দাড়ি কামাইতে হইলে দর্পণ সামনে থাকিলে ভাল হয়, কিন্তু দর্পণ না থাকিলে যে কামানো অসম্ভব তাহা বলিতে পারি না। দর্পণের অভাব ত সরোবর বা পুষ্করিনীর জল দ্বারাই পূরণ করা যাইত।

বনবাসকালে শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের পক্ষে শ্মশ্রুধারণ কি অবশ্য কর্তব্য ছিল? কৈকেয়ী বলিয়াছিলেন—

"সপ্ত সপ্ত চ বর্ষাণি দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ
অভিষেকমিদং ত্যক্ত্বা জটাচীর ধরো ভব।"

রাম বলেন—

'এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ
জটাচীর ধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন।'

পুনশ্চঃ—

"চতুর্দশ হি বর্ষাণি, বৎস্যামি বিজনে বনে।
কন্দমূলফলৈর্জীবন, হিত্বা মুনিবদামিষম্।।"

যদি শ্রীরামচন্দ্রের যুগে শ্মশ্রুর সমাদর থাকিত, তাহা হইলে আর কেহ না হউক, শূর্পনখা রামের যে আকৃতিদর্শনে বিমোহিতা হইয়াছিল, সেই আকৃতি বর্ণনে শ্মশ্রু কিছু

না কিছু স্থানলাভ করিত। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে শ্মশ্রুর কোন উল্লেখও ত নাই। সেই বর্ণনা শুনুন :

দীপ্তাস্যঞ্চ মহাবাহুং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্
গজবিক্রান্তগমনং জটামণ্ডল ধারিণম্
সুকুমারং মহাসত্ত্বং পার্থিব ব্যঞ্জনান্বিতম্
রামরিন্দীবাশ্যামং কন্দর্পসদৃশ প্রভম্
বভূবেন্দ্রোপমং দৃষ্টা রাক্ষসী কামমোহিতা।

বস্তুত রামায়ণের যেখানে যেখানে শ্রীরামচন্দ্রের উল্লেখ আছে প্রায় সে সব স্থলেই রামায়ণকার তাঁহাকে কোনো না কোনো বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন। এই বিশেষণগুলির মধ্যে কোথাও তাঁহার শ্মশ্রুঘটিত কোনো বিশেষণ আপনাদের নজরে পড়িয়াছে কি? আমার ত পড়ে নাই। কালিদাসের দাড়ি ছিল কি না জানি না, তাঁহার কথা ছাড়িয়া দেওয়াই ভাল। তাঁহার মত সৌন্দর্যস্রষ্টা, নয়নাভিরাম রামকে শ্মশ্রুমণ্ডিত করিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত করিবেন—একথা যেন আমরা ভাবিতেই পারি না। কিন্তু রামায়ণ রচয়িতা বাল্মীকির ত দাড়িতে এত অরুচি হইবার কথা নহে। রামের ও লক্ষ্মণের বটক্ষীর দ্বারা জটা প্রস্তুত করিবার কথা তিনি লিখিয়াছেন। বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরিয়া রামের এই জটা যে কর্তন করা হইয়াছিল তাহাও তিনি আমাদের জানাইয়াছেন, শুধু রামের শ্মশ্রুর উল্লেখ করিতে কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন?

রামের শ্মশ্রু না থাকার পক্ষে এ যাবত কারণ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। তবে তরণী সেন বধের রামচন্দ্রের দাড়ি আসিল কোথা হইতে? সংস্কৃতে প্রবাদ আছে—"বিষবৃক্ষোহপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম সাম্প্রতম্।" এরূপ কোনো কারণেই কি তবে তরণীসেন বধের শ্রীরামচন্দ্রের বদনমণ্ডলে শ্মশ্রুশোভা দেখা গিয়াছিল?

এরূপ অনুমান করা বোধহয় ঠিক হইবে না, কেন না রামায়ণের একস্থলে দেখিতেছি যে রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বনবাসকালে বৈখানস ব্রত অর্থাৎ বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য উভয়ের মতেই বানপ্রস্থকে শ্মশ্রুজটালোমভৃৎ হইতে হইবে। ইহার জন্যই হয়ত বা তরণী সেন বধের রামচন্দ্রকে শ্মশ্রুধারী দেখা গিয়ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে লক্ষ্মণেরও শ্মশ্রু থাকা উচিত ছিল।

কিন্তু শ্রীরামচন্দ্র কি বানপ্রস্থ ধর্ম নিষ্ঠা সহকারে পালন করিয়াছিলেন? শ্রীরামচন্দ্র ভগবানের অবতার, তাঁহার চরিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনাতে ভক্তদের মনে আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতেই হইবে, একান্ত নিষ্ঠার সহিত তিনি বানপ্রস্থধর্ম পালন করিয়াছিলেন কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বনবাসকালে স্বয়ং সীতা তাঁহাকে হিংসাবৃত্তি ত্যাগের জন্য অনুরোধ

করেন। এ অনুরোধের কারণ কি? মারীচকে নিহত করিয়া সীতার নিকট প্রত্যাগমন করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল কেন? তিনি মৃগশিকার করিতে গিয়াছিলেন বলিয়াই কি এই বিলম্ব হয় নাই? বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্র শুধু ফলমূল খাইয়াই জীবনধারণ করিয়াছিলেন, এরূপ ধারণার ভিত্তি যে খুব সুদৃঢ় তাহা ত বলিতে পারি না। মনে হয়, তিনি নিজে সময় সময় মাংস খাইতেন এবং সীতাকেও মাংস খাওয়াইতেন। এই সব বিবেচনা করিয়া, বনবাসকালে তিনি জটা রাখিলেও মাঝে মাঝে শ্মশ্রুকর্ম করিতেন বা করাইতেন এরূপ ভাবা কি নিতান্ত অন্যায়?

তরণীসেন বধের শ্রীরামচন্দ্রের কল্যাণে আমাদের গবেষণা বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে। অনেক বিদ্যা জাহির করা হইয়াছে। পূর্ণচ্ছেদ টানিবার সময় আসিয়াছে।

গবেষণার সারমর্ম্ম হইল এই—বনবাসকালে শ্রীরামচন্দ্রের যে দাড়ি ছিল তাহার একমাত্র প্রমাণ—তিনি বানপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই প্রমান আবার বিচারসাপেক্ষ। দাড়ির প্রতি জনসাধারণের এখন তেমন আকর্ষণ নাই—তা সে দাড়ি কানচাপা দাড়িই হউক, পাঁজাভরা দাড়িই হউক বা বোঁচামুখে দাড়িই হউক। দাড়ি থাকিলে শুধু যুদ্ধকালে যে বিপদ হইতে পারে, তাহা নহে, ললনাকুলের মনেও অশ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি থাকিলে জনকনন্দিনী সীতার মনোজগতে বিপ্লব উপস্থিত হইত কিনা কে বলিতে পারে। স্বেচ্ছায় শ্রীরাম সীতার অবাঞ্ছিত কোনো কার্য করিবেন ইহা ভাবিতেও যেন আমাদের কষ্ট হয়। শক্তিস্বরূপাদের মনোব্যাথাজনক কার্য করিলে সৃষ্টিকার্যে মহাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব তরণীসেন বধে শ্রীরামচেন্দ্রর দাড়ি না থাকাই উচিত ছিল।

আমার কথাটি ফুরাইল। একটা সংস্কৃত শ্লোক দিয়াই লেখা শেষ করি—পরিহাসবিজল্পিতং সখে, পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ।

সুখময়বাবু পণ্ডিত লোক। এ শ্লোকের অর্থ করিতে তাঁহার কোনো কষ্ট হইবে বলিয়া মনে হয় না। আর সংস্কৃত যদি তাঁহার না জানা থাকে, তবে বাসরের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরা তাঁহাকে এই শ্লোকের মানে বুঝাইয়া দিবেন, আশা করি।

প্রাসঙ্গিক কথা : পশ্চিমবঙ্গের পরিভাষা সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত ৺পতঞ্জলি ভট্টাচার্য রচিত এই রম্য-রচনাটির একটি রসপূর্ণ পশ্চাৎপট আছে যা যুগপৎ ত্রিপুরার নাট্যলোক ও সাহিত্য জগতের একটি বৈশিষ্ট্য বা বৈচিত্র্যের স্বরূপ প্রকাশ করে। ঘটনার আনুপূর্বিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল এই—

১৯৫৪ সালের শেষের দিকে আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র সম্মিলন উৎসবের অঙ্গস্বরূপ ছাত্র-অভিনেতা ও শিল্পীদের নিয়ে যাত্রা পালা অভিনয়ের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদানুসারে রামায়ণের কাহিনী ভিত্তিক 'তরণীসেন বধ' নাটক

মহাসমারোহে মঞ্চস্থ হয়। নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে অভিনয় করেন—তরণী সেনের ভূমিকায় ত্রিপুরেশ মজুমদার, রামচন্দ্রের ভূমিকায় সুখময় সেনগুপ্ত (ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী), রাবণের ভূমিকায় সুধাংশুমোহন দত্ত, লক্ষ্মণের ভূমিকায় পরিতোষ মুখার্জি, মন্দোদরীর ভূমিকায় কানু ব্যানর্জি, সীতার ভূমিকায় চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, বিভীষণের ভূমিকায় ধূর্জটি দাশগুপ্ত এবং সরমার ভূমিকায় সুধীর ভট্টাচার্য। এছাড়া পার্শ্বচরিত্রগুলিতে ছিলেন: কালনেমি—নীলরতন গাঙ্গুলী, অঙ্গদ—দিগেন ব্যানার্জি, সুগ্রীব—অবিনাশ গৌতম, সারণ—অজিত দেববর্মা, শুক—মনীন্দ্র ভট্টাচার্য, বিদ্যুৎজিহ্ব—পার্বতী ভট্টাচার্য, মারুতি—আশু রায়, নল—নিতাই ঘটক , বিবেক—বিধু দেববর্মা। কন্সার্টে রমেশ দেববর্মা ও তাঁর সহশিল্পীগণ। পালার 'অধিকারী' ও ম্যানেজার ছিলেন যথাক্রমে ডাঃ দিগেন্দ্রলাল ব্যানার্জী ও শ্রী তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত (ত্রিপুরার প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী) রূপসজ্জায় অংশগ্রহণ করেছিলেন রবি ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল সেন, মন্টু রায়, পীযূষকান্তি মজুমদার এবং স্থানীয় অন্যান্য রূপশিল্পীরা।

অভিনয়ের প্রস্তুতিপর্ব থেকেই বহুতর সংশয় ও বিতর্কের সূচনা হয় স্থানীয় নাট্যামোদী ও অভিনেতৃমহলে। সংশয় প্রধানত এজন্য যে, যদিও এ নাটকের মনোনীত অভিনেতারা সকলেই স্থানীয় থিয়েটারের কৃতী অভিনেতা তথাপি বিপরীতধর্মী যাত্রাভিনয়ে অনভ্যস্ত বিধায় তাঁরা এ অভিনয়ে সফল হতে পারবেন কি? অতি সঙ্গত সংশয়। কিন্তু কার্যতঃ শিল্পী ও অভিনেতারা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয় করে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন যে, প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের কাছে অসম্ভব কিছুই নয়। বস্তুত 'তরণীসেন বধ' নাটকের এই অভিনয় ত্রিপুরার নিজস্ব যাত্রাশিল্পের ইতিহাসে একটি কীর্তিসমুজ্জ্বল অধ্যায় সংযোজন করেছে।

নাটকের বির্তর্কিত বিষয়গুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রামচন্দ্রের 'দাড়ি প্রসঙ্গ'। কারণ, 'রাম' চরিত্রের অভিনেতার মুখমণ্ডলে সযত্নলালিত দাড়ি ছিল। (বলাবাহুল্য, স্বীয় শ্মশ্রুর প্রতি তাঁর প্রীতি ও মমতা ছিল অপরিসীম)। অভিনয়কালে তিনি দাড়ি কামিয়েই মঞ্চে অবতরণ করবেন এমন ধারণাই সকলের ছিল, কিন্তু কার্য্যকালে হলো বিপরীত, অর্থাৎ রামচন্দ্র শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত শ্মশ্রুমোচনে নারাজ। যদি অভিনয় তাঁকে করতেই হয় তবে দাড়ি রেখেই করবেন—ধনুকভাঙ্গা পণ! দাড়ি রাখার সপক্ষে তিনি প্রত্যয়শীল যুক্তিও রাখলেন যা প্রতিবাদীরা প্রতিযুক্তি দিয়ে খণ্ডন করতে পারলেন না। সমস্যার সমাধানও হল না। একদিকে নাটকের মহলা চলতে লাগলো পূর্ণোদ্যমে, সঙ্গে সঙ্গে দাড়ি রাখার পক্ষে-বিপক্ষেও চলতে লাগলো তুমুল বিতর্ক। অথচ এ নাটকের রামচন্দ্রের ভূমিকায় যে শ্রীসেনগুপ্ত মহাশয়ই রূপে-গুণে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' একথা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শেষপর্যন্ত ধনুকভাঙা পণের-ই জয় হল—শ্মশ্রুশোভিত রামচন্দ্ররূপেই তিনি মঞ্চে অবতরণ করলেন।

অভিনয়ও করলেন অনিন্দ্যসুন্দর। আলোড়নের সৃষ্টি হল সর্ব্বত্র। শুধু নাট্যলোকেই নয়, সাহিত্যজগতেও সেই আলোড়নের ঢেউ প্রবাহিত হল। সুরসিক সাহিত্যিক পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এই অভূতপূর্ব ঘটনাকে অবলম্বন করে লিখেছেন তত্ত্বসমৃদ্ধ রম্যরচনা 'শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি'। রচনাটি পাঠিয়ে দিলেন আগরতলায় 'সাহিত্য বাসর-এ' আলোচনার জন্য। সাহিত্য-বাসরের এক বিশেষ অধিবেশনে রচনাটি পাঠ করা হয় এবং বাসরের সুরসিক সাহিত্যিকগণ এই রম্য রচনার উপর সুরম্য আলোচনা করেন। সাহিত্য-বাসরে আলোচিত মহৎ সাহিত্য কর্মগুলির মধ্যে 'শ্রীরামচন্দ্রের দাড়ি' রচনাটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান হিসাবে প্রশংসিত হয়।

রচনার একাংশে 'শচীনবাবু' ও 'সুখময়বাবু' উল্লিখিত আছে, তাঁরা হলেন যথাক্রমে ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ও মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত।

—শ্রীঅনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাক্তন প্রচার সম্পাদক, সাহিত্য-বাসর

'যাত্রা সম্মেলন' ত্রিপুরার যাত্রাভিনয়কে আন্দোলনমুখী করেছে

যখন খুব ছোট ছিলাম গ্রামে এক যাত্রা দেখতে গিয়েছিলাম—'চাষার ছেলে'। চাষার ছেলে রাজা হোল অবশেষে। তারপর দীর্ঘ সংগ্রাম সেই সব সম্ভ্রান্ত রাজাদের বিরুদ্ধে যারা তাঁকে সম্মান দিতে রাজি নয়। আমার কানে আজো বাজে—'লোকে বলে চাষা-চাষা-চাষা'—। কি প্রচণ্ড ক্রোধ, ঘৃণা ঝরে পড়েছিল সেই চাষীরাজার কণ্ঠে। তাঁর অভিনয়ে আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে দেখার আগ্রহে সাজঘরের আনাচে কানাচে ঘুরঘুর করতাম প্রতিদিন। কনসার্ট বেজে যেত। শেষ ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে যাত্রা শুরুর শেষ কনসার্টটি বেজে উঠতো। যাত্রার সকল শিল্পী একে একে একটা ছবিকে প্রণাম করে বেরিয়ে আসতেন। তখন না জানলেও পরে জেনেছি যাঁকে তারা প্রণাম করতেন তিনি হলেন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ।

'যাত্রায় লোকশিক্ষা হয়রে'—যাত্রা লোকশিক্ষার একটা বড় মাধ্যম—এমন করে এই প্রধান চিন্তা ঠাকুর রামকৃষ্ণ ছাড়া আর কেউ বারে বারে মগজে ঢোকায়নি। লোক শিক্ষার এত বড় গণমাধ্যম—যাত্রার বিকল্প আর কিছু নেই। চারিদিকে অগণিত দর্শক, মধ্যিখানে যাত্রার মঞ্চ। মঞ্চে শিল্পীদের উদাত্ত কণ্ঠে অভিনয়, বিবেকের পথনির্দেশ উচ্চগ্রামে সুরবাঁধা সঙ্গীতের উপর; সমস্যা, সংঘাত, উত্তেজনা—লক্ষ মানুষকে পালার তালে তালে উদ্বেল করেছে। ঠিক যে সময় এই সহজ গ্রাম মানুষকে পাগলকরা

মাধ্যমকে উপেক্ষা করে শহুরে মানুষ থিয়েটারের নৌকোয় জয়যাত্রার পাল তুলে দিয়েছে, অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়েছে, ঠিক সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সচেতন করলেন দেশের মানুষকে যাত্রাকে মর্যাদা দান করে। অভিনেত্রী নটী-বিনোদিনীকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে দুহাত দুলে আশীর্বাদ করেছিলেন, সে আশীর্বাদ শুধু নটী-বিনোদিনীকেই নয়, সে আশীর্বাদ নটী-বিনোদিনীর মধ্য দিয়ে অতীত বর্ত্তমান এবং অনাগত ভবিষ্যতের সকল শিল্পীদের প্রতি আশীর্বাদ। রঙ্গালয়ের অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে লোকে তখন সুনজরে দেখতো না, সমাজে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা ছিল—অভিনেতারা দুশ্চরিত্র, আর অভিনেত্রীরা বারাঙ্গনা বলে একশ্রেণীর লোকেরা ঘৃণা করতো। গিরিশচন্দ্র ক্ষোভের সঙ্গে কবিতা লিখেছিলেন—

"লোকে কয় অভিনয়
কভু নিন্দনীয় নয়
নিন্দার ভাজন শুধু অভিনেতাগণ।"

অথচ এই নিন্দাভাজন ব্যাক্তিরা সমাজের একটি মহৎ ভূমিকায় অশেষ ত্যাগ ও কষ্টের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম এদের সামাজিক মর্যাদা এনে দিয়েছেন। ঠাকুর যদি বিনোদিনীকে 'মা' না বলতেন তাহলে এদেরকে সম্মান করার শিক্ষা আমরা পেতাম না।

এখন সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা অভিনয় মঞ্চে এসেছেন, অভিনয়কে উঁচু দরের শিল্প হিসেবে সম্মান দেখাতে শিখেছেন এবং দক্ষ অভিনেত্রী হিসেবে সমাজে যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছেন। কিন্তু এই সেদিনও মেয়েদের মধ্যে ইতস্তত ভাব ছিল। 'গন্ধর্ব'তে এক জায়গায় তৃপ্তি মিত্র নিজেও লিখেছেন—"একদিন হন্তদন্ত হয়ে গোষ্টদা (বিজন ভট্টাচার্য) এসে বললেন, 'মণি (তৃপ্তি মিত্র) তোকে একটা পার্ট করে দিতে হবে।' কারণ খুব সম্ভব যিনি এটি করেছিলেন তিনি চলে গেছেন।

তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত ঘর থেকে অভিনেত্রী পাওয়া সহজ ছিল না। এখন সাতদিন পরে নাটক, কি করে নাটক হবে। করে দিতেই হবে। বললাম—"না বাবা, আমি পারবো-টারবো না। প্রথমত ছেলেদের সঙ্গে অভিনয় করা সম্ভব বলে আমার মাথায় ঢুকতোনা তখন। তা, ও ত আমাকে জোর করতে লাগলো। দিদি বললো—যা না, করে দে না, বেচারা প্রথম নাটক লিখল, নইলে ওর নাটকটা হবে না।' ওর নাটকটা আমার করতে হয়েছিল।"

যাত্রা' লোকসংস্কৃতি। লোকশিক্ষার একটা বড় মাধ্যম। গ্রাম শহরের সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষের সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর শ্রান্ত অবসরে একটি সুস্থ অবসর বিনোদনের অঙ্গ যাত্রা, তর্জ্জা, কবিগান পাঁচালী গান ইত্যাদি। বহুযুগ ধরে

সংস্কৃতির এই মাধ্যমগুলি আমাদের দেশে চলে আসছে বিজয় পতাকা বহন করে। বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির ধারা ভারতের মাটিতে এসেছে, মিশেছে, ভারতীয় সংস্কৃতিকে বিকশিত করেছে—একেবারে ভারতীয় হয়ে। বাংলা সংস্কৃতি তাকে আত্মস্থ করেছে। এইভাবে মিলেমিশে একাকার। যদিও শ্রীরামকৃষ্ণ যাত্রা, পালাকীর্তন, কবিগান ইত্যাদি শুধুমাত্র বিনোদন নয় সেই সঙ্গে লোকশিক্ষার মাধ্যম বলে উৎসাহিত করতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মানুষ উদ্যোগ-সচেতন নয়, তাই এ মাধ্যমকে কাজে লাগাতে পারেনি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রম্যাঁ রলাঁর 'পিপলস থিয়েটার তত্ত্ব' সারা বিশ্বের প্রগতি সংস্কৃতিপ্রেমীমানুষকে সচেতন করে তোলে, সেই সঙ্গে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং সারা পৃথিবীর উত্তাল রাজনীতিতে নাট্য আন্দোলনের রূপ পায়। চল্লিশ দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার এ দেশের মানুষ তাকে স্বাগত জানায় অ-প্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসাবে "গণনাট্যের' মাধ্যমে। অবশ্য গণনাট্যর যে তত্ত্ব তা প্রথম শোনা যায়—জ্যাক রুশোর কণ্ঠে। প্রায়োগিক শিল্প বা পারফর্মিং আর্টের মূল লক্ষ্য হবে জনগণের কাছে পৌঁছনো এবং জনগণকে তুলে ধরা। এই চিন্তাভাবনা নিয়েই ১৮৯৫ সালে ফ্রান্সে মরিস পত্তিসের জনগণের নাট্যমঞ্চ স্থাপন করেছিলেন। জার্মানীতে গড়ে ওঠে ফোকাস থিয়েটার। এদের সকলের চেষ্টা হোল জনগণের কাছে যাওয়া, জনগণকে তুলে ধরা।

বাংলাদেশে চৈত্রমাসে যে শিবের গাজন গ্রাম পরিক্রমা করতো তাতে স্থানীয় পালাকারগণ জনগণের সমস্যা জনগণের কাছে তুলে ধরেছেন এবং জনগণের রায় নিয়ে সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন।

গাজনের বৃহত্তর চিন্তাধারার প্রকাশমাধ্যম এই যাত্রা। জনগণের শক্তির উৎস। তাই যাত্রার মঞ্চে মুকুন্দ দাসের আর্বিভাব। পরাধীনতা থেকে মুক্তির মন্ত্র এখান থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। স্বাধীনতার আগের সময় যখন সারা দেশ প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে, তখন একমাত্র এই গণনাট্য যাত্রা কি ভাবে দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে আগুন জ্বালিয়েছে সেতো সকলেরই জানা। চারণ কবি পালা বাঁধলেন। তাঁর প্রথম পালা 'মাতৃপূজা' স্বদেশী যাত্রা। বিপ্লবী যাত্রা। বিপ্লবী চারণ কবি গাইলেন—

'শোন সব ভাই স্বদেশী
হিন্দু মোছলেম ভারতবাসী
...আমি দশ হাজার প্রাণ যদি পেতাম
তবে ফিরিঙ্গী বণিকের গৌরব রবি
অতল জলে ডুবিয়ে দিতাম......

যাত্রা জনগণের কাছে একেবারে প্রাণের হয়ে গেল।

এদেশে চল্লিশ দশকে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অপ্রতিরোধ্য অস্ত্র হিসাবে গণনাট্য আন্দোলনের জন্ম হয় এবং এক অদ্ভুত শিহরণের ইতিহাস সৃষ্টি করে। এই আন্দোলন আজকে এবং আগামীদিনের প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলনের মূল ভিত্তি এ সম্পর্কে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। যদিও নীলকর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তৎকালীন গণআন্দোলনের উপর ভিত্তি করে 'নীলদর্পণ' নাটক বাঙালীর বিদ্রোহী চিন্তা চেতনার অগ্রদূত। এবং অবশ্য ১৯০৬ সালে 'রণজিতের জীবন যজ্ঞ' নামে এক বিপ্লবী নাটক লিখে হাজতবাস করেছিলেন হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। এ হোল পরিবর্ত্তনের পদধ্বনি।

ত্রিপুরায় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যর শিল্পসংস্কৃতির উপর গভীর অনুরাগের ফলেই এবং পরবর্তী অধ্যায়ে ১৮৯৭ সালে রাধাকিশোর মাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় আন্দোলন হিসাবে না হলেও যাত্রাভিনয়, কবির লড়াই এবং প্রচলিত লোকনাট্য গুলির চর্চা অব্যাহত ছিল। তারই ফলস্বরূপ ঢাকা বরিশালের যাত্রাদলের ভাবাদর্শে কয়েকটি যাত্রাদল এখানে গড়ে উঠলো। এরা শহরে গ্রামে গঞ্জে নাটকের অভিনয় করতেন। এদের দেখাদেখি আদিবাসীরাও যাত্রাদল গঠন করেছিলেন বনাঞ্চলে, নিজেরা পালাও লিখেছেন। এখান থেকেই শুরু।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস এলেন আগরতলার দুর্গাবাড়ী নাটমণ্ডপে স্বদেশী যাত্রা নিয়ে। আগরতলায় সংস্কৃতিপরায়ণ মানুষ, মুকুন্দ-গুণমুগ্ধ গুণীজনেরা চারণ কবিকে জানাল হৃদয়উজাড়করা সম্বর্ধনা। কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হোল অমৃত সুরের ঝংকার 'ভাইরে ধন্য দেশের চাষা, এদের চরণধূলি মাথায় পড়লে প্রাণ হয়ে যায় খাসা; অথবা, বান এসেছে মরাগাঙে খুলতে হবে নাও, তোমরা এখনো ঘুমাও.....।' সেদিন আগরতলার ঘরে ঘরে ঐ সমস্ত জাগরণী গান মন্ত্রশক্তির মত নব চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় মুকুন্দ দাসের পালা অভিনয় এই সময় থেকে অবাধ গতিতে চলেছিল। চারণকবির রচিত নাটক 'সমাজ', 'কর্মক্ষেত্র', 'পথ' ইত্যাদি নাটক ত্রিপুরার বিভিন্ন আসরে অভিনীত হয়েছিল। কর্মক্ষেত্র ও পথ ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে দেয় কিন্তু রাজগি ত্রিপুরায় এ নাটকগুলির অভিনয় অব্যাহত ছিল।

এরপর থেকে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে খোয়াই, শহর উদয়পুর এবং অমরপুর মহকুমাতেই ধীরে ধীরে কিছু কিছু যাত্রাদল গড়ে তোলে উপজাতি সম্প্রদায়। এর মধ্যে জমাতিয়া সম্প্রদায়ই বাংলা অভিনয়ে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। কিন্তু হলে কি হবে, যাত্রাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ ত্রিপুবাসীর যথেষ্ট থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় উচ্চমানের যাত্রাদল গড়ে ওঠেনি মূলত আর্থিক সংগতির অভাবে। পরবর্ত্তী সময়ে ব্যাপক থিয়েটারের প্রচলনে যাত্রা প্রায় কোনঠাসা হয়ে যায়। যাত্রা শুধুমাত্র গ্রামীণ সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়—এবং এই হিসাবে কিছু অনুকম্পা বাক্য শিক্ষিত মহল থেকে উচ্চারিত হতে থাকে। তবে একথা সত্যি, যাত্রা গ্রামের মানুষই বাঁচিয়ে

রাখে, চাষ-আবাদের শেষে অথবা ধানকাটার শেষে সুস্থ অবসর বিনোদনের জন্য। ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমায় যাত্রা পাগল কিছু যুবকের দল তাদের শিক্ষার দম্ভ ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে যাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রাণপণ লড়াই করেছিলেন বলেই ১৯৭৫ সালে ১ম বর্ষ যাত্রা সম্মেলনের মাধ্যমে যাত্রাকে নবআন্দোলনে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছিল।

প্রবল প্রতিকূল সমস্যার ভিতর ত্রিপুরার যাত্রাপ্রেমী মানুষ যাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে; এই যে বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে এগিয়ে চলার প্রচেষ্টা, এটাকে 'আন্দোলন' বলাটাই সঙ্গত হবে এবং সেই আন্দোলন আজ এক সার্থক রূপ পাওয়ার অপেক্ষায়। এখন এর উন্নয়নের জন্য সব সময় আমাদের ভাবতে হবে অতীতের ভাবধারা থেকে মুক্ত হবার কথা। আধুনিক যান্ত্রিক উপকরণের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল না হওয়া দরকার (কারণ যাত্রা পাহাড় গ্রামে তার বিজয় পতাকা বহন করবে স্বনির্ভরতায়, সীমিত শিক্ষিত দর্শক-শ্রোতাদের গণ্ডী পেরিয়ে একটা লোকায়ত যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে নিজস্ব স্থান অধিকার করবে)। 'যাত্রা শিক্ষায়তন' খুলতে হবে। যাত্রাদল ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের শুধু অভিনয়গত উৎকর্ষ বাড়ালে চলবে না, দর্শক শ্রোতাদের মধ্যেও সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার জোয়ার আনতে হবে। যাত্রা এবং থিয়েটারের পার্থক্য ঘুচিয়ে দেবার জন্য গভীর চিন্তাভাবনার প্রয়োজন।

আগেই বলেছি ১৯৭৫ সনে এই যাত্রাশিল্পকে উন্নতি, জনপ্রিয় এবং বেগবান করার ব্যাপক চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল যাত্রা সম্মেলনের মাধ্যমে। এই সম্মেলনে ধর্মনগর থেকে গণ্ডাছড়া পর্যন্ত সর্বমোট ২৬টি দল অংশগ্রহন করার জন্য আবেদন জানায় এবং শেষ পর্যন্ত ২১টি দল সম্মেলনে যোগদান করে। সম্মেলনটি ছিল ত্রিপুরার সর্বপ্রথম বে-সরকারী উদ্যোগ। ত্রিপুরার কোনো অর্থবান ব্যক্তি বা ধনী ব্যবসায়ী অর্থ সাহায্যের জন্য হাত বাড়াননি। ত্রিপুরা সরকারের কাছে অনেক আকুতি জানিয়েও কোনো আর্থিক সহায়তা পাওয়া যায়নি। তবে ত্রিপুরার রাজ্যপাল দয়াপরবশত: তাঁর তহবিল থেকে এক হাজার টাকা দান করেন। এই টাকাটি সম্বল করে ২১টি দলের মিলিত সম্মেলন ত্রিপুরার যাত্রা-আন্দোলনে ইতিহাস হয়ে গেল। টাকা না দিলেও তদানিন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত শেষপর্যন্ত আগরতলার ঐতিহাসিক দুর্গাবাড়ীকে যাত্রামণ্ডপে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করেছিলেন তাঁর হোমগার্ড বাহিনীকে দিয়ে। সেই সঙ্গে দুটাকা পর্যন্ত টিকিট প্রমোদ-কর মুক্ত করে দিয়েছিলেন। এই সময় থেকে ত্রিপুরার নাট্যচর্চা জগতে দু টাকার টিকিট হতে প্রমোদকর মুক্ত হয়ে যায়। এও একটি নীরব বিপ্লব।

এইসময় ত্রিপুরার থিয়েটার দলগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও 'যাত্রা' তাদের উন্নয়নে সহায়তা করেছে। আশাকরি এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকা উচিত হবে না।

এই যে ত্রিপুরার সর্বপ্রথম যাত্রা সম্মেলন—এখানে অংশগ্রহন করেছিলেন ত্রিপুরার

বিভিন্ন প্রান্তের দলগুলি শুধুমাত্র একটি সর্তে, যে ৭৫% ভাগ টিকিট নিজেরা বিক্রি করে তাঁদের অর্থসংগ্রহ করে নেবেন। এই সর্তে সহরের দলগুলির কোনো সমস্যা ছিলনা কিন্তু দূর-দূরান্ত থেকে আসা দলগুলি যাদের আগরতলা সহরে থাকার কোন জায়গা নেই, আত্মীয় নেই, পরিচিতি নেই, তাদের অবস্থা বড় করুণ হয়েছিল। তবু সাহসে বুক বেঁধে তারা সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল—যাত্রাকে ভালবেসে। আর এর পরিণতি কারো কারো হয়েছিল মর্মান্তিক বেদনাদায়ক।

সমসের গাজী

গণ্ডাছড়ার রাইমা শর্মা সংস্কৃতি বিকাশ সমিতি প্রথম দিন অভিনয় করতে পারেনি প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির জন্য। এদের অভিনয়ের দিন সম্মেলনের শেষের দিকে দেওয়া হবে বলে স্থির করা হয়। এরা ৫/৬ শত টাকার বেশী টিকিট বিক্রি করতে না পারায় ফিরে যাওয়ার টাকাও তাদের ছিল না। অর্থভাণ্ডার থেকে অর্থ সাহায্য করে কোনরকমে তাদের ফিরত পাঠান হয়। অথচ সম্মেলন তহবিলে বেশী পরিমান অর্থ জমা পড়েছিল ধর্মনগর নাট্যসংস্থার 'পাগল-ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ' অভিনয়ে। উপচে পড়া দর্শক শুধু হয়নি, রামকৃষ্ণ রূপী শ্রীকমল মৈত্রের পায়ে মহিলারা টাকা ঢেলে দিয়েছেন প্রণামী হিসাবে। এও এক বিস্ময়। যাইহোক সম্মেলন কমিটি এঁদের পূর্ণ করা তহবিল থেকে টাকা দিয়ে গণ্ডাছড়ার দলকে অমরপুরে ফেরত পাঠায়। এইভাবে কত ঘটনা দুর্ঘটনা নিয়ে ১৯৭৫ সালের দেশে জারি করা জরুরী অবস্থার মধ্যেই ২৯ দিন ধরে ১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন অবিশ্বাস্যভাবে এক ঐতিহাসিক সম্মেলনে রূপ পেয়ে গেল।

সম্মেলনের কথা

আমি যাত্রা ভালবাসি। আগরতলার প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যসংস্থার সদস্যরা আমাকে আমার অভিনয় চলাকালীন 'যাত্রা-যাত্রা' বলতো বলেই যাত্রাকে আরো বেশী শ্রদ্ধা করতে পেরেছিলাম। তাই মঞ্চ নাটকে প্রচণ্ড গতিবেগ আনার পর আমার মনে হয়েছিল এবার যাত্রাকে আন্দোলনমুখী করতে হবে। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছিলাম। যাত্রাশিল্পী সংঘের কর্ণধার যাত্রা-প্রেমী যাত্রা-পাগল ননী দাস কিছুদিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করে বলেছিলেন, দাদা, 'আমাদের যাত্রা নিয়ে কিছু করুন।' কথাটা তখন তেমন

করে ভাবিনি, এখন আবার ওর কথা মনে পড়ল। এবার ওকে আমিই আমন্ত্রণ জানালাম লক্ষ্মী নারায়ণ বাড়ীর গেটে লক্ষ্মী-নারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের চায়ের আসরে। এখানেই তখন আমি আড্ডা বসিয়েছি, যেমন ছিল লোকশিল্পী সংসদের সময় 'প্যারাডাইস' মিষ্টির দোকান হেমন্তকর্ত্তা চৌমুহনাতে, এখন যার নাম প্যারাডাইস চৌমুহনী; যেমন সাহিত্যবাসরের সময় আমাদের আড্ডা চিন্তাহরণের চায়ের দোকান, জেনারেল পোষ্ট অফিসের কাছে এখন যেখানে রবীন্দ্রপল্লী। এসবগুলির একটা ঐতিহ্য আছে।

সম্মেলনে মঞ্চস্থ একটি যাত্রার দৃশ্য

যাইহোক, ননীবাবুকে নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে কয়েকদিন আলোচনার পর স্থির হোল ননীবাবুর ক্লাবে 'যাত্রা শিল্পী সংসদে'র মিটিং ডাকা হবে এবং সেখানে আমার প্রস্তাব আমি রাখবো।

যাত্রাপাগল ননী দাস নাটক পাগল ত্রিপুরেশ মজুমদারের মতই শ্রেষ্ঠ। দারুণ অভিনেতা এবং সংগঠক। তিনি মিটিংএ সবাইকে এনে হাজির করলেন। আমিও আমার সংস্থা 'রূপারোপ' কে নিয়ে হাজির হলাম, রূপারোপ দল নয়, রূপারোপের সংগঠনের মাথারা। যেমন সংগঠনে একান্ত প্রয়োজনীয় ব্যক্তি শ্রীনরেশ পোদ্দার, শ্রীহরিপদ দাস, শ্রীবেণুধর গোস্বামী, এবং আরো কিছু তরুণ সদস্য। আন্তঃত্রিপুরা নাটক প্রতিযোগিতাও ত্রিপুরেশ নাট্যমেলায় আমাদের অভিজ্ঞতা এখানে কাজে লাগালাম। সভায় সর্বদলের আবেদন এলো সারা ত্রিপুরা যাত্রা প্রতিযোগিতা হোক। কিছুদিন আগে ননী দাস মহাশয় কয়েকটি দল নিয়ে রবীন্দ্রভবনে একটা প্রতিযোগিতা এবং সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান করেছেন এবং তাঁরও ইচ্ছা সারা ত্রিপুরা যাত্রা প্রতিযোগিতা হোক।

প্রতিযোগিতা ভাল কিন্তু প্রতিযোগিতার ভয়াবহ দিক কজন জানে, কজন তার খবর

রাখে? যারা রাখে তাদের মধ্যে আমিও একজন। আমি দেখেছি কিভাবে সংগঠন ভেঙ্গে যায়, প্রতিভার বিনাশসাধন হয়। তাই বললাম, 'আমি প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে। এটা প্রথম বছর যখন, তখন সম্মেলন হোক। আপনারা যখন আমাকে ডেকেছেন, আমি যাত্রাকে ভালবেসে যখন এসেছি, তখন দু এক বছর সম্মেলন আমাকে করতে দিন। তারপর আমি থাকব না, আপনারা থাকবেন। আপনারা যাত্রা প্রতিযোগিতা করুন, আমার কিছু বলার থাকবে না।'

স্থির, হোল 'নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন ১৯৭৫' হবে। উপস্থিত দলপ্রতিনিধিরা অর্থ সাহায্য করলেন, গড়ে উঠল সম্মেলন তহবিল। সেই টাকায় সম্মেলনের প্যাড এবং যোগাযোগের জন্য চিঠিপত্র, নিয়মাবলী ইত্যাদি ছাপানো হোল। সভায় সবচেয়ে বড় পাওনা হয়েছিল আর এক যাত্রাপ্রেমী হীরালাল সরকার যাঁর কাছে আছে বহু যাত্রার দলের পাত্তা আর তথ্য। তাঁরই সাহায্যে যোগাযোগ সহজ হোল বিভিন্ন যাত্রা দলের সঙ্গে। কাজ অনেকদূর এগিয়ে গেল, কিন্তু টাকা কোথায়? অনেক টাকার দরকার। নরেশ পোদ্দার সম্মেলনের যে বাজেট রচনা করল তা দেখে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। এত টাকা কোথা থেকে আসবে।

আবার সভা ডেকে বসা হলো নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদের সদস্যদের সঙ্গে। আলোচ্য বিষয় একটাই, টাকা কোথা থেকে আসবে। বহুভাবে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হলো সম্মেলন হবে রবীন্দ্রভবনে। সরকারের কাছে দাবী থাকবে, যেহেতু উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে যাত্রা আসর গড়ে তোলা সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, সেইহেতু রবীন্দ্রভবনেই যাত্রা সম্মেলন হবে এবং সরকারকে ভাড়া মকুব করে দিতে হবে। সেই মত চিঠি দেওয়া হোল রবীন্দ্রভবনের সর্বোচ্চ অধিকার যাঁর কাছে সেই শিক্ষাঅধিকর্তার নিকট। রবীন্দ্রভবন কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দিলেন, ভাড়া মকুব করা যাবে না, একসঙ্গে এতদিন হল দেওয়া যাবে না।

সারা ত্রিপুরারাজ্যে সম্মেলনের ডাকে সাড়া পড়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে জোরদার মহড়া। বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আসছে। যোগাযোগ হচ্ছে, নানাসমস্যা নিয়ে আলোচনা চলছে। সমস্যা বহু, সমাধানের পথ কই? সম্মেলন হবেই এবং রবীন্দ্রভবন ছাড়া অন্য পথও নেই। সরকারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার প্রবণতা কোনোদিন আমাদের মাথায় ছিলনা। নাটক করেছি, রবীন্দ্রভবনের ভাড়া গুনে দিয়েছি। টিকিট বিক্রি করেছি, প্রমোদকর দিয়েই করেছি। দয়া ভিক্ষা করে নয়। সেতো আমাদের নিজেদের ব্যাপার কিন্তু এ তো সমবেত সম্মিলিত বহু সংগঠনের ব্যাপার।

প্রমোদ কর দেওয়া হবে না। ঠিক হোল সমস্ত অংশগ্রহণকারী সংগঠন গুলিকে টিকিট বিক্রয়ের তিনভাগ টাকা দিয়ে দেওয়া হবে। একভাগ টাকা দিয়ে সম্মেলনের বিভিন্ন

খরচ চালানো হবে। প্রমোদকর দিতে হলে দলগুলিকে কিইবা দেওয়া যেতে পারে।

পথ একটা সরকারকে সঙ্গে নেওয়া। শিক্ষামন্ত্রীকে সভাপতি করে নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন কমিটি গঠন করা তাহলে হোক। নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পীসংসদ বেসরকারী নিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে ভবিষ্যতে।

এ প্রস্তাবে সবাই সম্মত হলেন এবং গঠিত হোল ১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন '৭৫। সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম।

সর্বসম্মতিক্রমে গঠিত কার্যকরী সমিতি

পৃষ্ঠপোষক ঃ

শ্রীযুক্ত এল. পি. সিং। মাননীয় রাজ্যপাল, ত্রিপুরা।

শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সভাপতি ঃ

শ্রীযুক্ত শৈলেশচন্দ্র সোম। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সহঃ সভাপতি ঃ

শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর ভৌমিক। শ্রীযুক্ত আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

সংগঠক সম্পাদক ঃ শ্রীশক্তি হালদার

সম্পাদক অফিস ঃ শ্রীযুক্ত অজিত ভৌমিক

কোষাধ্যক্ষ ঃ শ্রীযুক্ত নরেশ পোদ্দার

সদস্য ঃ

শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য (সাহিত্যিক)

শ্রীযুক্ত বিনয় রায় (সাহিত্যিক)

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র দেববর্মা (সঙ্গীত শিল্পী)

শ্রীযুক্ত ননী দাস (যাত্রা সংগঠক)

শ্রীযুক্ত হরিপদ দাস (আলোর প্রবাদপুরুষ)

প্রচার সম্পাদক ঃ শ্রীযুক্ত বেণুধর গোস্বামী

নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদ ● কার্যকরী সমিতি ১৯৭৫

শ্রী শক্তি হালদার — সভাপতি

শ্রীযুক্ত বিনয় রায় — সহঃসভাপতি

শ্রীযুক্ত উত্তমাচরণ চক্রবর্তী — সহসভাপতি

শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দাস — সাধারণ সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হীরালাল সরকার — যুগ্ম সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বাদল দত্ত — যুগ্ম সম্পাদক

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ঘোষ — কোষাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত যতীন দাস — প্রচার সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বেণুধর গোস্বামী — সংগঠন সম্পাদক

সদস্য :

" হারাধন দত্ত — আগরতলা

" নারায়ণচন্দ্র দাস — যোগেন্দ্রনগর

" বিধুভূষণ বিশ্বাস — পশ্চিম দুর্গাপুর

" অনিল দেব — লেম্বুছড়া

" রমেশচন্দ্র সাহা — নন্দননগর

" শৈলেন চক্রবর্তী — রানীরবাজার

" মধুসূদন চক্রবর্তী — হাপানিয়া

" সুশীল রায় — মনুঘান (কৈলাশহর)

" রণজিৎ নাগ — নারায়ণপুর

" দীনবন্ধু দাস — উদয়পুর

" শান্তি ব্যানার্জী — মেলাঘর

" মিন্টু চৌধুরী — খোয়াই

" সুধীর পাল — আমতলী

" সুধীর দেব — ইন্দ্রনগর

" ননীগোপাল দাশগুপ্ত — বটতলা, আগরতলা

" অতুলচন্দ্র দেব — দুর্গা চৌমুহনী, আগরতলা

" যতীন্দ্র রায় — অভয়নগর, আগরতলা

" গোপেশ পাল — গান্ধীগ্রাম

" হারানচন্দ্র দাস — পুরান আগরতলা
" হীরালাল দেবনাথ — অরুন্ধতি নগর
" হারাধন ভৌমিক — পূর্বমোহনপুর
" হরিমোহন পাল — কামালঘাট
" সন্তোষ রায় — প্রতাপগড়
" যশোদুলাল বণিক — সৌখিল যাত্রা পার্টি
" অমলচন্দ্র মল্লিক — বাইখোড়া, বিলোনীয়া
" মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য — ত্রিপুরা পুলিশ
" হিমাংশু সরকার — রেশম বাগান
" যতীন দাস — অরুন্ধতি নগর
" সন্তোষ ভৌমিক — মোহনপুর
" বিমল গুপ্ত — মুখোশ
" প্রদীপ চক্রবর্ত্তী — খোয়াই
" শম্ভুনাথ লালা — ধর্মনগর
" সুনীলবিকাশ কাপালী — গন্ডাছড়া, সরমা
" পরেশ দত্ত — দুর্গাচৌমুহনী, জয়রাম অপেরা
" কানাইলাল মজুমদার — সাবব্রুম
" রবীন্দ্র ভট্টাচার্য — কৈলাশহর
" বলাই ভৌমিক — ৪র্থশ্রেণী কর্মচারীসংস্থা, আগরতলা।
" সুধীন্দ্র দাসগুপ্ত — কল্যাণপুর
" পরিমলকুমার দেব — ভাটি অভয়নগর

উপদেষ্টা মণ্ডলী

শ্রীযুক্ত অনিলকুমার দাশগুপ্ত
" ধূর্জটি দাশগুপ্ত
" মনীন্দ্র আচার্য - রানীরবাজার
" শশাংকশেখর চক্রবর্তী — বড়দোয়ালী
" রমাপ্রসাদ দত্ত

ডাঃ দিগেন্দ্র ব্যানার্জী

ডাঃ অমলেন্দু সেনগুপ্ত

ডাঃ হীরালাল চট্টোপাধ্যায়

গণতন্ত্রের দেশে সরকারের ভূমিকা নিরপেক্ষ। কথাটা শুনতে ভাল কিন্তু রাজনৈতিক দল যেহেতু সরকার গঠন করেন সেইহেতু সরকার প্রভাবিত হয়। তাই ভয় ছিল। চেষ্টা ছিল সরকার তথা দলীয় রাজনীতি থেকে সরে থাকা। কিন্তু সরে থাকা সম্ভব হোল না আমাদের আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য। বলতে দ্বিধা। নেই সম্মেলনে রাজনীতির প্রভাব কোনভাবেই পড়েনি। সম্মেলন এগিয়ে গেছে তার নিজের গতিতে বেসরকারী চরিত্র নিয়ে।

শিক্ষামন্ত্রী শ্রী শৈলেশচন্দ্র সোমকে আমরা সভাপতি কেন করেছিলাম পাঠক ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বুঝেছেন। রাজনীতির পোড় খাওয়া মানুষ শৈলেশবাবুও সে কথা বুঝেছিলেন। কিন্তু আমাদের কিছু করার ছিল না—কারণ শৈলেশবাবু রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, তাই আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সম্মেলন কমিটির কোন সভাতেই তাঁকে উপস্থিত করতে পারিনি ওঁর কথা মত সভার দিন ঠিক করলে সম্মেলন পিছিয়ে যাবে তাই। কিন্তু মাননীয় সভাপতি আমাদের ভুল বুঝলেন। ভাবলেন তাঁকে উপেক্ষা করা হচ্ছে। সারা ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন সার্থক হোল ঠিকই কিন্তু আমার জীবনে নেমে এলো চরম আঘাত। সম্মেলনের কিছুদিনের মধ্যেই আঘাতটা এলো নির্মমভাবে—আমি বদলি হয়ে গেলাম শহরের সেরা স্কুল উমাকান্ত একাডেমী থেকে ধর্মনগর সাবডিভিসনের পানিসাগর ব্লকে এক গণ্ডগ্রামে গভীর পার্বত্যঅঞ্চল বিলথৈ উচ্চইংরাজী বিদ্যালয়ে। একা নির্জন। বাড়ীঘর সংসার সাংস্কৃতিক সংগঠন, কিছু করার অদম্য ইচ্ছা, সব নিমিষে মুছে গেল। আমি পাগলের মত পানিসাগরের বাজারের আশপাশে সারাদিন ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রাণের জ্বালা মেটাতে। অপমান! বড় অপমান!

তখনও চলছে জরুরী অবস্থা দেশে, কিছু করার নেই। সরকারী আদেশ মাথা পেতে নিতেই হবে। অমান্য যদি করতাম শাস্তি কি পেতাম জানিনা তবে গুজবে আমার অনেক কিছু হতে পারে। মনে পড়ছে সম্মেলন যখন প্রায় কাছাকাছি তখন আমাদের জানিয়ে দেওয়া হোল সরকার বিরোধী কোনো নাটক করা যাবে না। নাটকে সরকার বিরোধী কোনো ডায়লগ থাকতে পারবে না। মহাবিপদ, অটো ভাড়া করে শহর সংলগ্ন দলগুলির কাছে দৌড়চ্ছি আমি আর ননী দাস। তোমাদের যাত্রা পালার বই এক কপি করে দাও, পড়ে দেখতে হবে। তোমরাও সরকার বিরোধী বক্তব্য থাকলে কেটে দাও বই থেকে।

ওরা বললেন 'স্যার, এটা কি করে সম্ভব, সবার পাঠ মুখস্ত হয়ে গেছে। আপনারা ঘোষণা করেছেন প্রম্পট্ করা যাবে না, তাই ঝাড়া মুখস্ত অভিনেতাদের, এখন সেখান থেকে দু এক লাইন বাদ দেব কি করে?' বললাম, ঠিক আছে, আপনারা অভিনয় করে

যান, আপত্তি উঠলে বলবেন, মুখস্থ ছিল বেরিয়ে গেছে মুখ থেকে; তবে বইতে কেটে দিন আপত্তিজনক ডায়লগ। দলগুলোকে বাঁচাতে পথ দেখালাম, কিন্তু বইগুলি।

সম্মেলনে অভিনয় হচ্ছে যে সব নাটক তার মধ্যে অনেক নাটকেই আপত্তি হতে পারে আপত্তি করতে চাইলে। যেমন— পথের ছেলে, রিক্সাওলা, একটি পয়সা, মায়ের ছেলে, কাঁচের স্বর্গ, পদধ্বনি ইত্যাদি। শাসকের বিরুদ্ধে কিছু না বললে নাটক জমে না এ তো সত্যি। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেভাবে বলি না কেন—তবে বইগুলি বাছবে কে? কোনটা করার যোগ্য আর কোনটা নয়? অগত্যা সভাপতির স্মরণাপন্ন হলাম। সভাপতি বললেন জনসংযোগ বিভাগে যাও। জনসংযোগে কে. পি. দত্ত ডিরেক্টর। তিনি বললেন তোমার কি মাথা খারাপ, এখানে এসেছ? একাজ আমাদের নয়। পুলিশের কাছে যাও। এক বাণ্ডিল নাটকের বই রিক্সা করে নিয়ে পশ্চিম কোতয়ালী গেলাম। ভারপ্রাপ্ত অফিসার বললেন—"আরে করেছেন কি, নিয়ে যান, নিয়ে যান বই। নাটকের আমরা কি বুঝি। আমাদের কাজ দেশের শান্তি রক্ষা করা।" আমি আহত হয়ে বললাম— তাহলে আমি এখন কি করি বলুন তো?

অনেক অফিসারই এলেন, সবাই বললেন, আরে একি আমাদের কাজ। যান আপনি যা ভাল বুঝেন তাই করুন।

নাটকের বই আবার দলেদের হাতে পৌঁছে দিলাম। বললাম, 'চালান রিহার্সাল, যেমন চলছে তেমন চলবে।'

খোদ শিক্ষা মন্ত্রী এখন আমাদের সভাপতি, তাই বুকের জোর বেড়ে গেছে। প্রমোদ কর মুক্ত হয়ে গেল সম্মেলন অনুষ্ঠান থেকে।

রবীন্দ্রভবন পাওয়ার জন্য শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীযুক্ত অধীপ চৌধুরীর কাছে গেলাম আমরা। আমাদের আবেদন প্রথম আলাপে নাকচ হয়ে গেল। যুক্তি, এক নাগাড়ে একমাস ধরে রবীন্দ্রভবনে 'যাত্রা' করতে দেওয়া যাবে না। ফ্রি তো নয়ই। রবীন্দ্রভবনের মাঠে প্যাণ্ডেল করে সম্মেলন করুন। বললাম টাকা থাকলে তো তাই করতাম। তিনি বললেন কিছুই করার নেই। তাছাড়া অন্যান্য দল যারা ইতিমধ্যে হল বুক করেছে তাদের বাতিল করা যাবে না। তার উপর আবার একমাস ধরে।

বললাম আন্তঃঅফিস নাটক প্রতিযোগিতা তো দশ-পনের-দিন ধরে হয়। উনি একটু রেগে গেলেন কিন্তু ঠাণ্ডা গলায় বললেন, যান না মশাই মাঠে যান। যাত্রা মাঠেই হয়। অধীপবাবু এ কথা বলতে পারেন কারণ সাংস্কৃতিক জগতে তাঁদের কৌলিন্য আছে। হাবেভাবে আগরতলাবাসী তাই ভেবেছে।

শেষপর্যন্ত রবীন্দ্রভবন পাওয়া গেল। কিন্তু ভয়াবহ বিপদ নিয়ে। একথা পরে বলছি। তার আগে যাত্রা সম্মেলনের সম্পাদক হিসাবে যে বিবৃতি পাঠ করেছিলাম, তা এখানে উদ্ধার করছি।

সম্মেলন সম্পাদক শ্রীশক্তি হালদারের বিবৃতি ঃ
১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন—১৯৭৫
ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক জগতের একটি ঐতিহাসিক সম্মেলন.....

গত ১৯শে জানুয়ারী ১৯৭৫-তে জন্ম নিয়েছিল যাত্রা সম্মেলনের সংকল্প নিয়ে একটি ফুলের কুঁড়ি। একটু একটু করে পাপড়ি মেলতে গিয়ে শুকিয়ে যাচ্ছিল—আর সবার মনে একই প্রশ্ন, সম্মেলনের ফুল কি ফুটবে না? উত্তর ছিল একটাই, 'যে ঠাকুর ফুল ফোটায় সেই জানে ফুল কবে ফুটবে।'

৩১শে আগষ্ট। যাত্রা সেমিনার ১৯৭৫, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে যখন হোল, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত সেমিনারের উদ্বোধন করতে এলেন হাতে কয়েক মিনিট সময় নিয়ে বেলা ১০টায়; আমাদের সম্মেলন সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী শ্রীশৈলেশচন্দ্র সোম মহাশয় যখন সভার উদ্বোধন করে সবাইকে জানালেন তাঁদের বক্তব্য রাখতে, ঠিক তখন থেকে বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। কয়েক মিনিটের জন্য এসে আর ফিরে যাওয়া হোলনা ঃ হয়তো অতীতের যাত্রাময় দিনগুলোতে চলে গিয়েছিলেন এই কয়েকঘন্টা। সেমিনার শেষ হলো প্রত্যয়শীল সংকল্প নিয়ে—সম্মেলন ১৯৭৫ হবেই হবে।

ত্রিপুরার বহু অঞ্চলে আবার কন্‌সার্ট বেজে উঠলো—যাত্রা-যাত্রা, যাত্রা সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি। অংশ নিতে চাইল আগরতলা শহর ও ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত হতে ২৬টি দল। ওঁদের প্রতিনিধিরা এলেন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে। সমস্যা কত রকমের; তার মধ্যে প্রধান সমস্যা অর্থসংগতির। এ সমস্যাতো আমাদেরও। সম্মেলন করার সংকল্প মাননীয় রাজ্যপালকে জানাবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাদের এক হাজার টাকা দান করলেন। সেমিনার করতে খরচ হল চার'শ টাকা, হাতে রইল মাত্র ছ'শ, এ দিয়ে কি এতবড় সম্মেলন সম্ভব? বলেছিলাম আমরা, আপনারাই বলুন আমরা কি সম্মিলিত হতে পারব না, আমরা কি আমাদের সাধের উৎসব উদযাপন করতে পারব না? আবার সবার কণ্ঠে ধ্বনিত হোল—'যাত্রা সম্মেলন ১৯৭৫ হবেই—এ আমাদের অস্তিত্বের প্রকাশ ও প্রমাণ।'

এ ভাবেই শুরু হোল সম্মেলনের প্রস্তুতি। কাজ, কাজ আর কাজ। কত কাজ কত সমস্যা। এক সমস্যার সমাধান হয় তো আর এক সমস্যার উৎপত্তি। তারপর আছে অর্থের অভাব। ইতিমধ্যে রাজ্যপালের দানের টাকার অনেকটাই খরচ হয়ে গেছে, অবশিষ্ট সামান্য টাকা হাতে নিয়ে সম্মেলনের দীর্ঘপথ পরিক্রমা? সত্যিই অবিশ্বাস্য! কিন্তু টাকার জন্য কি কাজ থেমে থাকবে? টাকা নেই বলে কি শিল্পী তার সৃষ্টি থামিয়ে দেবে? টাকা নেই বলে কি সাহিত্যিক তার সাহিত্য সৃষ্টি বন্ধ করে দেবে? টাকা নেই বলে কি কবি,

গায়ক তার কবিতা লিখবে না, গান গাইবে না? না, শিল্প কোন বাধা মানে না, এ প্রাণের আবেগ, এর গতিবেগ স্তব্ধ করতে পারে যে 'অভাব' সে অভাব সৃষ্টি হয়নি আজো। তাই সব বাধা অতিক্রম করার সংকল্প যাদের মনে, বাধাকেই তারা মূলধন করল। আগরতলা পৌর প্রশাসকের নিকট, তাঁদের দেওয়া জি, আই, সিট্ না পেলে এ যাত্রা মণ্ডপ তৈরী সম্ভব হোত না। কৃতজ্ঞতার ঋণ কখনও শোধ হবে না—মাননীয় ত্রিপুরার রাজ্যপাল এবং তাঁর প্রাক্তন স্পেশাল সেক্রেটারী লালা এন, কে, দে এবং বর্ত্তমান স্পেশাল সেক্রেটারী কে ব্যানার্জী এবং তাঁর পি, এ শ্রী শ্রীমান বসুর কাছে।

রূপারোপ নাট্যসংস্থার তরুণ শিল্পীদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, যাঁরা সম্মেলনকে সার্থক করার জন্য প্রাণপণ কাজ করে যাচ্ছেন। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই ভেনাস ক্লাবের সদস্যদের যাঁদের স্বেচ্ছাসেবী মন সম্মেলনের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত হয়েছে। কৃতজ্ঞতা জানাই স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের নিকট যাঁরা আলোকসজ্জার আলো দিয়ে এবং বিভিন্ন কাজে নানাভাবে সহায়তা করে চলেছেন। শ্রীযুক্ত ডি. কে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যিনি আলোকসজ্জায় সাহায্য করেছেন, তাঁর কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। অধিকর্ত্তা শ্রীযুক্ত কে, পি, দত্ত মহাশয়ের এবং তাঁর জনসংযোগ ও পর্যটন দপ্তরের কর্মীদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন সহযোগিতা আমরা ভুলবো না।

আমরা ভুলবোনা তাঁদের ঋণ, ঠিক যখন আমরা চরম বিপর্যয়ের মুখে তখন তাঁদের সাংগঠনিক মন আমাদের অভয় দিয়েছিল, আমাদের চরম হতাশা হতে দিয়েছিল মুক্তি, সেই তিনজন—শ্রীযুক্ত অমর গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মোহনলাল রায় এবং শ্রীযুক্ত জোর্তিময় মজুমদার মহাশয়। আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

আর, জানা অজানা গুণীজন যাঁরা অন্তরালে থেকে আমাদের কার্জে সহায়তা করে চলেছেন তাঁদের কাছে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। দৈনিক 'নাগরিক', দৈনিক 'গণরাজ', দৈনিক 'জাগরণ', এবং দৈনিক 'জনপদ' এবং স্যন্দন সম্পাদক শ্রীসুবল দে—আপনারা আমাদের প্রচারের সহায়তা করেছেন কোনো টাকা পয়সা না নিয়ে, আমরা শুধু আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞই থাকলাম। কৃতজ্ঞ আমরা আকাশবাণী আগরতলা এবং বিভিন্ন সাংবাদিক সংস্থার কাছে।

সব শেষে কৃতজ্ঞতা জানাই আগরতলার শ্রদ্ধেয় দর্শকদের কাছে যাঁরা ত্রিপুরার যাত্রা অপেরা বলে নাক সিঁটকিয়ে থাকেন নি। খ্যাত অখ্যাত প্রতিটি দলের অনুষ্ঠানে টিকিট কেটে যাত্রার আনন্দ গ্রহণ করে দিনের পর দিন দল গুলিকে আর্থিক সহায়তা করেছেন। অনেক অনুষ্ঠানে আপনারা তৃপ্ত হয়েছেন, আবার অতৃপ্তি অনেক অনুষ্ঠানে আপনাদের মনকে ভারী করে তুলেছে, তবুও সানন্দে আপনারা সহায়তা না করলে আজ এই প্রথম বর্ষের সম্মেলন ব্যর্থ হোত—তাই অনেক অনেক কৃতজ্ঞ আমরা আগরতলা এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত হতে আসা যাত্রাপ্রেমী দর্শকদের কাছে—আপনাদের উৎসাহ

আমাদের পাথেয়, আপনাদের আশ্রয়ে দলগুলির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক।

কেন এতখানি কৃতজ্ঞ আমরা?

কারণ সমবেত প্রচেষ্টায় বিনা খরচায় নতুন রূপে গড়ে উঠেছে দুর্গাবাড়ীর যাত্রা মণ্ডপ এবং সার্থক হয়েছে যাত্রা সম্মেলন ১৯৭৫। প্রিয় যাত্রাশিল্পী এবং সংগঠনের কর্তৃপক্ষমণ্ডলী, আপনারা আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আমরা আপনাদের কাছে প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ ছিলাম আপনাদের পালার টিকিট বিক্রয় লব্ধ অর্থের মোট ৭৫ ভাগ টাকা আমরা দিতে পারব এবং ২৫ ভাগ টাকার মধ্যে সাংগঠনিক খরচা বহন করে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে সে সম্বন্ধে সবাই মিলে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। আপনারা কেউ লাভবান হয়েছেন, কেউ ক্ষতি স্বীকার করেছেন; তবু মুখের হাসি আপনাদের বিলীন হয়নি শুধু একটি কারণে—আপনারা নতুন করে ফিরে পেতে চান আপনাদের নিজস্ব সংস্কৃতিকে। অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ সহ্য করেও যাত্রা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ঃ আপনাদের জন্য আমরা কিছুই করতে পারিনি—বহু বহুদুর হতে আসা ধর্মনগর নাট্যসংস্থা বা সাব্রুম হতে আসা লোকনাট্য সংস্থার মতো বহু প্রতিষ্ঠানকে।

৪ঠা নভেম্বর হতে সম্মেলন শুরু হবে বলে স্থির হোল এবং সেইভাবে ত্রিপুরার সর্বত্র ঘোষণা দেওয়া হোল। যেহেতু টাকা নেই সেই হেতু স্থির হোল সরকারী রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের রঙ্গমঞ্চেই যাত্রা সম্মেলন হবে। কিন্তু হবে বললেই কি হয়। প্রথম আবেদনে রবীন্দ্রভবনের অনুমতি পাওয়া গেল না, পাওয়া গেল দ্বিতীয় আবেদনে। প্রথম যখন আমরা আবেদন রেখেছিলাম তখন রবীন্দ্রভবন ছিল খালি। কোনো প্রতিষ্ঠানের কোনো আবেদন ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয়বারে পুনর্বিবেচনার আবেদনের সময় দেখা গেল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের স্বীয় অনুষ্ঠান করার জন্য আবেদন রেখেছেন। সংকট দেখা দিল আবার নতুন করে। আবার কি আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে? কারণ, আগরতলার অনেকগুলি দল তাঁদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য রবীন্দ্রভবনের রঙ্গমঞ্চ নিয়েছেন, এখন যাত্রা সম্মেলন তাদের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়াল। এ এক উভয়সংকট অবস্থা। এক সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আর এক সংস্কৃতির প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে আমাদের মন চায়নি। অবশ্য বলতে হয় কয়েক হাজার টাকা হাতে থাকলে এসব সমস্যা সমস্যাই হত না কারণ যে কোনো জায়গায় যাত্রা প্যাণ্ডেল তৈরী করে সম্মেলন করা যেত। যাইহোক এই সংকটময় অবস্থা হতে রক্ষা করলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় আমাদের দুরবস্থার প্রতি গভীর সমবেদনায়। তাঁর শুভেচ্ছায় নতুনভাবে সাজানো হোল ঐতিহাসিক দুর্গাবাড়ীর নাটমণ্ডপ। জেলা সমাহর্তা শ্রীযুক্ত অজয় সিন্‌হা যেভাবে দ্রুতগতিতে যাত্রা মণ্ডপটি তৈরী করতে সহায়তা করেছিলেন তারজন্য আমরা তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আরো কৃতজ্ঞ ডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত লোকেশ দাসের নিকট এবং বিভাগীয় কর্মী শ্রী কাজল রায়ের নিকট।

এঁরা মনে করলেন এ সম্মেলন তাঁদের নিজেদেরই। আহার, নিদ্রা সব বাদ দিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা একনাগাড়ে তত্ত্বাবধান করে সৃষ্টি করলেন শিল্পীদের মন কেড়ে নেওয়া এই যাত্রামণ্ডপ। ধন্যবাদ জানাই সেই সব হোমগার্ড ভাইদের যাঁরা সোৎসাহে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে কঠিন পরিশ্রম করে এই সুন্দর যাত্রামণ্ডপ তৈরী করেছেন। আমরা তাঁদের জন্য কিছুই করতে পারিনি। তবে কৃতজ্ঞতার ঋণ আংশিক শোধের জন্য প্রতিদিন যাত্রানুষ্ঠানে আমরা তাঁদের দশজনকে যাত্রা অনুষ্ঠান দেখিয়ে চলেছি, এইটুকুই আমাদের সান্ত্বনা। আমরা সমগ্র পুলিশ বিভাগের কাছে ঋণী, ঋণী উর্ধতন পুলিশ অফিসারদের নিকট এবং পুলিশ কনস্টেবল ভাইরা যাঁরা প্রতিদিন যাত্রাপ্যাণ্ডেল এবং সম্মেলনের শান্তিরক্ষার জন্য বুক দিয়ে আগলিয়ে রাখছেন সবকিছুই।

ত্রিপুরার মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলী, যাঁদের শুভেচ্ছা ও আর্শীবাদ আমাদের পরম পাথেয় হয়েছে তাঁদেরকে আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ঋণী আমরা তাঁদের পি, এ এবং অন্যান্য স্টাফদের কাছে। গভীর কৃতজ্ঞ আমরা রাজস্বমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য মহাশয়ের কাছে যিনি এককথায় প্রমোদ কর মুক্ত করার আবেদন মঞ্জুর করেছেন। আরো কৃতজ্ঞ আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীযুত সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী মহাশয় এবং ট্রেজারী অফিসার শ্রীযুত এস্, বি, দাশগুপ্ত মহাশয়ের নিকট। একইভাবে আমরা ঋণী বিদ্যুৎ বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ার শ্রীরঞ্জিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং তাঁর কর্মচারীদের কাছে যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোকসজ্জায় সাহায্য করেছেন। কৃতজ্ঞ আমরা শিক্ষা অধিকর্তা শ্রীযুত অধীপ চৌধুরী মহাশয়ের নিকট যিনি প্রথম দিকে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের রঙ্গমঞ্চ ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে সম্মেলনের পথ সুগম করেছেন এবং দ্বিতীয় অবস্থায় দুর্গাবাড়ী যাত্রামণ্ডপে সুব্যবস্থার জন্য বিভিন্ন স্কুল-কলেজকে সতরঞ্চি, চেয়ার, পর্দা লাইট ইত্যাদি দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে আমাদের সম্মেলনের প্রভূত সহায়তা করেছেন। কৃতজ্ঞ আমরা উপ-অধিকর্ত্তা শ্রীমতী শোভা বসু, জেলা পরিদর্শক শ্রীযুত রমেন্দ্র ভট্টাচার্য-এর নিকট। গণ্ডাছড়া রাইমা হতে আসা সংস্কৃতি বিকাশ সমিতি এবং বিলোনীয়া হতে আসা জগন্নাথ নাট্যসংস্থা—আপনাদের উৎসাহ এবং উদ্যমকে অভিনন্দন জানানো ছাড়া আর কিছুই করতে পারিনি, বহু দূর হতে বহুকষ্ট করে এসেছেন আপনারা প্রাণের আবেগে, তাই সেই আবেগকে শ্রদ্ধা জানাই আমরা। কৈলাশহর যাত্রাশিল্পী সংসদ এবং খোয়াই-এর নাট্য সংস্থা নানা অসুবিধার কারণে আসতে পারলেন না গভীর আগ্রহ সত্বেও। আমরা দুঃখিত আপনাদের জন্য। তবুও বলব সমবেত প্রচেষ্টায় ১ম বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন সার্থক সার্থক সার্থক। এ সার্থকতা আমাদের দিয়েছে শক্তি। এই বিরাট কর্মযজ্ঞে অনেক ত্রুটিও আছে, সেই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য সকলের কাছে আমরা ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। সব শেষে সমস্ত যাত্রা প্রতিষ্ঠান এবং যাত্রা-শিল্পীদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ, সম্মেলন শেষে

আসলে চুল চেরা ত্রুটির বিশ্লেষণ; করবে তথাকথিত এক শ্রেণীর বোদ্ধার দল। তাদের থেকে আপনারা সাবধান থাকবেন। এদের উদ্দেশ্যমূলক কথায় কর্ণপাত না করে সারা বছর যাত্রাভিনয় চালিয়ে যান, আগামী বছরের প্রস্তুতি নিন। গ্রামের মানুষের এক ঘেয়ে জীবনধারাকে আপনাদের সংস্কৃতির রসে উজ্জীবিত ও সঞ্জীবিত করার মন্ত্র আপনাদের হাতে। তাকে পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগান। গ্রাম গড়ে উঠুক। গ্রামের লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের কঠিন শ্রমের ফাঁকে ফাঁকে অফুরন্ত আনন্দ নিয়ে নতুন দেশগড়ার কাজে নবীন উদ্যমে এগিয়ে যেতে সাহায্য করুন। তবেই আমাদের যাত্রা-শিল্প পুনরুদ্ধারের চেষ্টা এবং যাত্রা সম্মেলন সার্থক হবে। জয়হিন্দ্।

৬ই নভেম্বর ১৯৭৫ যাত্রা সম্মেলনের উদ্বোধন হওয়ার পর, পরপর তিন দিন অভিনয় চলার পর চতুর্থ দিনে ৯ই নভেম্বর '৭৫ সকালে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে গিয়ে দেখা গেল ত্রিপুরা উপজাতি যুবসমিতির যুবক-যুবতীরা তাদের কনফারেন্সের জন্য স্টেজটির দখল নিয়েছে। আমি যখন বললাম আজ আমাদের অনুষ্ঠান আছে তখন তারা তাদের Order এর চিঠি আমাকে দেখাল। আমিও আমাদের কাগজপত্র দেখালাম। অল্পবয়সের ছেলেরা খুবই উত্তেজিত। ওদের নেতাকে বললাম, ভাই তোমাদেরও কোন দোষ নেই, আমাদেরও কোন দোষ নেই। তোমাদের সঙ্গে আমাদের সংঘাত সৃষ্টি করার জন্য একই দিনে দুজনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। চল ভাই এর প্রতিকারের জন্য আমরা দুজনেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যাই। সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত সুখময় সেনগুপ্তর কাছে আমরা যুগ্মভাবে অভিযোগ দায়ের করলাম। উনি সব শুনে বললেন— তোমাদের মধ্যে গোলমাল লাগানোর উদ্দেশ্যেই এটা করা হয়েছে এটা বুঝে তোমরা দু দলই যে আমার কাছে এসেছ এটাতে আমি খুব খুশী হয়েছি। এখন দুজনের একজনকে তো হল ছাড়তে হবে। ওঁরা পাহাড় ভেঙ্গে সব এসেছে, হল ওদের ছেড়ে দাও তোমরা।

বললাম— আমাদের যাত্রা দলতো এসে গেছে একদিন বন্ধ থাকা মানে কত খরচ চিন্তা করুন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন—এ ছাড়াতো কোন সমাধান নেই, ওরা একবার যখন গোলমাল করেছে তখন তোমরা আরো অসুবিধার মধ্যে পড়বে।

বললাম—D.E. তো সব জেনেও এসব করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন— তারও যুক্তি আছে। আমি বললেই তো যুক্তি দেখাবে।

বললাম— তা ঠিক। তবে একটা পথ করে দিন, আপনিও তো এককালে যাত্রা করেছেন। এখন একে একে সব দল আসতে থাকবে, সবাইকে-তো আর পিছিয়ে দেওয়া যায় না।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন—কিভাবে এর সমাধান চাও বল?

আমি চুপ করে রইলাম—কিছু মনে আসছে না এ পরিস্থিতি থেকে কিভাবে উদ্ধার পেতে পারি।

মুখ্যমন্ত্রী বললেন— চিল্ড্রেনস্ পার্কে-তো যাত্রা হয়, ওখানে একটা প্যাণ্ডেল করে নিলে কি হয়?

বললাম— আমাদের টাকা নেই।

উনি বললেন সে ব্যবস্থা আমি করছি। সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন ফোন করলেন। কিছুক্ষণ পর হোমগার্ডের এক বড় অফিসার এলেন। মুখ্যমন্ত্রী বললেন—ওকে নিয়ে যান সঙ্গে করে। ওরা যেখানে বলে সেখানে একটা প্যাণ্ডেল করে দিন আপনাদের বড় তাঁবু দিয়ে।

প্রমোদ গুনলাম। বললাম খোলা মাঠে টিকিট বিক্রি করে পালা গান। মানুষকে আটকান হবে কি করে?

সে ওরা বুঝবে তুমি যাও ওনার সঙ্গে। বললেন অভিনেতার মত মুড্ নিয়ে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। হোমগার্ডের গাড়ীতে আমি চলে এলাম। দিগন্ত বিস্তৃত চিল্ড্রেনস পার্কে এসে হোমগার্ডের সদস্যরাও চিন্তিত হয়ে পড়লেন কি করে কি হবে ভেবে।

আমি ওদের বললাম : এখানেতো একদিনের মধ্যে কিছু করতে পারবেন না। তার চেয়ে সামনের দুর্গাবাড়ীটাকে যাত্রা মণ্ডপে পরিণত করা আপনাদের পক্ষে খুবই সুবিধা হবে। আমাদের কাজ চলে যাবে।

ওরা খুব খুশী হোল। এ প্রস্তাবে বললেন, বিকেলের মধ্যেই আমরা সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ৩০/৪০ জন হোমগার্ড সদস্য সন্ধ্যার আগেই এক সুদৃশ্য যাত্রা মঞ্চ করে দুর্গাবাড়ীকে চতুর্দিক ঘিরে টিকিট বিক্রির কাউন্টার, চায়ের দোকানের জায়গা সব ব্যবস্থা করে দিলেন। হোমগার্ড ডিউটি দিলেন গেটে এবং ভিতরে। পুলিশের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রীর বদান্যতায় এক ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পেলাম আমরা। ঐতিহ্যপূর্ণ দুর্গাবাড়ী যাত্রামণ্ডপ তার পুরনো ঐতিহ্য ফিরে পেল। পরের দিন ১০ই নভেম্বর প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে অভিনয় বন্ধ থাকল। তার পরের দিন ১১ই নভেম্বর ঝকমকে আলোয় সজ্জিত দুর্গাবাড়ী যাত্রামণ্ডপে রাত ৮টায় আগরতলা এ্যামেচার যাত্রাপাটি আনন্দে টগ্‌বগ্ করতে করতে মঞ্চস্থ করলো ত্রিপুরার ইতিহাসাশ্রিত নাটক 'সামসের গাজী'।

আবার ফিরে আসছি আলোর নীচের অন্ধকারের কথায়—কি কারণে, কোন অন্যায় কাজ করেছি আমি যার জন্য আমাকে জঙ্গলে বদলী করা হোল এ প্রশ্ন আমি করেছিলাম মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। মুখ্যমন্ত্রী আমাকে বললেন, দেখি কি করা যায়, তুমি ছুটী নাও। ছুটী নিলাম মাসের পর মাস কিন্তু সংসার চলবে কি করে। ছেলেমেয়ে খাবে কি? বেতন বন্ধ। বিলথৈর হেডমাষ্টার আমার ড্রইং অফিসার, বেতন তিনি দেবেন। সুতরাং বিলথৈ স্কুলে join না করলে তিনি আমার বেতন Bill করবেন কেন। শিক্ষা অধিকর্তার কাছে আবেদন জানালাম, ছেলেমেয়েকে অনাহার থেকে বাঁচান। অধিকর্তা

অধীপ চৌধুরী Drawing officer হয়ে আমায় তিনমাসের বেতন দিলেন। কিন্তু এই ভাবে তো চলা যায় না। আবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলাম, মুখ্যমন্ত্রী বললেন—কিছু করতে পারছিনা, আমার ডানহাতই আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে—তুমি যাও join কর, তারপর আমি ফিরিয়ে নিয়ে আসবো। আমি তোমার সংস্কৃতির প্রতি কর্ত্তব্যবোধকে মর্যাদা দিতে পারলাম না এ আমার বড় দুঃখ, তুমি কিছু মনে করো না। ঐ দিনই শিক্ষামন্ত্রী শৈলেশ সোমের বাড়ী গেলাম। বললাম—এই কি আমার যোগ্য পুরস্কার স্যার? মন্ত্রী বললেন—"দু নৌকোয় পা দিয়ে চললে পরিণাম এইতো হবে।" বুঝলাম মুখ্যমন্ত্রী সত্যিই বিপাকে, নয়তো যাত্রা নাটক যে মানুষ এত ভালবাসে তার পক্ষে এ আচরণ কি সম্ভব! মুখ্যমন্ত্রী পারছেন না তাঁর নিজের তৈরী অস্ত্রকে সামলাতে, পারছেন না। তবে এই বিশ্বাস নিয়ে গেলাম, তিনি আমাকে আবার আমার সম্মানের জায়গায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন।

চলে এলাম বিলথৈ। কয়েকদিনের মধ্যে আগরতলা অফিস থেকে আদেশ হোল, পাণিসাগর বেসিক ট্রেনিং কলেজে যোগ দাও। যোগ দিলাম। উমাকান্তর শিক্ষক আমি, এখন বেসিকট্রেনিং কলেজের লেকচারার। একাজে যদি আমি যোগ্য হই তবে লেকচারার পদটি আমাকে দেওয়া হবে না কেন? বিনা পয়সায় আমাকে খাটিয়ে মারা হবে? এ প্রশ্ন করতেই Office order সংশোধন করা হোল, বলা হোল, তোমার Drawing officer বিলথৈ হেডমাষ্টার। আমার দাবী অচল হয়ে গেল।

১৯৭৬ সালে আর দ্বিতীয় বর্ষ যাত্রা সম্মেলন করা গেল না। যাত্রা সম্মেলন শুরু হোল ১৯৭৭ সালে। সেও আর এক নিকৃষ্ট বেদনাদায়ক ইতিহাস।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭৬ তারিখে ১৯টি যাত্রা দল নিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন উদয়পুরে অনুষ্ঠিত হয় আমাদের উদ্যোগে। স্থানীয় উৎসাহী কর্মীগণ, শিক্ষক লেখক অনাদি ভট্টাচার্যর নেতৃত্বে প্রচণ্ড পরিশ্রমে দক্ষিণ ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন সার্থক করে তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন সংগঠিত করার চেষ্টা চালানো হয় কিন্তু স্থান কৈলাশহর হওয়ার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। হয়তো স্থান ধর্মনগর হলে সম্মেলন সম্ভব হতে পারতো। মানসিক অশান্তি, হতাশা, সরকারী সহায়তার অভাব—সবকিছুই এই না পারার পিছনে কাজ করেছে হয়তো।

১ম বর্ষ সম্মেলনের সেমিনার থেকে আমরা দাবী তুলেছিলাম :

১) সারা ত্রিপুরায় অপেশাদারী যাত্রা অভিনয় প্রমোদকরমুক্ত করা হোক।

২) ত্রিপুরার গ্রামীন যাত্রাদলগুলির পুনর্গঠনের জন্য সরকারী আর্থিক-সহায়তা দেওয়া হোক।

৩) প্রতিটি মহকুমার পাবলিক লাইব্রেরীর এবং মোবাইল লাইব্রেরীর সঙ্গে একটা

যাত্রাপালা পুস্তকের শাখা সংযোজন করা হোক।

৪) প্রতিটি মহকুমায় একটি করে ড্রেস-ব্যাঙ্ক করা হোক।

৫) স্থানীয় ব্যাণ্ড পার্টিগুলিকে স্থায়ী কনসার্ট পার্টিতে রূপান্তরিত করা হোক।

৬) আগরতলা দুর্গাবাড়ী নাটমণ্ডপকে পুনর্গঠন করে 'মুকুন্দ মঞ্চ' নামে স্থায়ী যাত্রা মঞ্চ করে দেওয়া হোক। এখানে পূজার দিনগুলি বাদে লোক সংস্কৃতির যে-কোনো অনুষ্ঠান হতে পারে।

মোটামুটি এই কটি দাবী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য মেনে নেওয়া সরকারের পক্ষে মোটেই অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু আমরা দুঃখিত। এ পর্যন্ত আমাদের এই সামান্য দাবীর যৌক্তিকতা সরকারকে বোঝাতে পারলেও কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করানো যায়নি। বর্ত্তমান সরকারকে আমাদের এই একই অনুরোধ ঃ আমাদের দাবীগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে সমগ্র ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি উপকৃত হবে।

Nikhil Tripura Jatra Sammelan – 1975

AGARTALA, TRIPURA

STATEMENT OF EXPENDITURE IN CONNECTION WITH 1ST YEAR

NIKHIL TRIPURA JATRA SAMMELAN–1975 AT AGARTALA

RECEIPTS	Rs.–P.	PAYMENTS	Rs.–P.
1. Grants Received from		1. Jatra Seminar–	608.00
Governor's Fund	2.000.00	2. Remuneration paid	
2. By sale of tickets:		to the JatraParty-	14.694.00
i) Sammelan: 12,782.00		3. Pandel decoration including	
ii) For Utsab: 5,478.00		maintanance & electric	
	18,260.00	Charges–	762.25
3. Donation	111.00	4. Publication of Suvonir	
4. Subscription from the		including cost of	
members of the Reception		paper–	1,257.40
Committee:	24.00	5. Refreshment charges of the	
5. Donation received for		Workers &Volunters–	
1,171.25			
badges & donation cards		6. Publicity cost including	

in Seminar–	97.90	Printing of Poster, Handbills Tickets etc.	2,073.75
6. Entry Fee of the Jatra Party (24 Nos@ Rs.5/ each party)	120.00	7. Conveyance charges–	382.00
		8. Postage charges–	25.35
7. Contribution by the Jatra Parties to the Chief Minister's Relief Fund–	1,305.00	9. Stationary expenses–	146.81
		10. Contribution to the Chief Minister's Relief Fund	1,305.00
8. Realisation of Display Advertisement charges	750.00	11. Closing Balance :	
		i) Cash at Bank–	103.00
		ii) Cash in hand–	138.19
GRAND TOTAL	22,667.00	GRAND TOTAL	22,667.00

We have audited the Books and accounts to Nikhil Tripura Jatra Sammelan— 1975 in connection with First Year Jatra Sammelan at Agartala and we have to report that :–

1. All vouchers have been checked and found correct.
2. All the receipts have been checked and found correct.
3. Certified that a Grant of Rs. 2.000 (Rupees two thousand) sanctioned from Governor's Fund has been properly utilised for the purpose for which it was sanctioned.

for **M/s K. Bhattacharjee & Co.**
Sd/–
(K. Bhattacharjee)
Chartered Accountant

Sd/–S. Some	Sd/–**M. C. Podder**	Sd/-**S. Halder**
President	Treasurer	H. Secretary.

১৯৭৬ সালে আমাদের যাত্রা সম্মেলনের ২য় বর্ষ উৎসবের প্রস্তুতি চলে। গ্রামে গ্রামে দলগুলি ১ম বর্ষের সার্থকতার উৎসাহে নিজ নিজ পালার সুন্দরতর প্রস্তুতি গ্রহণ করে। পুরুষকে মহিলার ভূমিকায় অভিনয় করার রেওয়াজ আমরা বন্ধ করতে অনুরোধ করেছিলাম প্রথম সম্মেলনে, তাই এবার প্রতিটি দলই নতুন নতুন মহিলা শিল্পী সংগ্রহ করে তাদের গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। নতুন পালা, নতুন করে গড়ে তোলা মহিলা শিল্পী, প্রচুর অর্থ, প্রচণ্ড পরিশ্রম সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যায়, এক নিমেষে দলপতিদের চোখের সামনে কালো পর্দা নেমে আসে শুধুমাত্র রেভেনিউ ডিপার্টমেন্টের একটি সামান্য আদেশের অভাবে ঃ "সম্মেলন থেকে প্রমোদকর মুক্ত করা হোল" এ আদেশ আমরা পেলাম না। আজ শুধু এই কথা ভাবলে ব্যাথায় মন ভরে ওঠে যে, যাত্রা

সম্মেলনের শুভেচ্ছাকামী কর্মীদের প্রচণ্ড পরিশ্রমে গড়ে ওঠা সফলতার সূর্য পূব আকাশে নুতন রং ছাড়াবার আগেই অন্ধকার কালো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। যাত্রা সম্মেলন ও সংগঠনগুলি প্রচুর আর্থিক লোকসান গুনলো। সংগঠন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল বহু গ্রামে, মহকুমা শহরে! সরকার তথা রেভেনিউ ডিপার্টমেন্ট পরে ২য় সম্মেলনের অভিনয় প্রমোদকর মুক্ত করেছিলেন কিন্তু তখন দু-দুবার ঘোষিত সম্মেলনের তারিখ বদল করার পরে অনেক সময় চলে গেছে। যে কোনো সংগঠন পরিচালক জানেন, যে কোনো সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি একথা বোঝেন, দুবার দুবার তারিখ পাল্টাবার পর দলগুলি এবং সম্মেলন কমিটির পক্ষে মানসিক ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব কি না। হয়তো একথা উঠতে পারে, কমিটি সরকারী অনুমোদন না নিয়ে কেন সম্মেলনের দিন ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম সম্মেলন দেশের জরুরী অবস্থাতেই সংগঠিত হয়েছিল—এবং সরকারের অনুমোদন ছিল যদিও সম্পাদকের উপর মৌখিক কঠিন দায়িত্ব ছিল নাটক নির্বাচনের বিষয়ে। মাননীয় রাজ্যপালের দান ২০০০ (দুহাজার) টাকা পাওয়া গিয়েছিল। পাওয়া গিয়েছিল তদানিন্তন মন্ত্রীম'লীর শুভেচ্ছাবাণীও। যথারীতি সম্মেলনের হিসাব অডিট করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে পাঠানও হয়েছিল, তার পরেও কমিটি কি ধারণা করতে পারে যে দিন ফুরিয়ে অনুমোদন করা হবে সরকারী নীতি?

এবার নভেম্বর ১৯৭৭ আবার যাত্রা সম্মেলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। তদানিন্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ বিষয়ে খুবই উৎসাহ দেখান। কিন্তু ভেঙ্গে যাওয়া গ্রামীণ দলগুলির করুণ অবস্থার কথা আমাদের জানা আছে। তাই আমরা উৎসাহ বোধ করা সত্বেও আর্থিক বিষয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ি এবং এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের বিশদ আলোচনা হয়। শিক্ষামন্ত্রী ২৫০০ (দু হাজার পাঁচশত) টাকা সাহায্য দিতে পারবেন এই মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় কমিটি সংগঠনগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং তারই ফল হিসাবে ১৫ই অক্টোবর ১৯৭৭ তারিখে শিক্ষামন্ত্রীর অফিস কক্ষে এক সভায় সম্মেলন কমিটি পুনর্গঠিত হয়। সম্মেলনের নিয়ম অনুসারে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রীই কমিটির সভাপতি হবেন, তাই এই সভায় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকালীপদ ব্যানার্জীকে সভাপতি করে নুতন ভাবে গঠিত হোল মোট ৩৫ জন সদস্যের এক শক্তিশালী কমিটি। সদস্যদের মধ্যে শিল্পী, দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও গুণী বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন। এই সভায় অধিক সংখ্যক নিখিল ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদের সদস্যগণও উপস্থিত ছিলেন। যাত্রাশিল্পী সংসদ, যাত্রা সম্মেলন কমিটি গঠন করবে এই ছিল রেওয়াজ। এ ক্ষেত্রে সেই রেওয়াজ রক্ষা করা হয়। যথারীতি নবগঠিত সম্মেলন কমিটি ১২/১০/৭৭তে অনুষ্ঠিত সভায় ১২ই নভেম্বর হতে 'যাত্রা সম্মেলন' করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ খবর স্থানীয় এবং কলকাতার পত্রিকায় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের দলগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার বিভিন্ন দলগুলির মধ্যেও

সম্মেলনের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায় এবং ১৯টি দল সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানায়। কিন্তু আচমকা হতচকিত করে যাত্রাশিল্পী সংসদের সভাপতি শ্রী গিরীন্দ্র মজুমদার ১৮/৯/৭৭তে নয়জন কার্যকরী সমিতির সদস্যের উপস্থিতিতে এক অদ্ভুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জানিয়ে দিলেন—"পুনগর্ঠন সাপেক্ষে ১৫/৯/৭৭র গঠিত সম্মেলন কমিটি বাতিল বলে ঘোষিত হোল। এ এক আশ্চর্য আদেশ! গিরীন্দ্রবাবু সংসদ কমিটির সভাপতি হয়ে—সম্মেলন কমিটির সভাপতির সিদ্ধান্ত এবং কমিটিকেই বাতিল ঘোষণা করলেন কি করে? যাই হোক ত্রিপুরার বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে এলো বিভ্রান্তি, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের দলগুলির অবস্থা হোল 'কিম কর্ত্তব্য বিমূঢ়।' এই অবস্থার সৃষ্টি যদি গিরীন্দ্রবাবু না করতেন তাহলে হয়তো আরো অনেক দলকে সম্মেলনে আমরা দেখতে পেতাম। গিরীন্দ্রবাবু এখানেই থামলেন না, পত্রিকা মারফত বিবৃতি পাল্টা বিবৃতি দিতেই থাকলেন এবং ৬ই নভেম্বর দুর্গাবাড়ী যাত্রা মন্ডপে সংসদ আয়োজিত সম্মেলন হবে বলে ঘোষণা দিলেন। এই অ-গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করে আমি, বেণুধর গোস্বামী, হীরালাল সরকার যুগ্ম প্রচার সম্পাদক, বিধুভূষণ বিশ্বাস—কোষাধ্যক্ষ, শান্তি চক্রবর্ত্তী হীরা মিএগ, অন্নদা চক্রবর্ত্তী, বিনয়ভূষণ চক্রবর্ত্তী, বীরেন্দ্রচন্দ্র বণিক, বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, দ্বিজেন্দ্র সাহাজী, শ্রীমতী কাকলি ঘোষ, সহ অনেকে নিখিল ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদের কর্মসমিতি হতে পদত্যাগ করতে বাধ্য হই। কারণ সংসদের সদস্য হয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তে সই করেছি সংখ্যালঘু সংসদের সভাপতির একক সিদ্ধান্তকে প্রতিবাদ করার এ ছাড়া আর কোন সাংগঠনিক পথ ছিল না। সবথেকে দুঃখের ব্যাপার এই সংখ্যা লঘিষ্ঠ সদস্যের সংসদ ৬ই নভেম্বর সম্মেলন ঘোষণা করেও ৬ই নভেম্বর উদ্বোধন করতে পারলেন না, উদ্বোধন করলেন ৭ই নভেম্বর। উদ্বোধক প্রাক্তন কংগ্রেস মন্ত্রী শ্রীযতীন মজুমদার, গিরীন্দ্র মজুমদারের দাদা। মাত্র দুদিন যাত্রা অনুষ্ঠান করে তাদের সম্মেলন সমাপ্ত হয়ে গেল। ফলে এই অসম্পূর্ণ সম্মেলন—সংসদের সম্মান, সম্মেলনের দীর্ঘ প্রচেষ্টা ও উন্নয়ন কামনার উপর কালিমা লেপন করে আমাদের মূক করে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে গেছে। ১২ই নভেম্বর থেকে আমাদের নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন '৭৭, দুর্গাবাড়ীর যাত্রা মণ্ডপে দুচোখ ভরা স্বপ্ন আর ৩২ ইঞ্চি বুকের জোর আর প্রচণ্ড আর্থিক দুশ্চিন্তা নিয়ে শুরু হয়ে গেল। মাননীয় রাজ্যপাল এই দলাদলির কথা শুনে মাত্র ৫০০ (পাঁচশত) টাকা সাহায্য দিলেন। এই টাকাকে মূলধন করে যাত্রা সংগঠনগুলির উৎসাহ নিয়ে আমরা এগিয়ে গেলাম আমাদের যাত্রাপথে।

১২ ও ১৩ই নভেম্বর সেমিনারের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হোল। যাত্রা উৎসবের পূর্বে দুদিন ব্যাপী এই সেমিনার বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ; যেহেতু মন্ত্রীসভা নেই সেই হেতু সম্মেলনের সহঃসভাপতি যাত্রাপ্রেমী অধ্যক্ষ ডঃ হীরালাল চট্টোপাধ্যায় সভাপতি হিসাবে সমগ্র কাজ চালিয়ে যান। সেমিনারে প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত

করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দার্শনিক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রকুমার রায়। ত্রিপুরার এই গ্রামীণ সংস্কৃতি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন দিক নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন ডঃ কার্তিক লাহিড়ী, ডঃ সুখময় ঘোষ, অধ্যাপক বিজনকৃষ্ণ চৌধুরী, অধ্যাপক ভারতকুমার রায়, সাহিত্যিক অনিলচন্দ্র ভট্টাচার্য, গবেষক রমাপ্রসাদ দত্ত, শিক্ষক সুদর্শন মুখোপাধ্যায়, নাট্য সমালোচক আদিনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং প্রবীন অভিনেতা এবং পরিচালক ধূর্জটি দাশগুপ্ত। সেমিনারে দ্বিতীয় দিন প্রবীন ও গুণী যাত্রা শিল্পীদের সম্বর্ধনা জানান হয়। সারা ত্রিপুরার মোট ২৪জন প্রবীণ ও গুণী শিল্পীকে সম্মান পত্র দেওয়া হয়।

১৪ই নভেম্বর ১৯৭৭ থেকে শুরু হয় যাত্রা উৎসব। উৎসবের উদ্বোধন করেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক শ্রীমানিকলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রলাল ভৌমিক মহাশয়। প্রথম দিন অভিনয় করেন পঞ্চদীপ নাটসংস্থা, উদয়পুর—নটী-বিনোদিনী। মোট ২০টি দল সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে, এর মধ্যে অনিবার্য কারণে কল্যাণপুর, অমরপুর এবং ইন্দ্রনগর দল যোগদান করতে পারেনি। ৪ঠা ডিসেম্বর সম্মেলন সমাপ্ত হয়, প্রধান অতিথি শ্রী কে, এল চান্না, রাজ্যপালের উপদেষ্টা এবং বিশেষ অতিথি শ্রী টি.এস. মূর্তি, মুখ্য সচিব, ত্রিপুরা সরকার এবং শ্রীমতী রোমা মূর্তির সমাপ্তি ভাষণের মাধ্যমে। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহনকারী দলগুলিকে অভিজ্ঞান পত্র ও ৫৬ জন মহিলা শিল্পীকে সম্বর্ধনা পত্র প্রদান করেন শ্রীমতী রোমা মূর্তি। এদিন 'পার্থসারথি' পালাটি অভিনয় করে অতিথি এবং অভ্যাগতদের অনাবিল আনন্দদান করেন ত্রিপুরা সরকারের জনসংযোগ ও পর্যটন দপ্তরের সঙ্গীত ও নাটক বিভাগ।

সম্মেলন সমাপ্ত হোল; কিন্তু আমাদের সামনে পড়ে রইল গভীর সমস্যা। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুত অর্থ বরাদ্দের জন্য যে ফাইল নানা রকম Note এ ভরে শিক্ষাঅধিকর্তা শ্রী অধীপ চৌধুরীর কাছে গিয়েছিল তা লালফিতার শক্ত বাঁধনে আটকা পড়ে গেল। আমরা ভেসে গেলাম সমস্যার অথৈ জলে। ওদিকে প্রমোদকর মুক্ত করার কোন দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা সরকারী মহলে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই বেড়াজাল থেকে বাঁচবার জন্য গ্রামের সংগঠনগুলি মাত্র ২০ পয়সার টিকিট করে আইন বাঁচায়। ফলে সরকার এবং সংগঠন উভয়পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যেখানে পশ্চিমবঙ্গে পেশাদারী যাত্রা অভিনয় প্রমোদকর মুক্ত করে এই লোকসংস্কৃতিকে বাঁচানর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, সেখানে ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার শৌখিন যাত্রা (এখনও প্রফেসনাল দল গড়ে ওঠেনি) প্রমোদকর মুক্ত করার সিদ্ধান্ত দ্রুত নিয়ে ত্রিপুরার এই লোকসংস্কৃতির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করতে অপরাগ হবেন কেন? বাধাই বা কোথায়?

গ্রামীণজীবনের একঘেয়ে দিনগুলি থেকে গ্রামের মানুষকে মুক্তি দিতে না পারলে

দেশের চরম ক্ষতি। গ্রামের সারা দিনের খেটে খাওয়া কর্মক্লান্ত মানুষগুলো দিনান্তে একটু আনন্দ খোঁজে। তাই গ্রামে ছিল তর্জা, কবিগান, ঢপযাত্রা, যাত্রা ইত্যাদির আসর। শহরের বাবু-সভ্যতার কাছে এগুলো মর্যাদা না পেলেও গ্রামের মানুষ এর মধ্যেই আনন্দের খোরাক পেয়েছে যুগযুগ ধরে। কিন্তু অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তায় আজকের গ্রাম-মানুষ মূক হয়ে আছে। নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন কমিটি গত চার বছর ধরে এ ব্যাপারে অক্লান্ত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এদেরও উৎসাহের একটা সীমা অবশ্যই আছে। তাই ত্রিপুরার নির্বাচিত সরকার এই লোক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে প্রমোদকর অবিলম্বে মুক্ত করে এবং আমাদের দাবীগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে, মৃতকল্প এই শিল্পটিকে রক্ষা করুন।

ইচ্ছা যদি ঐকান্তিক হয়, প্রচেষ্টা যদি সৎ হয় তবে কোন বাধা বাধাই নয়। এই মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। ত্রিপুরার ছোট বড় জানা অজানা সমস্ত দলের কাছে এই একই মন্ত্র নিয়ে তাদের নিজস্ব শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার সঙ্কল্প নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এই সম্মেলনের সার্থকতায় যাঁরা আমাদের সহায়তা করেছেন তাঁদের কাছে জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা। বিশেষ করে পৌর প্রতিষ্ঠান, রাজস্ব বিভাগ, জনসংযোগ ও পর্যটন দপ্তর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সমহর্তা অফিস, আকাশবাণী আগরতলা, ত্রিপুরা পুলিশ, অধ্যক্ষ মহিলা কলেজ, অধ্যক্ষ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ, রবীন্দ্রভবন, প্রধান শিক্ষিকা তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়, স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, কসমোপলিটন, দৈনিক সংবাদ, ত্রিপুরা দর্পন, গণরাজ, স্যন্দন, জাগরণ, মানুষ, জনপদ, গণসংবাদ স্বাধিকার দর্পণ, অগ্রগতি, দৈনিক সীমান্তপ্রকাশ, ত্রিপুরা পত্রিকা এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞাপন দিয়ে আমাদের সাহায্য করেছেন, আর জানা অজানা অগণিত ত্রিপুরাবাসী যাঁরা পিছন থেকে বহুভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন তাঁদের জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

দ্বিতীয় বর্ষ সম্মেলন যাঁদের ঐকান্তির চেষ্টায় সফল হলো তাঁরা হলেন—

২য় বর্ষ : নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মোলন—৭৭ কার্যকরী সমিতি।

পৃষ্ঠপোষক : মাননীয় রাজ্যপাল, ত্রিপুরা।
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরা।

সভাপতি : শিক্ষামন্ত্রী, শ্রীযুক্ত কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সহঃসভাপতি : সমাজ কল্যাণমন্ত্রী-শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ।

সহঃসভাপতি : ডঃ হীরালাল চট্টোপাধ্যায়।

সহঃ সভাপতি : শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার আঢ্য।

সাধারণ সম্পাদক : শ্রী শক্তি হালদার
সংগঠন সম্পাদক : শ্রী শান্তি চক্রবর্তী
যুগ্ম সম্পাদক : শ্রী হারাধন দত্ত
যুগ্ম সম্পাদক : শ্রী উত্তম চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক : শ্রী হীরালাল সরকার
সহ-সম্পাদক : শ্রী দীনেশ দাস
প্রচার সম্পাদক : শ্রী বেণুধর গোস্বামী
কোষাধ্যক্ষ : শ্রী অমরেশচন্দ্র দত্ত

অর্থকরী উপসমিতির সদস্য : শ্রী বিধুভূষণ বিশ্বাস
: শ্রী বিনয়ভূষণ চক্রবর্তী
সদস্য : শ্রী কৃষ্ণপদ ভট্টাচার্য
: শ্রী রমাপ্রসাদ দত্ত
: শ্রী কপিল নাথ
: শ্রী বিশ্বজিৎ সেন
: শ্রী প্রশান্ত মজুমদার
: শ্রী সুবলকুমার দে
: শ্রী কানাই ধানুক
: শ্রী হীরাপ্রসাদ দত্ত
: শ্রী মৃণালকান্তি কর
: শ্রী জীতেন্দ্রচন্দ্র পাল
: শ্রী হিমাংশু সরকার
: শ্রী মোঃ হীরা মিঞা
: শ্রী শিবপ্রসাদ দত্ত
: শ্রী গিরীন্দ্র মজুমদার
: শ্রী যতীন্দ্র দাস
: শ্রী ননীগোপাল দাস
: শ্রী জগদীশ দত্ত
: শ্রী বিশু চৌধুরী
শ্রী নিখিল ভট্টাচার্য

: শ্রী অনাদি চক্রবর্ত্তী

: শ্রীমতী ইরা পাল

উপদেষ্টা মণ্ডলী : শ্রীযুক্ত মাণিকলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জেলা শাসক, পশ্চিম ত্রিপুরা।

: শ্রীযুক্ত বি. বি. দেবরায়, অর্থসচিব।

: শ্রীযুক্ত অধীপ চৌধুরী, শিক্ষাঅধিকর্ত্তা।

: শ্রীযুক্ত এম. কে. সিনহা, অতিরিক্ত মুখ্য বাস্তুকার।

: শ্রীযুক্ত এস. এন. ব্যানার্জী, প্রশাসক, পৌর সংস্থা।

: শ্রীযুক্ত আর দাস, পুলিশ সুপার।

: শ্রীযুক্ত এন. ঘোষ, স্টেশন ডিরেক্টর আকাশবাণী, আগরতলা।

: শ্রীযুক্ত সি. আর. ভট্টাচার্য, সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার।

সম্মেলন শুরু হওয়ার আগেই মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যাওয়ায় সম্মেলন সভাপতি শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থলে সহঃসভাপতি ডঃ হীরালাল চট্টোপাধ্যায় সম্মেলন পরিচালনা করেন।

যথা সময়ে সম্মেলন সমাপ্ত হলো। একে একে সকল দল আগামী বছরের যাত্রা উৎসবের আবেদন রেখে বিদায় নিয়ে চলে গেল যার যার জায়গায়। পত্র-পত্রিকায় অনেক খবর প্রকাশিত হলো, হলো অনেক আলোচনা। যাত্রামণ্ডপ ধীরে ধীরে খালি হয়ে গেল। এবার যারা এলো তারা পাওনাদার। ভাবটা, এখন প্যাণ্ডেল থেকে কর্মকর্ত্তারা সরে গেলে আর বুঝি পাওনা টাকা পাওয়া যাবে না। আমাদেরও যে বাড়ীঘর আঁছে এই শহরের প্রধান সড়কে, সে কথা তারা ভুলে গেল।

কর্মসমিতির সদস্যগণ নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফিরে গেলেন। শুধু পড়ে রইল সাধারণ সম্পাদক, দায়-দায়িত্ব তো তারি বেশী। বিজ্ঞাপনের প্রাপ্য টাকা কিছু পাওয়া গেল, কিছু গেলনা। পাওনাদারের তাগাদা থেকেই যাচ্ছে। অবশেষে আগামী দিনের সম্মেলনের জন্য, এদের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত না হওয়ার জন্য—নিজের পকেটই কাটতে হোল। দেনা শোধ হোল—আমি ঋণমুক্ত, মুক্ত, মুক্ত।

ড্রেস ব্যাঙ্কের লক্ষাধিক টাকার পোষাক কিনতে গিয়ে সস্ত্রীক আছি কলকাতার ত্রিপুরাভবনের ১নং পুরনো বিল্ডিংএ। সময়টা বেশ ভালই কাটছে। আগরতলা থেকে প্লেনে ওঠার সময় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী এবং শ্রদ্ধেয় দশরথ দেবের সামনাসামনি পড়লাম। নৃপেনবাবু বললেন—ফেরার সময় রাজা সেজে ফিরতে হবে। একটু লজ্জা পেলাম। বুঝলাম ড্রেস কেনার বিষয়টি উনি সব জানেন। মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সাথে আমাদের সরকারী গাড়ীও আছে। এলাম একসঙ্গে সবাই ত্রিপুরা ভবনে। একেই বলে রাজসুখ, রাজ অনুগ্রহ।

একদিন হীরালাল সেন এলেন আমাদের ১নং রুমে। সদ্য সম্বর্ধনা পেয়েছেন, দিয়েছেন ত্রিপুরার পার্থ গাঙ্গুলী। পার্থ তখন রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র। পার্থরাই সম্বর্ধনা জানাল হীরালালবাবুকে। কথায় কথায় যাত্রা সম্মেলনের কথা উঠলো—আলোচনার মধ্যে, একসময় আমি বললাম, এবার তো সম্মেলনে আপনিই তো মধ্যমণি? তাছাড়া এক বনে তো দুই বাঘ থাকতে পারে না, কি বলেন? হীরালালবাবু বুঝলেন, কিছু বললেন না—।

১৯৭৮ সালে ২৩শে নভেম্বর থেকে ১১ই ডিসেম্বর দুর্গাবাড়ী যাত্রামণ্ডপে নিখিল ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ আয়োজিত ৩য় বর্ষ নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন ১৯৭৮ অনুষ্ঠিত হোল। কার্যকরী সমিতি গঠিত হোল।

সভাপতি	:	শ্রী অনিল সরকার, মন্ত্রী
সহ-সভাপতি	:	শ্রী দীনেশচন্দ্র দাস
সহ-সভাপতি	:	শ্রী বিশ্বজিৎ সেন
সাধারণ সম্পাদক	:	শ্রী হীরালাল সেনগুপ্ত
সহঃসম্পাদক	:	শ্রী হীরালাল সরকার
	:	শ্রী শিশির মজুমদার
	:	শ্রী বিধুভূষণ বিশ্বাস
	:	শ্রী মনোরঞ্জন ভৌমিক
	:	শ্রী হরিপদ দাস
	:	শ্রী যাদব সাহা
কোষাধ্যক্ষ	:	শ্রী নরেশচন্দ্র পোদ্দার
সদস্য	:	শ্রী গিরীন্দ্র মজুমদার
	:	শ্রী শান্তিরঞ্জন ঘোষ
	:	শ্রী ননীগোপাল দাস
	:	শ্রী শান্তি চক্রবর্তী
	:	শ্রী কপিলকান্তি নাথ
	:	শ্রী যতীন দাস
	:	শ্রী বিশ্বরঞ্জন চৌধুরী
	:	শ্রী বাদল দত্ত
	:	শ্রী জগদীশ দত্ত
	:	শ্রী অজিত মজুমদার

: শ্রী নিধু হাজরা

: শ্রী হীরা মিএর

: শ্রীমতী ইরা পাল

: শ্রীমতী রাণু দেব

: শ্রী পরেশ দত্ত

সম্মেলন সম্পাদক ঘোষণা করলেন—

মানুষের যাত্রাপথে যুগেযুগে সংগ্রামের রূপ বদলেছে কিন্তু সংগ্রাম শেষ হয়নি। দাসযুগে সাধারণ মানুষ দাস মালিকদের বিরুদ্ধে লড়েছে। সামন্ততান্ত্রিক যুগে তারা লড়েছে সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে, আর আজ পুঁজিবাদের যুগে সাধারণ মানুষ লড়ছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে, তাই কালে কালে যাত্রা নাটক ও অন্যান্য লোক-সংস্কৃতিতে এ লড়াইয়ের উপাদান থাকা স্বাভাবিক। এই সংস্কৃতিই সাধারণের উন্নতির একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার। এই হাতিয়ার বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষকে করে তুলেছে শ্রেণী সচেতন। তাই, যাত্রা পালাগান, জারী, ভাটিয়ালী ইত্যাদি লোকসংস্কৃতিকে বিচার করতে হবে সামাজিক স্তর হিসেবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য নিয়ে চলতে লাগলো যাত্রা সম্মেলন নয়—যাত্রা প্রতিযোগিতা।

আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা বস্তাবন্দী হয়ে গেল, আমি মিশে গেলাম ত্রিপুরার জনারণ্যে।

।। একটি চিঠি ।।

ত্রিপুরার মৃতপ্রায় যাত্রাশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাই। যাত্রা মূলতঃ ভারতীয় নিজস্ব অভিনয়কলা। থিয়েটার ওদেশের। আমাদের মঞ্চরীতি সংস্কৃত-নাট্যের অনুসরণ করলেও আপত্তি থাকতো না। কিন্তু আমরা স্বদেশের ঠাকুরকে বড় বেশী অবহেলা করে ফেলেছি। আমি বুঝেছিলাম যাত্রার পুনরুজ্জীবনেই আমাদের সাংস্কৃতিক মুক্তি। এ কারণে যাত্রা উন্নয়নে আমার এত চেষ্টা। আমি বিশ্বাস করতাম, আমরা একদিন নিশ্চই ঘরমুখো হবো। পশ্চিমবঙ্গে সেই আন্দোলন সফল হয়েছে। আপনাদের জয়যাত্রা অবহেলিত যাত্রাশিল্পকে বুকের একান্ত কাছে টেনে আনুক—এই প্রার্থনা করছি। সব সময় জানবেন আমি আপনাদের কাছের, একান্ত পাশের লোক।

প্রীতি ও শুভ কামনান্তে

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা।

গবেষক রমাপ্রসাদ দত্ত-র রচনা থেকে সংগৃহীত

ত্রিপুরার যাত্রাভিনয়ে নারী

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হবার পূর্ব্ব পর্যন্ত ত্রিপুরায যে সব যাত্রা অভিনয় হয়েছে তার অধিকাংশ যাত্রাতেই স্ত্রী চরিত্র অভিনয় করত পুরুষরা; কশ্চিৎ দু'এক ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হত। যেহেতু তখন পর্যন্ত আমাদের সামাজিক ব্যবস্থায় প্রকাশ্য যাত্রামঞ্চে মেয়েদের অভিনয় করা সর্ব্বসম্মতভাবে স্বীকৃত ছিলনা, তাই অভিভাবকরা তাদের মেয়েদের প্রকাশ্য মঞ্চে অভিনয় করার অনুমতি দিতেন না।

তারপর ধীরে ধীরে সামাজিক উন্নতি এবং জনসাধারণ ও অভিভাবকদের চিন্তার প্রসারতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের মতের পরিবর্তন সুরু হতে থাকে। এবং ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ কী তারও কিছু পূর্ব্ব থেকে ত্রিপুরার যাত্রা অভিনয়ে মেয়েদের অভিনয় করতে দেখা যায়।

যেমন সদর বিভাগের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত কালাছড়া বাগানে ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে খোয়াই নিবাসী রুঞ্জু বেগম নামে এক মহিলা তিনটি যাত্রার অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে রয়েল শ্রীকৃষ্ণ অপেরার স্বত্বাধিকারী শ্রীপরেশ দত্ত, আগরতলার সন্নিকটে অবস্থিত শালবাগান নিবাসী মায়ারাণী দাস ওরফে কালীকে তাঁর যাত্রাদলে নৃত্য করার জন্য নিয়োগ করেন এবং তিনি ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত উপরোক্ত সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে মায়ারাণী পর পর বিভিন্ন সৌখিন যাত্রাদলে অভিনয় করেন এবং ঐ সনেই তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সাময়িকভাবে অভিনয় ছেড়ে দেন।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে কৈলাশহরের অন্তর্গত মনুঘাট অপেশাদার যাত্রা সংস্থায় অভিনয় করেন মায়ারাণী দত্ত। তিনি এখনও যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত আছেন। উপরোক্ত সনেই আগরতলার দুর্গাচৌমুহনীর যাত্রাদলে নৃত্যে সুপ্রভা রায় ও অভিনয়ে বাচ্চু দেবরায়কে পরেশ দত্ত নিয়োগ করেন।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দে আগরতলা শিবশক্তি অপেরা পার্টিতে খয়েরপুর নিবাসী শ্রীমতী কমলা দেবী অভিনয় করেন। প্রখ্যাত যাত্রা অভিনেতা পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় কমলাদেবীকে অভিনয় করার জন্য আনেন।

১৯৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী হীরা পাল (ঘোষ) প্রথমে থিয়েটারে এবং পরবর্ত্তী সময়ে বিভিন্ন যাত্রা সংস্থাতে অভিনয় করেন। বর্তমানেও তিনি যাত্রাভিনয় করে যাচ্ছেন।

১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে পেচারথল ও মুন এলাকার অপেশাদার যাত্রাদলে উপজাতীয় মহিলাদ্বয় শুভারেখা চাক্‌মা ও রীণা গুড়ুম অভিনয় শুরু করেন এবং এখনও বিভিন্ন যাত্রাদলে

অভিনয় করে যাচ্ছেন।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দে উদয়পুর মাতাবাড়ির ত্রিপুরেশ্বরী যাত্রপার্টিতে পারুল শীল ও ঝর্ণা চক্রবর্তী অভিনয় করতেন। তাঁদের উভয়েরই বাসস্থান ছিল উদয়পুরের ছনবন এলাকায়। এই সনেই উত্তর ত্রিপুরার মনুঘাট অঞ্চলের ছায়ারাণী দত্ত মনুঘাট অপেশাদার যাত্রা সংস্থায় প্রথমে নৃত্যশিল্পী হিসেবে এবং পরে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এখনও অভিনয় করেন।

১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে ভাটি অভয়নগরের বীণা বেগম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যাত্রাদালে নৃত্য ও অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রতাপগড় নিবাসী মীনা চক্রবর্তী এবং সূর্যমণিনগরের দেবীরাণীকে যাত্রা অভিনয়ে যোগদান করতে দেখা যায়। সে সময় দেবীরাণী আগরতলা এ্যামেচার যাত্রা সংস্থাতে অভিনয় করেছিলেন। উপরোক্ত এই সনেই অরুন্ধতীনগরে অবস্থিত পি, এল, ক্যাম্পের দ্বারা অনুষ্ঠিত 'ঝান্সীর রাণী পালায়', শ্রীমতী বাণী ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী শেফালী চক্রবর্তীকে অভিনয় করতে দেখা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য, এর কিছুদিন পর ঐ সনেই উপরোক্ত দুই মহিলার উদ্যোগে অরুন্ধতীনগর পি. এল. ক্যাম্পে পুনরায় 'ঝান্সীর রাণী' পালা অভিনীত হয় এবং পালার প্রতিটি ভূমিকায় ছিল নারীশিল্পী। অর্থাৎ ত্রিপুরায় সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারা অভিনীত যাত্রা পরিবেশন সেটাই ছিল প্রথম। পরবর্তীকালে ১৯৭০ খৃষ্টাব্দে অরুন্ধতীনগর জনকল্যাণ সমিতির যাত্রাতেও বাণী ভট্টাচার্য্য ও শেফালী চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেন। যাত্রা পালাটির নাম ছিল 'প্রতিশোধ।' এই সনেই শ্রীমতী সাধনা দত্ত রাণীরবাজার যাত্রাদলে অভিনয় সুরু করেন।

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মনুঘাটের স্থানীয় যাত্রাদলে শ্রীমতী অনিতা দত্তচৌধুরী প্রথম অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন এবং পরে অন্যান্য যাত্রাদলেও অভিনয় করেন। খোয়াই-এর 'শ্রীমা নাট্যসংসদে' সোনাতলা নিবাসী কুমারী মিলন দত্ত প্রথম যাত্রাভিনয় করেন। এই সনেই চম্পকনগরের নন্দনকানন ক্লাবের যাত্রা সংস্থায় উপজাতীয় মহিলা অনিতা রূপিনী এবং অপর তিনজন উপজাতীয় মহিলা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গা চৌমুহনীর পরেশ দত্ত মহাশয়ের যাত্রাদলে শ্রীমতী তুলসী চক্রবর্তী, শ্রীমতী বাসন্তী দেবরায় ও শ্রীমতী শ্যামলী দেবরায় অভিনয় করেন। এই সনেই আনন্দনগর যাত্রদলে শ্রীমতী রাণু দেব প্রথম যাত্রাদলে অভিনয়ের জন্য যোগ দেন। এবং তিনি পরবর্ত্তী সময়ে আড়ালিয়ার 'জোনাকী নাট্যসংস্থায়' এবং বর্তমান সময়ে আগরতলা এ্যামেচার যাত্রা পার্টিতে অভিনয় করছেন। জোনাকি নাট্য সংস্থার অপর মহিলা অভিনেত্রী হলেন লক্ষ্মীরাণী আচার্য।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অভয়নগর নিবাসিনী কুমারী মালতী বণিক 'ইন্দ্রনগর যাত্রাদল'-এ

অভিনয় করেন। এই সনের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থায় যেসব মহিলা অভিনয় করেছেন তাঁরা হলেন— দুর্গা চৌমুহনী যাত্রাদলে শ্রীমতী কাকলী ঘোষ, খোয়াই শ্রীমা নাট্যসংসদে শ্রীমতী লক্ষ্মী ঘোষ প্রভৃতি। কুমারী সন্ধ্যা দেবনাথ ও মঞ্জু দেবনাথ যদিও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দেই যাত্রা দলে নৃত্যশিল্পী হিসাবে যোগ দেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা অভিনয় আরম্ভ করেন ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদের "চণ্ডীতলা মন্দির" নাটকে। পরবর্তী সময়ে তাঁরা ঈশানচন্দ্র নগরের 'পল্লী নাট্য সমাজ' যাত্রাদলে অভিনয় করেন। বর্তমানে উভয়েই 'আগরতলা এ্যামেচার যাত্রাদল'এর নিয়মিত অভিনেত্রী। কুমারী মায়ারাণীও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে নৃত্যে এবং ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে শিশু চরিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ঈশানচন্দ্রনগর 'পল্লী নাট্যসমাজ'এর যাত্রায় কাজললতা দাস অভিনয় সুরু করেন।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনগরের 'বাণী নাট্য সংস্থা'তে যাত্রাভিনয় করেন কুমারী সরমা দেববর্ম্মা, প্রতিমা দেববর্ম্মা ও স্বপ্না বণিক। এই সনেই যোগেন্দ্র নগরের অপর যাত্রা সংস্থা 'শ্রীমা নাট্য সংসদ'-এ অভিনয় করেন সাবিত্রী ঘোষ ও লক্ষ্মী দেব। উপরোক্ত সনেই উদয়পুরের 'মাতাবাড়ী নাট্য সংস্থায়' যাত্রাভিনয় করেন বাসনা ঘোষ, মায়া পাল ও আরতি পাল। উদয়পুরের অপর যাত্রা সংস্থা 'পঞ্চদ্বীপ'-এ অভিনয় করেন শিউলি সরকার, প্রতিভা দে, শিখা সরকার ও সুদীপ্তা দাস। কৈলাসহর যাত্রা সংস্থায় এই সনেই অভিনয় করেন অপর্ণা মজুমদার ও অপর এক উপজাতীয় মহিলা শিল্পী।

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর স্থানীয় দুর্গাবাড়ী যাত্রামণ্ডপে নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ যাত্রা সম্মেলনে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থান ও মহকুমা থেকে প্রায় ২২টি যাত্রা সংস্থা যোগদান করেছিল। এবং সমস্ত সংস্থায় অভিনীত যাত্রায় প্রায় ৪০ জনের উপর মহিলা যাত্রাভিনয় করেন। নিম্নে সংস্থা ও মহিলা শিল্পীদের নাম দেয়া গেল।

১। আগরতলা এ্যামেচার যাত্রাপার্টি ঃ—ইরা পাল, রাণু দেব, সন্ধ্যা দেবনাথ, মঞ্জু দেবনাথ, মায়ারাণী দে।

২। পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ঃ—কাকলি ঘোষ।

৩। নবীন নাট্য পরিষদ, রেশমবাগান ঃ—সাধনা দত্ত, সুজাতা ধর, দুলালী বর্ধন, রীণা মজুমদার, লীলা দত্ত।

৪। ঐক্যশক্তি, রাণীরবাজার ঃ—মীরা চক্রবর্তী, অনিতা চক্রবর্তী।

৫। লোকনাট্য, সাবরুম ঃ— ঝর্ণা দে, শুক্লা ঘোষ।

৬। ধর্ম্মনগর নাট্যসংস্থা ঃ— বাসনা দেবরায়, মীরা চক্রবর্তী, নমিতা ভট্টাচার্য, সাথী রায়, লিপিকা রায়, দীপালী চক্রবর্তী।

৭। মুখোশ কাল্‌চারাল ঃ— পূর্ণিমা রায়, মঞ্জু রাহা, ডলি রায়।

৮। জোনাকী নাট্যসংস্থা ঃ— লক্ষ্মীরাণী আচার্য, ঊষারাণী গোস্বামী, ললিতা সিন্‌হা।

৯। অরবিন্দ নাট্যসংস্থা ঃ— দুলন দেব, নীলু দেব, অর্চনা বীর, মনোরমা ভৌমিক।

১০। ত্রিপুরা গ্রাম্যশিল্পী যাত্রা সংস্থা ঃ— রঞ্জিতা মজুমদার, মীরা কর।

১১। জয়রাম অপেরা ঃ— অরুণা সাহা, জ্যোতির্ময়ী সাহা, বীণা বেগম।

১২। শ্রীদুর্গা শিল্পীসংসদ ঃ— পদ্মা দত্ত।

১৩। চাক্‌মা গাবুর্জ্জা জঠা পরিষদ ঃ— রূপসী চাক্‌মা, জয়া দেবী চাক্‌মা, শুভরেখা চাক্‌মা, চিত্রমল্লিকা চাক্‌মা, মঞ্জরী চাক্‌মা, প্রেমলতা চাক্‌মা।

১৪। রাইমা সরমা সাংস্কৃতিক বিকাশ সমিতি, গণ্ডাছড়া ঃ— শৈলজানন্দা রায় ও লক্ষ্মীরাণী মালাকার।

পরিশেষে একটি কথা বলে রাখা ভাল যে উপরোক্ত যে সব মহিলা শিল্পীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁরা ব্যতীত বহু মহিলা যাত্রাশিল্পীর নাম এ লেখায় বাদ পড়েছে। যেহেতু বহু চেষ্টা করেও তাঁদের নাম পাওয়া যায়নি বা সংস্থাগুলির দিক থেকে কোনরূপ চেষ্টা না নেওয়ায় কিংবা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নাম আমাদের না বলায় তা উল্লেখ করা গেল না। বিশেষ করে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরে অনুষ্ঠিত দক্ষিণ ত্রিপুরা যাত্রা সম্মেলনে ১৯টি যাত্রাপার্টি অভিনয়ে যোগ দেয়। কিন্তু তাদের দিক থেকে একটি যাত্রা সংস্থাও তাদের মহিলা শিল্পীদের নাম আমাদের নিকট পাঠায়নি। এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরার সাব্রুম, উদয়পুর, বাইখোড়া ও মুহুরীপুরের যাত্রাদলগুলি এ সম্পর্কে নীরব। নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা সম্মিলনীর সদস্য শ্রীহীরালাল সরকার মহাশয় নিজ উদ্যোগে যে সব নাম সংগ্রহ করে এনে দিয়েছেন, তার উপর নির্ভর করেই এ প্রবন্ধ লেখা। এ কথা অনস্বীকার্য্য যে একার পক্ষে সারা ত্রিপুরার যাত্রাদলের মেয়েদের নাম সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এদিক থেকে প্রতিটি যাত্রাদলের অবশ্য কর্তব্য হিসাবে যথাসময়ে যাত্রা সম্পর্কিত সমস্ত খবর কেন্দ্রীয় যাত্রা কমিটির আগরতলাস্থিত ঠিকানায় পাঠান উচিত। প্রকৃত ইতিহাস লিখতে, গেলে সঠিক তথ্যের প্রয়োজন হয়। সেই তথ্য যদি যাত্রাদলগুলি সময়মত না জানান তবে তার জন্য একক সংগ্রাহককে দায়ী করা যায় না। হীরালালবাবুর একক প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে—লেখায় প্রেরণা যুগিয়েছে সুতরাং আমি তাঁর কাছে ঋণী।

হীরালাল সরকার সংগৃহীত ত্রিপুরার প্রবীণ যাত্রা শিল্পী পরিচিতি
১৯৭৫ — ১৯৭৬

১। বিশ্বম্ভরনাথ ভৌমিক ঃ—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার আবদুলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১০ বৎসর বয়সে আগরতলায় আসেন। ১৮ বৎসর বয়সে মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের যাত্রাদলে যাত্রা করেন। তাঁকে ১৯৭৪ খৃঃ এর ৫ই জানুয়ারী তারিখে আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'আগরতলা এ্যামেচার যাত্রাপার্টি' কর্তৃক মানপত্র ও সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। ১৯৭৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তিনি বীরেন্দ্র কিশোর মাণিক্যের কাছ থেকে যাত্রার পোষাক পুরস্কারস্বরূপ পেয়েছিলেন।

বিশ্বম্ভর নাথ ভৌমিক

২। শ্রী মনীন্দ্র আচার্য ঃ—

১৩১৩ বঙ্গাব্দের ৮ই আশ্বিন তিনি বর্তমান বাংলাদেশের দরইন গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। দেশবিভাগের পর তিনি আগরতলায় আসেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে রাণীরবাজার এলাকায় 'ত্রিপুরেশ্বরী অপেরাপার্টি' নামে যে পেশাদারী যাত্রাদল সৃষ্টি হয়েছিল—তারই প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। এরপর তিনি গঠন করেন রাণীরবাজার এলাকায় 'স্মৃতি নাট্য সংসদ'। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদ' তাঁকে মানপত্র ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পীসংসদ-এর তিনি অন্যতম সদস্য।

৩। শ্রী শচীন্দ্রমোহন বণিক ঃ—

তিনি আখাউড়া সন্নিকটবর্ত্তী নয়াদিল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরায় আসেন। শচীন্দ্র মোহন 'ত্রিপুরেশ্বরী অপেরা পার্টী'র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম। ব্যক্তিগতভাবে তিনি রাণীরবাজারের প্রতিটি যাত্রা সংসদের সঙ্গে জড়িত।

৪। নৃপেন্দ্র দাস (টেকই)

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কৈলাসহরে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র পনেরো বছর বয়সে ১৯৪০

ব্রজেন্দ্র লাল দত্ত

ং আদিত্য কিশোর তলাপাত্র
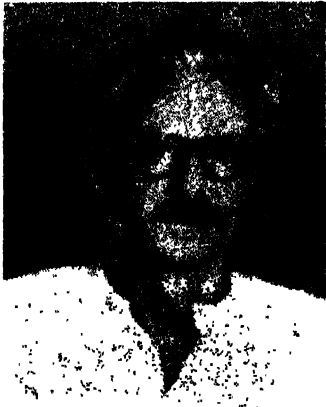
পুলিন বিহারী ভট্টাচার্য্য
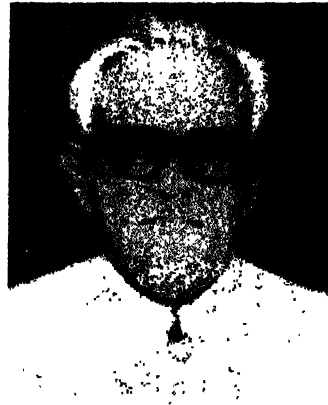
মণীন্দ্র আচার্য্য

খৃষ্টাব্দে তিনি যাত্রাদলের সংস্পর্শে আসেন। এবং ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি 'গোপীনাথ অপেরা', 'গৌরাঙ্গ অপেরা', 'বাসন্তী অপেরা' ও 'রাধাগোবিন্দ অপেরা' প্রভৃতি যাত্রাদলে যাত্রাভিনয় করেন। ১৯৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতার 'স্টার থিয়েটারে' যোগ দেন।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি কৈলাসহরে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি নিজে যাত্রা বিষয়ক বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী এবং দলের গানগুলির সুরকারও তিনি নিজেই।

৫। আদিত্যকিশোর তলাপাত্র— টাউন রামপুর।

আদিত্য কিশোরের জন্মস্থান ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামে। পরে তিনি আগরতলা টাউন রামপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন।

৬১ বৎসর বয়সে ১৯৭৪ ইং সনে তিনি লোকান্তর গমন করেন। তাঁর শিল্পী জীবন খুব অল্প বয়সেই সুরু হয়েছিল। তিনি যে সমস্ত নাটকে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন তার মধ্যে টিপু সুলতান, পাঞ্জাবকেশরী, পথের শেষে, বিসর্জন এবং চন্দ্রগুপ্ত বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৩ ইং সনের ৩রা জুন 'ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ' তাঁকে গুণী যাত্রাশিল্পী হিসেবে সম্বর্ধনা ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করেছিল।

৬। শ্রী পুলিনবিহারী ভট্টাচার্য—ভট্টপুকুর।

ব্রাহ্মনবাড়ীয়ার অন্তর্গত তালসহরে পুলিনবাবু জন্মগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ৩৫ বৎসর যাবৎ তিনি ত্রিপুরায় বসবাস করছেন।

শ্রী ভট্টাচার্য্য ছাত্রজীবন থেকেই যাত্রা থিয়েটারে মেতে উঠেন। তাঁর প্রথম নাটক 'কনৌজ কুমারী'। এতে তিনি পৃথ্বীরাজের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে তিনি বহু নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে ত্রিপুরার দর্শক সমাজে একটি স্থায়ী আসন করে নেন। কিছুকাল 'নবশক্তি যাত্রা পার্টি'-র সাথে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এবং ঐ পার্টির রামপ্রসাদ, আত্মাহুতি, রক্ততিলক, নবরাত্রি, সিরাজদ্দৌলা পালায় সু-অভিনয় করেন।

৬৮ বৎসর বয়সেও তাঁর যাত্রা প্রীতিতে ভাঁটা পড়ে নি। 'আগরতলা এ্যামেচার যাত্রা পার্টি' তাঁকে ১৯৭৪ সনে বিশিষ্ট প্রবীণ যাত্রাশিল্পী হিসেবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিল।
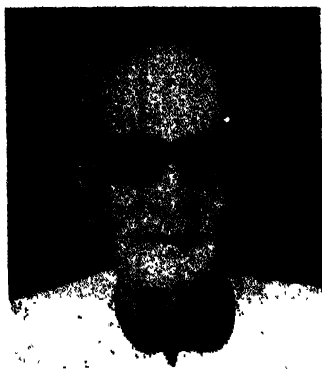
শচীন্দ্র মোহন বণিক

উত্তমাচরণ চক্রবর্তী

সত্যেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী
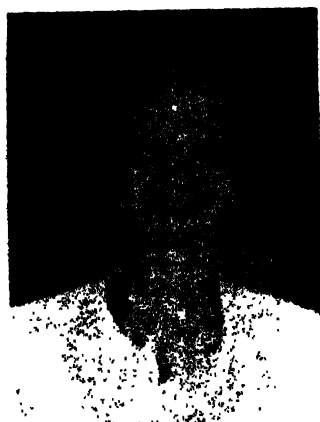
ডাঃ নরেন্দ্র বিশ্বাস

৭। শ্রীব্রজেন্দ্রলাল দত্ত—অভয়নগর।

ব্রজেন্দ্রলাল ১২ বৎসর বয়স থেকে অভিনয় শুরু করেন। অভয়নগর যাত্রা পার্টির তিনি ছিলেন অন্যতম অভিনেতা এবং পরিচালক। তাঁর অভিনীত স্মরণীয় নাটকগুলি হচ্ছে সমাজের বলি, বাঙ্গালী, মা, দানবীর হরিশচন্দ্র ইত্যাদি। তাঁর সুদীর্ঘ শিল্পীজীবনে শতাধিক পালায় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন।

প্রবীন যাত্রাশিল্পী হিসেবে ১৯৭৩ ইং সনের ৩রা জুন 'ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদ' তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

৮। শ্রী উত্তমাচরণ চক্রবর্তী — বেলতলী।

তাঁর জন্মস্থান বর্ত্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জিলার বিদ্যাকূট গ্রাম। পিতা ৺সারদাচরণ ছিলেন একজন সু-অভিনেতা। পিতার অনুপ্রেরণাতেই অভিনয় বিদ্যায় হাতে খড়ি হয় তাঁর। শ্রীযুত প্রমথনাথ ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর শিল্পগুরু। বহু বিখ্যাত নাটকের বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি। তাঁর মতে পথের শেষে নাটকে 'অনাদি', স্বর্গ হতে বিদায় নাটকে 'গোকুল', মা ও ছেলে, চাঁদের মেয়ে ও স্বামীর ঘর যাত্রা পালায় যথাক্রমে 'শুকদেব' 'শ্রীমন্ত' ও 'চরণের' ভূমিকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। উত্তমাচরণ বেলতলী 'ত্রিবেণী নাট্য সংস্থার' অন্যতম পরামর্শদাতা ও নাট্য পরিচালক এবং নিখিল ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন।

৯। শ্রী নরেন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস — ব্রজেন্দ্র নগর।

কুমিল্লা জেলার গোঁসাইস্থল গ্রামে বাংলা সনে ১৩১৬ নরেন্দ্রবাবু জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮ বৎসর বয়সে যাত্রাশিল্পে যোগদান করেন এবং বহু পৌরানিক ও সামাজিক যাত্রা পালা পরিচালনা ও অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন।

দেশ বিভাগের পর চলে আসেন ত্রিপুরায় ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামে (কমলা সাগর এলাকা), প্রতিষ্ঠা করেন 'ব্রজেন্দ্রনগর যাত্রা পার্টি'। এই যাত্রা পার্টি বহু রাত্র সুনামের সহিত যাত্রাভিনয় করে এলাকার জনসাধারণের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

তাঁর অভিনীত ও পরিচালিত শ্রীকৃষ্ণ চরিত, রাবণবধ, তরণী সেন বধ, সীতার বনবাস, হরিশচন্দ্র, সাধু তুকারাম, আগুন জ্বালো, গরীব কেন মরে প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৯৭৩ সনের ৩রা জুন আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ' নরেন্দ্রচন্দ্রকে মানপত্র ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১০। সত্যরঞ্জন রায়চৌধুরী — মেলারমাঠ।

সত্যরঞ্জন রায়চৌধুরী ত্রিপুরার অন্যতম গুণী যাত্রা শিল্পী। তিনি বেশ কিছু দিন পেশাদারী যাত্রা দলে সুনামের সাথে অভিনয় করেন। পরবর্তীকালে ত্রিপুরাতে এসে শিক্ষকতার চাকুরী গ্রহণ করেন এবং ১৯৫৭ সালের পর থেকে কর্ম্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে বহু নাটক ও যাত্রাপালায় অভিনয় করেন।

'ত্রিপুরা যাত্রা শিল্পী সংসদ' ১৯৭৩ ইং সনের ৩রা সেপ্টেম্বর তারিখে গুণী যাত্রাশিল্পী হিসাবে সত্যরঞ্জনকে মানপত্র ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১১। শ্রী দীনেশচন্দ্র চক্রবর্তী—(১০.১.৭৬ ইং তারিখের সাক্ষাৎকার অনুসারে)

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের বিলোনীয়া মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম মুহুরীপুর গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুহুরীপুরের 'জগন্নাথ অপেরার' ম্যানেজার যতীন্দ্র সেন মহাশয় দীনেশবাবুকে প্রথম যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করবার সুযোগ প্রদান করেন। সে সময়ে দীনেশবাবুর বয়স ৩৬ বৎসর। আর 'জগন্নাথ অপেরা' ত্রিপুরার প্রাচীনতম যাত্রা সংস্থা।

দীনেশবাবুর 'অনুধ্বজের হরিসাধন' পালায় বিক্রমসিংহের ভূমিকায় জীবনের প্রথম অভিনয়। এরপর ক্রমান্বয়ে অভিনয় করেন—রক্তমুকুট, সংসারচক্র ও সুরথ উদ্ধার-এ।

বর্তমানে তিনি কোনো যাত্রায় অভিনয় করেন না। কিন্তু যে কোনো যাত্রাশিল্পী যাত্রা সম্পর্কে তাঁর কাছ থেকে আজও উৎসাহ পান।

১২। শ্রী জয়কুমার রায় ঃ—

১৩০৯ ত্রিপুরাব্দে, অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের মাধবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কিশোর বয়সে বাদ্যযন্ত্র মেরামতের কাজ আয়ত্ত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যযন্ত্র বাজাতেও শেখেন।

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে মাধবপুর গ্রামে 'রাজসূয় যজ্ঞ' পালায় প্রথম অভিনয় করেন এবং যাত্রাপার্টিতে যোগদান করেন। তারপর কিছুদিনের মধ্যেই সে যাত্রাপার্টি ভেঙ্গে যায়।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে জয়কুমার নিজে উদ্যোগী হয়ে নিজ গ্রামের (মাধবপুর) যাত্রাপার্টিকে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং বর্তমান সময় পর্য্যন্ত তিনি সে দলের পৃষ্ঠপোষকরূপে আছেন।

১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাধবপুর ছেড়ে এসে বিশালগড়ের কল্‌কলিয়াতে নিজ বাড়ী তৈরী করেন। এখানে এসেও তিনি গঠন করলেন "কল্‌কলিয়া যাত্রা পার্টি"।

এখন তিনি বৃদ্ধ, তবুও গ্রামের যাত্রাভিনয়ের যন্ত্রসঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন।

১৩। শ্রী সীতানাথ মজুমদার ঃ—

অধুনা বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুর মহকুমার আশীকাটি গ্রামে ১৩১০ বঙ্গাব্দে সীতানাথ মজুমদারের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম অশ্বিনীকুমার মজুমদার।

শৈশবকাল থেকেই তিনি যাত্রায় অভিনয় করে সুনাম অর্জ্জন করেন। কিছুদিন পর বেলঘর পেশাদার যাত্রাপার্টিতে অভিনয় করার চাকুরী পান। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার 'কৃষ্ণনগর যাত্রাপার্টি'তে যোগ দেন। এবং এই যাত্রাদলের পক্ষ থেকে তিনি সে সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ, আসাম, কাছাড় এবং আগরতলার রাজবাড়ীতে যাত্রার অভিনয় করেছেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে চলে আসেন এবং জিরানীয়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। জিরানীয়া সাংস্কৃতিক সংস্থায়ও তিনি বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেন। জীবনে তিনি প্রায় অর্ধশতের উপর যাত্রাভিনয় করেন।

১৪। শ্রী ক্ষীরমোহন সাহা ঃ—

১৮৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কুমিল্লা জেলার চান্দুরা গ্রামে ক্ষীরমোহন সাহা মহাশয়ের জন্ম। কিশোর ও যৌবনে তিনি নিজ এলাকায় বহু যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন।

দেশ বিভাগের পর ত্রিপুরা রাজ্যের সদর উত্তরাঞ্চল ঈশানপুর গ্রামে তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি প্রায় ৩০। ৩৫টি যাত্রাদলে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। তাঁর মতে তিনি শ্রেষ্ঠ অভিনয় করেছেন "মানুষ" যাত্রা পালাতে।

১৫। শ্রী বরদানন্দ দত্ত চৌধুরী ঃ—

১৩১৮ বঙ্গাব্দের ১৯শে আশ্বিন শ্রীহট্ট জেলার মাধবপুর থানার অর্ন্তগত দুর্গানগর গ্রামে বরদানন্দ দত্ত চৌধুরী মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি তাঁর নিজ গ্রামে একটি সৌখীন যাত্রাদল গঠন করেছিলেন বলে তাঁর জবানবন্দীতে জানা যায়। 'মেবারকুমারী' তাঁর অভিনীত প্রথম নাটক।

দেশ বিভাগের পর তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে এসে ঈশানপুর এলাকায় বসবাস করতে আরম্ভ করেন। তাঁর মতে 'বঙ্গবীর' পালাটি তাঁর অভিনীত শ্রেষ্ঠ পালা। এখানে তিনি অর্ধশতাধিক যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে তিনি অসুস্থতার জন্য কোনো যাত্রাতেই অংশগ্রহণ করেন না।

১৬। শ্রী হারানচন্দ্র বাউল ঃ—

১৩১৮ বঙ্গাব্দে, অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার নরসিংদী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন হারানচন্দ্র বাউল মহাশয়।

১২ বৎসর বয়সে জন্মস্থান নরসিংদীর বিখ্যাত সৌখীন যাত্রা সংস্থা সারস্বত অপেরার "কর্ম্মফল বা প্রতিভা" নাটকের সমদমের (শিশু চরিত্র) ভূমিকায় অভিনয় সুরু করেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত উপরোক্ত জেলার বিভিন্ন সৌখীন দলে বহু যাত্রায় অভিনয় করে সুনাম অর্জন করেন। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং আগরতলা শহর সংলগ্ন পূর্ব প্রতাপগড়ে স্থায়ীভাবে বাসস্থান নির্বাচন করেন। প্রতাপগড় সৌখীন যাত্রা সংস্থার তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, নির্দেশক ও অভিনেতা। ১৯৫৫ সালের ২৯শে নভেম্বর প্রাচ্যভারতী বিদ্যালয়ের সাহায্যকল্পে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক তিন রাত্র নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয় এবং হারান বাবু ঐ নাট্যভিনয় পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। জীবনে ৪০টিরও বেশী যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর মতে 'মানুষ' পালার কোতল খাঁর ভূমিকাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়।

ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে এই কৃতী অভিনেতাকে মানপত্র ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

১৭। শ্রী মলিনচন্দ্র নন্দী ঃ—

ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণের নিকট যিনি মলিনমাষ্টার নামে পরিচিত, সেই মলিনচন্দ্র নন্দী ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারীপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিল্পীজীবন আরম্ভ হয় ১২ বৎসর বয়সে। চাঁদপুরের 'চিত্তরঞ্জন অপেরা'র শিশু নৃত্যশিল্পী ছিলেন তিনি।

পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বিখ্যাত ২নং নট্ট কোম্পানীতে এবং অপর কয়েকটি পেশাদারী যাত্রাদলে অভিনয় করেন।

দেশ বিভাগের পর তিনি ত্রিপুরায় চলে আসেন এবং রাণীরবাজারে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি তাঁর সুহৃদ্ শচীন্দ্র বণিক, মনীন্দ্র আচার্য প্রভৃতি কতিপয় খ্যতিমান যাত্রাশিল্পীর সহযোগিতায় রাণীরবাজারে পেশাদার হিসাবে "ত্রিপুরেশ্বরী যাত্রা পার্টি" প্রতিষ্ঠা করেন। যাত্রাজগতে তিনি অধিক পরিচিত নৃত্যশিল্পী হিসেবে। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় কলিকাতার যাত্রাজগতের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী আদিনাথ কীর্তনীয়া তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

মলিনবাবু অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্যে সমান পারদর্শী। তিনি ত্রিপুরার উপজাতিদের নিয়েও বহু যাত্রাদল গঠন করেন। তিনি যন্ত্রসঙ্গীত ও নৃত্য শিক্ষক হিসাবে সর্বত্র সর্বজনপূজ্য। তিনি প্রায় শতাধিক যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

১৮। ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস ঃ—

খোয়াই মহকুমার অন্তর্গত তোতাবাড়ী নিবাসী ডাঃ যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস মহাশয় ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ্যের চারিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আজ বৃদ্ধ। সুতরাং

এককালের প্রসিদ্ধ যাত্রাশিল্পী আজ আর অভিনয়ে নামেন না। তাঁর কাছ থেকে জানা যায় যে, কিশোর বয়সে ত্রিপুরার রাজন্যবর্গের দ্বারা অভিনীত যাত্রা এবং শ্রীপাটের (প্রভুর বাড়ীর) শিল্পীদের অভিনব যাত্রা দেখে তাঁর মনে যাত্রাভিনয় করার ইচ্ছা জাগে এবং সে ইচ্ছা তিনি ফলবতী করেন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নিজ জন্মস্থান চারিপাড়ায় সৌখীন যাত্রাদল গঠন করে। সে দলের নাম দিলেন "চারিপাড়া যাত্রাপার্টি"। সে যাত্রাপার্টি থেকে তিরিশ বৎসরের যুবক ডাক্তার যোগেন্দ্রচন্দ্র দাস প্রথম যাত্রা মঞ্চস্থ করলেন "প্রহ্লাদ চরিত"।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে নিজ জন্মস্থান চারিপাড়া পরিত্যাগ করে পুর্বোলিখিত খোয়াই এর তোতাবাড়ি (মোহরছড়া)-তে চলে এলেন। এখানে এসেও যাত্রায় অভিনয় করা তিনি ছাড়লেন না। তারই ফল হিসেবে দেখি তিনি একের পর এক যাত্রাভিনয় করলেন— 'প্রহ্লাদচরিত্র', 'পণমুক্তি', 'চাষার ছেলে', 'মানুষ', 'সোনাইদিঘী' প্রভৃতি।

'চাষার ছেলে'র দেবরায়ের ভূমিকায়ই তিনি তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রাখতে পেরেছিলেন বেশী। যার জন্য ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এই দেবরায়ের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য কস্‌বা এলাকা থেকে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসেবে তাঁকে পুরস্কৃত করা হয়।

বর্তমানেও তিনি কয়েটি যাত্রাদলের পৃষ্ঠপোষক।

১৯। শ্রী রমেশচন্দ্র আচার্য ঃ—

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে কস্‌বা থানার অর্ন্তগত মোগ্‌রা গ্রামে রমেশচন্দ্র আচার্য জন্মগ্রহণ করেন। তের বৎসর বয়সে প্রথম তিনি যাত্রাভিনয় করেন। তিনি স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করতেন।

মহাত্মা গিরিশ ঘোষের "সীতার বনবাস" নাটকে 'সীতার' ভূমিকায় অভিনয়ই তাঁর জীবনের প্রথম অভিনয়।

রমেশবাবুর নিজের মতে 'জাগরণ' নাটকের ভারতী চরিত্রে অভিনয়ই তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়। তিনি বিভিন্ন সময়ে স্ত্রী ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন। শিক্ষাবিদ্ অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী তাঁকে 'গিরিশ গ্রন্থাবলী' উপহার দেন। একবার প্রভুর বাড়ীর যাত্রামঞ্চে রাণীরবাজারের ত্রিপুরেশ্বরী যাত্রাপার্টির দ্বারা অভিনীত দানবীর হরিশচন্দ্র পালায় শৈব্যার ভূমিকায় অভিনয় করে মাতামহারাণীর কাছ থেকে ৫০ টাকা পুরস্কার পান। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে আগরতলাস্থিত রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ' তাঁকে মানপত্র প্রদান করে তাঁর শিল্পীজীবনকে সম্বর্ধিত করে।

তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটকের তালিকায় আছে 'সীতার বনবাস', 'নিয়তি', 'দানবীর হরিশচন্দ্র', 'জাগরণ', 'উদয়ের মা' প্রভৃতি। তিনি প্রথম জীবনে কর্ণেলবাড়ীর যাত্রাদলে স্ত্রী ভূমিকায় নিয়মিত অভিনয় করতেন। বর্তমানে তিনি রাধানগরে বসবাস করেছেন।

২০। শ্রী প্রাণগোপাল গোস্বামী ঃ—

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী জেলার আলিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রাণগোপাল গোস্বামী মহাশয়। তিনি প্রথম যাত্রাভিনয় করেন ১১ বৎসর বয়সে।

দেশবিভাগের পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম ত্রিপুরারাজ্যের উদয়পুর বিভাগে চলে আসেন। এর কিছুদিন পর তিনি ত্রিপুরা সরকারের সমাজশিক্ষা বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিলোনীয়া মহকুমার শান্তিরবাজারে চলে যান এবং সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। তিনি দক্ষিণ ত্রিপুরায় বহু সৌখীন যাত্রাদল গঠন এবং পরিচালনা করেন। ২৫ বৎসর পূর্বে তিনি উদয়পুর থাকাকালীন গড়ে তোলেন 'উদয়পুর নাট্যসংঘ'। তিনি বহু নাটকে অভিনয় করেন। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— 'চন্দ্রহাস', 'টিপু সুলতান', 'পরশমণি', 'রাজা দেবীদাস', 'চাষার ছেলে', 'নন্দকুমার', 'সিপাহী বিদ্রোহ' প্রভৃতি। তাঁর স্বরচিত যাত্রা 'মিলন শঙ্খ' ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালীর চৌমুহনীতে মঞ্চস্থ হয়েছিল বলে তিনি বলেন।

২১। শ্রী হিরণ্ময় দাশগুপ্ত ঃ—

অধুনা বাংলাদেশের চট্টগ্রাম জেলায় হীরেনবাবুর জন্ম। তিনি প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চা করতেন এবং ১৮ বৎসর বয়সে যাত্রাভিনয় আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী জীবনে 'ভোলানাথ অপেরা' এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার 'জয়দুর্গা অপেরা'য় অভিনয় করেন।

দেশ বিভাগের পর ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরারাজ্যের জিরানীয়া এলাকার নোয়াবাদী গ্রামে এসে বসবাস সুরু করেন। তিনি রাণীরবাজারের ত্রিপুরেশ্বরী অপেরার অন্যতম অভিনেতা। তিনি অধিকাংশ যাত্রায় নায়কের অভিনয় করতেন। তাঁর অভিনীত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ— 'চাষার ছেলে', 'রামানুজ', 'মহিষাসুর', 'মানুষ', 'মায়ের ডাক', 'ভাওয়াল সন্ন্যাসী', 'জাগরণ', 'মহারাজ নন্দকুমার' প্রভৃতি।

১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জুন, আগরতলা রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'ত্রিপুরা যাত্রাশিল্পী সংসদ' তাঁকে কৃতী অভিনেতা হিসাবে মানপত্র ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে।

২২। শ্রী রণেন্দ্রলাল চন্দ ঃ—

ত্রিপুরারাজ্যের ধর্মনগর শহরে রণেন্দ্রবাবুর জন্ম। সঙ্গীত নাটক খেলাধূলা ইত্যাদির প্রতি পরিবারের আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতার সূত্র ধরেই রণেন্দ্র চন্দ ওরফে রুণু চন্দ অভিনয় জগতে পদচারণা সুরু করেন।

ত্রিপুরাসরকারের অধীনে সামান্য চাকুরী সম্বল করে সংসার চালিয়ে বাড়তি সময়টুকু তিনি একমাত্র অপেশাদারী অভিনয় এবং তৎসংক্রান্ত ব্যাপারে কাটিয়ে দিচ্ছেন। তিনি থিয়েটার যাত্রা মিলিয়ে ত্রিশখানারও বেশী নাটকে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেন। ধর্মনগর নাট্যসংস্থার তিনি নিয়মিত অভিনেতা।

নাট্য আন্দোলনে উত্তর ত্রিপুরা ধর্মনগরের উল্লেখযোগ্য অবদান

ধর্মনগরের নাট্যচর্চ্চায় পাদ-প্রদীপলোকে যারা

অজয় রায়

বর্ত্তমান প্রতিবেদক, কৈশোরে ধর্মনগর কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে অবস্থিত নাট্যমঞ্চে অধীর আগ্রহে লক্ষ করত ড্রপসিন আঁকা মাঠ, ঘর, কতগুলো কলাগাছ, ঘরের চালে বসে একটি বাঁদর কলা খাচ্ছে। দুপাশে কাঠের ফ্রেমে কাপড় আঁটা—অঙ্কিত মকরদেহী এক তম্বী-শ্যামা, শিখরিদশনার অঙ্কন শৈলী। দেখেছিল একটি সিনে শুধু তাঁবু আঁকা আর কামান সাজান, বোধ হয় কোনো যুদ্ধ দৃশ্য প্রদর্শনের জন্য, একটি রাজ-দরবারের সিনোও ছিল। চল্লিশের দশকের প্রথমদিক। তারও প্রায় পনের বছর পূর্বে বিশের দশকের শেষ দিকে তৎকালীন নাট্যপ্রেমী ব্যক্তিত্ব হলেন ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী, ৺দ্বারিকা চক্রবর্তী, ৺বিনোদবিহারী ঘোষ, ৺মহিমচন্দ্র রায়, ৺অজয় গুপ্ত, ৺কামিনী ভট্টাচার্য, যজ্ঞেশ্বর রায় প্রমুখ। এঁরা গড়ে তুললেন একটি সংস্থা "রাধাকিশোর পাব্লিক লাইব্রেরী" নামে। বর্ত্তমানেও বিদ্যমান গৃহটি, শুনেছি ওটাই ধর্মনগর এর প্রথম মহকুমা শাসক অফিস ছিল। নাট্যব্যক্তিত্বগণ একটু অগ্রসর হয়ে গড়ে তুললেন "প্রমোদ নাট্যসমাজ"— ১৯৩০ সালে। মহড়া চলত এই ঘরেই, ঢাকা থেকে আমদানীকৃত নাটকের প্রয়োজনে সমস্ত কিছু ছিল, বড় বড় গোল গোল চারপাঁচটা হ্যাজাক লাইট, কয়েক সিন্দুক ভর্তি ঐতিহাসিক নাটকের পোষাক, টিনের তলোয়ার, নকল বন্দুক-পিস্তল, কি নয়!

মনে পড়ে 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকের মহড়া চলছে জোর কদমে, মঞ্চস্থ হলো কালীবাড়ী নাট্যমঞ্চে, মুখ্য ভূমিকায় ৺বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য—চাণক্য, ৺বিলাসভূষন চক্রবর্ত্তী, অন্ধগায়ক— ৺মন্মথ গুপ্ত, ডি এল রায়ের 'ঐ মহাসিন্ধুর ওপার হতে.....গাইতে গাইতে চাণক্যের চুরি যাওয়া কন্যা 'আত্রেয়ীর' হাত ধরে মঞ্চে প্রবেশ, চাণক্যের কাছে চুরি যাওয়া কন্যার কথা স্বীকার, নাম বলছে 'আত্তেরী'। চাণক্যের পাগলপারা অভিনয়, আধুনিক লাইটের কারসাজি নেই, নেই শব্দ প্রসারণ ব্যবস্থা (মাইক), শুধু দর্শক শ্রোতৃ-মণ্ডলীর স্তব্ধ মুখ আর ছল-ছল চোখ। অনবদ্য সৃষ্টি মাধুর্য্য। সহযোগী শ্রীবিলাস ঘোষ, শ্রীকানাই কানুনগো, কালী ব্যানার্জী, স্বপন চক্রবর্তী, হরিদাস চৌধুরী, কৃষ্ণময় ভট্টাচার্য (মনা), চিত্ত পালচৌধুরী, রসিক ভট্টাচার্য; স্ত্রী চরিত্রে পুরুষরাই অভিনয় করেছিলেন—

সর্বশ্রী মঙ্গলা দত্ত, সুবোধ ভট্টাচার্য, অমরেশ চক্রবর্তী এবং কিশোরবিজন শর্মা।

পরবর্ত্তী প্রযোজনা ১৯৪৬ সালের 'পথের শেষ'। কুশীলবরা প্রায় সবই পূর্ব উল্লেখিত, মঞ্চ—কালীবাড়ী প্রাঙ্গণ। আবহ সঙ্গীতে রামগোপাল কর্মকার, প্যারীমোহন নাথ প্রমুখ। ১৯৪৮ সালে 'গৈরিক-পতাকা', শ্রেষ্ঠাংশে মন্মথ গুপ্ত শিবাজী চরিত্রে, পিতা "শাহজী" বিলাসভূষণ, সহযোগী— বঙ্কিম ঘোষ, নিশিকান্ত চক্রবর্ত্তী, নৃপেন ঘোষ, এবং স্ত্রী চরিত্রে পূর্বোক্তরাই উল্লেখযোগ্য। 'পথের শেষে' নাটকে জমিদার দুর্গাশঙ্কর (বিলাসবাবু)-এর মোসাহেব ছিলেন শচীন্দ্র ভট্টাচার্য, তিনি খুব তামাক রসিক ছিলেন। নাটক মধ্যে নেশা ধরত তাই সুযোগ গ্রহণের জন্য নাটক বহির্ভূত কথা সংযোজন করে বলতেন— "দুর্গাশংকর, তুমি একটি গাধা, কেন মিছিমিছি পত্রের কথা চিন্তা করছ? যে নিজের ইচ্ছায় তোমার পছন্দ করা পাত্রীকে বিবাহ না করে আর একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘর বেঁধেছে! তুমি একটু ঘুমোও। প্রায় স্বগতোক্তি "আমি একটু তামাক খেয়ে আসি"। দর্শক মধ্যে প্রচণ্ড হাস্যরোল বাচনভঙ্গী ও অঙ্গভঙ্গী দেখে।

পঞ্চাশের দশকে পরিলক্ষিত হয়েছে শহর প্রান্তীয় একটি যাত্রাদল—নরোত্তম নাথের তত্বাবধানে ও প্রযোজনায় 'পদ্মপুর যাত্রাদল'; কুশীলবেরা ছিলেন করুণাময় নাথচৌধুরী (পরবর্ত্তীকালে এম. এল. এ.) নিতাই নাথ (মঞ্চে এসেই ঘন বাবরী চুলের একটা ঝাঁকুনি দেওয়া বিশেষ আকর্ষণ ছিল), কাশীনাথ—তিনি প্রায়শই উড়িষ্যাবাসী চরিত্রে অভিনয় করতেন, মঞ্চে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হাসির উদ্রেক হতো—খর্বকায়, মসীকান্তি, বিশাল শিখা, ঠোঁট দুটো সাদা. সংলাপ—'ধাইকিরি পকাই কিরি, মু বিরিঞ্চিবাবা হওছন্তি।' কাশীনাথের সঙ্গে কমিক চরিত্রের অভিনেতা রমেশ নাথ (টলা রমেশ) উল্লেখযোগ্য। পরবর্ত্তীকালে মনীন্দ্রনাথ এবং শ্রীকুটি নাথ, বিজন শর্মা এর ভারগ্রহণ করেছিলেন। এই দল প্রধানতঃ সন্নিহিত চা বাগান বা বড়লোক-বাড়ী বা কোন বিয়েবাড়ী বা অঞ্চলে বহু পূজিতা 'দেবীমনসার' পূজাঙ্গনে কখনো সৌজন্যমূলক, কখন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে অভিনয় করতেন। এ দলের আরো প্রধান আকর্ষণ ছিল রাজবাড়ীবাসী জয়দেব সিংহ এবং চন্দ্রপুরবাসী আমো দেব (লাল ডাক্তার) এর বাইদ্যা ও বাইদ্যানীর চরিত্রাভিনয়, বাইদ্যার গানের কলি—"ও বাইদ্যানী লো, "তুই আমার সঙ্গে যাইবিনি।"—"দিমু কাঁচের চুড়ি, নতুন শাড়ী, বিয়ার আসরে বইবিনি।" "ও বাইদ্যারে আমি চুড়ির লোভে যাইতাম না, প্রাণের পরশ পাইতাম না।* বাইদ্যা জয়দেবদাকে দেখতাম মঞ্চে যে কোনো কোণের বাঁশ খুটি বেয়ে কিছুটা উপরে উঠে যেতেন, খুব আনন্দ পেতাম, বাইদ্যানীর সাজ আজকের বলিউড নায়িকা কাজললতা বা মনীষা কুমারীর চেয়ে কম ছিল না। সমসাময়িক সময়ে সহপাঠী বন্ধুবর শ্রীরতি পাল অনুরূপ 'রাধাপুর যাত্রাদল'-এর কর্ণধার, পরিচালক দীর্ঘ প্রয়াসে যথেষ্ট প্রশংসাধন্য হয়েছিল। অপরদিকে শহরের উত্তর ও পূর্বপ্রান্তে যথাক্রমে রাঘনা ও থেরেং জুরিতে

দল পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্বে প্রধানতঃ শ্রীদেবেন্দ্র সিংহ, ও পি. নাথচৌধুরী, বিমল নাথ যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন, তবে আঞ্চলিকতা দুষ্ট দোষে উচ্চারণ নাট্যেৎকর্ষ ব্যাহত করত যা সাধারণ্যে ধর্তব্য ছিল না। ব্যতিক্রমী চরিত্র দেবেন্দ্র সিংহ বা শহর সন্নিহিত রাজবাড়ীর শ্রী গোপীমোহন সিংহ। তাঁর ধর্মনগর রেলকর্মী দলের হয়ে কোতল খাঁ চরিত্রাভিনয় উলেখযোগ্য। সহযোগী বি সি শীল প্রমুখ। বাজার যাত্রা পার্টির শ্রী যতীন্দ্র নাথ, শ্রী হরলাল নাথ এবং শ্রী রাধাকান্ত নাথদের 'গরীব কেন কাঁদে' একটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

পঞ্চাশের দশকে ধর্মনগরের নাট্যধারা অনেকাংশে ধরে রেখেছিলেন বি বি আই এর শিক্ষক মণ্ডলী। প্রতি গ্রীষ্মের ছুটীতে বিদ্যালয় থেকে একটি নাট্য উপস্থাপনা আজো উল্লেখযোগ্য। বিদ্যালয় মঞ্চে বর্ত্তমান প্রতিবেদক ১৯৪৭ সালে 'টাকার পূজায়' প্রধান চরিত্রে অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালে 'স্বাধীনতা জাগলো'—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উপর রচিত। চরিত্রাভিনয়ে মাষ্টার-দা সূর্য সেন পঞ্চা শর্মা, ধীরেন্দ্র দেবনাথ (পরবর্ত্তীকালে chief engineer, Govt of Tripura) লোকনাথ বল, ত্রিপুরাসেন, (টেগরা) শ্রী বিজন ভট্টাচার্য গভীর রেখাপাত করেছেন।

১৯৪৯ সালে 'আনন্দমঠ'এ মহেন্দ্রের চরিত্রে লেখক নিজে, সত্যানন্দ পঙ্কজ শর্মা, অন্যান্য চরিত্রে শ্রীললিত দেবনাথ, শ্রীঅনুকূল শর্মা, শ্রীবিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, শ্রী মনোজ গুপ্ত, দয়াব্রত গুপ্ত অভিনয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

১৯৫০ সালে 'ডাকঘর'-এ অমল চরিত্রে বিজন ভট্টাচার্য গভীর রেখাপাত করেছিলেন। লেখক হলেন দৈ-ওয়ালা। আজো সেই সুর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় নিজেরই মনে 'দৈ নেবে গো দৈ... দৈ.....।

১৯৫২ সালে 'বি বি আই স্কুল', নাটক 'সিরাজের স্বপ্ন'। সিরাজ—বিজন ভট্টাচার্য, আলীবর্দ্দী— বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, রাজবল্লভ— হরিদাস রায় প্রমুখ।

১৯৫৩ তে ধর্মনগরে অভিনীত হোল 'প্লাবন'। লেখক স্ত্রী চরিত্রে অভিনয় করেন। নায়ক বর্ধমান থেকে আগত মহকুমা ব্লকে শিল্পবিভাগে কর্মরত সওকাত আলী খান। সহযোগী— দেবদাস ব্যানার্জী, পরিমল চক্রবর্তী, শান্তি ব্যানার্জী, বিজন ভট্টাচার্য, বিজন শর্মা ও অন্যান্যরা।

১৯৫৪ সালে 'মীরকাশেম'। শ্রেষ্ঠাংশে রামকৃষ্ণ দেবনাথ, ক্ষীরোদ দেবনাথ, রমেন্দ্রমোহন দেবনাথ, সুধন ঘোষ, হারান ভট্টাচার্য, সাধন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া ডঃ পি. বি. রায় (মনিদা, পরবর্তীকালে এম. এল. এ.) সদ্য লক্ষ্ণৌ থেকে এসে "প্রমোদনাট্য সমাজ"-এর পুনর্জন্ম ঘটিয়ে নিজ দায়িত্বে পরিচালনা করলেন "কঙ্কাবতীর ঘাট" বর্তমান অজন্তা সিনেমা হলে। দলে অপর কুশীলবেরা ছিলেন রণেন্দ্রলাল চন্দ, ধীরা চন্দ, সত্যেন্দ্র চক্রবর্তী, শান্তি ব্যানার্জী, দেবদাস ব্যানার্জী। অপূর্ব

মঞ্চসজ্জা দায়িত্বে ছিলেন সমবায় দপ্তর কর্মী শ্রী অমূল্য পাল। লেখক নারী চরিত্রে কঙ্কাবতী। ডাঃ রায় নাট্যজগতে উদীয়মান তারকার মত সকলের কাছে প্রেরণা।

১৯৫৫ সালে এলো নতুন নাটক 'পথের শেষে'—নায়িকার চরিত্রে হরিনারায়ণ ভৌমিক, দলকর্মীরা পূর্বোক্ত। লেখক এবার একটি বিশেষ চরিত্রে, 'নায়েব অনাদি'। গার্লস স্কুল মঞ্চে অভিনীত হয় এই নাটক।

অনাদি চরিত্রে একটি শপথ বাক্য ছিল মনিবের উদ্দেশে। নাটকের মধ্যে হঠাৎ করে পৈতে হাতে নিয়ে সংলাপের সময় আবেগে পৈতাটা ছেঁড়ার বিশেষ ভঙ্গীতে দর্শক-করতালিতে মুখরিত হয়ে উঠল হলঘর। নিজেও বুঝতে পারিনি ঐ তাৎক্ষণিক মুহূর্তের কথা, আজো স্মৃতিতে জেগে ওঠে।

ইতিমধ্যে রামকৃষ্ণ দেবনাথের পরিচালনায় ১৯৫৩-তে শিশু নাটক "অভিমন্যুবধ" ও "বিজয় সিংহ" এবং ১৯৫৪তে বড়দল ছেলেদের নিয়ে "উৎসব ও সমাজ" পদ্মপুরে অভিনীত হয়। মেয়েদের নিয়ে অভিনয় করান রামকৃষ্ণ দেবনাথ ১৯৫৪ তে 'সীতার বনবাস'। ১৯৫৫তে 'সীতার বিবাহ', ১৯৫৮ 'লবকুশ' ১৯৫৯তে 'মাটির ঘর', ১৯৬১ এবং ১৯৮৪তে 'রাজা ও রানী', ১৯৬৫তে 'মেঘনাদ বধ', ১৯৮৩তে 'দুইবীর' এবং 'রাবণ বধ' (রচনা ডঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ), ১৯৮৬তে 'গান্ধারীর আবেদন'। কুশীলবরা ছিলেন যথাক্রমে ক্ষীরোদ দেবনাথ, প্রাণকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বৃষকেতু দেবনাথ, পরীন্দ্র শীল (মটর), অবিনাশ নাথ, যতীন্দ্র নাথ (কুটি), সুখময় নাথ (রাধাপুর) কাশীনাথ (বিরিঞ্চি খ্যাত), মনোজ গুপ্ত, শ্রীমতী জ্যোৎস্না নাথ, সুনীতি নাথ, হেমলতা নাথ, মালতীনাথ চৌধুরী, হীরা নাথ, মীরা নাথ, নীরা নাথ, মানকুমারী সিংহ, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, অনিতা ভট্টাচার্য, সবিতা ভট্টাচার্য মঞ্জুশ্রী নাথ, শ্রীমতী প্রদিতি ভট্টাচার্য, ঝর্না দে, নমিতা সিংহ, দেবারতি চক্রবর্তী, মিতালী দেবনাথ, প্রদীপ্ত দেবনাথ, পূরবী রায় (গান্ধারীর আবেদন নাটকে), রুমা, পঞ্চশ্রী, শ্রাবণী, মিনু, দোলন, মনীষা, রেখা চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৯৫৫ সালেই "বিজয় সিংহ" নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন রামকৃষ্ণ দেবনাথ, রমেন্দ্র দেবনাথ, ক্ষীরোদ নাথ, চন্দ্রধন সিংহ প্রমুখ। নাটকগুলির দায়িত্বে ছিলেন শিক্ষক সর্বশ্রী কাম্যাখ্যা রায়চৌধুরী, জ্যোতিরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী অপরাজিতা রায়। এই সময় নবম শ্রেণীতে পাঠরতা মেয়েরাও স্কুলে পড়ার সুযোগে নাট্যাভিনয় করে "গান্ধারীর আবেদন", অংশগ্রহণে গৌরী ভট্টাচার্য, দুর্যোধন, নমিতা সেন, অনিমা চৌধুরী প্রমুখ। শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য বর্তমানে গৌরী কুমার, আমেরিকা প্রবাসী। ঐ স্কুলে ইংরেজী নাটকও অভিনয় হয়। ডঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথের পরিচালনায় এবং শিক্ষক শ্রীক্ষিতীশ অধিকারী ও ডঃ অমিয় চক্রবর্তীর সহযোগিতায় "The Death Trap" ১৯৬৮ সালে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়।

পরবর্তী নাট্যাভিনয় এই একই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় 'গেটম্যান'। রচনা জ্যোতু

বন্দ্যোপাধ্যায়। ইংরেজী নাটকের মূল অভিনেতা অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। বিশ্ব বিখ্যাত সত্যজিৎ রায়ের স্নেহধন্য এই বলিষ্ঠ শিল্পীর সৃষ্টি খাসিয়া ভাষায় ডকুমেনটারি ফিল্ম 'মানিক রাইতং' রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্তির মধ্যে অমর হয়ে আছে। অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে ছিল শ্রী কল্যাণ ওয়াদেদ্দার, সন্দীপ দেবরায়, দিব্যেন্দু দত্তরায় প্রমুখ। 'গেটম্যানের' মুখ্য চরিত্রে ছিল তরুণ ভট্টাচার্য (১৯৬৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিকে ত্রিপুরায় ১ম স্থানাধিকারী)। পাগলের ভূমিকায় অরুণ ভট্টাচার্য অভিনয় করে। অন্যান্য শিল্পীরা ছিলেন সর্বশ্রী রামকৃষ্ণ দেবনাথ (নাট্যকার ও পরিচালক), প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ, ক্ষীরোদ দেবনাথ, আশুতোষ দত্ত, সুপ্রীতি ঘোষ, তপতী ঘোষ, মধুমিতা দেবনাথ, পারমিতা দেবনাথ, রাজর্ষি দেবনাথ, মেরীমিতা দেবনাথ, মিতালী দেবনাথ, পারুল দেবনাথ প্রমুখ। প্রাযোজনা শ্রীদেবীপ্রসাদ দেববর্মা এবং শ্রীহরপ্রসাদ মান্না।

১৯৫৫তেই আবার "বিজয় সিংহ"। শ্রেষ্ঠাংশে রামকৃষ্ণ দেবনাথ, রমেন্দ্র দেবনাথ, ক্ষীরোদ নাথ, চন্দ্রধন সিংহ প্রমুখ। নাটকটির দায়িত্বে ছিলেন শ্রী কামাখ্যা রায়চৌধুরী।

১৯৫৬তে ডঃ রায়ের উৎসাহে উদ্দীপনায় উদ্বুদ্ধ আমরা তাঁর সহকর্মী বন্ধুগণ (বয়সের ফারাক থাকা সত্বেও) রানীবাড়ী চা বাগানে তিনরাত্রি চুক্তি মাফিক যাত্রাপালা যথাক্রমে "মহিষাসুর বধ" "মাটির প্রেম" ও "চাঁদ সওদাগর" অভিনয় করেছিলাম। শ্রীনারায়ণ দাসের দুর্গাসাজা দেবীমূর্ত্তি আজো অনেকের স্মৃতিতে ভাস্বর, তৎসঙ্গে ভূষণ আলী, দুলুখাঁ প্রমুখের বাদ্যযন্ত্রের মনোমুগ্ধকর আবহসঙ্গীত সংযোজনা।

ধর্মনগরে প্রথম co-acting এর কৃতিত্ব অর্জন করে ১৯৫৯ সালে একদল কলেজ পড়ুয়া উচ্চ শিক্ষাধারী যুবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শিল্পনাট্য সংঘ'। নাটক বনফুলের 'রূপান্তর', BBI মঞ্চে অভিনীত হয়। শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য, অঞ্জলি ভট্টাচার্য, অনিতা ভট্টাচার্য, চিনু নাথ, ৺গিরীন্দ্রনাথ দে, অনংগ পাল, অনিমেষ ভট্টাচার্য, নৃপেন দে, প্রবীর ঘোষ, রাখাল চৌধুরী, কান্তি ব্যানার্জী, শশাংক নাথ, বিভূতি বিশ্বাস, হরিমোহন নাথ, সত্যব্রত ভট্টাচার্য, জয়ব্রত ভট্টাচার্য, ৺দেবব্রত চক্রবর্ত্তী (বাবুল), মনোজ গুপ্ত, তারাবিনোদ ভট্টাচার্য, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকুমার নাথ—এঁরা অভিনয়ে ছিলেন।

এঁরাই প্রযোজনা করলেন রামকৃষ্ণ দেবনাথের পরিচালনায় ১৯৬৩-তে তারাশঙ্করের "দ্বীপান্তর" নাটক, বি বি আই মঞ্চে এবং নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'চক্র', এই একই মঞ্চে। পশু পালন দপ্তরের ডাঃ শঙ্কর ব্যানার্জী আলোকসম্পাতে ডিমার ব্যবহার করে আলোর ব্যবহারে একটা উন্নত দিক উন্মোচন করেছিলেন। আজ হয়তো ভাববে অনেকে এটা আর কি— এটাতো জলভাত।

১৯৫৮ সালে এই দলেরই নাট্য উপস্থাপনা ডি. এন. ভি. স্কুল মঞ্চে 'ক্ষুধা' যথেষ্ট প্রশংসাধন্য হয়েছিল। ওদের (শিল্পী নাট্য সংঘ) আরো কিছু নাটক, আকাশবাণী

আগরতলা থেকে প্রচারিত হয় ঃ ১। টিয়ার স্বপ্ন (২০.১২.৮২) ২। নীলকণ্ঠ (২২.১০.৮৩) ৩। এমন ভুল নি মাইনসে করে (৮.৭.৮৪) ৪। বৃক্ষরোপণ (১৪.৭.৮৫) ৫। ফিরে চলো মাটির টানে (১৭.৭.৯৪), ৬। নিজেরে হারায়ে খুঁজি (২৫.৬.৯৫)।

১৯৬১ সাল। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব সরকারীভাবে পালনের জন্য মহকুমাশাসক শ্রী এন. এন. সেন (WBCS)-এর সভাপতিত্বে উৎসব কমিটি গঠিত হয়। শ্রীশম্ভুনাথ জোয়ারদার (পরবর্ত্তীকালে Joint Director, Education, Govt. of Tripura and P.O. (Edn) ADC) এবং বর্তমান লেখক যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। অনুষ্ঠিত হল 'রবীন্দ্র শিশুনাটক প্রতিযোগিতা'। প্রতিযোগিতা হয়েছিল বিদ্যালয় স্তরে। বি বি আই এর ছাত্র শ্রীবিভূতি বিশ্বাস 'শারোদোৎসব' নাটকে প্রথমস্থান অধিকার করেছিল। ঐ নাটকে ঠাকুর্দার ভূমিকায় শিক্ষক শ্রীবিকাশ ভট্টাচার্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। ভাল আবৃত্তিকার হিসাবে ওঁর খ্যাতি ত্রিপুরাব্যাপী।

শতবার্ষিকী কমিটির পক্ষে লেখকের পরিচালনায় "শেষরক্ষা" অভিনীত হয়। পরিচালক নিজে—গড়াই, ইন্দুমতী—শ্রীমতী বিজিতা গাঙ্গুলী এবং ডঃ পি বি রায়, শ্রী রেনু চন্দ, শ্রীমতী রমা পাল, (অধ্যাপিকা South Calcutta Girls College) শ্রীমতী স্বাগতা চক্রবর্ত্তী, শ্রীমতী ভারতী চন্দ, ডঃ পাল (SDMO ধর্মনগর হাসপাতাল), শ্রীসন্তোষ গাঙ্গুলী, (পরবর্ত্তী জীবনে IAS), ৺স্বপন চক্রবর্ত্তী বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। সম্পূর্ণ আঞ্চলিকতা দোষ দুষ্ট উচ্চারণমুক্ত একটি সাবলীল অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল বালিকা বিদ্যালয় মঞ্চে।

ঐ সময় বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীমতী নীলা ভট্টাচার্য, ছবি ভট্টাচার্য, বেবী ভট্টাচার্য ভারতী ভট্টাচার্য, এরা মিলে একটি সুন্দর নাটক প্রযোজনা করেছিল বিদ্যালয় ছাত্রীদের দিয়ে। নাটকটি পরিচালনা করেছিলেন জ্যোতিরঞ্জন ভট্টাচার্য।

১৯৬২ সালে ধর্মনগর পাব্লিক লাইব্রেরীর তৎকালীন লাইব্রেরিয়ান শ্রী ফনীভূষণ ভৌমিক শিক্ষাবিভাগ থেকে অর্থানুকুল্য লাভ করে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বর্তমান লেখকের পরিচালনায় অভিনীত হলো বিশ্ববিখ্যাত রবীন্দ্রনাটক 'বিসর্জন'। নাটকে রাজা গোবিন্দমাণিক্যর ভূমিকায় অভিনয় করলেন সুদর্শন ডঃ পি. বি. রায়। রঘুপতি—দরাজকন্ঠ রনু চন্দ, মহারানী—শ্রীমতী আভা দে, নক্ষত্র রায়—শান্তি ব্যানার্জী, অপর্ণা—ভারতী ভৌমিক এবং জয়সিংহ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন লেখক স্বয়ং। আগরতলা শিক্ষা বিভাগ থেকে সাহায্যকারী হিসাবে এলেন প্রখ্যাত মঞ্চ আলোকশিল্পী হরিপদ দাস ও নাট্যশিল্পী ৺তুলসী দত্ত। ওঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা বালিকা বিদ্যালয় মঞ্চে একটি ঝড়ের দৃশ্যে এক অনবদ্য মুহূর্ত সৃষ্টি করেছিল। জয়সিংহের দেবী ত্রিপুরেশ্বরীর পাদমূলে রঘুপতির আদেশ বিধায় রাজরক্তধারী প্রিয় শিষ্যের আত্মবলিদান, অপর্ণার আর্তকণ্ঠ, কান্না গায়ে শিহরণ জাগায়, স্মৃতি-অনুভূত স্পর্শে গর্ব অনুভব করি।

সরকারী পর্যায়ে ১৯৯০—১৯৯১ সালে নাটক প্রতিযোগিতায় 'বিসর্জন' অভিনীত হয়েছিল টাউন হলে। শ্রীবিশ্ববন্ধু সেন এর পরিচালনায় ছিলেন। জয়সিংহের ভূমিকায় শ্রীসমরজিৎ সিংহের অভিনয় অতি উচ্চাঙ্গের হয়েছিল এবং শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছিল।

১৯৬২-৬৩-তে শান্তিনিকেতনে training-এর জন্য চলে গেলাম। বিনয়ভবনের পক্ষে বিচিত্রা হলে অভিনয় করার সুযোগ এলো 'রমা' নাটকে নায়ক রমেশের ভূমিকায়। ত্রিপুরার সহপাঠীদের মধ্যে নন্দিতা সেনগুপ্তা (কর) বীণা ভট্টাচার্য, বীণাপাণি ভট্টাচার্য, মঞ্জুশ্রী রায়চৌধুরী, শীলা দত্ত, ধর্মনগরের হরগোবিন্দ দেবনাথ, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য—এঁরা সবাই কুশীলব ছিলেন। প্রায় আশিজন trainee-কেই involve করিয়েছিলেন পরিচালক অধ্যাপক ডঃ প্রবোধরাম চক্রবর্তী। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাওনা হচ্ছে রবীন্দ্রসান্নিধ্য-ধন্য কণিকা বন্দোপাধ্যায় (মোহরদি) ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক শান্তিদেব ঘোষ আমায় ব্যক্তিগত ভাবে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন। ছাত্রছাত্রীরা 'রমেশদা' বলে ডাকতো যখন Teaching Practice এর ক্লাশ হতো।

ধর্মনগরে ফিরে এলাম, ফিরে এলাম পার্বত্য ত্রিপুরার কোলে। হঠাৎ একদিন একটা আমন্ত্রণ এলো শ্রীসন্তোষকুমার বিশ্বাস, মহকুমার প্রথম superientendent of Agriculture-এর কাছ থেকে। পরিচয়ে জানলাম ওঁরা মুর্শিদাবাদের মানুষ। খুবই নাট্যমোদী; সঙ্গে Agri Extension Officer শ্রীদিলীপ চক্রবর্তী, শ্রীসুশান্ত চক্রবর্তী (SI of Police), সিদ্ধান্ত হোল নাটক করা হবে। নাটক "উল্কা"। নাট্যকার নীহাররঞ্জন গুপ্ত। মহড়া চলতে থাকল যুগ্ম পরিচালনায়। লেখক এবং শ্রী বিশ্বাস। অবশেষে মঞ্চস্থ হলো স্থানীয় 'মায়া' সিনেমা হলে। ১৯৬৩ সালের জুলাই মাসে প্রতিদিন দুইশত টাকা ভাড়া দিয়ে হল নেওয়া হল। মঞ্চ নিজেরা গড়ে নিলাম কাঠের তক্তা দিয়ে। নাটক অভিনয় হোল মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের সাহায্যার্থে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ধর্মনগরে এই প্রথম কাউন্টারে টিকিট কিনে নাটক দেখার সূচনা হলো।

মিসেস বিশ্বাস মা চরিত্রে অভিনয় করলেন। নায়িকা মিলি ভট্টাচার্য চীনা-বারের নর্তকীর ভূমিকায় ছিলেন। কিরণকুমারী সিংহ (পিতা কামিনী সিংহ) মাড়োয়াড়ীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন। চীনাম্যান চু—পে শ্রীবেনু চক্রবর্তী, শ্রী বারীন চক্রবর্তী (সন্ন্যাসী), বিকৃত দর্শন অরুণাংশু (অজয়) এর প্রতিপালক শ্রী স্বপন চক্রবর্তী, শ্রী দিলীপ চক্রবর্তী (নায়ক), শ্রী সুশান্ত চক্রবর্তী প্রমুখ দারুণ অভিনয় করেছিলেন। আবহ সঙ্গীতে আসামান্য পারদর্শী—কি বেহালা, কি বাঁশী, কি তবলা, কি হারমোনিয়ামে সমান দক্ষ—পাঞ্জাবী শিখ বোলপুর নিবাসী এবং বাংলা ভাষায় দক্ষ শ্রী গুরুচরণ সিং-এর কথা আজ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি। তিনি ছিলেন একজন Perfect gentleman এবং আবহ সঙ্গীতকার।

পরের বছর আমাদের প্রযোজনা হলো ধর্মনগর থানার কালীপূজা উপলক্ষে মুক্তমঞ্চে

'ময়ূর মহল' নাটক। নির্দেশনায় ডঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ। কুশীলবের মধ্যে নায়ক চরিত্রে লেখক নিজে। নায়িকা ইরা ভট্টাচার্য, স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী প্রভা দাস ও অন্যান্যরা। এছাড়া ছিলেন শ্রী কামাখ্যা রায়চৌধুরী, শ্রী সাধন চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ।

মাঝে দেশ মধ্যে পাক-ভারত যুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি, তাই ১৯৬৭ সালে বি বি আই মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো টিপু সুলতান। টিপু সুলতানে লেখক টিপু, রানিবেগম রুবী দেবী, হায়দার আলী রামকৃষ্ণ দেবনাথ ছিলেন। সহ-অভিনেতা ছিলেন বিভূতি বিশ্বাস, স্বপন চক্রবর্তী প্রমুখ।

১৯৬৮ তে সখের দল নিয়ে বি বি আই মঞ্চে পর পর অভিনীত হোল কয়েকটি নাটক 'বকুল স্মৃতি প্রতিযোগিতা'য়। আমাদের পক্ষে মঞ্চস্থ হলো ''লৌহকপাট''। বদরমুন্সীর ভূমিকায় শ্রীঅম্বর সেন, লেখক হলেন ফকির, কুট্টী বিবির ভূমিকায় মীরা চক্রবর্তী, দারোগা লালা বাবু, তা-ছাড়া ছিলেন প্রভা দাশ প্রমুখ। নাটকটি ১ম স্থান অধিকার করে।

এই সময় শহরের উপকণ্ঠে বিদগ্ধজন তৈরী করলেন ''রবীন্দ্র সংস্কৃতি পরিষদ''। ওদের প্রথম প্রযোজনা ১৯৬৯ সালে শ্রী মতিলাল দে পরিচালিত নাটক 'একটি শপথ'। অভিনয়াংশে ছিলেন মিন্টু চৌধুরী, রত্না দাশ, জীতেন্দ্র ভট্টাচার্য, নির্মল ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য। ওরাই প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তীর প্রভাতফেরী অনুষ্ঠান করে সঙ্গীত-নৃত্যে মাতিয়ে রাস্তায় রাস্তায়। শ্রীমতী আরতী ভট্টাচার্য এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পরে এই পথ অনুষ্ঠান মহকুমার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। পরের বছর শ্রীদিলীপ দত্তর পরিচালনায় 'আদর্শ হিন্দু হোটেল' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। অভিনয়ে ছিলেন শ্রীমতিলাল, শ্রীমতি চিনু সেন, নীলমনি দত্ত, দুলাল বিশ্বাস, জয়ন্ত পুরকায়স্থ, সুইটি ভট্টাচার্য। ঐ বছরই ওদের নাটক ''ভাঙ্গা-গড়ার খেলা''। এরপর শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাশের নৃত্য নির্দেশনা ও শ্রীমতী তপতী ভট্টাচার্যের সঙ্গীত পরিচালনায় এবং বিজন পুরকায়স্থ, সুইটি ভট্টাচার্য, পার্থ দাশ, মিতা নাগ, ঝুম ঝুম ভট্টাচার্যর অভিনয় সমৃদ্ধ 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য। ১৯৭১ এবং ১৯৭২ সালে নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা' অভিনীত হয় ধর্মনগর হরিমন্দিরে। ১৯৭৫ সালে 'লালন ফকির' অভিনীত হয়। আগের অভিনেতারা সবাই অংশগ্রহণ করেন, সেই সঙ্গে যুক্ত হন গৌরাঙ্গ দত্ত, জয়ব্রত ভট্টাচার্য, দেবেন্দ্র সিংহ, স্বাতী রায়। বিবেকের চরিত্রে অভিনয় করেন শ্রী উত্তম দাস। আবহসঙ্গীতে শ্রীপ্রমোদ দাশ। অনুষ্ঠিত হয় বি বি আই মঞ্চে এবং কৈলাশহরে।

১৯৭৬ সালে দিলীপ দত্তের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় 'চণ্ডীতলার মন্দির'। নতুন শিল্পীরা হলেন সর্বশ্রী দেবাশিস সান্যাল, বিদ্যুৎ রায়, মৃণাল কর, অঞ্জলি চক্রবর্তী, বনানী পুরকায়স্থ, ঝুমুর দেবরায়, কৃষ্ণা হালদার, রণজিৎ সিংহ, দয়াল দাশ।

১৯৭৭ সালে শ্রী দিলীপ দত্তর পরিচালনায় মঞ্চ সফল যাত্রাপালা 'কপালকুণ্ডলা' অভিনীত হয়। নায়িকা কবিতা ভট্টাচার্য; অন্যান্য চরিত্রে ডঃ রণেন্দ্র ভট্টাচার্য, বিশ্ববন্ধু সেন, শ্যামলী দেবরায় (লালী) প্রমুখ। অলোকসম্পাতে নিখিল দে, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র এবং বাঁশীতে দক্ষ বেতার শিল্পী শ্রী প্রমোদ দাশ ছিলেন আবহসঙ্গীতে। পালাটি অনুষ্ঠিত হয় গার্লস স্কুল মঞ্চে।

১৯৭৮ সালের প্রায় ঐ একই অভিনেতা-অভিনেত্রী নিয়ে অভিনীত হয় 'চাঁপাডাঙ্গার বৌ' (রচনা তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়), এবং রতনকুমার ঘোষ রচিত 'সীতাহরণ'। ১৯৮৩তে 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ' অভিনয়ে ছিলেন হীরালাল দে, অলোক দাশগুপ্ত, বিশ্ববন্ধু সেন, সমর সিং, রামজনম পাশী প্রমুখ। '৭৯ সালে গার্লস 'স্কুলে এবং পরে করিমগঞ্জে অভিনীত হয় রতন ঘোষের নাটক 'ভূমিকম্পের আগে'। সানি দে, বিকাশ ভট্টাচার্য, ভূপাল চৌধুরী এবং পূর্বোক্ত প্রায় সবাই নাটকে অংশগ্রহণ করে। পরে ওদের উদ্যোগ সফল হওয়ায় 'মন্দির থেকে মসজিদ' ও 'মীরার বঁধুয়া' যাত্রাপালা সার্থকভাবে অভিনীত হয়। ইতিমধ্যে এঁরা আঞ্চলিক ভাষায় (সিলেটি) কয়েকটি মঞ্চ সফল নাটক উপস্থাপনা করেছেন। যথাক্রমে—'নেরার বেরা' লেখক জয়ব্রত ভট্টাচার্য; তাঁর লেখা আর একটি নাটক 'শাস্তি'; মতিলাল দে রচিত 'কুনদিন আইব আগন মাস'; নাটক 'আততায়ী', 'কফন' এবং নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা। মূল অভিনেত্রী ছিলেন শর্বরী ভট্টাচার্য, দীপক কর, অজন্তা ভট্টাচার্য বিদ্যুৎ রায়, দেবাশিস সান্যাল প্রমুখ। আবহসঙ্গীতে ছিলেন প্রমোদ নাথ, আলো গৌর দেব (হেনা মাইক সার্ভিস)।

১৯৬৯ সালে সগৌরবে জন্মলাভ করে ধর্মনগর নাট্যসংস্থা। প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য 'মাইকেল মধুসূদন', প্রথম অভিনয় থানার কালীপূজা মুক্তমঞ্চে, পরে গার্লস স্কুল। শ্রেষ্ঠাংশে ছিলেন অজয় চক্রবর্তী (লেখক), শ্রীমতী মালা গুপ্তা হেনরিয়েটা; অন্যান্য ভূমিকায় কান্তি ভট্টাচার্য, ভানুমতি দত্ত (কলকাতার বেতার শিল্পী) সাথী রায়, রেভারেন্ড গোপাল ভট্টাচার্য, নৃপেন দে, শম্ভুনাথ লালা, রাজচরণ মিত্র, কমল গুপ্ত, রাম কৃষ্ণ দেবনাথ, দেবব্রত চৌধুরী, স্বপন চক্রবর্তী, রনু চন্দ, শ্যামল চৌধুরী (বেতার শিল্পী) মুরারী দেবনাথ প্রমুখ। গার্লস স্কুল মঞ্চে মাইকেল চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শ্রী অজয়কে বিশেষ সম্বর্ধনা জানান হয় এবং পুরস্কৃত করা হয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে।

১৯৭০ সালে পুণে ফিল্ম ইনসটিটিউটে পাঠরত, পরে ধর্মনগরে 'অংকুর' নাট্যসংস্থার জন্মদাতা, প্রতিভাধর গুণী দরাজকণ্ঠধারী অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, সুপ্রিয় অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য একটি পূর্ণাঙ্গ নাট্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করে গার্লস স্কুল মঞ্চে। আমাদের (TGTA) অভিনীত পার্থপ্রতিম চৌধুরীর রহস্য নাটক 'ফিঙ্গারপ্রিন্ট' শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়। ২য় হয় 'নামটি তাহার রঞ্জনা'। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা লেখক নিজে। শিল্ড প্রাপ্তির গৌরব আজো সুখস্মৃতি হয়ে গৃহে শোভা পাচ্ছে। ২য় শ্রেষ্ঠ অভিনেতা শ্রীসুব্রত

দাশগুপ্ত, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী মণিমালা ভট্টাচার্য। বিচারক মণ্ডলীতে ছিলেন সর্বশ্রী মন্মথ গুপ্ত, বঙ্কুবিহারী ভট্টাচার্য এবং অমরেশ চক্রবর্তী।

১৯৭১ সালের ২য় শ্রদ্ধার্ঘ্য, প্রশংসাধন্য 'পাগল ঠাকুর', মুখ্য ভূমিকায় শ্রীকমল মৈত্র। কি নিষ্ঠা এই চরিত্রে অভিনয় করার পূর্বদিন তিনি পালন করতেন! অভিনয়ের দিন কাটাতেন উপবাসে—শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ কৃপাধন্য, দর্শকদের প্রশংসা ও আশীর্বাদ ধন্য শ্রীমৈত্র। লেখক ভাগ্নে হৃদয়ের চরিত্রে ছিলেন, অভিনয় করে পরম তৃপ্তিলাভ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে শম্ভু নাথ, ভোলাবাবু, মুরারী দেবনাথ, দিলীপ দত্ত, সুব্রত দাশগুপ্ত প্রমুখ, এবং রূপসজ্জায় রাসবিহারী রায় (রূপম), আবহসঙ্গীতে প্রমোদ দাশ, আলোয় সুভাষ চৌধুরী। সেদিন সবার মুখে কেবল 'পাগল ঠাকুর'।

১৯৭৩ সালে নূতন পালা 'ফাঁসিরমঞ্চে ক্ষুদিরাম'। শ্রেষ্ঠাংশে লেখককে ১৮ বছরের যুবকের পাঠ করতে হয়েছিল ত্রিশোর্ধবয়সে। অন্যান্য চরিত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কমল গুপ্ত, স্বপন চক্রবর্তী। নাটকটি ধর্মনগর গার্লস স্কুল এবং আগরতলার রবীন্দ্রভবনে যথেষ্ট প্রশংসাধন্য হয়েছিল। আলোকসম্পাতে ছিলেন হরিপদ দাস, আবহসঙ্গীতে প্রমোদ দাস।

এরপর সরকারী প্রযোজনায় যুদ্ধবিরোধী একাঙ্ক-নাটক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় টাউন হলে। 'এখন মধ্যরাত' নাটকে প্রফেসর অটোহানের ভূমিকায় লেখক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। ২য় শ্রেষ্ঠ সুব্রত দাশগুপ্ত, ৩য় অশোক দাশগুপ্ত, কিন্তু শ্রেষ্ঠ নাটক উপস্থাপনার কৃতিত্ব অর্জন করে বিশ্ববন্ধু সেনের রচিত নাটক। উল্লেখ্য এই প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ শ্রী হাসিম আব্দুল হালিম পুরস্কার প্রদান করেছিলেন, মঞ্চে আসীন ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ প্রথিতযশা নাট্যকার, শিক্ষাবিদ শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা, বিখ্যাত শল্য চিকিৎসক ডাঃ রথীন্দ্র দত্ত, অধ্যাপক ডঃ মহাদেব চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপিকা ডঃ মালবিকা দাশগুপ্তা, সভানেত্রী শিশুমহলের শিল্পী সোমা রায়।

নাট্যধারা অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। অনেক নূতনের উৎসাহ উদ্দীপনায় নূতন নূতন সংস্থা গড়ে উঠতে থাকলো। এদিকে বিশ্ববন্ধু সেনের প্রত্যক্ষ উদ্যোগে "অনন্যা" নাট্যগোষ্ঠী গঠিত হোল। ওরা নিবেদন করে পর পর তিনবছর '৮৭, '৮৮, '৮৯— যাত্রা পালা 'দেবী সুলতানা, 'কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ এবং 'ধর্ম সিংহাসন'। অভিনয়াংশে ছিলেন—শ্যামলী দেব রায় (লালী), অর্জুন ত্রিবেদী, রামজনম পার্শী, অশোক দাশগুপ্ত, শুভব্রত মহাপাত্র, শ্রীমতী উমা ব্যানার্জী, সবিতা ব্যানার্জী, স্বস্তিকা পুরকায়স্থ, বিশ্ব পুরকায়স্থ, ভূপাল চৌধুরী, হরিমোহন নাথ, বিশু রায় প্রমুখ। মহকুমা ও রাজ্যভিত্তিক প্রতিযোগিতায় এই দল শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করে। শ্রী সেন স্বয়ং শ্রেষ্ঠ অভিনেতার মুকুট লাভ করার গৌরব অর্জন করেছিলেন। অপরদিকে প্রদীপালোকে এলো 'আদি

নাট্যসংস্থা'। শ্রী ভীষ্ম গুপ্তের পরিচালনায় প্রথম অর্ঘ্য "মা মাটি মানুষ"। অভিনয়াংশে ছিলেন সর্বশ্রী সুনীল দাস, বিভূতি বিশ্বাস, অনিল নাথ, সুদর্শন শ্রী বিভূ পুরকায়স্থ, স্বস্তিকা পুরকায়স্থ, পিন্টু দে প্রভৃতি। পরবর্ত্তী আকর্ষন "কৃষ্ণ সুদামা"। সুদামা চরিত্রে অভিনয় করেন পরিচালক ভীষ্ম গুপ্ত এবং কৃষ্ণের ভূমিকায় মানিক নাথ (বাবু)। উল্লেখ থাকে যে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার আগে বাবু নাথ একমাস নিরামিষভোজী থেকে নিজেকে তৈরী করেছিলেন, এই একাগ্রতা, নিষ্ঠা আজ পরিলক্ষিত হয় না। অন্যান্য ভূমিকায় পূর্বোক্ত সবাই।

লেখক তাঁর নিজের এই অভিজ্ঞতায় বলতে চান যে, নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত "মাইকেল জীবনী" প্রণিধান করে দীর্ঘদিন তাঁর বহু বিনিদ্র রজনী অনুশীলনে ভোর হয়েছে। এটা আত্ম-প্রশংসা নয়, জীবনে জীবন যোগ করার প্রয়াস। নাটক দর্শক মনে স্পন্দন (vibration) সৃষ্টি করতে না পারলে দীর্ঘস্থায়ী হয়না, হতে পারে না।

আদি নাট্য-সংস্থার পরবর্তী শ্রদ্ধার্ঘ্য মঞ্চ সফল নাটক 'নটী বিনোদিনী'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় ভীষ্ম গুপ্ত, গিরীশ—দরাজ কন্ঠশিল্পী সুনীল দাস, বিনোদিনী—স্বস্তিকা পুরকায়কস্থ।

সৃষ্টি হোল নতুন সংগঠন 'নিক্কন যাত্রা ইউনিট'-এর। এই সংগঠনে প্রযোজনা এবং পরিচালনায় ছিলেন গৌরাঙ্গ দত্ত। উপস্থাপনা—'দস্যু কন্যা ফুলনদেবী'; ফুলনদেবীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মনু চক্রবর্তী, সহযোগী শিল্পী সন্ধ্যা ধর, গৌরাঙ্গ দত্ত, হীরালাল নাথ প্রমুখ। এদের ২য় প্রযোজনা 'রাক্ষসী পৃথিবী'।

পাদপ্রদীপালোকে এলেন একদল শৃঙ্খলাসম্পন্ন নাট্যকর্মী—সর্বশ্রী কল্যান চক্রবর্তী, শুভাশিস ভট্টাচার্য, শিবব্রত পাল, বিবেকানন্দ রায়, শুভ্র রায়, প্রোজ্জ্বল পুরকায়স্থ, প্রশান্ত কর্মকার, তীর্থঙ্কর গুপ্ত, অমিতবিক্রম ভট্টাচার্য, দেবাশিস সান্যাল, অসীম মুখার্জী, অনুপম চক্রবর্তী, অনুময় চক্রবর্তী, রামচন্দ্র ত্রিবেদী, সুধীর গুপ্ত, শ্রীমতী রূপালী নাথচৌধুরী, সঞ্চিতা সাহা, সেবা ভট্টাচার্য প্রমুখ। দলের নাম "Common Platform"। মঞ্চসফল নাট্য উপস্থাপনা—"পাথরের চোখ' এবং 'মারীচ সংবাদ'। এছাড়া ওদের মুখ্য ভূমিকায় একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তোলবার জন্য আবৃত্তি, শিশুনাটক, নৃত্য, সঙ্গীত ইত্যাদির প্রতিযোগিতার আয়োজন ও নাটক নির্মানকার্য পরিচালনা তারা করতে লাগলো।

সৃষ্টি হোল 'ঝংকার সাংস্কৃতিক সংস্থা'। ১৯৮০ সালে ডঃ রামকৃষ্ণ দেবনাথ রচিত 'হকুনের ছাত্ত'—আঞ্চলিক নাটক—এলো প্রদীপালোকে গার্লস স্কুল মঞ্চে। সঙ্গে আর

একটি নাটক 'তুলে মূলে বিনাস'। পরিচালক শ্রীদেবনাথ নিজে অভিনয় করলেন 'হুকুনের ছাত্ত' এ অম্বিকা ডাক্তার-এর এক অনন্য চরিত্রে; শ্রীমতিলাল দে—কুচক্রী সুদখোর গ্রাম্য নেতা 'অম্বিকাবাবু'; শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ— বসির আলী; শ্রীক্ষীরোদ দেবনাথ সুন্দর এক ভদ্র নেতার ভূমিকায়—'সুবলবাবু'; 'চড়া'—সিদ্ধার্থ হালদার, 'ভুতু'—নির্মল ভট্টাচার্য (নমু), 'বৈরাগী' শিবপ্রসাদ ধর; লেখক অভিনয় করেন রুদ্রপ্রসাদ চরিত্রে—নাম অনুযায়ী অন্যায়ের প্রতিবাদী। মুরারী দেবনাথ, চিত্ত দেবনাথ শ্রীমতী শান্তি সিংহ, সাথী রায়, পারুল নাথ, ভূপাল নাথ, দীপক কর এবং অন্যান্য অনেকে ছিলেন বিভিন্ন ভূমিকায়। পরবর্তীকালে পরপর তিনরাত্রি রবীন্দ্রভবনে লেখককেই রুদ্রপ্রসাদ ও কলকাতাবাসী ভদ্রলোক এর ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। আগরতলাতে যে এই আঞ্চলিক নাটক এত সমাদৃত হবে ভাবতে পারা যায় নি। দর্শক প্রাবল্যের জন্য অতিরিক্ত আরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল। আগরতলা বেতারেও দুবার হুকুমের ছাত্ত প্রচার করা হয়েছিল এবং পরবর্ত্তী কালে শিলং এ State Central Library হলে নাটকটি অনুষ্ঠিত হয়। বিদগ্ধ দর্শক শ্রোতৃমণ্ডলী নাটক দেখে অভিভূত হয়েছেন। সবচেয়ে বেশী প্রশংসা পেয়েছে বাঞ্ছার চরিত্রে দীপক করের অভিনয়। ত্রিপুরা উপজাতি সম্প্রদায়ের মূর্ত প্রতীক 'বাঞ্ছা' চলনে বলনে অভিনয়ে দর্শক হৃদয় জয় করেছিল।

'ধর্মনগর নাট্যসংস্থা' অর্ঘ্য হিসাবে নিয়ে এলো প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত গায়ক-নায়ক শ্রীনৃপেন দে-কে নিয়ে 'সাধক রামপ্রসাদ'। কমল গুপ্ত, দেবব্রত চৌধুরী (সিরাজ), দেবব্রত চক্রবর্তী (মোহনলাল), ডঃ রনেন্দ্র ভট্টাচার্য (মহারাজ), কৃষ্ণচন্দ্র (লেখক), রসরাজ গোপাল ভাঁড় অধীপ চক্রবর্ত্তী, কাজী ভজন বাদল দত্ত/ভীষ্ম গুপ্ত। ভজা—সুভাষ চক্রবর্ত্তী; স্বপন চক্রবর্তী আজু গোঁসাই, রুনু চন্দ নরহরি। অন্যান্য বিভিন্ন চরিত্রে শ্রী প্রদীপ সেনগুপ্ত, জহর চক্রবর্ত্তী, রামকৃষ্ণ রায়, শ্যামল চৌধুরী। আলো—সুভাষ চৌধুরী, শিলচর। রূপসজ্জায় রাসবিহারী রায়। আবহসঙ্গীতে—প্রমোদ দাস।

স্ত্রী চরিত্রে দেবী—শ্রীমতী লিপিকা রায়/ অপর্ণা দাশ, সিদ্ধেশ্বরী—শ্রীমতী সবিতা রায় পরে শ্রীমতী প্রভা দাস। এছাড়া ঝুমুর দাশ, নূপুর দাশ, সুব্রত দাসগুপ্ত, দিলীপ দত্ত শংকর ভট্টাচার্য, প্রমুখ।

পরবর্তী নাট্যার্ঘ্য 'রমা'। নায়ক রমেশ চরিত্রে অভিনয় করেন শ্রীদেবু চৌধুরী এবং নায়িকা 'রমা'—মহুয়া চন্দ।

ইতিমধ্যে আরো একটি বলিষ্ঠ নাট্যদল সম্মুখ সারিতে নিজ ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রতিভাত হলো। নাম—'অঙ্কুর নাট্যসংস্থা'। প্রথম নাট্যার্ঘ্য 'রক্তকরবী', পরিচালক অভিনেতা অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, সহাধ্যায়ী শ্রীমতী সাথী রায়, বিশ্ব পুরকায়স্থ, স্বপন চক্রবর্তী, স্বপন চন্দ, প্রদীপ সেনগুপ্ত। এরপর প্রদীপালোকে এল নূতন অর্ঘ্য 'ফুলওয়ালী'। রচনা—

জীবন গোস্বামী, পরিচালক—অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, অভিনয়ে—সর্ব্বশ্রী সমর সিংহ, অশোক দাশগুপ্ত, স্বপন চন্দ, স্বপন চক্রবর্তী, নৃপেন দে, সাথী রায়। সত্তর দশকের শেষার্ধে স্থানীয় বিদ্যামন্দির মাঠে অস্থায়ীভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চলে সর্বপ্রথম ঘূর্ণায়মান নাট্যমঞ্চ স্থাপন করে নাট্য প্রদর্শনীর এক দুর্ধর্ষ প্রয়াস তাদের সার্থক হয়েছিল।

শ্রী বিকাশ ভট্টাচার্য ও শ্রী সত্যনারায়ণ ভৌমিক স্বল্পকালের জন্য হলেও 'ত্রিবেণী নাট্যসংস্থা'-এর যৌথ পরিচালনায় কয়েকটি নাটক উপহার দিয়েছিল, তাদের প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল—কিংস অজগর, মহাক্ষুধা।

'৮০র দশকে Syco নাট্যদল তুলে ধরেছে, 'একটি অবাস্তব গল্প', 'আকালের সন্ধানে', 'স্বরবর্ণ'। পরিচালক ছিলেন শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী। সহযোগীরা সর্বশ্রী কল্যাণ চক্রবর্তী, অরূপ দে, পার্থ শর্মা এবং শ্রীমতী রীতা ভট্টাচার্য।

'৯০ এর দশকে 'Smax' সংস্থার নাট্যার্ঘ্য আর্যভট্ট রচিত 'আতঙ্ক', সিলেটী নাটক 'আমরা পাইরাম' এবং Aids. পরিচালক ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য। অভিনয়াংশে ছিলেন গৌতম ভট্টাচার্য, মৃন্ময় নাথ, মিলন দেব, সুমিতনাথ চৌধুরী, আশিস ভট্টাচার্য, সোমা ব্যানার্জী এবং ঝিমলী দেবরায়।

'৮০র দশকের মাঝামাঝি ('৮৫—৮৬') শুরু হোল সরকারী সহায়তায় যাত্রা প্রতিযোগিতা। বিভাগীয় এবং রাজ্যস্তরে। গঠিত হয় গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী কলাকুশলী সংঘ। গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ অঙ্গীভূত সংগঠন 'যাত্রা শিল্পী সংঘ', 'লোকশিল্পী সংঘ', 'ককবরক সাহিত্য প্রসারণ সংঘ' এবং 'শিশু মহল' বর্ত্তমানে 'ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র'। ধর্মনগরেও তথ্য সংস্কৃতি-প্রচার দপ্তরের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত প্রথম বারের মত যাত্রা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করল ধর্মনগর নাট্যসংস্থার বলিষ্ঠ প্রযোজনা 'গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম'। মহকুমাতে শ্রেষ্ঠ কমল গুপ্ত, 'সিরাজ' অভিনেতা দেবব্রত চৌধুরী রাজ্যস্তরে শ্রেষ্ঠ। মহকুমাতে ২য় শ্রেষ্ঠ—রবীন্দ্রসংস্কৃতি পরিষদের 'চণ্ডীতলার মন্দির'। এরপর, পরপর তিনবার 'অনন্যা' তাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমান প্রদর্শন করেন বিভাগীয় এবং রাজ্যস্তরে।

সবিশেষ উল্লেখ্য :

ধর্মনগর নাট্যসংস্থা আমন্ত্রণ লাভ করে সালেমা ব্লক থেকে নাটক অভিনয়ের জন্য। সংস্থা 'রামপ্রসাদ', 'মা মাটি মানুষ' উপস্থাপনা করে বহু প্রশংসা কুড়োয়। কাঞ্চনপুর দশাদাতেও অনুরূপ প্রদর্শনী জনগণকে মোহিত করে।

১৯৮৩তে এলো আহ্বান নূতন উপস্থাপনায় 'কবি বিদ্যাপতি' নাট্যাভিনয়ের। স্থির হলো লেখক বিদ্যাপতির ভূমিকায় অভিনয় করবেন। শ্রীমতী সিঁহিনাথ লছমীর ভূমিকায়। অন্যান্য চরিত্রে ৺স্বপন চক্রবর্তী, সুভাষ চক্রবর্তী, ৺কমল গুপ্ত, প্রদীপ সেনগুপ্ত, শংকর ভট্টাচার্য, ভীষ্ম গুপ্ত, শ্রীমতী প্রভা দাশ, মঞ্জু ভট্টাচার্য, রেখা চক্রবর্তী। নির্দেশনায়—

শ্রীসুবল ভট্টাচার্য (সুব্রত)। আলো—হেনা মাইক সার্ভিস। রূপকার—রাসবিহারী রায়, আবহসঙ্গীত— প্রমোদ দাশ।

চৌদ্দ দেবতার বাড়ীতে আহুত হয়ে ধর্মনগর নাট্যসংস্থা মঞ্চস্থ করে 'সাধক রামপ্রসাদ'। 'মা মাটী মানুষ'। শিবঠাকুর—শ্রীদেবব্রত চৌধুরী, সাবিত্রী—শ্রীমতী নাথ, খলনায়ক—শ্রী বিজন চন্দ, লেখক উচ্চাভিলাষী ভাই-এর চরিত্রে, এছাড়া শ্রীনৃপেন দে, শ্রীঅমল চৌধুরী, সুবল—B.D.O র চরিত্রে উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় নাটক—'কবি বিদ্যাপতি'।

'জনম জনম হাম রূপ নেহারিনু,
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

লছমীর উদ্দেশ্যে বিদ্যাপতির আর্তি আজো নিজ হৃদয়তন্ত্রীতে বাজে। বিদ্যাপতির ভূমিকায় লেখক শ্রীঅজয়, অন্যান্যরা পূর্বোক্ত।

উদয়পুর টাউন হলের মঞ্চে অভিনীত হলো "সাধক রামপ্রসাদ"। এ ছাড়া কখনো কখনো মঞ্চসফল নাট্যার্ঘ্য 'গান্ধারীজননী' এবং 'মা মাটি মানুষ', 'অচল পয়সা', টাউন হলে বিপুল করতালি ধ্বনিতে সম্বর্ধিত হয়ে থাকে। নির্দেশনায় ছিলেন—শ্রীসুবল/শ্রীশংকর ভট্টাচার্য, আবহ—শ্রী উত্তম দাস, রূপকার—রূপম, আলো—হেনা মাইক সার্ভিস। উল্লেখ্য—শ্রীমতী সুতপা রায়, কবিতা দত্ত, টুসি দত্ত এরা।

রবীন্দ্রসংস্কৃতি পরিষদ অব্যাহত গতিতে নাট্যধারা বইয়ে নিয়ে চলেছে। রচনা এবং প্রযোজনায় সমান উৎসাহী। ১৯৯৬তে জয়ব্রত ভট্টাচার্যর রচনায় 'ক্রোধ' এবং 'পাকে বিপাকে' ধর্মনগর, কমলপুর এবং কৈলাশহরে অভিনীত হয়। '৯৭ এবং '৯৮তে মতিলাল দে রচিত নাটক 'বাজপাখী' ও 'মুখপাত' এবং '৯৯তে ডঃ কাননবিহারী গোস্বামীর নাটক 'ঝড়ের রাতে' ঝড় তুলতে সমর্থ হয়েছে।

ধর্মনগর নাট্যসংস্থার নাট্যার্ঘ্য "অচলপয়সা" মহকুমা ভিত্তিক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করে এবং রাজ্যস্তরে দশটি পুরস্কারধন্য হয়। স্ত্রী চরিত্রে শ্রীমতী কবিতা দত্ত রাজ্যভিত্তিক শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর সম্মান লাভ করেন। '৯৮-'৯৯ সালে অসিত স্মৃতি পাঠাগার (রবীন্দ্রসংস্কৃতি পরিষদ) বিভাগীয় স্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে 'নটীবিনোদিনী' নাটক নিয়ে এবং সাক্রমে অনুষ্ঠিত রাজ্যস্তরে প্রথম দল হিসাবে পুরস্কৃত হয়। শ্রী বিদ্যুৎ রায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মানলাভ করে। ২০০০ সালে বিভাগীয় স্তরে যাত্রা প্রতিযোগিতায় ধর্মনগর নাট্যসংস্থা (উপস্থাপনা 'কলির চাণক্য') শ্রেষ্ঠদল এবং বিমল চন্দ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা, ২য় শ্রেষ্ঠ গায়ক সুভাষ চক্রবর্তী, শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী কবিতা দত্ত নির্বাচিত হন।

রাজ্যস্তরে কমলপুর দল শ্রেষ্ঠত্বের গৌরব অর্জন করে—অমরপুরে রাজ্যস্তর প্রতিযোগিতায়।

উল্লেখ্য ধর্মনগরে ইতিপূর্বে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছে। (১) TCCE থেকে 'চাবুক' চিত্ত গোস্বামীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। সহ অভিনেতারা ছিলেন—দেবব্রত চৌধুরী রঞ্জিৎ ভট্টাচার্য, সুব্রত দাশগুপ্ত, বরেন রায়, সুনির্মল সোম, সুদীপ ভট্টাচার্য এবং অন্যান্য।

শ্রীবিশ্ববন্ধু সেন কর্তৃক 'ডাইনোসোরাস' এবং কল্যাণ চক্রবর্তীর পরিচালনায় 'লাস বিপনি' ইত্যাদি প্রযোজিত হয়। 'পঞ্চম বৈদিক নাট্য সংস্থা বেশ কিছু সময়োপযোগী বলিষ্ঠ নাটক নাট্য প্রতিযোগিতায় উপস্থাপনা করেছে। Classics নাট্য গোষ্ঠীও উপযুক্তভাবে প্রয়াসী অনির্বান চক্রবর্তী, অরিন্দম ভট্টাচার্যদের নিয়ে। ওদের মধ্যে যথেষ্ট সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়। নাট্যকার হিসাবে শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা, শ্রীনবেন্দু ভট্টাচার্য, শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন, শ্রী মতিলাল দে, শ্রীযতীশ ভট্টাচার্য, শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী এবং নতুন নাট্যকার শ্রীহৃষিকেশ নাথ, শ্রী দীপঙ্কর গুপ্ত, শ্রী রঞ্জিৎ পুরকায়স্থ, শ্রীমিলন দেব, শ্রীদীপ্তেন্দু নাগ উল্লেখ্য। এঁদের অনেকেই আবার দক্ষ পরিচালক। আগামী প্রজন্ম ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

বিদ্রঃ সূত্রধার হিসাবে যাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ —

১। শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দেবনাথ। অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক, পদ্মপুর, ধর্মনগর।

২। শ্রীমতিলাল দে প্রখ্যাত নাট্যকার, কাছাড়-ত্রিপুরার নাট্য যোগসূত্রকার, চন্দ্রপুর।

৩। শ্রীদীপঙ্কর কর (দীপক) নাট্যশিল্পী, জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার 'পূর্তবিভাগ' ত্রিপুরা সরকার।

৪। শ্রীমতী ভক্তি নাথ—শিক্ষিকা, পদ্মপুর ধর্মনগর।

নাট্য আন্দোলনে খোয়াই

খোয়াইয়ে নাট্যচর্চা ।। সঞ্জয় কর

খোয়াই শহরের পুরানবাজার, যার নাম মহারাজগঞ্জবাজার, এর কাছেই হরিমন্দির। হরিমন্দিরের গা ঘেঁষেই টিনের চালা আর বাঁশের বেড়ার তৈরী টাউন হল। পুরনো টাউন হল। ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছি এ টাউনহল; শুনে আসছি স্বাধীনতার সমবয়সী এটি। বড়দের মুখে শুনেছি, স্বাধীনতার পরবর্ত্তী সময়ে এখানকার নাট্যচর্চা সম্পূর্ণই ছিল কলকাতা প্রভাবিত এবং তা পৌরাণিক নাটক। শান্তি সিংহ, দেবেশপ্রসাদ চক্রবর্তী, বঙ্কু সেন, কামদা সেন, সনৎ দে, জীবন চক্রবর্তী, কালী চক্রবর্তী প্রমুখরা সেকালে নাট্যাভিনয়ে অগ্রণী ছিলেন। এঁদের পরে মিন্টু চৌধুরী, কাজল সিংহ, রেখা সরকার, করুণাময় সেন, তুলসী দত্ত, তুলসী দে, সুপ্তি ঘোষ, বিজন ভৌমিক, নীরেন ঘোষরায়, চিন্ময় ভট্টাচার্য প্রথম আর্বিভাবে পুরনো ছকেই চলছিলেন। কিন্তু এঁদের সময় থেকে অর্থাৎ ছয়ের দশকের শেষে এবং সাতের দশকে নতুনত্ব যা ছিল তা হলো নারী চরিত্রে নারীরাই অভিনয় করতেন। নাট্যদল বা গ্রুপ তখনও সেভাবে গড়ে ওঠেনি, বাৎসরিক নানা পূজোপার্বনকে কেন্দ্র করে টাউন হলে হতো এসব নাট্যাভিনয়। টিকিটের মূল্য ছিল ২৪ পয়সা।

রক্তকরবীতে রাজার ভূমিকায় সঞ্জয় কর

খোয়াইএর নাটকে আধুনিকতার যুগ শুরু হয় সাতের দশকের একেবারে শেষ লগ্নে। 'কসমিক' ক্লাবের ব্যানারে এ যাত্রা শুরু হয়। সম্ভবত ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলো শুধু নাটকের জন্যেই খোয়াইতে প্রথম নাট্যদল 'সারথি'। যদিও সারথির যাত্রা শুরু হয়েছিল পৌরাণিক নাটক দিয়েই—নীরেন ঘোষের রচনা ও নির্দেশনায় 'মহিষাসুর-মর্দিনী'। ১৯৮০ সাল খোয়াই এর নাট্য চর্চ্চার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৎসর হয়ে আছে। এ বছরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'কালচারাল ক্যামপেন' ও 'নাট্যসংসদ'। একেবারে তরুণরা গড়ে তোলেন প্রথম নাট্যদলটি এবং দ্বিতীয় দলটি গঠিত হয় অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞদের নিয়ে। একই সঙ্গে কালচারাল ক্যাম্পেনের নানা পরীক্ষামূলক নাটক ও দুর্দমনীয় গতি অন্যদিকে 'নাট্যসংসদ' এর নতুন ভাবনা ও সংযত পদক্ষেপ খোয়াইকে ত্রিপুরার

নাটকের রাজধানীতে পরিণত করল। ' ৮০ সালের আগষ্ট মাসে দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে 'কালচারাল ক্যাম্পেন' এর প্রযোজনা 'চিতাভস্ম' আজ ইতিহাস। এ নাটকের অভিনয় শেষেই মঞ্চের বিদ্যুৎ কানেকশান খুলতে গিয়ে অভিনেতা শেখর ভট্টাচার্য প্রাণ হারালেন। বন্ধু হারানোর শোক নতুন সৃষ্টির 'উৎসবে' পরিণত হল।

খোয়াই-এর নাটকের একটি দৃশ্য

১৯৮১ সাল থেকে শুরু হলো ত্রিপুরার প্রথম বেসরকারী নাট্য প্রতিযোগিতা। গত কুড়িটি বছর ধরে নিয়মিত ভাবে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতা সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অন্যতম নাট্যকর্মকাণ্ড হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সময় থেকেই ত্রিপুরায় স্থানীয় নাটক নিয়ে কাজ করার উদ্যোগ নিল কালচারাল ক্যাম্পেন। খোয়াইয়ের কবি কমল রায়চৌধুরী লিখলেন ত্রিপুরার ইতিহাসে তিন কৃষক রমনীর আত্মত্যাগের কাহিনী নিয়ে নাটক 'দেবো না তিতুন'। নাটকটি আমার নির্দেশনায় হওয়ায় এটির প্রশংসা করতে আমি কুণ্ঠা বোধ করি। তবু বলবো, কাহিনী, উপস্থাপনা রীতি ও প্রয়োগ কৌশলের অভিনবত্বে ও ত্রিপুরার নিজস্বতায় সমৃদ্ধ এ নাটকই প্রথম রাজ্যের বাইরে গিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের নাট্য চর্চা সম্পর্কে সম্ভ্রম আদায় করেছে। ১৯৮৫ সাল থেকে ৮৯ সাল পর্যন্ত 'দেবো না তিতুন' তিনটি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কলকাতাতেই অভিনীত হয়েছে। রাজ্যের ভেতরেও প্রায় ছ'বছর ধরে নাটকটি বহুবার অভিনীত হয়েছে। এছাড়া কালচারাল ক্যাম্পেনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা হল 'জগন্নাথ', ব্রেখটের 'সমাধান', চন্দন সেনগুপ্তর 'সাদা পায়রার জন্য' (পূর্ণাঙ্গ), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রক্ত করবী' চন্দন বাবুরই লেখা 'প্রসঙ্গ হরধনু'। সবগুলিই হয়েছে আমার নির্দেশনায়। খোয়াইয়ের আর একজন কৃতি নাট্যকার যিনি বাংলা নাটকের ভাণ্ডারকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করেছেন—চন্দন সেনগুপ্ত 'সাদা পায়রার জন্য' লিখেই প্রথম আলোড়িত করেছিলেন সমগ্র নাট্যাঙ্গনকে। এরপর থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত (১৯৯৬) তিনিই ছিলেন ত্রিপুরার সবচেয়ে ব্যস্ত নাট্যকার।
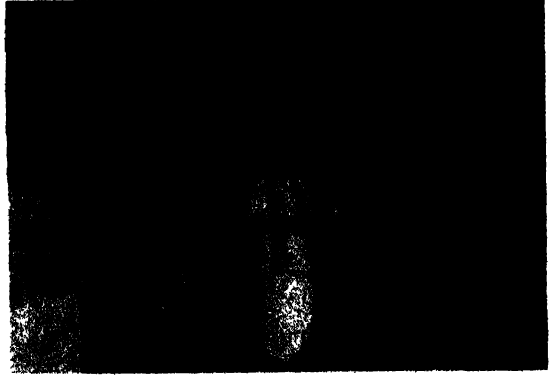
'নাট্যসংসদ'র প্রযোজনাগুলিও হীরেন্দ্র সিন্‌হার সুনিপুণ নির্দেশনায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'জিওদানো ব্রুনো', 'আলীবাবা পাঁচালী', 'বাবা বদল', 'সাদা পায়রার জন্য'

একাঙ্ক নাটকের পাশাপাশি তাঁদের অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা 'অন্য পৃথিবী'। এই নাটক নাট্য সংসদকে শিলচরে আয়োজিত সর্বভারতীয় নাট্য প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা ও শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের পুরস্কার এনে দিয়েছিল। হীরেন্দ্র সিন্‌হার রচিত এবং নির্দেশিত 'নাট্যসংসদ' এর দুটি বর্তমান প্রযোজনা 'অপহৃতের ডাইরী' ও 'রাজেন্দ্র ঢাকীর গল্প' ত্রিপুরার সাম্প্রতিক নাট্যচর্চ্চার অন্যতম নিদর্শন। এই দুটি সংস্থার পাশাপাশি 'সারথি' সংস্থাও অভিনয় চালিয়ে যায় প্রায় নিয়মিতই। সারথি প্রযোজিত সমীর রায় নির্দেশিত 'দলিল' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে 'কুশীলব', 'শুভম', 'সুকান্ত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' প্রভৃতি নাট্যদল সক্রিয়। এই সময় এক ঝাঁক প্রতিভাবান অভিনেতা অভিনেত্রী উঠে আসে খোয়াইয়ের মঞ্চ থেকে। কয়েকজন অভিনেত্রী—নন্দা চৌধুরী, তপতী ঘোষ, সুপ্রীতি ঘোষ, সুপ্রিয়া চৌধুরী, লিখা বিশ্বাস ত্রিপুরার মঞ্চ নাটককে তাঁদের অভিনয়ে আলোকিত করেন। অভিনেতাদের মধ্যে অভীকপ্রসাদ চক্রবর্তী, বিভূ ভট্টাচার্য, সমীর রায়, পুলক ভট্টাচার্য, হরিপদ সিন্‌হা, মনোরঞ্জন দাস, অনুপম ভট্টাচার্য, সুখেন্দুবিকাশ দে, মানিক পাল, অমিতাভ ভট্টাচার্য, রাজীব ভট্টাচার্য, ইন্দুমাধব চক্রবর্তী, বিশ্বজিৎ দত্ত, বিক্রম দাস, রাণা চৌধুরী, অরুণ পাল, রতন দাস, পরেশ সূত্রধর, দেবাশিস সরকার, জীবন দাস, অরূপ চৌধুরী, শংকর ভট্টাচার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নাটকের সার্বিক ক্ষেত্রেই চিন্তাশীল মননের ছাপ পড়তে দেখা যায়। আলোক পরিকল্পনায় তপন দত্ত, মাণিক বণিক, অঞ্জন চক্রবর্তী, দুলাল দাস নানা সার্থক প্রযোজনার অংশীদার। মঞ্চ ও রূপসজ্জায় তাপস রায়, অমল নাথ শর্মা, সুবোধ চৌধুরী, নান্টু সরকার, তাঁদের কাজের কুশলতা প্রমাণ করেছেন। খোয়াইয়ের নাটকে সবচেয়ে ইতিবাচক দিক হলো নাট্যদলগুলোর কিশোর বাহিনী—যা খোয়াইয়ের নাট্যচর্চ্চার ভবিষ্যৎকে বাঁচিয়ে রাখবে।

ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার
স্রষ্টা শ্রী হরিপদ দাস এক বিরল প্রতিভা

শক্তি হালদার

অনেকদিনের বন্ধুত্ব আমাদের, সেই ১৯৫৫ সাল থেকে। গেঁদুমিঞার বাড়ীটা সরকার কিনে নিল। ওখানে শুরু হলো সর্বপ্রথম শিক্ষা অধিকারের অফিস। প্রথম শিক্ষাঅধিকর্ত্তা জে. সি. দাশগুপ্ত। জ্ঞানীগুণী অমায়িক সজ্জন ব্যক্তি। আমি তখন প্রথম চাকরীতে ঢুকেছি। ডিরেক্টরের পিছনে পার্টিশান দেওয়া একটি লম্বা ঘরে আমার ছবি আঁকার স্টুডিও। শিশুবিহারের উদ্বোধন হবে, অবনঠাকুরের বুড়ো আঙলা থেকে ছবি আঁকছি। এই ছবি দিয়ে শিশুবিহার সাজান হবে। শিশুবিহার প্রথম শুরু হয়েছিল অনুরূপা মুখার্জীর বাড়ী জগন্নাথ মন্দিরের পাশে। বাড়ীটা সম্ভবত সরকার কিনে নিয়েছিল, ঠিক মনে নেই।

হরিপদ দাস

হরিপদবাবু প্রায় কাজের ফাঁকে আমার স্টুডিও রুমে এসে ছবি আঁকা দেখতেন, গল্প করতেন। এই বিল্ডিংএর মাঝখানে একটু ফাঁকা জায়গা, তারপর পাকা টিনের চালের একটি বড় ঘর। এই ঘর জুড়ে হরিপদবাবুর অফিস, সিনেমা, মাইক আর পুতুল নাচ। সবের দেখাশুনার ভার হরিপদবাবুর। আমিও কাজের ফাঁকে ওঁর ঘরে গিয়ে বসতাম। কখন টেপমেসিন, কখন মাইক, কখন প্রজেকটার নিয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন। ধীরে ধীরে সম্পর্কের গভীরতা বাড়ল, নাটকে আলো দেওয়ার জন্য অনুরোধও বাড়তে থাকলো। লোকশিল্পী সংসদের জন্ম হয়েছে, বেশীরভাগ সদস্য শিক্ষা বিভাগের। হরিপদবাবু ধীরে ধীরে নাটকে আলো নিয়ে ভাবতে লাগলেন কারণ তখন আমরা মটরগাড়ীর হেড লাইট দিয়ে কাজ চালাচ্ছি। সেই ভাবনার শুরু, তারপর নাটকের আলো মানে হরিপদ দাস। আলো নয়, গভীর ভাবনা ও চিন্তার প্রকাশ।

রূপারোপের কার্যকরী সমিতির সদস্য হরিপদবাবু। রূপারোপ নতুন নতুন নাটক করছে, হরিপদবাবু চুটিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'দুইরাত্রি' নাটকে ট্রেনের জানলা দিয়ে স্টেশনের উপর আলো ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে, সেই effect দেখাবার জন্য কি প্রচণ্ড ভাঙ্গাগড়ার চেষ্টা! কি অসীম ধৈর্য্য! তারপর এই দৃশ্যে হলের উপছেপড়া দর্শকদের কি দারুণ উত্তেজনা— হরিপদবাবুকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছে। রতনকুমার ঘোষের

'ভোরের মিছিল' নাটকে আমার ইচ্ছে ছিল স্টেজের পতাকা নিয়ে এগিয়ে-যাওয়া মিছিলের সঙ্গে পিছনে সাদা পর্দায় প্রোজেকশন দিয়ে হাজার জনতার মিছিল গতিশীল করতে হবে। প্রথমেই হবে না বলে-ও কাজে নেমে গেলেন। তারপর ... সারা হলে হাততালি। আর দুর্মুখরা বলতে লাগলো ২২ রীলের হিন্দি ছবির পরীক্ষা-নিরীক্ষা। বহু সুযোগ সৃষ্টি করেছে রূপারোপ। তাঁর ছিল সৃজনী প্রতিভা, সেই প্রতিভা তাঁকে নিয়ে এলো পুতুল নাচে। তিনি ছিলেন সমাজশিক্ষা বিভাগে, এখানে একটি ছোট্ট পুতুল নাচ শাখা ছিল। গ্রামের পুতুল নাচ নাচিয়ে গাইয়েদের দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল হরিপদবাবুর। এই পুতুলগুলোকে একটু উন্নত ধরণের করার প্রয়োজনে নিজে পুতুল করে উন্নত প্রযোজনা করলেন হরিপদবাবু। আমরা সবাই তখন তাঁর সঙ্গে। সৃষ্টি হোল লবকুশ' পালা পুতুল নাচ। সেই পরিবর্তনের সূচনা। সৃষ্টি হলো 'ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার'। এ একান্ত একার গবেষণা হরিপদর। সহযোগী সবাই, ত্রিপুরার সংস্কৃতিমনা প্রত্যেকে।

১৯৭৪ সাল। রূপারোপ ভাঙ্গাগড়ার খেলায় মত্ত। এবং ধীরে ধীরে ভেঙে গেল। সারা জীবনে এই একটিমাত্র দলে তিনি সক্রিয় সদস্য ছিলেন, তাই আঘাতটা তাঁর ভীষণ। আর নাট্য সংগঠন নয়, এবার নিজের বিষয়, নিজের সংগঠন 'ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার' জন্ম নিল এই বছরে। রূপারোপের ব্যানারে পরিবেশিত হলো কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর 'একটি মোরগের কাহিনী' অবলম্বনে 'পুতুল নাচ' ৩রা ও ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ তে রবীন্দ্রভবনে। পুতুল গড়ে তুললেন ননী ব্যানার্জী, তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করলেন রাজকুমার সূত্রধর এবং বাসনা অধিকারী। আবৃত্তি করলেন স্বপন নন্দী। সঙ্গীতে ছিলেন শিবপ্রসাদ ধর, আবহসঙ্গীত পরিচালনা করেন গোপাল রায়। রূপশিল্পী ছিলেন ফনীভূষণ চক্রবর্ত্তী, যাদব সাহা, গৌরী দাশগুপ্তা, চিত্ত পাল, প্রদীপ দাস, রবি দে, প্রণব কর, মনোরঞ্জন দে, পল্লব বর্মন, নরেশ পোদ্দার।

Directory of Cultural Organisation of India তে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটর রেজিষ্ট্রি ভূক্ত হয়ে গেল। নথি নং 491, নথিভূক্ত হয়েছিল Indian Council for Cultural Relations, New Delhi থেকে। সংস্থার সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী লীলা দাশগুপ্তা, ডিরেক্টর হরিপদ দাস, স্টাফ ১১জন, সদস্য ২৫ জন।

ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার ১৯৮৭র মার্চ মাসের ১৫ তারিখে ICCR এবং UNIMA, INDIA দ্বারা সংগঠিত দিল্লীতে অনুষ্ঠিত International Puppet Festival এ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

এরা সঙ্গীত নাটক একাডেমী থেকে এই অনুষ্ঠানে John Henry পুতুল নাচটির রেকর্ডিং এর Documentation fee হিসাবে ২০০০ টাকা অনুদান পায়।

এছাড়া কলকাতায় অনুষ্ঠিত পুতুল নাচের কর্মশিবিরেও অংশগ্রহণ করে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার।

সঙ্গীতনাটক একাডেমীর উদ্যোগে ও আসাম সরকারের সহযোগিতায় ১৯৯৪-র ২৯শে মার্চ থেকে ২রা এপ্রিল পর্যন্ত গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় পুতুলনাচ (ম্যারিওনেট) উৎসব ও কর্মশালায় ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার অংশগ্রহণ করে। উৎসবে আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, কর্নাটক, কেরালা, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান সহ মোট নয়টি রাজ্য তাদের দল নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল।

সেখানে বিশেষজ্ঞ হিসাবে ছিলেন সঙ্গীত নাটক একাডেমীর সচিব শ্রীমতী উষা মালিক, উপসচিব বি. আর. ভার্গব, দাদী পাদুমজী, কমল কোঠারী, সুরেশ দত্ত, জি. ডেনু, ডঃ বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ডি. এন. পট্টনায়ক প্রমুখ।

কর্মশালায় প্রতিদিন প্রতিটি দলের পরিচালকরা নিজ নিজ রাজ্যের পুতুল নাচের উৎপত্তি, বিবর্তন, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যার উপর বক্তব্য রাখেন এবং প্রত্যেক রাজ্যের নিজ নিজ ঘরানার কারিগরি ও বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের মাধ্যমে কারিগরী আদান-প্রদান হয়— যা ছিল খুবই আকর্ষনীয়। ত্রিপুরা দলের পরিচালক হিসেবে হরিপদ দাস বক্তব্য রাখেন ১লা এপ্রিল ১৯৯৪। উল্লেখ্য সঙ্গীত নাটক একাডেমীর আমন্ত্রণে 'ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার'-এর নয় সদস্য বিশিষ্ট একটি দল তাতে যোগদান করে। অংশ গ্রহণকারী শিল্পীরা হলেন প্রদীপ দাশ, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য, প্রভাতাংশু দাশ, ফনীভূষণ চক্রবর্তী, অমিয় দে, বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী, দীপক দত্ত, সত্য রায় ও পরিচালক হরিপদ দাস।

গৌহাটির বিভিন্ন স্থানে পুতুল নাচের এই উৎসবে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার অংশগ্রহণ করে মোট চারটি অনুষ্ঠানে। ৩০শে মার্চ পাণ্ডুতে, ৩১শে মার্চ কুমার ভাস্কর নাট্যমন্দির, ১লা এপ্রিল প্রাগজ্যোতিষপুর কলা পরিষদে।

গৌহাটির বিভিন্ন স্থানে ও সাতটি বিভিন্ন মঞ্চে প্রতিদিন বিভিন্ন দলের পুতুল নাচের অনুষ্ঠানে দর্শক সমাগম ছিল উল্লেখনীয়। সেই সঙ্গে গৌহাটি রবীন্দ্রভবনে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধরণের পুতুলের একটি প্রদর্শনীও ছিল।

এরকম জাতীয় পুতুলনাচ (ম্যারিওনেট) উৎসব ও কর্মশালা প্রথম ১৯৮৫ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯০ সালে দ্বিতীয়বার ব্যাঙ্গালোরে ও ১৯৯৪ এ তৃতীয়বার গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত হলো।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রত্যেক রাজ্যের প্রত্যেক দলের বক্তব্যে দেখা যায় যে, তাদের প্রধান সমস্যা ও বাধা হলো আর্থিক প্রতিকূলতা যার ফলে প্রাচীনতম এই লোকসংস্কৃতিটি ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এক কর্মশিবিরে বেঙ্গল সোস্যাল লীগ ভবনে এক মনোজ্ঞ আলোচনা হয়েছিল : পুতুলরা নিছক যে পুতুল নয়, তাদেরও সাজসজ্জা আছে, ভদ্রতাবোধ এবং শিষ্টাচারের রীতিনীতি আছে, দেশি-বিদেশী রুচির রকমফের আছে অর্থাৎ মানুষের অভ্যাস ও ছায়া

নিয়ে প্রতিটি পুতুল জন্মায়। সেইজন্যে পুতুলের নাচে ও নাটকে মানুষের ইচ্ছে অনিচ্ছের ছায়া পড়ে। আলো ও আবহসঙ্গীতের দরকার হয়।

এই আলোচনা সভা বা সেমিনারের উদ্যোক্তা ছিলেন রাজ্য উপকরণ কেন্দ্র, বয়স্কশিক্ষণ ও সোস্যাল সার্ভিস লীগ। চারদিন ধরে বয়স্ক শিক্ষণ সম্পর্কিত এক শিবিরের একটি অঙ্গ এটি। শিবিরের উদ্বোধন করেন সত্যেন মৈত্র। স্বাগতভাষণ দেন প্রখ্যাত চিত্রকর বিজন চৌধুরী।

চিত্র ভাস্কর্য এবং পুতুলনাট্য জগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আলোচনায় যোগ দেন। যেমন অমরেন্দ্রলাল চৌধুরী, মাধব ভট্টাচার্য, ভগবানদাস গাঙ্গুলি, সুশান্ত হালদার এবং চিত্ত দে।

হরিপদ দাসের চিন্তা ভাবনার একটি ফসল পুতুল নাটক 'জন হেনরী'। আমেরিকার রেলপথের ধারে বসবাসকারী এক নিগ্রো শ্রমিকের করুণ কাহিনী এই 'জন হেনরী' নাটকের মূল বিষয়। অতৃপ্ত মুনাফার লোভে যন্ত্র সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ফলে বহু শ্রমজীবী কালো মানুষ নির্দয়ভাবে ছাঁটাই হয়ে যায়। ক্ষুধা দারিদ্র্য এবং হতাশাকে তুচ্ছ করে জন হেনরী তাঁর সতীর্থদের সংগঠিত করে যন্ত্রসভ্যতার মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন। বেঁচে থাকার জন্যে মানুষ দিনরাত পরিশ্রম চালিয়ে যায়। যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের সহায়তার জন্যেই, কিন্তু ধ্বংস করার জন্য নয়। পুতুল নাচের মাধ্যমে এই সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে।

জন হেনরী হরিপদ দাসের একটি সমৃদ্ধ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা রূপ দিয়েছেন পুতুল গড়ে হরিপদবাবুর যোগ্য পুত্র প্রভাতাংশু দাস। পুতুল সঞ্চালনে ছিলেন অমিয় দে, যাদব সাহা, প্রভীতাংশু দাস, প্রণব কর, বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী, দীপক দত্ত, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য, ফনীভূষণ চক্রবর্তী, প্রদীপ দাস, নরেশ পোদ্দার, গৌরী দাশগুপ্তা, মনীন্দ্র দাস, লীলা দাশগুপ্তা। নেপথ্য সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন শিবপ্রসাদ ধর, শুভ্রাংশু চক্রবর্তী, রূপা সেনগুপ্তা। নেপথ্য কণ্ঠে আশিস মোদক, উত্তম চক্রবর্তী, শেখর দত্ত, দিলীপ পাল, রঞ্জিতা দে, ঝুনু মজুমদার ও রূপা সেনগুপ্ত। জন হেনরী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে উচ্চপ্রশংসিত হয়।

১৯৯৫ সালের ১৪ই আগষ্ট ত্রিপুরার তথ্যসংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর আয়োজিত সুকান্ত জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার আর একটি চমকপ্রদ প্রযোজনা করে 'রানার'। রানার পরিকল্পনার মধ্যে আরো নতুনত্ব নিয়ে আসেন তিনি, সেই সঙ্গে পুতুলের উন্নত কারিগরি। উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কম মুন্সিয়ানা ছিল না। অপূর্ব মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল প্রখ্যাত শিল্পী রূপেন চক্রবর্তীর। কণ্ঠসঙ্গীতে শিবপ্রসাদ ধর, ধারাপাঠে আশিস মোদক এবং তপশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। শব্দগ্রহণে প্রভাতাংশু দাস এবং পুতুল সঞ্চালক ছিলেন প্রদীপ দাস, অমিয় দে, প্রভীতাংশু দাস, দীপক দত্ত, সত্য রায়, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য।

দৈনিক জনপদ লিখছে ঃ বাংলা কাব্যধারায় সুকান্ত ভট্টাচার্য অন্যধারায় কাব্যকৃতির জন্য সুখ্যাত এবং অনন্য। কবিতাকে তিনি শুধু রসাস্বাদনের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ না রেখে তার মধ্যে সঞ্চার করেছিলেন 'কঠোর কঠিন গদ্যের' জীবনবোধ। এই স্বকীয় ও অনন্য জীবনবোধের জন্য একুশ বছর বয়সী কবিকে প্রতিবছরই আমরা স্মরণ করি।

প্রতিবছরের মত এ বছরও তাঁকে আমরা স্মরণ করেছি দু-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এবারের সুকান্ত জয়ন্তীর অনুষ্ঠান কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা অর্জন করে আমাদের মনোযোগ দাবী করেছে। সর্ব প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটারের পুতুলনাচ 'রানার'। সুকান্তের এই বিখ্যাত কবিতাটি নিয়ে নাচ-গান এর আগে বহু হয়েছে। কিন্তু পুতুল নাচে রানারের উপস্থাপনা অভিনবত্বের দাবী করতে পারে। হরিপদ দাসের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় রানার সুকান্ত-জয়ন্তীর উদ্‌যাপনের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানকে এক অন্যমাত্রা দিয়েছিল। মঞ্চসজ্জা, শব্দ, আলো সব মিলিয়ে ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রানার এক প্রথম শ্রেণীর উপস্থাপনা। যে নিষ্ঠা, শ্রম ও আন্তরিকতা এই উপস্থাপনাকেএমন উচ্চ পর্যায়ের মনোগ্রাহিতায় পৌছে দিয়েছে তাকে আমরা আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

সমাজ সেবার উপর রচিত পুতুল নাচের পালা 'পরিবর্তন' হরিপদবাবুর এক অক্ষয় কীর্ত্তি। পালাটির মূল রচনা ছিল কলকাতার সুরেশ দত্তর।

পরিবর্তন গল্পটিতে গ্রাম্যজীবনের নিরক্ষরতা, নেশা ও বাল্যবিবাহের কু-ফল বিষয়ে বলা হয়েছে। একজন গ্রাম্যলোক তার দৈনিক উপার্জন মদ খেয়েই শেষ করে দিত। তার বউ ঝুড়ি বানিয়ে তা বিক্রি করে বহু কষ্টে সংসার চালাত। তাদের দুটি সন্তান। মেয়েটির বয়স ১০ বছর এবং ছেলেটির বয়স ৮ মাস । বউটি আবার সন্তান সম্ভবা। কিছু টাকার পরিবর্তে লোকটি তার ছোট মেয়েটিকে এক লম্পটের সাথে বিয়ে দেওয়ার জেদ ধরে। কিন্তু মেয়েটি পড়াশুনা করতে চেয়েছিল। মারও তাই ইচ্ছে ছিল। শেষ ঘটনা—লোকটিও নিরক্ষরতা, নেশা ও বাল্যবিবাহের কু-ফল বুঝতে পেরেছিল। এখানেই নাটকের সার্থকতা।

এই পালায় কারিগরি সহায়তায় ছিলেন ঃ আবহসঙ্গীত ও শব্দ—প্রভাতাংশু দাস, নেপথ্য কণ্ঠ—সবিতা মজুমদার, আশিস মোদক ও দেবযানী, নেপথ্য সঙ্গীত—উত্তম সাহা ও শেলী দাস। পুতুল সঞ্চালক—লীলা দাস, অমিয় দে, প্রভাতাংশু দাস, বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী, দীপক দত্ত, ফনীভূষণ চক্রবর্তী, প্রদীপ দাস, সত্য রায়, গৌরী দাশগুপ্তা এবং জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য।

হরিপদ দাসের পরিকল্পনা এবং পরিচালনায় 'যাদুকর' এক অনবদ্য সৃষ্টি। পুতুলনাচের নাট্যরূপ রচনা প্রভাতাংশু দাস। নেপথ্য কণ্ঠে ছিলেন ফনীভূষণ চক্রবর্তী এবং জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য।

পুতুল সঞ্চালক— প্রদীপ দাস, অমিয় দে, প্রভাতাংশু দাস, দীপক দত্ত, সত্য রায়, বিদ্যুৎ রায়চৌধুরী, জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য ও ফনীভূষণ চক্রবর্তী।

সঙ্গীত নাটক একাডেমী সংগঠিত ও প্রযোজিত রড ও গ্লাবস্ পুতুল উৎসব ও কর্মশালা (সহযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর)-তে

ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার সম্মানের সঙ্গে আমন্ত্রিত হয়। সেখানে তাঁরা প্রযোজনা করেন 'গুপ্তধন' (বিনোদন পুতুল নাচ)।

একজন গ্রাম্যলোক ও তার অল্পবয়সী নিরক্ষর বোকা বৌকে নিয়ে এ গল্প। লোকটি তার পৈত্রিক সঞ্চয় সোনারমোহর বাড়ীর উঠোনের ধারে এক গাছের কাছে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেছিল। বোকা বৌ জানতো না এগুলি সোনার মোহর। একদিন সে দুই চতুর বাসন বিক্রেতার পাল্লায় পড়ে। চতুরলোক দুটি কিছু বাসনের পরিবর্তে মোহরগুলি নিয়ে যায়। গ্রাম্যলোকটি তারপর ঐ লোকগুলির কাছ থেকে মোহরগুলি উদ্ধার করে এবং বোকা বৌকে মোহরের গুরুত্ব বুঝিয়ে দেয়। তারপর দুজনেই উপযুক্ত স্থানে নিরাপদে সঞ্চিত ধন রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। এ কাহিনী অল্পবয়সে বিবাহ, নিরক্ষরতা এবং সঞ্চিতধন নিরাপদ স্থানে না রাখার কু-ফল বিষয়ে আলোকপাত করে।

যাদুকর

প্রতিটি ক্ষেত্রে হরিপদবাবু নতুনত্বের সৃষ্টিতে উজ্জ্বল, এক্ষেত্রেও তাই। গুপ্তধনের অনুষ্ঠান উচ্চপ্রশংসিত হোল।

অনুষ্ঠানে পুতুল সঞ্চালক ছিলেন—শ্রীমতী লীলা দাস, প্রদীপ দাস, দীপক দত্ত, অমিয় দে, প্রভাতাংশু দাস এবং জয়নারায়ণ ভট্টাচার্য।

নাটকে আলোকসম্পাতের অদ্বিতীয় যাদুকর ত্রিপুরার উন্নত পুতুলনাচের পথপ্রদর্শক, শ্রী হরিপদ দাস প্রতিভা, সাধনা ও প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাগত যোগ্যতায় অনেকের থেকে অনেক এগিয়ে।

ত্রিপুরার লেখকদের প্রকাশিত নাটক

(প্রথম পর্ব)

[রমাপ্রসাদ দত্ত সংগৃহীত:]

১। ১৯৬০ খৃঃ— যাত্রা হল সুরু—অগ্নিকুমার আচার্য

২। ১৯৭১ খৃঃ— রক্তস্বাক্ষর—গোপাল দে

৩। ১৯৭২ খৃঃ— রূপ ও রূপান্তর—অধ্যাপক জ্ঞানপ্রকাশ মণ্ডল

৪। ১৯৮০ খৃঃ— হকুনর ছাও—ডক্টর রামকৃষ্ণ দেবনাথ

৫। ১৯৮২ খৃঃ— সমকালের পালা—গণতান্ত্রিক লেখকসমিতি

৬। ১৯৮২ খৃঃ— শিশুরাজার দেশ—অগ্নিকুমার আচার্য

৭। ১৯৮৫ খৃঃ— সংহতি সূর্য্য জাগো—অগ্নিকুমার আচার্য

৮। ১৯৮৬ খৃঃ— মৃতসৈনিকের ডায়েরি—অগ্নিকুমার আচার্য

৯। ১৯৮৬ খৃঃ— সাদা পায়রার জন্য—চন্দন সেনগুপ্ত

১০। ১৯৮৬ খৃঃ— সদ্গতি—কল্যাণ রায়

১১। ১৯৮৭ খৃঃ— বিদ্রোহী সন্নাসী—শ্রীবিকাশ

১২। ১৯৮৭ খৃঃ— দিন দিন প্রতিদিন—রতীশ মজুমদার

১৩। ১৯৮৭ খৃঃ— পথনাটিকা—কমল রায়চৌধুরী

১৪। ১৯৮৭ খৃঃ— ত্রয়ীনাটক—প্রফুল্ল দেবনাথ

১৫। ১৯৮৮ খৃঃ— একাঙ্কিকা—প্রফুল্ল দেবনাথ ও নিধু হাজরা

১৬। ১৯৮৮ খৃঃ— দু'বিঘা জমি—প্রফুল্ল দেবনাথ

১৭। ১৯৮৮ খৃঃ— মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে—মলয় চক্রবর্তী

১৮। ১৯৮৯ খৃঃ— বধূহত্যা—গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯। ১৯৯০ খৃঃ— ক্ষুধার পেটে—মন্টুরাম মহিষ্যদাস

২০। ১৯৯৪ খৃঃ— রাজার সাজা—হীরেন্দ্র সিন্‌হা

২১। ১৯৯৪ খৃঃ— অথ শিবুরাম কথা—রতীশ মজুমদার

২২। ১৯৯৪ খৃঃ— ছুমন্তর—নরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য

২৩। ১৯৯৪ খৃঃ— শেষ চিঠি—সমর বিশ্বাস

২৪। ১৯৯৫ খৃঃ— ভালবাসার মৃত্যু নেই—প্রদীপ আচার্য
২৫। ১৯৯৫ খৃঃ— নীরমহলের রাজা—প্রদীপ আচার্য
২৬। ১৯৯৫ খৃঃ— এ যুগের একাঙ্ক—তমাল চক্রবর্তী
২৭। ১৯৯৪ খৃঃ— দু'টি একাঙ্ক—তমাল চক্রবর্তী
২৮। ১৯৯১ খৃঃ— সদগুরু নিগমানন্দ—চন্দনা দেবনাথ
২৯। ১৯২৬ খৃঃ— জয়াবতী ও ত্রিপুরাসতী—ত্রিপুর নাট্যসম্মিলনী
৩০। ১৯০৫ খৃঃ— জীবনমঙ্গল—দৌলত আহাম্মদ
৩১। ১৯১৭ খৃঃ— পতিব্রতা—মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মণ
৩২। ১৯২৫ খৃঃ— রেশম—যোগেশচন্দ্র চৌধুরী
৩৩। ১৯৪৪ খৃঃ— বাংলা দেশের মাটি—জ্যোতিপ্রসন্ন সেনগুপ্ত
৩৪। ১৯৬৩ খৃঃ— প্রকৃতি—রানা ডাহালজং ও নগেন্দ্র দেববর্মণ
৩৫। ১৯৯৪ খৃঃ— কচি কাঁচার নাটক—পদধ্বনি প্রকাশন
৩৬। ১৯৯৭ খৃঃ— নক্সীকাঁথার মাঠ—অজিত মজুমদার
৩৭। ১৯৯৫ খৃঃ— দিনের বাণী—মঞ্জুরাণী বিশ্বাস
৩৮। ১৯৯৫ খৃঃ— ইঁমাগী যৌগন—মনিপুরী নাটক—চন্দ্রকুমার সিংহ

রাখাল রায়চৌধুরী রচিত এবং পরিচালিত নাটক সমূহ

১। 'পদধ্বনি' — তিন অঙ্ক — ১৯৫১
২। 'দর্শকের গ্যালারী থেকে' — ১৯৬৭
৩। 'ভোরের আলো' — একাঙ্ক — ১৯৯০
৪। 'শাহজাদী' — ১৯৯২
৫। 'আড়ি' — (ছোটদের একাঙ্ক) — ১৯৮২
৬। 'একক সংলাপ' — একটি চরিত্র — ১৯৯২
৭। 'আমি আজ চোর বটে' — ১৯৯৬
(রবীন্দ্রনাথের 'দুইবিঘা জমি' অবলম্বনে।)

ত্রিপুরায় উল্লেখযোগ্য নাট্যসংস্থার অভিনীত নাটকপঞ্জী

উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ

১৮৯২খৃঃ

'কল্যাণী'

প্রযোজনায়— উজ্জয়ন্ত নাট্যসমাজ

পরিচালনা— মহারাজকুমার মহেন্দ্র দেববর্মণ

স্থান— রাজবাড়ির অঙ্গন

১৮৯৭খৃঃ

চাঁদবিবি

পরিচালনা— ম: কু: মহেন্দ্র দেববর্মণ

১৫ই জুন

স্থানঃ— খোসবাগ।

মেবার পতন

পরিচালনা— ম: কু: মহেন্দ্র দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ৭ই আগষ্ট

স্থান ঃ— খোসবাগ

পতিব্রতা

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

তারিখ ঃ— ২রা ফেব্রুয়ারী

স্থান ঃ— রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন মুক্তপ্রাঙ্গন।

১৮৯৮খৃঃ

'উপেক্ষিতা'

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

তারিখ ঃ— ১৫ই মার্চ

স্থান ঃ— খোসবাগ

কালাপাহাড়

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

স্থান ঃ— খোসবাগ

তারিখ ঃ— ১৮ই এপ্রিল

১৮৯৯খৃঃ

সাজাহান

পরিচালনা— রাঃ কুঃ মহেন্দ্র দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ২রা মে

স্থান ঃ— রাজবাড়ির মুক্তপ্রাঙন

১৮৯৯খৃঃ

দুর্গাদাস

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

তারিখ ঃ— ১৪ই জুন

১৯০০খৃঃ

রাণাপ্রতাপ

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

তারিখ ঃ— ৪ঠা ফেব্রুয়ারী

স্থান ঃ— খোসবাগ

চাঁদ সওদাগর

পরিচালনা— মঃ কুঃ মহেন্দ্র দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ১৭ই সেপ্টেম্বর

স্থান ঃ— উজিরবাড়ির মুক্তপ্রাঙন

চন্দ্রগুপ্ত

পরিচালনা— মঃ কুঃ মহেন্দ্র দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ২১শে নভেম্বর

স্থান ঃ— রাজবাড়ির মুক্তপ্রাঙন

ত্রিপুর গৌরব

পরিচালনা— ব্রজেন্দ্র মুখার্জি

তারিখ ঃ— মে

স্থান ঃ— খোসবাগ

১৯০৫খৃঃ

বিসর্জন

পরিচালনা— ম: কু: মহেন্দ্র দেববর্মণ

স্থানঃ— রাজবাড়ির প্রাঙ্গন।

পুষ্পবন্ত নাট্যসমাজ

১৯০৪খৃঃ

দেবল্যা দেবী

পরিচালনা— ম: কু: রণবীর দেববর্মণ

স্থান ঃ— খোসবাগ

১৯০৬খৃঃ

চাঁদ কুমুদিনী

পরিচালনা— মহারাজা বীরেন্দ্র কিশোর

১৯১২ খৃঃ

বৃন্দাবন বিলাস

পরিচালনা— মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর

স্থান ঃ— রাজবাড়ির প্রাঙ্গন

১৯১৫ খৃঃ

দোললীলা

প্রযোজনা ঃ— রাজঅন্তঃপুর রঙ্গমঞ্চ

পরিচালনা— মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর

তারিখ ঃ— ৪ঠা এপ্রিল।

১৯১৬ খৃঃ

দোললীলা

প্রযোজনা ঃ— রাজঅন্তঃপুর রঙ্গমঞ্চ

পরিচালনা— মহারাজা বীরেন্দ্রকিশোর

তারিখ ঃ— ৪ঠা এপ্রিল।

১৯১৭ খৃঃ

আলিবাবা

পরিচালনা— রণবীরকিশোর দেববর্মণ

রণবীর কর্তার থিয়েটার পার্টি

১৯১৭ খৃঃ

সমাজ

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ৫ই সেপ্টেম্বর

স্থানঃ— খোসবাগ

দেবলাদেবী

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ৫ই সেপ্টেম্বর

স্থানঃ— খোসবাগ

লায়লামজনু

পরিচালনা— অন্দরমহল নাট্যশালা

স্থান ঃ— রাজঅন্তঃপুর

১৯১৭ খৃঃ

মেবারপতন

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ১২ই মে

১৯১৮ খৃঃ

জন্য

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ২৩শে মার্চ

স্থান ঃ— রাজবাড়ির অঙ্গন।

ত্রিপুর গৌরব

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

প্রভাস মিলন

পরিচালনা— অন্দরমহল নাট্যশালা

তারিখ ঃ— ৩রা সেপ্টেম্বর

জয়াবতী ও ত্রিপুরসতী

পরিচালনা— অন্দরমহল নাট্যসমাজ

তারিখ ঃ— ২১শে সেপ্টেম্বর

হিন্দুবীর

পরিচালনা— ম: কু: রনবীর দেববর্মণ

স্থান ঃ— খোসবাগ

১৯১৯ খৃঃ

হরিশচন্দ্র

পরিচালনা— রনবীর দেববর্মণ

তারিখ ঃ— ৩রা জুন

স্থান ঃ— রাজবাড়ির প্রাঙ্গন

১৯২৩ খৃঃ

ভীষ্ম

প্রযোজনা ঃ— উমাকান্ত একাডেমী ছাত্র নাট্যসংস্থা

পরিচালনা— দীনেশচন্দ্র চৌধুরী

স্থান ঃ— উমাকান্ত একাডেমী হল।

১৯২৪ খৃঃ

বিপ্রলব্ধা

পরিচালনা— মহরাজকুমারী ইলা দেবী

তারিখ ঃ— ৩রা মার্চ

হিন্দুবীর

প্রয়োজনা ঃ— ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী

পরি :— মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর

তারিখ ঃ— ৫ই সেপ্টেম্বর

১৯২৪ খৃঃ

গুরুদক্ষিণা

প্রয়োজনা ঃ— ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী

পরিঃ— মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর

তারিখঃ— নভেম্বর

প্রফুল্ল

প্রযোজনা ঃ— তরুণ সংঘ

তারিখ ঃ— ৫ই সেপ্টেম্বর

রঘুবীর

প্রযোজনা ঃ— তরুণ সংঘ

১৯২৫ খৃঃ

প্রতাপাদিত্য

প্রযোজনা ঃ— তরুণ সংঘ

১৯২৬ খৃঃ

মন্ত্রশক্তি

প্রযোজনা ঃ— তরুণ সংঘ

বাসুকী

পরিচালনা— লক্ষ্মীনারায়ণ অপেরাপার্টি

রিজিয়া

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্যসম্মিলনী

শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলাবিলাস

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্য সম্মিলনী

১৯৭২ খৃঃ

রোশেনারা

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুর নাট্যসম্মিলনী

দুর্গাদাস

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

শ্রী

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্যসম্মিলনী

রিজিয়া

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

১৯২৮ খৃঃ

বঙ্গনারী

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

পরিঃ— সুধাংশুমোহন দত্ত।

ব্যাপিকা বিদায়

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুর নাট্য সম্মিলনী

তারিখ ঃ— ২৯শে জানুয়ারী

স্থান ঃ—আস্তাবল ময়দান

বোধন বিসর্জন

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্যসম্মিলনী

পথের শেষে

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্যসম্মিলনী

তারিখ ঃ— ৩০শে জানুয়ারী

স্থান ঃ— আস্তাবল মাঠ

বঙ্গেবর্গী

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

পরিঃ— সুধাংশুমোহন দত্ত

স্থান ঃ— দুর্গাবাড়িমণ্ডপ

১৯২৯খৃঃ

মেবার পতন

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

পরি ঃ— সুধাংশু মোহন দত্ত

স্থান ঃ— উমাকান্ত একাডেমী

১৯৩০ খৃঃ

পরপারে

প্রযোজনা ঃ— স্টুডেন্ট এসোসিয়েশন

১৯৩২ খৃঃ

চিরকুমার সভা

প্রযোজনা ঃ— ত্রিপুরা নাট্যসম্মিলনী

রমাপ্রসাদ দত্ত-র রচনা হতে গৃহীত।